শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম পাঠ

ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, এম. এস্‌সি. (গোল্ড মেডালিস্ট), বি. টি.
অধ্যাপক, শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিএনবিএ ব্রাদার্স
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

আগস্ট, ১৯৬১

ডিএনবিএ ব্রাদার্সের পক্ষে সন্দীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রথম পত্র/প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় পত্র/প্রথম খণ্ড: শ্রীরাধাশ্যাম রায় কোঙার, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রেস, ৯এ, রামধন মিত্র লেন কলিকাতা-৪, প্রথম পত্র/দ্বিতীয় খণ্ড: শ্রীতুলসীচরণ বক্সী, ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৩ডি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, দ্বিতীয় পত্র/দ্বিতীয় খণ্ড: শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, রেনবো প্রিন্টার্স, ১এ, কার্তিক বোস লেন, কলিকাতা-৬, ব্যবহারিক অংশ: শ্রীপ্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, টাইপোগ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া, ৩৬এ, তালপুকুর রোড কলিকাতা-১০ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

নতুন +২ কোর্সের অর্থাৎ ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট 'শিক্ষাতত্ত্বের' সিলেবাস অনুযায়ী 'শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম পাঠ' লিখিত হল। শিক্ষাতত্ত্ব একটি নতুন বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের নতুন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ইহা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কারণে বিষয়টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার।

শিক্ষাতত্ত্ব একটি সামাজিক বিজ্ঞান (social science)। গণিত বা ভৌত বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের একটি সুবিধা এই যে, ইহা দেশ-কাল ভেদে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নীতি তেমন খাটে না। প্রত্যেক দেশেই সামাজিক বিজ্ঞানের আদর্শ নির্ধারিত হয় ঐ দেশের সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। শিক্ষাবিদদের মত এই যে, সামাজিক বিজ্ঞান অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতির মূল্যমান ও তত্ত্ব নির্ধারিত হয় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা। তাই দেখি ইংরেজ আমলে ভারতের ইতিহাস যে ভাবে লিখিত হয়েছে বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—স্বাধীন ভারতে তাহা সাধারণভাবে পরিত্যক্ত। পূর্বে অর্থনীতির বিভিন্ন প্রকল্প বিদেশী শাসনের সমর্থনে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হত এখন তা বহুলাংশে পরিবর্তিত।

শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কেও এই নীতি সমান ভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক সমাজে শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির ধ্যানধারণা, জীবন আদর্শ, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা যেমন রূপায়িত হবে, তেমনি সমগ্র জাতিকে 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'-এর মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করবে। জাতীয় শিক্ষার এই আদর্শটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কতটুকু রূপায়িত হয়েছে তা বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা তাদের দ্বারাই করা সম্ভব যাদের শিক্ষাতত্ত্বের মৌল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রেখে 'শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম পাঠ' লিখিত হয়েছে।

এতকাল আমরা শিক্ষাতত্ত্বের মূল তত্ত্বের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের আলোচনা ও নীতির উপর নির্ভর করেছি। কিন্তু আমাদের দেশেও যে **রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের** মত মহান শিক্ষাবিদদের আবির্ভাব হয়েছে এবং শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাদের মতামত আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূল ভিত্তি স্থাপনে সবিশেষ উপযোগী—এই বিষয়টির দিকে এই পুস্তকে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই পুস্তক রচনায় যে বিষয়টি সদাসর্বদা মনে রাখা হয়েছে তা হল—

'পাঠ্য পুস্তক কেবলমাত্র সংবাদ বহন করিবে না, ইহা ছাত্রছাত্রীদের মনকে উদ্বুদ্ধ করিবে।' (রবীন্দ্রনাথ)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম পাঠের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বের হল। এই সুযোগে সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধন্যবাদ জানাই যারা তাদের স্কুল ও কলেজের জন্য পুস্তকখানি মনোনীত করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই পুস্তকখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে পুস্তকখানির ভাষা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা প্রভৃতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও সন্দেহ করেছিলেন যে, চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে পৃথক ধরনের এই পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাপাশের পক্ষে তেমন উপযোগী হবে না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হওয়ায় ঐ আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে পুস্তকখানির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অনেক নূতন বিষয় যোগ করা হয়েছে এবং কয়েকটি অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হয়েছে। আশা করি এই সংস্কারের ফলে পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষায়তনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট অধিকতর উপযোগী মনে হবে। পুস্তকখানিকে বিষয়বস্তু অনুসারে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রথম পত্র (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড) এবং দ্বিতীয় পত্র (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)। প্রথম পত্র ১ম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে শিক্ষার তত্ত্ব সম্পর্কে যাকে ইংরাজীতে বলা হয় **Principles of Education.** এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যেমন—

(১) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা (২) উদার অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য, (৩) পুরাতন শিক্ষা ও নূতন শিক্ষা, (৪) শিক্ষার ভিত্তিসমূহ ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি—**"Education is the manifestation of the perfection already in man"** অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে তার বিকাশ ঘটানোই শিক্ষা—এই বিষয়টি শিক্ষার সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখা এপর্যন্ত কোন পাঠ্যপুস্তকে করা হয়নি। এ ছাড়া শিক্ষার অর্থ হল বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং শিক্ষার অর্থ হল উপযোজন বা সংগতি বিধান। এই প্রসঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা মনে হয় একমাত্র এই পুস্তকেই পাওয়া যাবে। চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথক করে আলোচনা করা হয়েছে—'শিশু, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষককে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন?' শিশুর বিকাশে বংশগতি পরিবেশের তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং শিশুদের বুদ্ধি, শিক্ষালাভের ক্ষমতা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ একটি আধুনিক চিত্তাকর্ষক আলোচনা। পাঠ্যক্রমের সংগঠন আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্কুলে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১ম পত্রের ২য় খণ্ডে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অংশটি সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখিত হল। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষায় দুই ভাষার প্রভাব সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষানীতি সম্পর্কে যারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমালোচনা করছেন তাদের দৃষ্টি এই অংশটির দিকে আকর্ষণ করি। মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নূতনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণটিও সচিত্র করা হয়েছে এবং বইয়ের শেষাংশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশমত বহু 'আদর্শ প্রশ্ন' দেওয়া হয়েছে। এই আদর্শ প্রশ্নে **Psycho-educational test** এক নতুন ধরনের প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলি সাধারণত করা হয়েছে উন্নত মানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

আশা করি এই সংস্করণটিও ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন অধিকতর সুষ্ঠুভাবে মেটাতে সক্ষম হবে।

ইতি
ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য

স্নেহের রঞ্জন ও তনিকাকে

বাবা

EDÚCATION

(Elective)

Full Marks—200

PAPER I (Marks—100)

1. Education—its meaning, necessity, aims and functions.
2. Education and Community—home, school and society.
3. Factors of Education—child, teacher and curriculum.
4. Education in India—Primary, Secondary and Higher : Aims and objectives.
5. Issues in Education in Modern India : Literacy, Community service, women's education, national integration, development of vocational efficiency. (Issues are to be studied with brief historical perspective).

PRACTICAL

Data of Educational Surveys and their gràphical representations Bar, Line, Pie graphs) and preparation of charts and aids for ommunity Education.

PAPER II (Marks—100)

1. Education and Psychology.
   Educational Psychology—its nature and functions.
2. Psychological neĕds of children—their emotions, interests and attitudes.
3. Child learning—its nature and various mechanisms · Observation and imitation, trial and error, conditioning and insight.
4. Some modern educational practices.
   Learning by doing : Project, workshop and laboratory methods.
5. End-product of learning—evaluation practices and follow-up for improvement.

PRACTICAL

Study of child-achievement in schools—General treatment of ores simple graphical representation and discussion.

ext Book .

[Total No. of pages 400 plus 10 percent extra for practical ortion. Relaxation may be allowed upto 15 percent over and ove the maximun page limit specified.] Size of the book : ouble Demy 1/16. Small Pica.

বিষয়সূচী

প্রথম পত্র / প্রথম খণ্ড

প্রথম পত্র / দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পত্র / প্রথম খণ্ড

---

* উন্নততর পর্যায়ে অতিরিক্ত পাঠ্য

দ্বিতীয় পত্র / দ্বিতীয় খণ্ড

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাবাণী।। জীবনের যাহা লক্ষ্য, শিক্ষারও লক্ষ্য তাহাই। শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শিক্ষাবাণী :: মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতার সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার কাজ হল তার প্রকাশ ঘটানো।

শিক্ষাগুরু মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষাবাণী ।। শিক্ষা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়—শিক্ষা একটি বিশেষ লক্ষ্য-সিদ্ধির সাধন। আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টির সহায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই কেবল যথার্থ শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

প্রগতিশীল শিক্ষা-দার্শনিক জন ডিউই

শিক্ষাবাণী ॥ শিক্ষা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ। শিক্ষার কাজ হল অভিজ্ঞতার মূল্যবান অংশ সর্বাংশিকভাবে নূতন কাজের জন্য স্থানান্তরিত করা। শৈশবকালেই হোক বা বয়স্ককালেই হোক, ব্যক্তি জীবনযাপনের মাধ্যমে কিছু না কিছু শিখে থাকে। এই অর্থে জীবনই হল শিক্ষা।

প্রথম পত্র

● প্রথম খণ্ড ●

১. শিক্ষাশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

২. শিক্ষার তাৎপর্য, প্রয়োজন, লক্ষ্য ও কাজ

৩. শিক্ষা ও সামাজিক গোষ্ঠী-গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ

৪. শিক্ষার উপাদান : শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক

১

শিক্ষাশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

EDUCATION—AS A SUBJECT

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে শক্তি হিসাবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দান করে। এই শিক্ষার জোরেই মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে রোগের ভয়, মৃত্যুর ভয়, দুর্ভিক্ষের ভয়, অত্যাচারীর অত্যাচারের ভয়, কুসংস্কারের ভয় প্রভৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকৃত স্বরাজ প্রদান করে এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন শক্তিমান মানুষে পরিণত করে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনের দাসত্ব মোচন করা।

শিক্ষার তাৎপর্য মানুষের জীবনে অপরিসীম। সুতরাং আমাদের সকলকে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে।

আধুনিক পাঠক্রমে **শিক্ষাশাস্ত্র** একটি নতুন বিষয়। শিক্ষার গতি-প্রকৃতি, লক্ষ্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এই শিক্ষা-শাস্ত্রের সংজ্ঞাটি কি ?

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে শিক্ষার লক্ষ্য, ভিত্তি, পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা, শিখননীতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারা যায় তাকে শিক্ষাশাস্ত্র বলে। শিক্ষাশাস্ত্রকে কেউ কেউ বলেন শিক্ষাবিজ্ঞান।

ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় শিক্ষাশাস্ত্রকে একটি বিশুদ্ধ বিষয় বলা চলে না। ভূগোলশাস্ত্রের ন্যায় শিক্ষাশাস্ত্রেও বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব দেখা যায়। ভূগোলে যেমন গণিত, ভূ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব দেখা যায়, তেমনি শিক্ষা-শাস্ত্রেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল—**দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাশিবিজ্ঞান** প্রভৃতি।

মানব সংস্কৃতি অখণ্ড। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা অখণ্ড জ্ঞানকে অনেকগুলি অংশে ভাগ করেছি এবং এক একটি অংশের নাম দিয়েছি এক একটি বিষয়, যথা—ভাষা, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সমাজসেবা প্রভৃতি। বিজ্ঞানশাস্ত্রকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—[ক] **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান,** [খ] **জীববিজ্ঞান,** [গ] **আচরণবিজ্ঞান** ও [ঘ] **সমাজবিজ্ঞান।**

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ছকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বিজ্ঞান

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	জীববিজ্ঞান	আচরণবিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান
১. পদার্থবিদ্যা	১. প্রাণিবিদ্যা	১. মনোবিজ্ঞান	১. ইতিহাস
২. রসায়নবিদ্যা	২. উদ্ভিদবিদ্যা		২. ভূগোল
৩. ভূবিদ্যা	৩. নৃতত্ত্ব		৩. অর্থবিদ্যা
৪. জ্যোতির্বিদ্যা			৪. সমাজতত্ত্ব
৫. গণিত			৫. শিক্ষাতত্ত্ব
৬. রাশিবিজ্ঞান			

উপরোক্ত ছক বা তালিকায় একটি প্রধান বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটি হল **দর্শন**। দার্শনিকেরা দর্শনকে বলেন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। এই মন্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। কারণ পদার্থবিদ্যাই বল, বা রসায়নবিদ্যাই বল বা প্রাণিবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যে বিজ্ঞানের বিষয়ে আমরা বলি না কেন প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির মূলে আছে দর্শনশাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্র থেকে ঐ বিজ্ঞানগুলি বিচ্ছিন্ন করে বর্তমানে নতুন বিষয় হিসাবে চর্চা করা হচ্ছে। ঐ দিক থেকে আমরা বলতে পারি শিক্ষাতত্ত্ব দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বিশ্বে যতজন শিক্ষামনীষীর কথাই আমরা আলোচনা করি না কেন, তা থেকে একটা বিষয় আমরা দেখতে পাই যে, তারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ধরনের দার্শনিক মতের প্রবক্তা। এদিক থেকে প্লেটোকে আমরা বলতে পারি একজন ভাববাদী দার্শনিক, রুশোকে বলতে পারি একজন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক, ডিউই একজন প্রয়োগবাদী দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষাবিদ্ হিসাবে একজন ভাববাদী, গান্ধীজীর মধ্যে ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মূলত ভাববাদ দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত।

শিক্ষাতত্ত্বে এই দর্শনের প্রভাব কিভাবে কাজ করে থাকে? শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের কথা আমরা শিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে উল্লেখ করেছি। তার মধ্যে **শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য** দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের জীবনে কোন্ বিষয়টি মঙ্গলকর এটি একমাত্র দর্শনই স্থির করতে পারে। এই বিষয়ে অন্য বিষয়গুলির প্রভাব তেমন দেখা যায় না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি শিক্ষাতত্ত্বকে প্রভাবিত করে তা হল **মনোবিজ্ঞান**। এই সম্পর্কে স্যার জন অ্যাডাম্‌স নামক একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। **'আধুনিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞান-প্রভাবিত।'** মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন যে, পদ্ধতির ক্ষেত্রে দর্শনের চেয়ে মনোবিজ্ঞানের দান খুব বেশি। পদ্ধতির ক্ষেত্রে দর্শনের তেমন প্রভাব দেখা যায় না।

আমরা বলেছি, শিক্ষাতত্ত্ব একটি **সমাজবিজ্ঞান**। কারণ সমাজকে একটি আদর্শের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষার কাজ। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ **নান** এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে,

বিদ্যালয়-সমাজকে দু'ভাবে বিচার করা যায়। প্রথমত, বিদ্যালয়-সমাজ আমাদের বৃহৎ সমাজের অংশ। সেই দিক থেকে বিচার করলে বৃহৎ সমাজের গুণ এর মধ্যে দেখা যায়। বিদ্যালয়-সমাজ যখন বৃহৎ সমাজের অংশ তখন সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই এর মধ্যে প্রতিফলিত হবে। এই দিক থেকে বিচার করলে বৃহত্তর সমাজ ও বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। অপর দিকে বিদ্যালয়-সমাজে একটু কৃত্রিমতাও থাকবে। এটি বহির্জগতের যথার্থ প্রতিকৃতি হলেও জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ বা শক্তিমান শুধু তারই স্থান এতে থাকবে।

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে **নাগরিকতাবোধ** জাগ্রত করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে **সহযোগিতামূলক মনোভাব** সৃষ্টি করা। শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার্থীকে সামাজিকীকরণের নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়। এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের বিবর্তন ধারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীকে পরাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। পরাবিদ্যার অর্থ হল আত্মোপলব্ধি যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। বর্তমান যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার মানুষকে এমন এক শক্তির অধিকারী করেছে যে, মানুষ ইহকালেই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সচেষ্ট হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে উন্নত এক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে বুঝতে হলে তার ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারাটি বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষাতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। আবার মনোবিজ্ঞানের নানা বিষয় শিক্ষাতত্ত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করবার জন্য দরকার। শিক্ষাতত্ত্বে নানাবিধ মনোবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উপাত্ত নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবার দরকার হয়। এই কারণে শিক্ষাতত্ত্বে রাশিবিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। গাণিতিক গড, মধ্যক, প্রমাণ ব্যত্যয় ও প্রমাণ সাফল্যাঙ্ক, অনুবন্ধ সহগ প্রভৃতি রাশিবিজ্ঞানের বিষয়গুলি শিক্ষাবিষয়ক নানাবিধ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে শিক্ষাতত্ত্বে রাশিবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

শিক্ষাতত্ত্বের পরিধি বা আলোচ্য বিষয়সমূহ

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকল বিষয়ই শিক্ষাতত্ত্বের পরিধির অন্তর্গত। একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করলে তাদের তালিকা এইভাবে উল্লেখ করা যায়। যথা—

১. শিক্ষার তাৎপর্য, ২. শিক্ষার লক্ষ্য, ৩. শিক্ষার ভিত্তি, ৪. শিক্ষার উপাদান, ৫. শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা, ৬. শিক্ষকের গুণ ও কাজ, ৭. পাঠ্যক্রম, ৮. বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা বা অনুশাসন, ৯. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, ১০. শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি, ১১. শিক্ষার নিয়ম ও শিক্ষাতত্ত্ব, ১২. শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও তার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

বিষয় হিসাবে শিক্ষাতত্ত্বের সামাজিক ও বৃত্তিগত মূল্য

আমরা কোন বিষয় যখন পড়ি তখন কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখি না ; বিষয়ের সামাজিক ও বৃত্তিগত মূল্যের কথাও চিন্তা করি। আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান পড়ার যে ঝোঁক দেখা যায় তার পিছনেও সামাজিক ও বৃত্তিগত মূল্যের প্রভাব খুব বেশী। শিক্ষাতত্ত্ব বিষয় হিসাবে আধুনিক এবং এর মধ্যে বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ উভয় বিষয়ের প্রভাব দেখা যায়। এই কারণে যারা হিউম্যানিটিজ পড়তে ভালবাসে তারা এতে আনন্দ পায় এবং যারা বিজ্ঞানধর্মী বিষয় পড়ে আনন্দ পায় তারা এই বিষয়টি পছন্দ করে। পরবর্তীকালে আমাদের সকলকে পিতা ও মাতার দায়িত্ব পালন করতে হয়, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হয়, তখন শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব কাজে লাগে।

অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের যে সুবিধা, শিক্ষাতত্ত্বের পাঠের ভিতর দিয়ে আমরা সেগুলিও যথেষ্ট পেতে পারি। নতুন বিষয় হিসাবে আজকাল শিক্ষাতত্ত্ব বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে অনার্স ও এম. এ. পাস করে আমরা ঐ সকল স্কুল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে পারি। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞান শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। ঐ বিভাগে শিক্ষাতত্ত্বের স্নাতকদের সবিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। বিভিন্ন রাজ্যসরকার শিক্ষাতত্ত্বের এম. এ ডিগ্রীধারী ছাত্রছাত্রীদের স্টেট স্কলারশিপ দিচ্ছেন। শিক্ষাতত্ত্বের ভাল ছাত্রছাত্রীরা ঐ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

২

শিক্ষার তাৎপর্য, প্রয়োজন, লক্ষ্য ও কাজ

EDUCATION—MEANING, NECESSITY, AIM AND FUNCTIONS

শিক্ষার তাৎপর্য

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরাজী **Education** শব্দটি বাংলা শিক্ষা শব্দটির সমার্থক। **Education** কথাটি এসেছে ল্যাটিন **'Educere'** ধাতু থেকে। **'Educere'** কথাটির অর্থ হল পালন করা বা মানুষ করে তোলা। কথাটির অন্য অর্থ হল ভিতর থেকে আকর্ষণ করে আনা। [**E means 'Out of' and duco means 'I lead' Educere thus means to draw out or to lead out.]**

শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া

স্যার জন অ্যাডামসের মতে **'শিক্ষা একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া' [Education is a bipolar process.]**। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

শিক্ষক——————————শিক্ষার্থী

এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার একদিকে রয়েছেন শিক্ষক এবং অন্যদিকে রয়েছে শিক্ষার্থী। উভয়ের মানসিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। শিক্ষক তাঁর উন্নত পবিত্র এবং উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রে পরিবর্তন আনয়ন করেন। একটি সঠিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষককে জানতে হবে তাঁর ছাত্রকে। শিক্ষক জানবেন ছাত্রদের শিক্ষা লাভের যোগ্যতা, বুদ্ধির মান, প্রবণতা, গৃহ পরিবেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান। এই বিষয়টি অ্যাডামস অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'শিক্ষক ছাত্রকে গণিত শেখাচ্ছেন'—এই বাক্যটিতে শেখাচ্ছেন ক্রিয়াপদটির দুটি কর্ম রয়েছে,—যেমন ছাত্র ও গণিত। সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে যেমন 'গণিত' অর্থাৎ বিষয়টিকে জানতে হবে, তেমনি তাকে জানতে হবে ছাত্রকে। ছাত্রকে সঠিকভাবে না জানলে শিক্ষকের পক্ষে গণিত শিক্ষাদান সম্ভব হয় না।

স্যার জন অ্যাডামসের তত্ত্বের মধ্যে একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, অ্যাডামস তাঁর শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি। শিশু যেমন শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করে, তেমনি শিশু পরিবেশ থেকেও শিক্ষালাভ করে। আবার তত্ত্বটির অন্য ত্রুটি এই যে, শিক্ষার্থীর আত্মশিক্ষা প্রক্রিয়া (**Self education**) সম্পর্কেও এই তত্ত্বে কিছু বলা হয় নি।

শিক্ষা একটি ত্রি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া (Education is a Tripolar Process)

শিশুর শিক্ষায় যদি পরিবেশের প্রভাব আমরা স্বীকার করি, তাহলে শিক্ষাকে আমরা বলবো একটি 'ত্রি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া'। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি এইভাবে দেখানো যায়।
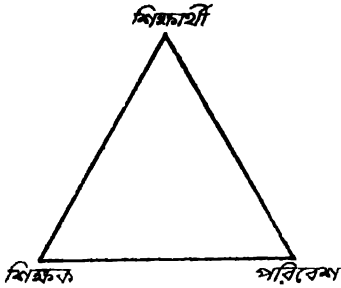
প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ অ্যাডাম্‌সন্‌ শিক্ষাকে একটি ত্রি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া বলেছেন। এই তিনটি মেরু হল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবেশ। অ্যাডাম্‌সনের মতে শিক্ষার মূল কথা হল, শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট থেকে যেমন শিক্ষা-লাভ করে তেমনি পরিবেশের প্রভাবেও তার আচরণে পবিবর্তন আসে। সুতরাং শিক্ষার্থী পরিবেশ থেকেও শিক্ষালাভ করে। অ্যাডাম্‌সন্‌ অবশ্য পবিবেশকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কবেছেন —যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানসিক পবিবেশ এবং নৈতিক পরিবেশ।

শিক্ষার দুটি শ্রেণী

শিক্ষাকে আমবা সাধারণত ২টি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education) এবং ২. অনুষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা বা পরোক্ষ শিক্ষা (Non-formal education)।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ স্কুল-কলেজে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কবে শিক্ষা দিযে থাকেন, তাকে বলা হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রত্যক্ষ শিক্ষা।

এই শিক্ষাব বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিক্ষা শিশু লাভ করে শিক্ষকেব প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুস্তকেব মাধ্যমে। এই শিক্ষায পূর্ব থেকে একটি পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়। শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিন কার্যক্রম অনুসরণ কবে একটি শিক্ষাবিধি পরিকল্পিত হয়। অল্পবয়স্ক শিশুদেব জন্য এই শিক্ষা কর্মভিত্তিক হতে পাবে এবং পরবর্তী ধাপে এই শিক্ষা হবে পুস্তককেন্দ্রিক। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করা এবং ভবিষ্যতের এক দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে তাব যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রেই এইরূপ শিক্ষাব একটি সামাজিক মূল্য আছে।

অনুষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা বা পরোক্ষ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ এরূপ শিক্ষাকে ইংরাজীতে বলা হয় Non-formal education। আমাদেব দেশে অধিকাংশ শিশুই এখন বিদ্যালযে পডবাব সুযোগ পায না। যারা বিদ্যালযে পড়বার সুযোগ পায় না তারাও সমাজে বাস করে অনেক সামাজিক গুন আয়ত্ত কবে। এই ক্ষেত্রে সমাজ তথা শিশুর পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে।

এরূপ পরোক্ষ শিক্ষাব ত্রুটি এই যে, এটি ধারাবাহিক নয। ব্যক্তি জীবনে নানা

সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এই শিক্ষালাভ করে থাকে। এই শিক্ষার তেমন কোন সামাজিক মূল্য দেওয়া হয় না। একে বলা যায় ঘটনাজাত শিক্ষা (Incidental education)। বর্তমানে এই পরোক্ষ শিক্ষাকে বয়স্ক শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এরূপ শিক্ষার সঙ্গে লেখাপড়ার কৌশল যুক্ত করে একে একটি প্রয়োজনীয় রূপ প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

পূর্বে গ্রাম্য সমাজজীবনে পরোক্ষ শিক্ষার একটি বিশেষ মূল্য ছিল। তখন যাত্রা, কথকতা বা পাঁচালী গানের ভিতর দিয়ে পরোক্ষভাবে একটি শিক্ষার জাল পাতা ছিল। দেশ-প্রেম, গুরুভক্তি, ঈশ্বরভক্তি, পাতিব্রত্য, প্রভৃতি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা ও আখ্যায়িকা যাত্রা, কথকতা বা কবিগানের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হত। এরূপ শিক্ষা পরোক্ষভাবে সমাজ-মনে কাজ করতো এবং সামাজিক শৃঙ্খলার মান বজায় রাখতো।

এই ধরনের শিক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, এই শিক্ষা বর্তমানের জটিল সমাজব্যবস্থায় তেমন উপযোগী নয়। এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীব কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় না এবং এই শিক্ষাব তেমন সামাজিক মূল্যও নেই।

• শিক্ষার দুটি তাৎপর্য : উদার অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে
Broader and Narrower Meanings of Education

শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন—উদার অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে। এখানে শিক্ষাব ঐ দুটি অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

উদার অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য : রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। প্রকৃতপক্ষে উদার অর্থে শিক্ষা জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত। উদার অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি কববার জন্য আমরা কযেকজন শিক্ষা-মনীষীর শিক্ষা সংক্রান্ত মতামত নিয়ে আলোচনা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'মানুষেব মনে যে পূর্ণতা রয়েছে তাব প্রকাশ ঘটানোই শিক্ষার কাজ'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মানুষের চরম প্রকাশ ঘটবে মনুষ্যত্ব লাভের ভিতর দিয়ে। শিক্ষাই মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করে'।

গান্ধীজী বলেছেন—'শিশুর শরীর মন ও আত্মাব মধ্যে যে গুণ সুপ্ত আছে, তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত কবাই শিক্ষার কাজ।'

শিক্ষাবিদ্‌গণ উদার অর্থে শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন :

১. উদার অর্থে শিক্ষাকে বিচার করা হয় একটি বিশেষ শক্তি হিসাবে যার সাহায্যে শিক্ষার্থী প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যাব সমাধান করতে পারে। উদার শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনকে ভয়-মুক্ত করে এবং শিক্ষার্থীর মনকে মিথ্যা জাতিভেদ, কুসংস্কার প্রভৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে উন্নত করতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন উদার প্রকৃতির শিক্ষার প্রভাবজাত মানুষ, যিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পুত্র হয়েও মিথ্যা আচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

২. এই শিক্ষা-প্রক্রিয়া পরীক্ষার পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা শৈশব থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করে।

৩ উদার শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মকেন্দ্রিক করে না, এটা সুচরিত্র গঠন করে এবং ব্যক্তির মধ্যে দেশপ্রেম প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটায়।

৪. উদার শিক্ষা ব্যক্তিকে দেশের ও দশের জন্য স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।

৫ উদার শিক্ষা ব্যক্তিকে এমন শক্তি দান করে যার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানে সক্ষম হয়।

৬. উদার শিক্ষা শিক্ষার্থীর চরিত্রে নির্ভীকতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

৭ উদার শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মবিচারে উদ্বুদ্ধ করে এবং সমস্যার সমাধানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ ঘটায়।

৮ উদার শিক্ষা ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক যুক্তিশক্তির বিকাশ ঘটায় এবং শিক্ষার্থীকে এমন শক্তি দান করে যার সাহায্যে মৌলিকতা ও সৃজনশক্তির (**Originality and creativity**) বিকাশ ঘটে।

৯ উদার প্রকৃতির শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারে।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য ঃ সাধারণ লোকে আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করে 'আমার ছেলেটির তেমন শিক্ষা লাভ হচ্ছে না'। এর অর্থ হল, বক্তার ছেলেটি স্কুলের লেখাপড়ায় তেমন উন্নতি করতে পারছে না। এখানে 'শিক্ষা' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যে ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয় ছেলেটি সেই শিক্ষায় তেমন কোন উন্নতি দেখাতে পারছে না। বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় তা অনুসরণ করে ছেলেটি ভাল ফল দেখাতে পারছে না। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য হল পরীক্ষায় পাস করা। আমরা স্কুল-কলেজে মুখস্থ করে বা অন্যভাবে যে জ্ঞান অর্জন করি, বই পড়বার শক্তি অর্জন করি, নানাবিধ কৌশল আয়ত্ত করি —ঐগুলিকে বলা হয় সংকীর্ণ শিক্ষা।

প্রাচীনকালে ভারতে শিক্ষার্থীদের দ্বাদশ বৎসর ধরে ব্যাকরণ শিখতে হত এবং মনে করা হত শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হল মুখস্থ করে কোন কিছু মনে রাখা। মধ্যযুগে য়ুরোপেও এই ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করা হত। তখন শিক্ষার্থীকে নানা বিষয়ের খবর সংগ্রহ করতে হত। নানা বিষয় সম্পর্কে নানা ধরনের জ্ঞান সংগ্রহ করাই ছিল শিক্ষা। এখনও আমাদের দেশের বহু অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে শিক্ষার্থীকে নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। ইংরাজ আমলে শিক্ষার অর্থ ছিল ইংরাজী ভাষা সঠিকভাবে লিখতে ও পড়তে জানা। শিক্ষার্থীর সাহিত্যের জ্ঞান,

গণিতের জ্ঞান, বিজ্ঞানের জ্ঞান তত প্রয়োজন ছিল না যত প্রয়োজন ছিল ইংরাজী জানা। আমাদের দেশে পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক হত—'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র'। অথবা 'গাছ থেকে তালটি টিপ্ করে পড়লো, না পড়ে টিপ্ করলো ?' ইউরোপে এইরূপ যে সকল সমস্যা নিয়ে তর্ক করা হত, তার একটি উদাহরণ হল, 'একটি পিনের অগ্রভাগে কতজন দেবদূত অবস্থান করতে পারে ?' অথবা, 'ঈশ্বর দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে কতটি উপত্যকা সৃষ্টি করতে পারেন ?' ইত্যাদি।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যায় :

১. পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় (Subjects) পুস্তকেব সাহায্যে বা শিক্ষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে এবং মুখস্থ করে আয়ত্ত করা।

২. শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাস করা এবং যে কোন উপায়েই হোক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা।

৩ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করা এবং যে সকল বিষয় পাঠ করলে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাওয়া যায় শিক্ষার্থী সেই সকল বিষয়ে আগ্রহ দেখায়।

৪ সংকীর্ণ শিক্ষার সহিত শিক্ষার্থীর চরিত্র বিকাশেব তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

৫. সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের অংশের সঙ্গে মাত্র পরিচয় লাভ করা, সম্পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে নয়।

৬. সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটায না। একটি উদাহরণেব সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। এরূপ কথিত আছে যে, একদিন গান্ধীজী একটি বিদ্যালয়ের' নিকট দিয়ে যাবার সময়ে লক্ষ্য করলেন, টিফিনেব সময়ে ছেলেরা একটি ফেরিওয়ালার নিকট থেকে নোংরা খাবার কিনে খাচ্ছে। একটি ছেলে অন্যদের বলছে—আমি আজ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পুরা নম্বর পাবো, কারণ আমি সকল প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর দিয়েছি। গান্ধীজী ছেলেটির কথা শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন—'খোকা, শোন, তুমি বলছ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পুরা নম্বর পাবে। কিন্তু তুমি ফেরিওয়ালার নিকট থেকে নোংরা খাবার কিনে খাচ্ছ দেখে মনে হয়, তুমি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছুই শেখোনি ? শুধু স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বই পড়ে মুখস্থ করেছো। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পরীক্ষায় তোমার শূন্য পাওয়া উচিত।"

এই ঘটনাটি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার একটি উদাহরণ। ছেলেটি বই পড়ে পরীক্ষায় ভাল নম্বব পাবে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি সম্পর্কে কিছু মাত্র জ্ঞান লাভ করে নি।

৭. সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক করে এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে বিমুখ করে।

প্রচলিত শিক্ষা বা পুরাতন শিক্ষা এবং নতুন শিক্ষা
Traditional or Old Education and New Education

স্যার জন অ্যাডাম্স প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথা,— প্রচলিত শিক্ষা এবং নতুন শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল যে, এই শিক্ষায় পাঠ্য

বিষয়টি হল প্রধান অর্থাৎ এই শিক্ষা হল বিষয়-কেন্দ্রিক। এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন প্রাধান্য থাকে না। শিক্ষার্থীকে পুনঃ পুনঃ চর্চার দ্বারা মুখস্থ শক্তির সাহায্যে পাঠ্য বিষয়টি আয়ত্ত করতে হয়। এই শিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটে না। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর যুক্তি শক্তিকে তীক্ষ্ণ করে না। এই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ বা জাতির কোনরূপ বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় না। প্রচলিত শিক্ষার প্রধান ত্রুটি, এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। প্রাচীন শিক্ষা যৌক্তিক পদ্ধতি নির্ভর অর্থাৎ Logical। প্রচলিত শিক্ষা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তিদানে বিশ্বাসী। প্রচলিত শিক্ষার নীতি হল শাস্তি না দিলে ছেলে মানুষ হবে না অর্থাৎ 'Spare the rod and spoil the child।

নতুন শিক্ষার বৈশিষ্ট্যঃ নতুন শিক্ষাকে ইংরাজীতে বলা হয় New Education। একে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাও বলে। এই নতুন শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে নতুন শিক্ষার পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়। এই শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষা দেন না, শিক্ষার উপযোগী এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন যাতে শিশু সহজেই নিজের চেষ্টায় পাঠ্য বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে। নতুন শিক্ষায় শিক্ষককে একজন ফুল বাগানের মালির সঙ্গে তুলনা করা হয়। মালি যেমন একটি গোলাপ ফুলকে অন্য ফুলে রূপান্তরিত করতে পারে না। তেমনি শিক্ষকও শিশুর যোগ্যতা, বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেবেন এবং শিশুর সম্ভাবনা অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করবেন। নতুন শিক্ষা শৃঙ্খলা রাখার জন্য 'মুক্ত শৃঙ্খলা রক্ষা' (Free discipline) নীতিতে বিশ্বাসী। এই শিক্ষায় শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান গৌণ। শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, পরামর্শদাতা পথ নির্দেশক (Friend, philosopher and guide)।

নতুন শিক্ষায় পাঠ্যক্রম স্থির করা হয় শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী। শিশু শিক্ষা লাভ করে বিদ্যালয় পরিকল্পিত বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে। পুস্তক থেকে ও শিক্ষকের নিকট থেকে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে তাকে বলা হয় পরোক্ষ জ্ঞান (Second-hand knowledge)। শিশু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে সক্রিয়তার মাধ্যমে অর্থাৎ কাজে অংশ গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিকে গান্ধীজী বলেছেন, 'Learning by doing'।

পরোক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Indirect knowledge and Direct knowledge)**ঃ** শিক্ষা লাভের ফলে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে তাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শিশু প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে বা কোন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান শিশুর নিজস্ব জ্ঞান। শিশু পুস্তক থেকে বা শিক্ষকের নিকট থেকে যে জ্ঞান লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা চলে না। একে বলা হয় পরোক্ষ জ্ঞান। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ শিশুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।

শিক্ষার ভিত্তি (Foundations of Education)

শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। সমাজ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার একদিকে রয়েছে শিক্ষার্থী ও অন্যদিকে রয়েছে সমাজ। যখন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে আমরা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করি— আমরা দেখি শিক্ষার সঙ্গে শিশু মনের সম্পর্ক খুব গভীর, শিশুর একটি জৈবিক সত্তা আছে। যে সকল শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন, তারা তা করেছেন একটি দার্শনিক চিন্তা থেকে। আবার কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শূন্যের উপর গড়ে ওঠে না। প্রত্যেক দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। উপরের আলোচনায় আমরা শিক্ষার কয়েকটি ভিত্তি নির্দেশ করতে পারি। এগুলি হল—

১. জৈবিক ভিত্তি (Biological bases of Education)।
২. সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি (Sociological bases of Education)।
৩. মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological bases of Education)।
৪. দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical bases of Education)।
৫. ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historical bases of Education)।

১. জৈবিক ভিত্তি ঃ শিক্ষার জৈবিক ভিত্তিগুলি যখন আমরা আলোচনা করি, প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে যে প্রত্যেক শিশুরই একটি জৈবিক সত্তা আছে। প্রত্যেক জৈবিক সত্তার প্রথম প্রয়োজন একটি সুস্থ শরীর। আমাদের আগে হতে হবে একটি সুস্থ প্রাণী (Healthy animal)। শিক্ষা লাভের প্রথম শর্ত হল একটি সুস্থ জীবন। একটি জৈবিক সত্তা হিসাবে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাত আছে। প্রথমত, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘস্থায়ী। এই দীর্ঘ শৈশবকালে মানুষের প্রযোজন শিক্ষা লাভের জন্য। দ্বিতীয়ত, মানুষের শরীর খুব নমনীয়। এই নমনীয়তার প্রয়োজন শিক্ষা লাভের জন্য। তৃতীয়ত, শৈশবকালে মানুষ পরনির্ভর। এই পরনির্ভরতাকে স্বনির্ভরতায় পরিণত করার জন্য শিশুর শিক্ষার প্রয়োজন। চতুর্থত, মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর তফাত এই যে মানুষ নিজের দুই পায়ের উপর সমস্ত শরীরের ভার রক্ষা করতে পারে। ফলে তার হাত দুটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এর ফলে মানুষের শিক্ষা লাভের সুযোগ অনেক বেশী।

২. সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি ঃ আমাদের শিক্ষার একদিকে রয়েছে **সমাজ**। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। একে আমরা বলি **সামাজিকীকরণ** (Socialisation)। অন্যদিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় আমাদের বিদ্যালয়েরও একটি সমাজ জীবন আছে। কিন্তু বিদ্যালয় সমাজ ও বৃহত্তর সমাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনশীল। এই কারণে আমাদের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও পরিবর্তনশীল। শিক্ষিত মানুষ যেমন সমাজকে পরিবর্তন করে,

তেমনি সমাজও ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এইরূপ আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজ ছাড়া আমরা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না, তেমনি আধুনিক বিশ্বে সমাজ আছে, কিন্তু বিদ্যালয় নেই এরূপ অবস্থাও আমরা কল্পনা করতে পারি না।

৩. **মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি:** শিক্ষার যে একটি মনোবৈজ্ঞানিক দিক আছে—এই দিকে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসী প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান হল 'শিশু'। কিভাবে শিশু নানা বিষয় শেখে, নানা কৌশল ও দক্ষতা আয়ত্ত করে—এই সম্পর্কে মনোবৈজ্ঞানিকেরা নানা গবেষণা করেছেন। শিশু মনের এই গতি প্রকৃতি না জানলে শিক্ষকের পক্ষে শিশুকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার সব শিশুই সমানভাবে শেখে না। বিভিন্ন শিশুর বুদ্ধি ও শিক্ষা লাভের ক্ষমতা পৃথক। এই সকল বিষয় বর্তমান শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ।

৪. **দার্শনিক ভিত্তি:** দর্শন যুক্তিসিদ্ধ উন্নত চিন্তার শেষ ফল। শিক্ষার পশ্চাতে কোন না কোন দর্শনের প্রভাব আছে। সাধারণত তিন শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষার উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এইগুলি হল ভাববাদ (**Idealism**), প্রয়োগবাদ (**Pragmatism**) এবং স্বভাববাদ (**Naturalism**)। পরবর্তী উচ্চ পাঠ্যক্রমে এই বিষয়গুলি বিশদভাবে জানতে হবে। তবে এই কথাটি মনে রাখতে হবে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রত্যেকটি বিষয় কোন না কোন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত।

৫. **ঐতিহাসিক ভিত্তি:** কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা শূন্যের উপর গড়ে উঠতে পারে না। তার পশ্চাতে প্রাচীন কোন ব্যবস্থা থাকে যার প্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়। যেমন, প্রত্যেক স্বাধীন দেশের শিক্ষা ঐ দেশের মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংলণ্ডে শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরাজী ভাষা, ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা, জাপানে জাপানী ভাষা। কিন্তু ভারতে ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য বর্তমানে খুব বেশী। বহু স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী। সকলেই স্বীকার করবেন যে, স্বাধীন দেশে এরূপ ব্যবস্থা সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, কেন ইংরাজীর এই প্রাধান্য। ভারতের গত ২০০ বৎসরের ইংরাজ শাসনই যে এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, এতে সন্দেহ নেই। কোন দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জানতে হলে অতীত ইতিহাসও জানতে হবে।

শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা *

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে তার বিকাশ ঘটানোই শিক্ষা

Education is the Manifestation of the Perfection already in Man

শিক্ষার প্রকৃতি নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। স্বামীজীর বক্তব্যের মূল কথা হল যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে একটি সম্ভাবনা এবং এটি রয়েছে

* উন্নততর পর্যায়ে অতিরিক্ত পাঠ্য।

সুপ্ত অবস্থায়। একটি বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে একটি বিশাল মহীরুহের সম্ভাবনা। উপযুক্ত পরিবেশ সূর্যতাপ, জল ও বায়ুর সাহায্যে সেই ক্ষুদ্র বীজ ধীরে ধীরে পরিণত হয় বিশাল বৃক্ষে। একটি ছোট শিশুর মধ্যেও রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা; উপযুক্ত পরিবেশে গৃহে পিতামাতা ও পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে সেই ক্ষুদ্র শিশু পরিণত হয় একজন দায়িত্বশীল নাগরিকে।

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন যে, জ্ঞান রয়েছে সুপ্ত মনুষ্য মনে। বাইরে থেকে আমরা কোন জ্ঞান পাই না। আমাদের মনে সুপ্ত রয়েছে আমাদের জ্ঞান। যখন আমরা বলি, 'সে জানে', এর অর্থ হল সে আবিষ্কার করেছে বা উন্মোচন করেছে। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই শক্তি কি কোথায়ও তার জন্য অপেক্ষা করছিল যাতে তিনি তা আবিষ্কার করতে পারেন? প্রকৃতপক্ষে এই বোধ নিউটনের মনেই ছিল। বহির্জগতের ঘটনা আমাদের মনে উত্তেজক হিসাবে কাজ করে এবং আমরা নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করি। আপেল ফলটি পড়া দেখে নিউটন এই শক্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। কিন্তু নিউটনের পূর্বেও বিশ্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল এবং আপেল ফলটির পড়াও অনেকে দেখেছে। কিন্তু একমাত্র নিউটন পারলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে আবিষ্কার করতে।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে আমরা দুটি বিষয়ের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারি। একটি হল বংশগতি এবং অন্যটি হল পরিবেশ। বংশগতির প্রভাব আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি শিশুর বিকাশ ধারায়। ফ্রয়েবেল বলেছেন—'গোলাপ গাছে গোলাপই জন্মাবে এবং একটি বাঁধাকপি কখনও গোলাপে পরিণত হবে না।' বংশগতি একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই শিশুকে বিকাশ লাভে সাহায্য করে। বংশগতি শিশুর বিকাশের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে। শিশুর বিকাশে পরিবেশও একটি বিশেষ উপাদান। উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া শিশুর বিকাশ কখনই সঠিকভাবে ঘটে না। শিশুর শিক্ষায় গৃহ পরিবেশ, সমাজ পরিবেশ ও বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে।

শিক্ষা হল জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান সঞ্চয়
Education by Accretion or Storage

শিক্ষার এই সংজ্ঞাটির তাৎপর্য হল এই যে, শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক তার উন্নত জ্ঞানকণা দ্বারা শিশুর অপূর্ণ ও শূন্য মনকে পূর্ণ করেন। শিক্ষক ও পুস্তক হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। শিশু শিক্ষা লাভ করে শিক্ষকের নিকট থেকে ও পুস্তক থেকে। শিক্ষকের নিকট আছে জ্ঞানের স্বর্ণ কণিকা, তিনি এর দ্বারা শিশুর শূন্য মনের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেন। এই তত্ত্বকে বলা হয় **স্বর্ণ কণিকা ও শূন্য ভাণ্ডার তত্ত্ব** (Gold-sack theory)।

যেমন উচ্চস্থান থেকে জলরাশি নল বেয়ে নিম্নস্থানে অবস্থিত শূন্য কুম্ভ পূর্ণ করে, তেমনি শিক্ষকের উন্নত জ্ঞানরাশি শিশুমনের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করে। [illegible] তত্ত্বটিকে বলা হয় **নল ও শূন্য কুম্ভ তত্ত্ব** (**Empty vessel and pipe theory**)।

উপরের দুটি তত্ত্বে জ্ঞান সংগ্রহ বা অর্জনকেই শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে যে, যেমন বস্তু দ্বারা শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করা যায়, তেমনি শিক্ষার্থীর শূন্য মনভাণ্ডারকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার উপরে উল্লিখিত দুটি তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা শিক্ষাকে সাধারণত এই অর্থে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ ব্যক্তিদের ধারণা, শিশুরা শিক্ষালাভ করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পুস্তক থেকে খবর সংগ্রহ করে। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদেরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় যাতে তারা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মুখস্থ শক্তির সাহায্যে পুস্তক থেকে নতুন জ্ঞানলাভ করতে পারে। এই নতুন জ্ঞান শিশু কতখানি মনে রাখতে পারে তার বিচার হবে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। যদি ছাত্র পরীক্ষায় পাস করতে পারে তা হলে সে পাবে পাসের সার্টিফিকেট। যে ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে কোন সার্টিফিকেট পেল না তাকে কোন মতেই শিক্ষিত বলা চলে না। শিক্ষার এই অর্থ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু সাধারণ লোকেরা পরীক্ষায় পাস করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাকেই শিক্ষা বলে থাকেন। কারণ, এই পরীক্ষায় পাসের সাহায্যে ব্যক্তির পক্ষে চাকুরি পাওয়া অধিকতর সহজ হয়। পরীক্ষায় পাস এবং সেই সম্পর্কে সার্টিফিকেট লাভ চাকুরি লাভের পাসপোর্ট।

'জ্ঞান অর্জনই শিক্ষা' এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হল এই যে, শিক্ষাকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি যত বেশি বিষয় মুখস্থ করে মনে রাখতে পারে তাকে বেশি শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে। শিশু যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিখে থাকে, কোন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে—এই তত্ত্বটি এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও দেখা যায়—এই তত্ত্বটি গ্রহণ-যোগ্য নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষা হল 'পুরাতন আচরণের পরিবর্তন'। শিক্ষার্থীর আচরণের উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ এই তত্ত্বে দেখা যায় না। আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক—শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ 'ব্যক্তিবৈষম্য' (**Individual differences**), তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে, বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে। পুস্তকের বিষয় তোতা পাখীর মতো মুখস্থ করলেই সেই জ্ঞান কারও নিজস্ব জ্ঞান হয় না। আলোচ্য সংজ্ঞাটিতে শিশুর অভিজ্ঞতা লাভের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা হয় নি। আমাদের বিদ্যালয়ে যেভাবে আমরা লেখাপড়া করি তাতে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ খুব কম। আমাদের বর্তমান শিক্ষার দুর্বলতা এখানেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: "ভাড়ার ঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য

সঞ্চয় করে আমরা তেমন করিয়া শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে।"

শিশুর মানসিক শক্তিগুলির উন্নতির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই শিক্ষা

Education as Mental or Formal Discipline

শিক্ষার এই তত্ত্বটির নাম **মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্ব**। এই তত্ত্বটির মূল কথা হল যে, দেহকে শক্তিশালী করতে হলে যেমন কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, তেমনি মনের বিভিন্ন গুণ বা শক্তিগুলিকে উন্নত করতে হলে, উপযুক্ত অনুশীলন বা অভ্যাসের প্রয়োজন। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞানলাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ধারণার শক্তি, বিচারের শক্তি, বিশ্লেষণের শক্তি, সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের শক্তি প্রভৃতি আয়ত্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বাল্যকাল থেকেই শিশুদেব মনকে সংযত করতে শেখাতে হবে। এই তত্ত্বেব সমর্থকদের মতে মানুষের মন হল কতকগুলি পৃথক শক্তির সমষ্টি এবং শিক্ষার সাহায্যে ঐগুলিকে উন্নত ও সুগঠিত করতে হবে। মনেব এই শক্তিগুলিব মধ্যে প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি, কল্পনাশক্তি, চিন্তন, স্মরণ, সংকল্প প্রভৃতি প্রধান।

পাশ্চাত্য দেশে এই তত্ত্ব বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের দেশেও এই তত্ত্বেব যথেষ্ট প্রভাব আছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, অতি প্রাচীনকালে গ্রীক দেশে মনীষী প্লেটো তার **রিপাবলিক্** গ্রন্থে এই তত্ত্বটির মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা দেওয়া হত তাবও উদ্দেশ্য ছিল প্রবৃত্তির সংযম সাধন এবং চবিত্র গঠন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মনে করতেন পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও অভ্যাস দ্বাবা ছাত্রকে ব্যাকরণ ও শাস্ত্রেব বিভিন্ন বিষয় অবগত করাতে হবে।

মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বেব প্রবক্তাদের মতে শিক্ষণীয় বিষয়টি অপেক্ষা শিশুর চরিত্র গঠনে শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতিটি হল প্রধান। শিশুব শিক্ষায় মনের শৃঙ্খলা রক্ষাব প্রচেষ্টাই প্রধান। সুতরাং আমরা কতখানি শিখেছি, সেটি আমাদেব প্রশ্ন নয়, আমাদের প্রশ্ন হবে আমরা কিভাবে বিষয়টি শিখেছি। প্রধান বিষয়টি হল, কি শক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগেব দ্বারা আমাদের শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষার মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানের মানসিক শক্তি বা ফ্যাকাল্টির তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন গ্রীক দেশে মনে করা হত মনের একটি অখণ্ড সত্তা বিদ্যমান। মানসিক শৃঙ্খলাব অর্থ হল যে, মনের যে কোন ফ্যাকাল্টি বা শক্তির চর্চা করলে তা দ্বারা সমগ্র মনের উন্নতি ঘটে। পরবর্তীকালে মনে করা হল যে, মানুষের মন অনেকগুলি শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। যে শক্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক একটি পৃথক কুটীরে অবস্থান করে। আবার এও মনে কবা হল যে, প্রত্যেকটি শক্তিকে পৃথকভাবে শক্তিশালী করা যায় বা ট্রেনিং দেওয়া যায়।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, শিক্ষার মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানের শক্তিবাদেব (**Faculty theory**) উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বের

সমর্থকেরা মনে করেন যে, আমাদের মনের ঐ শক্তিগুলি হল মনোসংযোগের ক্ষমতা (Attention), পর্যবেক্ষণ (Observation) স্মরণশক্তি (Memory), যুক্তিশক্তি (Reasoning), কল্পনাশক্তি (Imagination) প্রভৃতি। এই শক্তিগুলির উন্নতি বিধানকে বলা হয় মানসিক শৃঙ্খলা বা Formal discipline।

যে কোন একটি বিষয় শিক্ষার সাহায্যে যদি কোন একটি শক্তি বা ফ্যাকাল্টির উন্নতি করা যায়, তা হলে অনুরূপ শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে এরূপ শিক্ষায় ঐ শক্তিটি আরও উন্নতভাবে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি গণিতের সাহায্যে যুক্তিশক্তিকে ট্রেনিং দেওয়া যায়, তাহলে তার ফল অন্য বিষয়েও, যেখানে যুক্তিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, আরও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মতে আমাদের পাঠ্যক্রমে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি আমাদের মনের এই শক্তিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে উন্নত করতে পারে। পাঠ্যক্রমের এরূপ বিষয়গুলি হল, গণিত, ব্যাকরণ, ল্যাটিন বা সংস্কৃত ভাষা, ছন্দ, কবিতা ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে ল্যাটিন, গণিত ও ব্যাকরণ আমাদের মনের যুক্তিশক্তিকে, কবিতা আমাদের স্মরণশক্তি ও কল্পনাকে এবং প্রকৃতপাঠ আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বিষয়বস্তুটি আদৌ মুখ্য নয়। মুখ্য হল, ঐ বিষয়গুলি মনের যে বিশেষ গুণ বা ফ্যাকাল্টিগুলির ট্রেনিং দিয়ে থাকে। কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ শক্তিগুলিই কাজে আসবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর শিক্ষায় এমন সকল বিষয়ের নির্বাচন করতে হবে যেগুলি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মানসিক শক্তির উন্নতি সহজতর হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বটি সাধারণ ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণ করেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার সংক্রমণ ঘটে থাকে। যখন দুটি বা বহু বিষয়ের মধ্যে এক জাতীয় অংশ বিদ্যমান, সেখানে কিছু সংক্রমণ ঘটে। যেমন সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান উত্তম হলে বাংলা ভাষারও জ্ঞান উত্তম হতে পারে। আবার যদি কোন বিষয় চর্চার মাধ্যমে সামান্যীকরণ বা সূত্র প্রয়োগের অভিজ্ঞতা জন্মে থাকে, তবে অন্য বিষয়ের অনুরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সহজেই সামান্যীকরণ বা সূত্র প্রয়োগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে।

উপরে আলোচিত শিক্ষার সংজ্ঞাটি উদার অর্থে ব্যবহার করা চলে না। একে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার অন্য অর্থ হল বৃদ্ধি ও বিকাশ

Education as Growth and Development

জীবনের ধর্ম হল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া এবং বিকাশ লাভ করা। একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে মহীরূহের সৃষ্টি হয়। আজ যে শিশু, কাল সে হবে দায়িত্বশীল নাগরিক। প্রথম জীবনে শিশু থাকে অসহায়, দুর্বল ও পরনির্ভর। জীবনের প্রথম দিকে তার একমাত্র নির্ভর পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ। স্নেহের আবরণে মা শিশুকে ঢেকে রাখেন। এই স্নেহ পরিবেষ্টনের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুর সঙ্গে শিশুর

পরিচয় হয়। শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুমনের এই অবস্থাকে বলেছেন বিস্ময়ের পর্যায় (Wonder stage)।

বৃদ্ধি কথাটির সাধারণ অর্থ হল শারীরিক উন্নতি। এই বৃদ্ধি ঘটে বাইরের বস্তুর সাহায্যে। যেমন, গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় উপযুক্ত খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রভাবে। আলো, বাতাস, জল ও মাটি গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শিশুর: বৃদ্ধিতেও দরকার উপযুক্ত খাদ্য ও স্নেহের পরিবেশ। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ হর্নী (Herman Harrell Horne) বলেছেন যে, প্রাণী বাইরের থেকে তার বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে। সমাজ শিশুকে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কারণ আজকের শিশু কাল হবে সমাজের নাগরিক। শিশু একটি জীবন্ত সত্তা। বৃদ্ধির ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে ঘটে না। প্রাণী আপনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন, বটগাছের বীজ থেকে বটগাছ জন্মায় এবং আমগাছের আঁটি থেকে জন্মায় আমগাছ।

বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থাকে কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত। শিশুর এই বৃদ্ধি শর্ত সাপেক্ষ। বৃদ্ধির প্রথম শর্ত হল **অপরিণতি** (Immaturity); একে অপূর্ণতাও বলা যায়। এই অপরিণতির দুটি গুন বা বৈশিষ্ট্য আছে। ঐগুলি হল, ১. **পরনির্ভরতা** ও ২ **নমনীয়তা**। এই শব্দ দুটির অর্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অপরিণতি বলতে আমরা বুঝি যে, জীবসত্তার বৃদ্ধি পাবার শক্তি। প্রকৃতপক্ষে অপরিণত অবস্থায় এমন একটি শক্তি বিদ্যমান যা শিশুকে বৃদ্ধিলাভে সাহায্য করে। অন্য অর্থে অপরিণতি একটি সদর্থক (Positive) ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অপরিণত জীব-সত্তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। জীবনের যে স্তরেই রয়েছে অপরিণতি সেখানেই বৃদ্ধির উপযোগী শর্ত বিদ্যমান। অপরিণতি ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, অপরিণতি একটি বিপরীতমুখী নঞর্থক (Negative) প্রক্রিয়া। অপরিণতির অর্থ পূর্ণতার অভাব। অপরিণতির মধ্যে কিছুর অভাব রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণ করা যায় যখন আমরা শিশুর অপরিণতিকে বয়স্কদের সঙ্গে তুলনা করি।

আমরা অপরিণতির দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছি—**পরনির্ভরতা** ও **নমনীয়তা**। পরনির্ভরতার অর্থ হল অন্যের উপর নির্ভর করা। শিশু জন্মের পর থেকে অনেক বৎসর পর্যন্ত অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। স্ব-শক্তির উপর নির্ভর করে সে এক দণ্ডও বাঁচতে পারে না। মনুষ্য-শিশুর সঙ্গে তুলনায় অন্যান্য প্রাণী শৈশবকালে অধিক স্বাবলম্বী।

কিন্তু শারীরিক দিক থেকে শিশু পরনির্ভর হলেও সামাজিক দিক থেকে অন্য প্রাণীর শাবক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। পরনির্ভর শিশুদের **সামাজিক শক্তি** খুব জোরালো। মনুষ্যেতর প্রাণীদের সামাজিক শক্তি নেই বললেই চলে। সুতরাং মনুষ্য-শিশু শারীরিক দিক থেকে যতটা দুর্বল, সামাজিক দিক থেকে ততোধিক শক্তিশালী।

কিন্তু মনুষ্য-শিশুর এই পরনির্ভরতা তার সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। তার পরনির্ভরতা তার বৃদ্ধির জন্য গঠনমূলক ক্ষমতার উৎসস্বরূপ (Constructive power to grow)। শিশু সমাজে বয়স্কদের পরিবেশে বাস করে। এই পরিবেশের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক সামাজিক। শিশু শারীরিক দিক থেকে অশক্ত, কিন্তু সামাজিক পরিবেশে অন্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বয়স্করা শিশুর দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে সত্য, কিন্তু শিশুও এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, অন্যের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পারে। সুতরাং শিশুর পরনির্ভরতা এমন একটি শক্তি যা সামাজিক পরিবেশে পারস্পরিক নির্ভরতায় পর্যবসিত হয়।

অপরিণতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা নমনীয়তার (Plasticity) কথা উল্লেখ করেছি। নমনীয়তা হল এমন একটি ক্ষমতা যা অপরিণত জীবসত্তাকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সাহায্য করে। নমনীয়তা গুণের মাধ্যমে শিশু অভিজ্ঞতার মারফত শিক্ষালাভ করে থাকে। এটি শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা বা স্বভাব বিকাশে সাহায্য করে থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এই নমনীয়তা গুণের আধিক্য বেশি। শিশুর মধ্যে এই নমনীয়তা গুণ যতই বেশি থাকবে ততই সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভের ক্ষমতা লাভ করবে এবং শিক্ষার সাহায্যে উন্নতি লাভের ক্ষমতা অর্জন করবে। হর্নী মনে করেন যে, নমনীয়তা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি গুণ। মানুষের **অভ্যাস গঠনের ক্ষমতা** এই স্নায়ুতন্ত্রেই অবস্থান করে।

শিশুর নমনীয়তা গুণই তাকে নানাবিধ অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে, এবং বিভিন্ন অভ্যাস আয়ত্তের ফলেই শিশুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য রূপ পেয়ে থাকে।

আমাদের জীবনের প্রতি অংশেই অভ্যাসের প্রভাব ও স্পর্শ রয়েছে। আমাদের কর্মে ও সক্রিয়তায় অভ্যাসের প্রভাব যথেষ্ট। সহজভাবে, নিপুণভাবে এবং তাড়াতাড়ি কাজ করবার ক্ষমতা এই অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, শিশুর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হল শিশুকে সু-অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা। তবে কেবলমাত্র অভ্যাস গঠনকেই বৃদ্ধির মূল লক্ষ্য হিসাবে ধরলে **শিক্ষার তাৎপর্য বৃদ্ধি** এই উক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না।

শিক্ষার অর্থ হল বিকাশ

'শিক্ষার অর্থ হল বৃদ্ধি'—এই উক্তিটির তাৎপর্য আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু অন্য অর্থে শিক্ষার অর্থ হল 'বিকাশ'।

বৃদ্ধি ও বিকাশের তুলনা : আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ হর্নীর মতে শিশু বৃদ্ধির জন্য বাইরের উপকরণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিকাশ ঘটে থাকে আন্তরশক্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ জীবসত্তার বংশগতি বা আদি প্রকৃতি তার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে এবং পরিবেশ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক সুযোগ বৃদ্ধি ঘটায়। বৃদ্ধির সাহায্যে শিশু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল ও পুষ্ট করে, এবং মানসিক শক্তির উন্নতি ঘটায়। কিন্তু বিকাশের অর্থ হল নতুন

কর্মদক্ষতা ও শক্তির আবির্ভাব ঘটানো। বৃদ্ধির সাহায্যে আমাদের শরীরের কোষসমূহ বহুগুণিত হয়, কিন্তু বিকাশের মাধ্যমে ঐগুলি শক্তিশালী হয় ও আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক হয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী হয়ে থাকে। একটি চারাগাছ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় বৃদ্ধি। কিন্তু যখন একটি বীজ থেকে একটি চারাগাছ জন্মে তখন এই পরিবর্তনকে বলা হয় **বিকাশ**। একটি মুরগীর বাচ্চা যখন একটি বড় মুরগীতে পরিবর্তিত হয়—তাকে বলা হয় বৃদ্ধি; কিন্তু একটি ডিম থেকে যখন একটি মুরগীর বাচ্চা বের হয় তখন তাকে বলা হয় বিকাশ। যখন মুরগীটি ছোট থেকে বড় হয়ে অনেকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হয় তাকেও বিকাশ বলা হয়।

সুতরাং বিকাশকে যখন আমরা শিক্ষার সমার্থক হিসাবে ধরি তখন আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, শিশু অনেক শারীরিক ও মানসিক গুণ আয়ত্ত করেছে। ডিউই (**Dewey**) মনে করেন যে, শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা পুনর্গঠনের মাধ্যমে।

বিকাশের বৈশিষ্ট্য ঃ বিকাশলাভ জীবনের ধর্ম। বৃদ্ধির ন্যায় বিকাশও কয়েকটি শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিকাশের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির ন্যায় অপরিণতি, নমনীয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা চাই। কিন্তু সর্বোপরি থাকা চাই **প্রাণশক্তি**। বিকাশ যদিও শিশুর আন্তরশক্তির সাহায্যে ঘটে থাকে, কিন্তু পদে পদে এটি পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ডিউই-এর মতে বিকাশই জীবনের ধর্ম এবং বিকাশলাভ ও বৃদ্ধি-ই হল জীবন। শিক্ষাকে ডিউই বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। **তবে এই বিকাশ শক্তিটি যখন একটি লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখনই বিকাশ ও শিক্ষাকে একই অর্থে ব্যবহার করা যায়।**

শিক্ষা হল জীবনকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা
Education as Direction

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশকে আমরা শিক্ষার অন্যতম তাৎপর্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু এই বৃদ্ধি বা বিকাশ এলোমেলো বা বিশৃঙ্খলভাবে ঘটলে তাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে না। শিশুর বিকাশ ক্রিয়াটি হবে ধারাবাহিক এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত।

প্রত্যেক শিশুই একটি সমাজ-পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক মূল্যমান নানাভাবে শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-পরিবেশ শিশুর পরিচালনায় নির্দেশক হিসাবে কাজ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানের **উদ্দীপক-সাড়া** (**Stimulus-response**) তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ-পরিবেশ শিশুর নিকট উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে থাকে। শিশু এই উদ্দীপকের প্রেরণায় সাড়া দিয়ে থাকে।

শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ (**Impulse**) অনেক সময়ে সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলতে শিশুকে বাধা দেয়। শিশু এই বাধা অতিক্রম করতে পারে উপযুক্ত নির্দেশনের মাধ্যমে। শিক্ষাকে যদি আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা—এই অর্থে গ্রহণ করি,

তাহলে আমরা দেখতে পাই এর সঙ্গে তিনটি বিষয় যুক্ত থাকে। সেগুলি হল—**নির্দেশন** (Guidance), **নিয়ন্ত্রণ** (control) এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে **পরিচালন** (Direction)। এই তিনটি পদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। **নির্দেশন**-এর অর্থ হল সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক দক্ষতাকে ঠিকভাবে পরিচালনা করা। **নিয়ন্ত্রণ** কথাটির অর্থ হল বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু করতে বাধ্য করা। এই প্রক্রিয়ায় যাকে বাধ্য করা হয় তার নিকট থেকে বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে **পরিচালন** (Direction) কথাটির অর্থ হল শিশুর ধারাবাহিক বিকাশকে এলোমেলোভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে ঘটতে না দিয়ে একটি লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা। উদ্দীপক-সাড়া তত্ত্বে সাড়া হল শিশুর সক্রিয়তা এবং উদ্দীপকটি হল নির্দেশক (Guide)।

তত্ত্বটির বৈশিষ্ট্য ঃ নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালন কর্মটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটা ধারাবাহিক এবং শিশুর সক্রিয়তার সঙ্গে একই যোগে ঘটে থাকে। দ্বিতীয়ত, এটি শিশুর একাধিক কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সঠিক প্রচেষ্টাটিকে বাছাই করে নিয়ে থাকে, যেটি শিশুকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি কাজ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এর ফলে কার্যধারার মধ্যে একটি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আসে।

লক্ষ্যের দিকে পরিচালন—এই তত্ত্বটির দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, এটি শিশুর প্রচেষ্টাকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য **কেন্দ্রীভূত** করে (Focussing) এবং দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে **বিন্যাস** (Ordering) করে। প্রথমটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে সচেষ্ট করে এবং দ্বিতীয়টি পরবর্তী কাজের উপযোগী করে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন। একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নির্দেশ দান বাইরে থেকে দেওয়া যায় না। শিশুর সমাজ-পরিবেশ একমাত্র উদ্দীপক হিসাবেই কাজ করতে পারে। একটি বিশেষ উদ্দীপক কিভাবে শিশুর মনে প্রতিক্রিয়া জন্মাবে—তা নির্ভর করে শিশুর আদিম বৈশিষ্ট্যের উপর। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যায়। মনে করা যাক, একটি বালককে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করানো হল। কিন্তু এই ভয় দেখানো ব্যাপারটি তাদের উপরেই কাজ করবে যাদের মধ্যে 'ভয়' সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে আছে।

পারসি নানের মত ঃ স্যার পারসি নান বিষয়টি অন্যভাবে আলোচনা করেছেন। শিশু দেখে পরিবারে নানা লোকে নানা কাজ করে। মা, বাবা, ভাই, বোন শিশুর দৃষ্টির মধ্যে নানা কাজে লিপ্ত থাকেন। শিশু যখন এই সব কাজ দেখে তখন সে তার কৌতূহল ও অনুকরণের প্রবৃত্তিবশে নিজের জীবনে এই কাজগুলি প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। নতুন লোক ও কর্মের উদাহরণ শিশুমনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই শিশু খেলার মাধ্যমে নানাবিধ সক্রিয়তায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানিগণ বলেন এগুলি শিশুর আচরণের সার্থক রূপ। এর মূলে রয়েছে **সার্থক**

আত্মানুভূতি (Positive self-feeling)। অবশ্য এই সার্থক আত্মানুভূতি প্রথম থেকেই জন্মে না। শিশু যখন অন্যকে কাজ করতে দেখে তখন নিজে ঐ কাজ করবার সুযোগ না পেলে শিশুর মনে **ব্যর্থ আত্মানুভূতির** (Negative self-feeling) সৃষ্টি হয়। নিজের অনুকরণ প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিশু ঐ খেলা আরম্ভ করে থাকে। ব্যর্থ আত্মানুভূতিকে সার্থক স্তরে চালিত করবার জন্য ঐ খেলায় শিশুর সমস্ত মন যুক্ত হয় এবং ফলে শিশুর প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধিত হয়। এই অবস্থায় শিশুর আত্মানুভূতি সার্থক স্তরে উন্নীত হয় এবং সক্রিয়তার মাধ্যমে শিশুর শরীর ও মন উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

নান এই ধরনের সক্রিয়তাকে বলেছেন **পরীক্ষামূলক আত্মগঠন কর্ম** (Experimental self-building)। প্রকৃত গঠনমূলক কর্ম থেকে এর পার্থক্য আছে। তবে যে সকল কর্মের মাধ্যমে শিশু আপনার আত্মসাম্মুখ্য প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে থাকে, তা প্রধানত **প্রকৃত আত্মগঠনমূলক কর্ম** (Serious business of self-building)।

শিশু অনুকরণ, অনুভাবনের সাহায্যে সমাজ-পরিবেশ থেকে এরূপ কাজ বাছাই করে নিয়ে থাকে যা তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী আত্মবিকাশে ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

শিক্ষার অর্থ উপযোজন (Education as Adjustment)

জীবনের বৈশিষ্ট্য হল বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং এই বৃদ্ধির জন্য জীবকে সর্বদাই পরিবেশের সহিত উপযোজনে সচেষ্ট হতে হয়। বৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন শিশু তার বিকাশের প্রতিস্তরে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে পারে। পূর্ববর্তী সঙ্গতি বিধান শিশুকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করে। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করা যেতে পারে। সমাজ-পরিবেশে সঠিক উপযোজনের জন্য শিশুর দরকার গণিতের জ্ঞান। কিন্তু গণিতের উন্নতি শিশুর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না যদি শিশু গণিতের বিভিন্ন ধাপগুলি ধারাবাহিকভাবে আয়ত্ত করতে না পারে। যেমন শিশুকে যোগের জ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে প্রথমে দরকার সংখ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা। পরবর্তী ধাপে যদি বিয়োগের জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়, তাহলে তাকে যোগের জ্ঞান সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে হবে। এমনিভাবে গুণ ও ভাগের জ্ঞান অর্জন করতে হলে শিশুকে যোগ ও বিয়োগের জ্ঞান আয়ত্ত করতে হবে। শিক্ষাকে যদি আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করা বুঝি তাহলে শিশুকে প্রতি স্তরের সঙ্গেই সঠিকভাবে উপযোজনের মাধ্যমে পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শিক্ষাকে উপযোজন হিসাবে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

উপযোজনের পদ্ধতি ঃ এই উপযোজনের জন্য তিনটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত হতে হয়। এই বিষয়গুলি হল, **ব্যক্তি, জগৎ পরিবেশ এবং এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের পদ্ধতি**।

ব্যক্তি ও জগৎ পরিবেশের মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য স্থাপনের পদ্ধতিটি কিরূপ তা আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা দরকার জগৎ পরিবেশের স্বরূপটি কি ? শিক্ষাবিদ্‌গণ

বলেন যে, ব্যক্তির জগৎ পরিবেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা **হল**—[ক] **প্রাকৃতিক জগৎ**, [খ] **সামাজিক জগৎ** এবং [গ] **নৈতিক** বা **ধর্মীয় জগৎ**।

পরিবেশের স্বরূপ ঃ শিশুকে জন্মগ্রহণ করে এই তিনটি জগতের সংস্পর্শে আসতে হয়। ব্যক্তিকে এই **প্রাকৃতিক জগতের** সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা। প্রাকৃতিক জগৎ থেকে মানুষ নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে নিজের ব্যবহারের প্রয়োজনে। কিন্তু ইতর প্রাণীর এই শক্তি নেই। ইতর প্রাণী প্রাকৃতিক জগৎকে অপরিবর্তনীয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু নিজের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জোরে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে থাকে। দুভাবে মানুষ প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে থাকে। প্রথমত, মানুষ এই প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে বাস করে। তখন সে এই প্রাকৃতিক জগতের অংশ। প্রাকৃতিক জগৎ উদ্দীপক হিসাবে মানুষের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মানুষ আপন শক্তির জোরে প্রাকৃতিক নিয়ম জেনে প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে থাকে। শিক্ষার একটি প্রধান কাজ হল মানুষের বৈজ্ঞানিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তির জোরেই মানুষ প্রাকৃতিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

দ্বিতীয় পরিবেশ হল **সামাজিক পরিবেশ**। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষকে প্রতিনিয়ত সমাজের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করে চলতে হয়। আধুনিক সমাজ খুব জটিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিষয়সমূহ নানাভাবে মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। এই জটিল প্রভাবের মধ্যে মানুষকে নানাভাবে পথ খুঁজে ঠিক পথে চলতে হয়।

তৃতীয় পরিবেশটি হল **ধর্মীয় পরিবেশ** বা **নৈতিক পরিবেশ**। মানুষ কেবলমাত্র সমাজ-পরিবেশ বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে না। মানুষের আছে একটি মনোজগৎ। সেখানে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি, প্রক্ষোভ, সক্রিয়তা, বুদ্ধি, প্রবণতা বা মেজাজ নানাভাবে মানুষের আচরণকে পরিবর্তন করে থাকে। মানুষের মনোজগতে আছে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষকে প্রতিমূহূর্তে সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলতে হয়। এই শক্তি একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে দিতে পারে।

উপরে যে তিনটি পরিবেশের কথা আমরা আলোচনা করেছি—সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি যেমন একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল, তেমনি মানুষের মনোপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতিও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই তিনের যোগেই গঠিত হয় মানুষের সম্পূর্ণ পরিবেশ।

পরিবেশের বিশেষ অর্থ ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন উপযোজন হিসাবে আমরা দেখি, তখন উপযোজন শব্দটির যেমন ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিবেশ শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ। ডিউই বলেছেন যে, পরিবেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি ব্যক্তিকে তার কর্মে সক্রিয় করতে পারে। পরিবেশ ব্যক্তিকে কোন কার্য সম্পাদনে বাধা দিতে পারে কিংবা উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখে। সুতরাং পরিবেশের প্রকৃত তাৎপর্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন।

একজন জ্যোতির্বিদের কাছে দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র ও টেলিস্কোপ যন্ত্রটি তার পরিবেশের অংশ। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছে বিশ্বের সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ, তা কাছেই জন্মাক বা দূরেই জন্মাক, পরিবেশ হিসাবে কাজ করে থাকে। একজন দার্শনিকের কাছে তার মনোজগৎই তার প্রকৃত পরিবেশ।

উপযোজনের তাৎপর্য ঃ উপযোজন বা সামঞ্জস্য বিধান শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি হবে? **উপযোজন শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ হল ব্যক্তিকে ও পরিবেশকে পরস্পরের কাছাকাছি আনা এবং এমনভাবে সেগুলিকে পরিবর্তিত করা যাতে উভয়ে যৌথভাবে অবস্থান করতে পারে।** উপযোজন প্রক্রিয়াটি উন্নতিমূলক, ব্যাপকতা এবং গভীরতা গুণ যুক্ত। শিশু প্রথম জীবনে যে ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন হয়, ক্রমশ যতই বড় হতে থাকে ততই বৃহত্তর পরিবেশের সম্মুখীন হয়। এই ক্রমবর্ধমান পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে ক্রমাগত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। এই সামঞ্জস্য সাধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু বিকাশ লাভ করে থাকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। প্রথম জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনের মারফত শিশু যে সংখ্যার ব্যবহার শিখে থাকে সেগুলি হল ব্যবহারিক সংখ্যা (Natural numbers)। এই সংখ্যাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং অসম্বদ্ধ। যেমন, পাঁচ বলতে আমরা বুঝি পাঁচটি বস্তুর সমষ্টি। যথা—পাঁচখানি বই বা পাঁচটি ঘোড়া। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিশু অন্য ধরনের সংখ্যার জ্ঞান লাভ করে। যেমন, ভগ্নাংশের বা দশমিকের ব্যবহার। এই অবস্থায় শিশুর কাছে 'সংখ্যা' শব্দটির ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সংখ্যার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী ধাপে শিশুকে আরও নানাধরনের সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, যথা—বীজগণিতের চিহ্নিত বা নির্দেশক সংখ্যা (Directed numbers), অমূলদ সংখ্যা (Irrational numbers) অথবা কল্পিত সংখ্যা (Imaginary numbers)। বর্তমানে নতুন গণিতে এক নতুন ধরনের সংখ্যার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। সেটি হল সেট (Set)। সেটও একধরনের সংখ্যা।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, শিশু যেমন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়ে নতুন জ্ঞান লাভ করতে থাকে তেমনি এই জ্ঞান লাভ ঘটে পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের মাধ্যমে। উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যে উপযোজন ঘটে তা ক্রমবর্ধমান, ব্যাপক ও গভীর। দ্বিতীয়ত, উপযোজনের পদ্ধতিটি যান্ত্রিক নয়, এটি একটি সক্রিয় পদ্ধতি। তৃতীয়ত, উপযোজন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি যেমন নিজেকে পরিবর্তিত করে, তেমনি প্রয়োজন ক্ষেত্রে পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটায়।

পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের মাধ্যমে শিশু কিভাবে শিক্ষালাভ করে থাকে তা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।—

"শিশু বলে আমি পা ফেলে চলব, কিন্তু যতক্ষণ বহুসাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন সামঞ্জস্য করতে না পারে ততক্ষণ তার উপায় নেই, শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

এই চলার নিয়মকে শিশু যখন গ্রহণ করে, এ নিয়ম তখন তাকে পীড়া দেয় না।

শুধু পীড়া দেয় না তা নয়, তাকে আনন্দ দেয়, সত্য নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করা মাত্র শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আনন্দিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য, মাটির সত্য, আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে, তখন যে তার কতকগুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়। জল, মাটি, আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে ওঠে, তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হযে ওঠবার জন্য বিস্তর সাধনা করতে হয়। তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয। তাকে অনেক রকম আবদার কমাতে হয। অনেক রাগ কমাতে হয়। নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয। যখন এই বন্ধনগুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয়, তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে, তখন তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়ম বন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হযে স্ফূর্তি লাভ করে।" (শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৫৬)

শিক্ষা ঃ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ

Education is the Reconstruction of Experience

শিক্ষা-দার্শনিক জন ডিউই তার প্রয়োগবাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার একটি নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ। পূর্বের আলোচিত সংজ্ঞাগুলি অপেক্ষা এই নতুন সংজ্ঞাটি একটি নতুন বিষয় নির্দেশ করছে। আমরা শিক্ষাকে বৃদ্ধি হিসাবে বিচার করেছি, আমরা শিক্ষাকে বিকাশ হিসাবে আলোচনা করেছি।' কিন্তু যখন বলা হচ্ছে যে, শিক্ষা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন তখন এখানে শিক্ষাকে একটি নতুন রূপে কল্পনা করা হচ্ছে।

শিক্ষার কাজ হল, অভিজ্ঞতার মূল্যবান অংশ সরাসরিভাবে নতুন কাজের জন্য স্থানান্তরিত করা। জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করে। এই প্রক্রিয়াটি সব সময়েই দেখা যায়। শৈশবকালেই হোক বা বয়স্ক কালেই হোক, ব্যক্তি জীবনযাপনের মাধ্যমে কিছু না কিছু শিখে থাকে। এই অর্থে জীবন যাপনকেই শিক্ষা বলা হযে থাকে।

অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা ঃ কিভাবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ করি? ডিউই বলেন, নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হযে সেগুলিকে সমাধানের মাধ্যমে আমরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। অবশ্য সকল অভিজ্ঞতাই যে আমরা সচেতনভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন নয। তবে অভিজ্ঞতা মাত্রই আমাদের নতুন কিছু শিক্ষা দিযে থাকে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নতুন কিছুর অর্থ বা তাৎপর্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে থাকে। তবে শিশুর অনেক কাজ আবেগের মাধ্যমে পরিচালিত হয। শিশু যেন অন্ধের মত কোন কিছু না বুঝে কাজে লিপ্ত হয়। কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কেও তাদের কোন জ্ঞান থাকে না। **কর্মের বিভিন্ন স্তর ও অংশের**

মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক (Inter connection) বিদ্যমান, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করাই হল শিক্ষা।

উদাহরণঃ এই সম্পর্কে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি। একটি জলন্ত মোমবাতিকে শিশু কিভাবে দেখে? মোমবাতির উজ্জ্বল আলোর শিখা তাকে আকর্ষণ করতে পারে, জিনিসটি ধরবার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। মোমবাতির শিখাটি যে উত্তপ্ত এ ধারণা তার প্রথমে থাকে না। হাত দিতে গিয়ে তার হাতে সেঁকা লাগল। এই অভিজ্ঞতার ফলে সে শিখল যে জলন্ত মোমবাতির শিখা উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত; হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক এই মোমবাতির শিখাটিকে কিভাবে দেখে? প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিকের আচরণও শিশুর মত। তবে উভয়ের কাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিক মোমবাতির শিখার সাহায্যে কোন পরীক্ষণ (Experiment) করতে আরম্ভ করলেন। তিনি বস্তুকে অগ্নির সংস্পর্শে এনে লক্ষ্য করলেন এতে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বে বৈজ্ঞানিকের কোনরূপ ধারণা ছিল না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি অনেকগুলি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করলেন। পরীক্ষার পরে তিনি বুঝতে পারলেন, দহন প্রক্রিয়া (Combustion), জারন ক্রিয়া (Oxidation) বলতে কি বোঝা যায়, এবং আলো ও উত্তাপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা আগের ধারণা অপেক্ষা স্পষ্ট ও যথাযথ হল। পরীক্ষণের পর মোমবাতির জলন্ত শিখার তাৎপর্য বৈজ্ঞানিকের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হল।

কোন বিষয় সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা ও তাৎপর্য বোধ ঐ বিষয়টির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে থাকে। এইভাবে কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। ঐ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা পূর্বের ধারণা অপেক্ষা অন্যরূপ হয়ে থাকে।

হর্নীর ব্যাখ্যাঃ 'শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ'—এই তত্ত্বটিকে হর্নী এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন অভিজ্ঞতার তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতা লাভে ব্যক্তিকে সক্ষম করে।—এটিই হল শিক্ষা।

হর্নীর সংজ্ঞাটিকে অন্যভাবে আলোচনা করা যাক্। অভিজ্ঞতার ফলপ্রসূ পুনর্গঠনের দুইটি দিক আছে—একটি হল **ব্যক্তিকে** নিয়ে এবং অন্যটি হল **সমাজকে** নিয়ে। অর্থাৎ একটি হল ব্যক্তি সম্পর্কিত এবং অন্যটি হল সামাজিক। অভিজ্ঞতা যখন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তখন তা ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনে; আর যখন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তখন তা সমাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। তবে আলোচ্য বিষয় দুটিও বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আলোচনার সুবিধার জন্য পৃথকভাবে আলোচনা করা হল। যে কোন কাজ বা সক্রিয়তাই ব্যক্তির নিকট শিক্ষার মর্যাদা লাভ করে না। ব্যক্তির সক্রিয়তা যদি এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বা যান্ত্রিক হয় তাহলে এর ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কখনই শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির সক্রিয়তা ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল হয় তখনই তা কেবলমাত্র শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে।

যখন সমাজের উপর শিক্ষার প্রভাব বিচার করা যায়, তখনও এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিশৃঙ্খল কর্মধারা কখনই সমাজের পরিবর্তন আনতে পারে না। যান্ত্রিক কর্মধারা যদিও বিশৃঙ্খল কর্মধারা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ, তবু উন্নতশীল সমাজের পক্ষে তা কার্যকরী নয়। স্থাণু বা অনড় সমাজ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক কার্য-পদ্ধতি কিছু ফলপ্রসূ মনে হয়, কারণ ঐরূপ সমাজের আদর্শ প্রাচীন সাংস্কৃতিক মান ও নিয়মকানুনের জালে আবদ্ধ। কিন্তু যে সমাজ ক্রমবর্ধমান এবং যেখানে জীবন-যাত্রার মান, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং উন্নতির দিকে ধাবমান—সেরূপ প্রগতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজন সুসম্বদ্ধ উন্নতিশীল কর্ম অভিজ্ঞতা। স্থাণু সমাজে প্রাচীন নিয়মকানুন ও সাংস্কৃতিক মান বজায় রাখা হয় এবং শিক্ষার কাজ হল শিক্ষার্থীদের ঐগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু প্রগতিশীল সমাজ বর্তমান অবস্থায় স্থির থাকে না। এই সমাজের প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা হল বর্তমান ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে আরও উন্নততর ও প্রগতিশীল ব্যবস্থায় উত্তরণ। প্রগতিশীল সমাজে ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং এই সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা যেন এরূপ হয় যে, সে যেন ভবিষ্যতে তার অভ্যাস ও চিন্তাধারাকে প্রগতিশীল সমাজের উপযোগীরূপে গঠন করতে পারে।

শিক্ষার প্রয়োজন

'শিক্ষার কি প্রয়োজন—?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের বলতে হয়, আধুনিক জগতে মানুষকে বাঁচতে হলে যেমন অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রয়োজন, তেমনি রয়েছে শিক্ষারও প্রয়োজন। একজন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য তা হল এই যে, শিক্ষিত মানুষ নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যেমন তার দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে পারে, অশিক্ষিত মানুষ তেমন পারে না। অশিক্ষিত মানুষকে চোখ থাকতেও অন্ধের মত বাস করতে হয়।

শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করতে পারি।

১. শিক্ষার প্রয়োজন ব্যক্তির আচরণগত পরিবর্তন ও কর্মের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য : একজন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, শিক্ষিত মানুষের আচরণে ও বাক্যে এমন একটি মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় যা অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। শিক্ষালাভের ফলে শিক্ষিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন কর্মে যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাকে যদি আমরা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখি, আমরা বুঝতে পারি শিক্ষালাভের ফলেই মানুষের এই উন্নতি। খাদ্য যেমন আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করে, তেমনি উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মনের পুষ্টি সাধন করে। এখন এই মনের পুষ্টি শিক্ষা কিভাবে সম্পাদন করে? শিক্ষা শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কৌশল শিক্ষা দেয়।

২. শিক্ষা ব্যক্তি তথা জাতির অন্তরে আশা ও আত্মবোধ জাগ্রত করে ঃ শিক্ষা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে **আশা ও আত্মবোধ** জাগ্রত করে। মানুষের অন্তরে এই অনন্ত আশার উদ্বোধনের জন্যই শিক্ষা প্রয়োজন। এই বিষয়টি নিয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী লিখেছেন, "ইউরোপের বহু নগর পরিভ্রমণকালে উক্ত দেশের গরীব লোকদের জন্য শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দের সুব্যবস্থা দেখিয়া স্বদেশে দরিদ্রগণের দুরবস্থার কথা আমার মনে পড়িত এবং আমি অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কিসে এই পার্থক্য হইল? উত্তর পাইলাম শিক্ষাই উক্ত পার্থক্যের মূল। সুশিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত-ব্রহ্ম জাগ্রত হয়।"

বিবেকানন্দ আরও লিখেছেন—

"পরাধীন আইরিশরা স্বদেশে উপেক্ষার আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত থাকিত। তথায় সমগ্র প্রকৃতি এক বাক্যে বলিত,—'প্যাট, তোমার কোন আশা নাই। তুমি আজন্ম গোলাম এবং মৃত্যু পর্যন্ত তুমি গোলামই থাকিবে।' জন্মকাল হইতেই এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইত বলিয়াই প্যাট এই বাক্যে বিশ্বাস করিত এবং 'সে যে সত্যই হীন' এই ভাব তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইত। কিন্তু আমেরিকাতে পদার্পণ করিয়া সে চারিদিক হইতে শুনিল,—'প্যাট, আমরা যেমন মানুষ, তুমিও সেইরূপ মানুষ, মানুষই এইসব করিয়াছে। আমার মত, তোমার মত মানুষই সব করিতে পারে। সাহস অবলম্বন কর।"

শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত-শক্তি রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তা জাগ্রত হয়।

৩. সামাজিক ও জাতীয় প্রগতির জন্য শিক্ষা প্রয়োজন ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বয়স্করা চান তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি স্থানান্তরিত করতে। সমাজের আছে বিভিন্ন নিয়ম, আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আছে ধর্মবিশ্বাস, উৎসব-আনন্দ। সমাজের আছে বিভিন্ন বৃত্তি, বিভিন্ন রকমের কাজ। এই সমাজ জীবনের প্রস্তুতির জন্য ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষার প্রয়োজন। যে শিক্ষিত নয়, তার পক্ষে সামাজিক কর্ম-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ সম্ভব হয় না।

৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার ঃ ভারত একটি বহুভাষাভাষী উপমহাদেশ। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে অর্থ নৈতিক ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য আছে এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্প্রীতির অভাব দেখা যায়, তা দূর হতে পারে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে সহযোগিতার মনোবৃত্তির। ভারতের কোন অংশই যে পৃথকভাবে চলতে পারে না—এই বোধ আমাদের একমাত্র উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাই দিতে পারে। যেমন জাতীয় ক্ষেত্রে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্প্রীতি আনয়নের একমাত্র উপায় উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। আজ পৃথিবীর কোন

অংশই অন্যের উপর নির্ভর না করে চলতে পারে না। এই বোধ একমাত্র আসতে পারে শিক্ষার সাহায্যে।

৫. শিক্ষার প্রয়োজন সামাজিক মর্যাদা লাভ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য: আমরা দেখি আমাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা আছে। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' বহু প্রাচীনকালেও দেখা যায়, শিক্ষার প্রতি মানুষের একটি বিশেষ মর্যাদাবোধ ছিল। সামাজিক মর্যাদা ছাড়া শিক্ষার ফলে মানুষ লাভ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। শিক্ষিত মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্য স্থান খুঁজে নিতে পারে।

শিক্ষার লক্ষ্য

সাধারণভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ঐ দুটি লক্ষ্য হল— ১ নিম্নতর লক্ষ্য ও ২. উচ্চতর লক্ষ্য।

শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য হল, শিক্ষার সাহায্যে কিছু ব্যবহারিক সুযোগলাভ করা এবং উচ্চতর লক্ষ্য হল, মানব জীবনের পূর্ণতা সাধন। অর্থাৎ শিক্ষার সম্পূর্ণ লক্ষ্য হল, মনের পূর্ণতা সাধনের সঙ্গে সংসারের পূর্ণতা সাধন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শিক্ষার যেমন আছে একটি অর্থনৈতিক দিক, তেমনি তার মানসিক পূর্ণতার দিকও আছে। উপরের দুটি লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি পেতে পারি। যথা, (১) শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য বা জীবিকা-অর্জনের লক্ষ্য, (২) শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-অর্জনমূলক লক্ষ্য, (৩) শিক্ষার নৈতিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য, (৪) শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য, (৫) শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন।

শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্য

সাধারণ লোকের নিকট লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হল, জীবিকা-অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করা। ইংরাজীতে এই লক্ষ্যকে বলা হয় 'Bread and butter aim of education'। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীরা সেই সকল বিষয় শিক্ষালাভ করতে চায় অর্থাৎ সেই সকল কোর্সে ভর্তি হতে চায়, যার সাহায্যে তারা পরীক্ষা পাসের পর উচ্চ-মাহিনার চাকুরি লাভের সুযোগ পায়। এই কারণে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, অ্যাকাউন্টেন্সী প্রভৃতি কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা বেশী আগ্রহ দেখান। জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা অর্জন শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তা শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না।

শিক্ষার সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞান অর্জনমূলক লক্ষ্য

শিক্ষিত মানুষকে হতে হবে এক উচ্চ সাংস্কৃতিক মানের অধিকারী। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর করে বলেছেন, "আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান

লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে নানা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনে সাহায্য করা। এই ব্যবহারিক কৃতিত্বের প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের জীবনে আর একটি বিশেষ জিনিসের প্রয়োজন। সেটি হল সংস্কৃতি বা কালচার।

"এই কৃতিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এযে যথেষ্ট নয়, এ কথা মানতে হবে।...... চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।"

সুতরাং সংস্কৃতিবান মানুষ সৃষ্টি সুশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা করতে পাবে না। তাকে সুশিক্ষা বলা চলে না। শিক্ষাবিদ হোয়াইট্‌ হেডের মতে —"সংস্কৃতি হল চিন্তার সক্রিয়তা এবং সৌন্দর্য ও মানবিকতা সম্পর্কে সূক্ষ্মবোধ। নানা বিষয়ের খবর সংগ্রহ করলেই সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটে না।"

আমরা উল্লেখ করেছি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য নানা বিষয়ের **জ্ঞান অর্জন**। বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান অর্জিত হয় পুস্তক পাঠের দ্বারা। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান যদি কেবলমাত্র পুস্তকের বিষয়ই হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে তা কোন কাজে আসে না। প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অর্জিত জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব জ্ঞানে পরিণত করবার জন্য জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

শিক্ষার নৈতিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য

শিক্ষাবিদদের মতে প্রকৃত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে চরিত্রবান করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় ভাব জাগ্রত করবে। বিবেকানন্দ প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেন 'মানুষ গড়ার শিক্ষা' হিসাবে, অর্থাৎ **Man making education**। রামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন যে, সেই হল মানুষ, যার হুশ আছে। এই 'হুশ' সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবিদের মত হল, নৈতিক ও ধর্মীয় ভাব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষ করে তোলাই শিক্ষা। এই মানুষ করা মনুষ্যত্ব লাভের সঙ্গে যুক্ত। এই 'মনুষ্যত্বলাভ' বিষয়টি একটু জটিল বিষয়। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের সঙ্গে এর যোগ আছে। দুঃখ ও সাধনার ভিতর দিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বলাভ করতে হয়।

অবশ্য 'নৈতিক শিক্ষা' একমাত্র বিদ্যালয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিশুর গৃহের অর্থাৎ পিতামাতা ও অন্যান্যদের দায়িত্বও কম নয়। বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য যেমন চরিত্র গঠন, তেমনি জ্ঞানর্জন করা। রাসেলের মতে আদর্শ চরিত্রের চারটি মূল ভিত্তি হল, ১. **প্রাণময়তা ও কর্মোদ্যম** ২. **সাহস**, ৩. **অন্তরের সংবেদনশীল বোধ** ও ৪ **বুদ্ধি**। তিনি আরও বলেছেন, শৈশব থেকে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষা, অনুভূতি ও বোধ, এই তিনটি বিষয়ের উপযুক্ত চর্চা ও পরিচালনা দ্বারা চরিত্রের বিভিন্ন সদগুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়।

শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। মানুষ সমাজের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিশুর মধ্যে **সুনাগরিকতা গুণের** উন্মেষ সাধন। যেহেতু মানুষ সামাজিক প্রাণী, এই কারণে মানুষ একা একা বাস করতে পারে না। মানুষকে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। এই মিলেমিশে থাকবার জন্য মানুষকে কিছু গুণ আয়ত্ব করতে হয় এবং এই গুণগুলি মানুষ লাভ করে শিক্ষার সাহায্যে। এই সমাজ জীবনে সঠিকভাবে বাস করার গুণ আয়ত্ব করাকেই হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন, **'পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি'**। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য স্পেন্সার মনে করেন,—প্রকৃত শিক্ষা আমাদের আত্মরক্ষার শিক্ষা দান করবে, আমাদের জীবিকা-অর্জনের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে, মানব জাতির জীবন ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সন্তান পালন সম্পর্কে শিক্ষা দান করবে, রাজনৈতিক, সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি মানসিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের যথাযোগ্য ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন করবে।

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন

স্যার পারসি নান শিশুর ব্যক্তিতার (Individuality) বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'ব্যক্তিতা' কথাটি আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না। আমরা বলি ব্যক্তিত্ব (Personality)। অবশ্য অনেকে মনে করেন, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিতা সমার্থক। ব্যক্তির বিভিন্ন চারিত্রিক গুণ তাকে যে বৈশিষ্ট্য দান করে তাকে আমরা ব্যক্তিতা বলতে পারি। আবার ব্যক্তির চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করে অর্থাৎ অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে পারি। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু সুপ্ত গুণ থাকে। শিক্ষার সাহায্যে ঐ গুণগুলি বিকশিত হয়। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনের যাহা লক্ষ্য, শিক্ষার লক্ষ্যও তাহাই। আমরা কী হইব এবং কি শিখিব এ দুটি কথা একবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশী ধরে না।"

এখন আমাদের জানতে হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণগুলি কি? শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের যে গুণগুলি বিদ্যালয়ে আমরা বিকাশের আশা রাখি সেগুলি হল, ১. অধ্যাবসায়, ২. সামাজিকতা, ৩. দায়িত্বশীলতা, ৪. কর্মে দক্ষতা, ৫ প্রাক্ষোভিক স্থিরতা, ৬. আত্মবিকাশ, ৭. চারিত্রিক সততা, ৮. স্বাবলম্বিতা, ৯. নেতৃত্বের ক্ষমতা, ১০. উচ্চ আদর্শ বোধ প্রভৃতি। এর সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটি গুণ যোগ করতে পারি, যেমন আশা ও আত্মচেষ্টা, দেশপ্রেম, সামাজিকতা ও গুরুজন, মহাপুরুষ ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হওয়া।

শিশুর মনুষ্যত্বের বিকাশ একটি ধারাবাহিক কঠোর প্রচেষ্টার ফল। কষ্ট ও সাধনা ছাড়া শিশুর সুসম ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষা শিশুর মধ্যে যে অনন্ত শক্তি

রয়েছে তার প্রকাশ ঘটায়। প্রকৃত শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করতে পারে। শিশু নিজের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে শেখে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

প্রায় তিন দশক হল ভারত স্বাধীন হয়েছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার লক্ষ্যের মূল বিষয়গুলি কি হবে তা বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং ভারতেব শিক্ষাব্যবস্থা ও লক্ষ্য যেন জাতীয় উদ্দেশ্যের অনুরূপ হয়। এ প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশন (১৯৫৩)-এর মতামতটি উল্লেখযোগ্য। মুদালিযর কমিশন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রযোজনের দিক থেকে বিবেচনা করে মধ্য-শিক্ষার কযেকটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। মধ্য-শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যবর্তী অংশ হিসাবে একটি স্বযংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভারতবর্ষের নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় তরুণ-তরুণীদেব দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টির (Training of character) উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা ভবিষ্যৎ সমাজজীবনে **দায়িত্বশীল নাগরিক** হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই শিক্ষার সাহায্যে তারা তাদের **জীবিকা অর্জনের উপযোগী** যোগ্যতা অর্জন (Vocational efficiency) কবতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিশালী ভারত গঠনে তারা নিজেদের নিযুক্ত করতে পাববে। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব (Personality) সৃষ্টি করাই হবে এই শিক্ষার লক্ষ্য। এর সাহায্যে তারা তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যোগ্যতা ও রুচি বর্ধিত করতে পারবে এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজেদেব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারক জাতীয় কমিশনের মতামতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার উক্ত কমিশনের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এই যে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ। (১) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, (২) শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব আয়ত্ত করা, (৩) জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা অর্জন, (৪) পারিবারিক জীবনের যোগ্যতা অর্জনের প্রস্তুতি, (৫) সুনাগরিকতার গুণ অর্জন, (৬) অবসরবিনোদনের শিক্ষা অর্জন এবং (৭) নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন।

মুদালিয়র কমিশনের মতামত ও আমেরিকার শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কিত কমিশনের মতামত মোটামুটি একই ধরনের। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটিভাবে একই বিষয় নির্দেশ করে।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য
Individualistic and Socialistic Aims of Education

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবধারা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। একটি **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও অন্যটি সমাজতন্ত্রবাদ**। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির স্বার্থের দিক থেকে নির্ধারিত হবে, না সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করা হবে এ নিয়ে একটি তর্ক

শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে দেখা যায়। আমরা বিষয় দুটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে ব্যক্তির বিকাশই হল শিক্ষার মূল কথা। নিজের প্রয়োজনে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে। সমাজ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিরই সমবায়। সুতরাং ব্যক্তির উন্নতি হলে সমাজেরও উন্নতি হবে। ব্যক্তি সুখী হলে সমাজও সুখী হবে। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউরোপে সভ্যতার বিকাশ হয় সর্বপ্রথম গ্রীস দেশে। প্রাচীন গ্রীস দেশের সোফিস্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। প্লেটো, এরিস্টট্‌ল প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক মনীষীদের রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতামত ব্যক্ত হয়েছে।

ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ তাঁদের রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সপক্ষে মত প্রচার করেন। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে গুরুগৃহে যে শিক্ষা দেওয়া হত তাতে প্রত্যেক শিশুকে পৃথকভাবে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হত। আধুনিক যুগের শ্রেণীশিক্ষা ব্যবস্থা তখনও প্রবর্তিত হয় নি।

স্যার পারসি নান বিষয়টি নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। নান বলেছেন, "একদিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয় ব্যক্তি-মানুষ একটি নির্জন দ্বীপের যেন একজন বাসিন্দা এবং অন্যদের কাছ থেকে একটি অনতিক্রমণীয় সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। একজনের সঙ্গে যেন অন্যের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজের যে একটি সার্বজনীন মন আছে, এই মতবাদ তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কারও মন বলে কিছু থাকে—তা আছে কেবলমাত্র ব্যক্তি-মানুষের। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ব্যক্তির একমাত্র কাজ হল সামাজিক মঙ্গলকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকা। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করতে হলে ব্যক্তিস্বার্থের দিক থেকেই তা করা উচিত।" মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি পৃথক সত্তা। প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি, প্রবণতা ও সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এইগুলির যথোচিত বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। ফ্রোয়েবলও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক শিশুকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী বড় হতে দিতে হবে। ফ্রোয়েবল শিশুদের বৃক্ষশিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষককে তুলনা করেছেন মালীর সঙ্গে। একটি বাঁধাকপিকে যেমন শত চেষ্টা করলেও গোলাপে পরিণত করা যাবে না, তেমনি একটি শিশুকেও তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাড়তে দিতে হবে, অন্য কিছু করবার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে।

পারসি নান খুব জোরের সঙ্গে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। নান বলেছেন, পৃথিবীতে ভাল যা কিছু ঘটেছে তা কেবল বিভিন্ন নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীন ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। তবে এই মন্তব্যের দ্বারা নান সমাজের প্রতি ব্যক্তির কোন দায়িত্ব নেই এ কথা বলেননি। কারণ তিনি মনে করেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি মানুষের প্রকৃতি অনুসারে ঘটে থাকে, আর মানুষের এই

প্রকৃতিতে যেমন আছে নিজের উপর শ্রদ্ধা, তেমনি আছে সামাজিক ভাব। নান মনে করেন না যে, ব্যক্তির উপর সমাজের এমন কোন অধিকার আছে যাতে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। নান মনে করেন, ব্যক্তির মর্যাদার ও সম্ভাবনার কোন শেষ নেই এবং নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তারই চরম দায়িত্ব রয়েছে। তবে একথাও নান স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কেবল সামাজিক আবেষ্টনেই বিকাশ লাভ করতে পারে। সেখানে তা সকলের সম্মিলিত আগ্রহ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে যেন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য শিক্ষার সাহায্যে অবাধে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায়। তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও খামখেয়ালীপনা এক বস্তু নয়। শিক্ষক মহাশয় কখনই নিজের ইচ্ছা অনুসারে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সচেষ্ট হবেন না। শিশুর প্রকৃতিতে যে সকল গুণ রয়েছে তাকে অবাধে বিকাশ লাভ করবার সুযোগ দেওয়াই হল শিক্ষকের কাজ।

শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য

সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সামাজিক গুণের উন্মেষ। সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে ব্যক্তিকে কাজ করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তুত করা। প্রাচীনকালে স্পার্টানরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করত। তারা মনে করত ব্যক্তির পৃথক কোন স্বার্থ নেই, ব্যক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের স্বার্থকে বজায় রাখা। হেগেলায় দর্শনেও রাষ্ট্রকে সবশক্তিমান বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাই ব্যক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যক্তির স্বার্থ যেন কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। হিটলারের জার্মানীতে, মুসোলিনীর ইটালীতে রাষ্ট্রতান্ত্রিক শিক্ষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি।

আমাদের দেশে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের উদাহরণ দেখি তখনই, যখন আমরা আলোচনা করি সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা, সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য শিক্ষা অথবা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ইত্যাদি। কোঠারী কমিশন শিক্ষাকে মানবিক সম্পদ (Human resources) বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারের কথা বলেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্রেনিং প্রাপ্ত তরুণ সমাজ একটি বড় সম্পদ।

অধ্যাপক বাগ্‌লের মতঃ উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন বা মঙ্গল সাধন। শিক্ষাকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **অধ্যাপক বাগ্‌লের** মতে শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করতে হবে **সামাজিক দক্ষতার নিরিখে**। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হলে সামাজিক যোগ্যতার কথা বিস্মৃত হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বাগ্‌লে মনে করেন যে, যে শিক্ষা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণযোগ্য তা যেন ব্যক্তির নিম্নলিখিত গুণের বিকাশ ঘটায়। যথা—শিক্ষা যেন ব্যক্তির অর্থনৈতিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে, ব্যক্তি যেন নিজের অর্থনৈতিক

দায়িত্ব নিজেই বহন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি যখন দেখে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী তখন যেন সে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে শেখে। তৃতীয়ত, ব্যক্তি যেন সামাজিক উন্নতিকে প্রথম স্থান দিতে শেখে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষাকে যেন দমন করতে শেখে। ব্যক্তির সর্বপ্রকার কাজ ও প্রচেষ্টা যেন সামাজিক দায়িত্বের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। সমাজতান্ত্রিক দিক থেকে যখন শিক্ষার লক্ষ্য বিচার করতে হবে, তখন যেন আমরা শুধু এইটুকু আশা করতে পারি যে, শিক্ষা যেন ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থপরায়ণ করে এবং সমাজ ও জাতির প্রয়োজনকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে স্থান দিতে শেখায়।

উদাহরণঃ সামাজিক পরিবেশ যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সবিশেষ প্রয়োজনীয়, এর সমর্থনে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১. ১৭৯৯ সালে ফরাসী দেশের এভেরনের জঙ্গলে একটি ১০।১১ বৎসরের বালককে পাওয়া গেল। সে একা একা বনের মধ্যে ঘুরছিল। তার চালচলন ছিল পুরোপুরি বন্য জন্তুর মত। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী **ইটার্ড** বহুভাবে চেষ্টা করেও তাকে ঠিকভাবে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করতে পারেন নি।

২ আমাদের দেশে লক্ষ্ণৌ শহরের নিকট একটি জঙ্গলে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক লালিত একটি বালককে পাওয়া গিয়েছিল। সে নেকড়েদের মত চার পায়ে চলত এবং রান্না করা খাবারের চেয়ে কাঁচা মাংস খেতে ভালবাসত। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও সভ্য সমাজের পরিবেশে বালকটি বেশি দিন বাঁচেনি।

উভয় মতের মধ্যে সমন্বয়ঃ উপরে আমরা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিক থেকে শিক্ষার লক্ষ্যের কথা আলোচনা করেছি। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ উভয় লক্ষ্যের মধ্যে একটি সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। নান বলেছেন যে, সামাজিক পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি সুন্দর করে বলেছেন :

"মানুষের মধ্যে নিত্য-প্রসার্যমান সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা, তার দুটি দিক আছে। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা। আর একটা সামাজিক সামঞ্জস্যতা। এ দুটো পরস্পর যুক্ত, এদের মাঝে কোন ভেদ নেই। সমাজের মধ্যে না থাকলে আমরা আমাদের সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে পারি না। মানবলোকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন, তাঁদের শক্তি সকলের ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিছিন্ন নয়।"

"শিক্ষার লক্ষ্য শুধু জীবনধারণের যোগ্যতা অর্জন নয়, শুধু ব্যক্তির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি নয়। উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠ করার দিকে পরিচালিত করে।"

"মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য সকলের সত্য সম্বন্ধে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় লক্ষ্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন দ্বন্দ্ব নেই। একটি অন্যটির পবিপূরক।

আমরা শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যকে আমরা ছকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি।
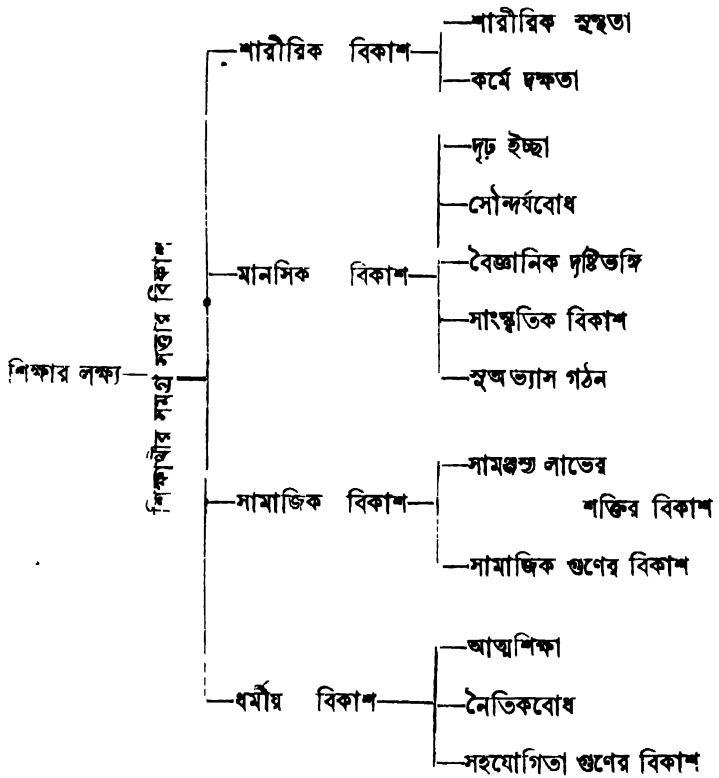
শিক্ষার কাজ

শিক্ষা কিভাবে ব্যক্তির মনে ও আচরণে ও সমাজজীবনে কাজ করে তা বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process) হিসাবে বর্ণনা করেন। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিমানসে যেমন পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি পরিবর্তন ঘটায় সমাজ-সংগঠনে। এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটে? বিজ্ঞানীদের মতে কোন কিছু পরিবর্তনের পিছনে কোন না কোন শক্তি কাজ করে। শিক্ষা যেহেতু পরিবর্তন আনে—এই জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে একটি শক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার কাজকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) **সহজাত প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ** (Sublimation);

(২) **সমাজের প্রগতি সাধন** (Social progress);

শিশুর জীবনের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শৈশবকালে শিশুর আচরণ ও মনোভাব নিয়ন্ত্রিত হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। 'আনন্দ ও দুঃখ নীতি' (**Pleasure and pain principle**) দ্বারা শিশু নিজেকে পরিচালিত করে। যে সকল কাজে বা বিষয়ে আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাই পছন্দ করে এবং যে সকল কাজে কষ্ট বা বেদনা অনুভব করে তাই পরিত্যাগ করে। প্রাক-শিক্ষাকালে শিশু বন্যভাবে বা এলোমেলোভাবে বৃদ্ধি পায়। অকর্ষিত ক্ষেত্রে যেমন নানা ধরনের আগাছা ও ঝোপঝাড় জন্মে, তেমনি শিক্ষার সুযোগ না পেলে শিশুর সু-অভ্যাস গঠিত হয় না। সমাজে ও পরিবারে অন্যের সঙ্গে সহজভাবে বাস করতে পারে না। যে নদী নিয়ন্ত্রিত নয়, বর্ষার প্রবল বর্ষণে বন্যায় তা জনপদ প্লাবিত করে এবং অশেষ ক্ষতি সাধন করে। তেমনি যে শিশু শিক্ষার সুযোগ পায়নি, সে নানাবিধ অসামাজিক আচরণে আনন্দ পায়। এখন এরূপ শিশুকে যদি শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে তার আচরণে পরিবর্তন আসে এবং সু-অভ্যাস গঠিত হয়। পরবর্তীকালে সে একজন সুনাগরিকে পরিণত হয়।

উপযুক্ত জমিতে বীজ বপন করলে সহজেই তা থেকে বৃক্ষ জন্মে। বৃক্ষ যেমন পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তেমনি তা অন্যপক্ষে পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটায়। উপযুক্ত বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষকের কাছ থেকে শিশু শিক্ষালাভ করে এবং একজন দক্ষ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তার শিক্ষা, উচ্চবুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে তার পরিবেশেরও পরিবর্তন সাধন করে। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তি যেমন তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগ্রহী হয়, তেমনি তার পরিবেশকেও নিজের মান অনুযায়ী পরিবর্তিত করে। শিক্ষার ফলে ব্যক্তি যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও অর্থনৈতিক দক্ষতা লাভ করে, তার সাহায্যে পরিবেশকে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতি পরিবেশে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে, সেগুলি আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। এই আবিষ্কারের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন পরিবর্তিত পরিবেশে ব্যক্তি আরও উপযুক্তভাবে সঙ্গতি বিধানের জন্য শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্রতী হয়। সমাজের উপরে শিক্ষার প্রভাবের ফলে সমাজের উন্নতি হয় এবং উন্নত সমাজ তার নতুন আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকেও পরিবর্তিত করে। এই শিক্ষা এবং সমাজ তথা ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের প্রগতি সাধিত হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বহুমনীষী সামাজিক প্রগতির কথা চিন্তা করেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পরবর্তীযুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন। এ সকল শিক্ষার ফলে হয়েছে সন্দেহ নেই। এইভাবে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায়ও পরিবর্তন হয়।

৩

শিক্ষা ও সামাজিক গোষ্ঠী—গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ

EDUCATION AND COMMUNITY—HOME, SCHOOL AND SOCIETY

সমাজের স্বরূপ

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। কোন কোন প্রাণীও করে থাকে। কিন্তু মানুষের সমাজ ও অন্যান্য প্রাণীদের দলবদ্ধ হয়ে বাস করবার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রাণীর প্রয়োজন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ,—প্রধানত জৈবিক। কিন্তু মানুষ তার জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তার প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করতে পারে।

এই সমাজের বৈশিষ্ট্য কি? সমাজতত্ত্ববিদদের মতে সমাজের একটি জৈবিক সত্তা আছে। বহু মানুষ যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে তখন তাকে **সমাজ** বলা হয়। ব্যক্তিকে এই সমাজের একক হিসাবে গণ্য করা চলে। একটি সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালে ব্যক্তি সমাজের অন্য মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। তবে ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিই সমাজ নয়। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি অপেক্ষা আরও কিছু বেশি। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক পারস্পরিক। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করলেও সমাজও অন্যপক্ষে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন এনে থাকে। ব্যক্তিকে সমাজে বাস করবার জন্য অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজতত্ত্ববিদগণ সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, একটি বিশেষ **ঐক্যবোধের** দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত। সমাজের মধ্যে একত্রে বাস করবার জন্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার একটা ইচ্ছা জন্মায়। এই সামাজিক ঐক্যবোধ সমাজের **প্রাণশক্তি**। এর অভাব হলেই সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজ ব্যক্তিকে একটি **নিরাপদ আশ্রয়** প্রদান করে। এই নিরাপত্তার জন্যই ব্যক্তিকে সমাজের অন্য সভ্যদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে হয়। মানুষ যখন একা, তখন অসহায়। কিন্তু সামাজিক মানুষ শক্তিশালী।

তৃতীয়ত, সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ব্যক্তির **যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তির বণ্টন**। আমরা সামাজিক পরিবেশে বাস করি, সেজন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও

সময় একমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যয় করতে হয় না। সমাজে মানুষ তার সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে নিয়েছে! আমরা কেউ বা কৃষক, কেউ বা শ্রমিক, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার। সমাজে প্রত্যেকেব কাজের বিভাগ আলাদা। একজনেব পক্ষে সকল কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তা যুগিযে থাকে কৃষক। তাঁতী আমাদের জন্য কাপড বুনে থাকে। পারস্পরিক শ্রম বিনিময় নীতির ভিত্তিতে আমরা যেমন অন্যের জন্য কাজ করি, তেমনি অন্যেরাও আমাদের কাজ করে দেয়। মানুষ যেমন সমাজ সৃষ্টি করেছে, তেমনি সমাজও মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করছে। এর ফলে মানুষের পক্ষে তার বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টার মধ্যেও প্রকৃতিব বহস্য উদ্‌ঘাটনে, নতুন শিল্পকলা সৃষ্টিতে, নতুন নতুন আবিষ্কারে আপনাকে নিযুক্ত করতে পাবে।

সমাজের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, একই সমাজের বিভিন্ন সভ্যদের মধ্যে একটি **সাংস্কৃতিক ঐক্য** বিদ্যমান। একটি সাংস্কৃতিক ভাব ও গৌরববোধ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে পরস্পরের নিকট আনয়ন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য থাকলেও একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান। ভারতীয় প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, জাতীয় গৌরববোধ এখনও নানাভাবে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মধ্যে একটি ঐক্যের সুব ধ্বনিত করে চলেছে। আবার একই সমাজব্যবস্থায়, জীবনযাত্রার প্রণালী ও ভাবগত জীবন আদর্শের মধ্যে এবং ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষ্যের মধ্যেও একটি বিশেষ মিল দেখা যায়।

সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠী বা কম্যুনিটি

ডিউই প্রভৃতি দার্শনিকদের মত এই যে, সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠী সমার্থক। প্রকৃতপক্ষে যেখানেই সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানেই সমাজেব অস্তিত্ব রয়েছে। কেউ কেউ সমাজকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন এবং কম্যুনিটি বা সামাজিক গোষ্ঠীকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন। ডিউই বলেন যে, আমরা একটি সমাজের মধ্যে বাস করি না, আমরা বাস কবি বহু সমাজের মধ্যে। আমাদের চতুষ্পার্শে যে সামাজিক পরিবেশ রয়েছে তা নানাবিধ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ধর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভাষা, জীবনযাত্রার প্রণালী, সাংস্কৃতিক মান, শিক্ষাগত পার্থক্য দ্বারা আমাদের চতুষ্পার্শের সমাজ পরিবেশ বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিকে এই বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্বেব মধ্যে প্রতিনিয়ত পথ করে চলতে হয়।

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যাপক অর্থে যদি আমরা সমাজকে দেখি তাহলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মানুষের সমাজ মানুষেব সৃষ্টি ধর্মের ফল। বৃহত্তর সৃষ্টির মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে, বিশেষ গুণ আছে, ধর্ম আছে, মানুষের সমাজের মধ্যেও ঐগুলির অস্তিত্ব দেখা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টিব মধ্যে যেমন সঙ্গতি আছে, নিয়ম আছে, মানুষের সমাজের মধ্যেও

তেমনি একটি বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি বা নিয়মের স্থান আছে। সৃষ্টি যেমন তার বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ, সমাজও তেমনি সম্পূর্ণ তার বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সমাজের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য ও কর্মপ্রণালী আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ হল মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রকাশ।

মানুষ সমাজকে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যথা—রাষ্ট্র, ধর্ম, নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশে সাহায্য করা। কিন্তু আজ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয়, আজ মানুষ প্রতি ানের অন্তরালে চাপা পড়েছে, ব্যক্তির চেয়ে আজ প্রতিষ্ঠান বড় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি সুন্দর করে লিখেছেন—"সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের সত্যকে প্রকাশ করে এবং প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ আপন সত্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে।"

মানুষ জীবনের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করে দুভাবে নিজেকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। মানুষ সমাজের মধ্যে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি আবার সকলের সঙ্গে যুক্ত। 'মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হতে হয়।'

মানুষের মধ্যে জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়েরই প্রভাব রয়েছে। কিন্তু মানুষ যতই উন্নততর আদর্শের বশবর্তী হয়ে সমাজকে উন্নত করবার চেষ্টা করছে, ততই সে নিজের জীবধর্মকে খর্ব করছে এবং সমাজধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি; কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিম প্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধা তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমনকি সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া, অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য করি। তবেই দেখা যাইতেছে—জীবনধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।"

জীবনের লক্ষণ বিকশিত হওয়া,—আপনার প্রাধান্য স্থাপন করা। এই বিকাশের জন্য দরকার সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা। এই বিকাশ ক্ষুণ্ন হলেই জীবের মৃত্যু হয়। সমাজ কিভাবে ব্যক্তিকে এই বিকাশে সাহায্য করতে পারে? আমরা দেখেছি যে, মানুষকে সমাজজীবনের উপযুক্ত হবার জন্য আপনার স্বাধীনতাকে অনেক অংশে খর্ব করতে হয়। তাহলে কিভাবে সমাজ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করেও, ব্যক্তিকে বিকাশের দিকে নিয়ে যেতে পারে? এই জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমাদের অন্যভাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

সমাজ মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রকাশ। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করলেও,—মানুষ সমাজের নিয়ম নীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে বেঁচে থাকে। কারণ সমাজ ও তার অঙ্গ ও অনুশাসন মানুষকে উন্নত করবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিমাত্র নয় বা ব্যক্তি সমাজের একটি অংশমাত্র নয়। সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি অপেক্ষা আরও বেশি। কারণ সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তির সম্পর্ক, বস্তুর সঙ্গে তার অংশবিশেষের সম্পর্কের মতো সাধারণভাবে যুক্ত নয়। যদিও একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্যক্তির মঙ্গলের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গলের কথা ভাবা যায় না, কিংবা ব্যক্তির লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে সামাজিক লক্ষ্যের চিন্তা অবাস্তব। সমাজের গঠন সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি তখন দেখি যে, সমাজ সৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তি নানা প্রকার জটিল সম্পর্ক ও নিয়ম অনুযায়ী মিলিত হয়েছে এবং মিলন একটা বিশেষ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধানের সাহায্যে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখে। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধানের লক্ষ্য মানুষকে সফলতার দিকে, জীবনের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ আপনাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, সেগুলিকে হেগেলীয় দার্শনিকগণ বলেছেন **সৎপ্রতিষ্ঠান** (Rational institutions)।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তনশীল। এই কারণে দেখা যায় যে, এক সময়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করেছে, তা পরবর্তীকালে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। ভারতের সমাজজীবনে এই তত্ত্বটির অনুকূলে অনেক উদাহরণ আছে।

ভারতীয় সমাজের প্রথম দিকে যে নিয়ম বন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধন করা, আজ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সেই পুরাতন নিয়ম শৃঙ্খলের মতো মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। আমাদের সমাজের জাতিভেদ, লোকাচার, কুধর্ম, কুসংস্কার সামাজিক বিধিনিয়মের ছদ্মবেশে মানুষের মনকে প্রতিনিয়ত পঙ্গু করেছে এবং তার স্বাধীনতাকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য এবং সৃষ্টি করেছে নানা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবর্তন করেছে নানা সামাজিক নিয়ম। সুতরাং সমাজ মানুষের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে তাকে পূর্ণতার দিকে চালিত করতে পারে যদি সমাজের যে নিয়মগুলি মানুষকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তাকে মানুষ অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু এটা সহজ বিষয় নয়। কারণ মানুষের পক্ষে সকল সময়ে কুপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হয় না। মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই দ্বন্দ্ব চলেছে। মানুষ চেষ্টা করছে সমাজের যে নিয়মগুলি তাকে বাধা দিচ্ছে সেগুলিকে অতিক্রম করতে। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যেই মানুষ এই বাধা অতিক্রম করতে পারে। যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষকে সুষম বিকাশে সাহায্য করছে তার মধ্যে

রয়েছে **গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ**। শিশুর শিক্ষায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সে সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছি।

গৃহ

পরিবার ও গৃহ অনেক স্থলে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরাও পরিবার ও গৃহকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। গৃহ কাকে বলে? সমাজের সঙ্গে গৃহের সম্বন্ধ কি? **পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে যে আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করেন তাকে গৃহ বলা হয়।** গৃহপরিবেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং গৃহেই শিশু বর্ধিত হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরা গৃহকে সমাজের 'একক' (Unit) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৃহের পার্থক্য আছে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

[ক] গৃহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এটি মানুষের আশ্রয়স্থল। শীতাতপ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রকোপ থেকে 'গৃহ'ই আমাদের রক্ষা করে।

[খ] গৃহ শুধু আশ্রয়স্থল নয়, গৃহ হল একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। গৃহ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে। গৃহপরিবেশে শিশু নিরাপত্তার ভাবটি পায় বলেই গৃহই শিশুর প্রাথমিক বিকাশের পক্ষে উত্তম স্থান।

[গ] গৃহপরিবেশেই শিশু শিক্ষাগত ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে থাকে; প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে গৃহের ভূমিকা খুব বড এবং বহুযুগ ধরে এই ভূমিকার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

[ঘ] গৃহই শিশুকে আচরণগত, অভ্যাসগত ও নৈতিক নির্দেশন দিয়ে থাকে। গৃহপরিবেশেই শিশু শিক্ষালাভ করে—কিভাবে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় এবং শারীরিক সুস্থতা ও সু-অভ্যাস গঠনের জন্য কি কি নিয়ম পালন করতে হয়। উত্তম গৃহপরিবেশেই শিশুর চরিত্রে নৈতিক বোধ জন্মে থাকে।

[ঙ] গৃহপরিবেশ যে বিশেষ কারণে শিশুর বিকাশের পক্ষে উপযোগী, তা হল এই যে, গৃহপরিবেশে শিশু মাতাপিতার স্নেহের আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, শিশুও তেমনি প্রকৃত স্নেহের পরিবেশ ছাড়া সঠিকভাবে বাড়তে পারে না। সেই শিশুই ভাগ্যবান যে শৈশব থেকে মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে লালিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ গৃহের তাৎপর্য সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষের নিকট গৃহের একটি চিরন্তন আবেদন আছে এবং এর ফলেই গৃহের পরিবেশ মানুষকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'গৃহের একটি গভীর তাৎপর্য এই যে, এটি একটি সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী মাত্রই নয়, এর আছে একটি শাশ্বত নৈতিক ভাব। গৃহ মানবিক সম্পর্কের প্রকৃত সত্যটিকে প্রকাশ করে থাকে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্য ও প্রেমের প্রকাশস্থল।'*

---

*'The permanent significance of home is not in the narrowness of its enclosure but in an eternal moral idea. It represents the truth of human relationship ; it reveals loyalty and love for the personality of man.—Creative Unity, P. 165.

একটি উজ্জ্বল ভালবাসার বেষ্টনী গৃহকে মাধুর্যমণ্ডিত করে রাখে। মায়ের ও আত্মীয়পরিজনের স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে গৃহ শিশুর মনকে বিকশিত করে। কিন্তু নানা কারণে আমাদের সমাজে আদর্শ গৃহের অভাব আছে।

গৃহের শ্রেণীবিভাগ

অতিরিক্ত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরিবারের লোকসংখ্যা গৃহপরিবেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। উপরোক্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে গৃহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

[ক] ক্ষুদ্র গৃহ বা একপরিবার বিশিষ্ট গৃহ (Small home): যে পরিবারের লোকসংখ্যা সীমিত এবং পরিবারের সভ্যসংখ্যা স্বামী, স্ত্রী ও দু-তিনটি সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাকে ক্ষুদ্র গৃহ বা একপরিবার বিশিষ্ট গৃহ বলে। এই ক্ষুদ্র গৃহের নেতা হল একজন এবং পরিবারের বিভিন্ন সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি-ভাবে ঘটে থাকে। এই সরাসরি সম্পর্কের জন্য পারিবারিক শৃঙ্খলা হয় উচ্চ পর্যায়ের।

[খ] বৃহৎ গৃহ বা বহুপরিবার বিশিষ্ট গৃহ (Big home): যে পরিবারের লোকসংখ্যা বহু এবং একই গৃহে বা গৃহপরিবেশে একাধিক পরিবার বাস করে তাকে বৃহৎ গৃহ বলা হয়। বৃহৎ গৃহপরিবেশে একাধিক গৃহের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বৃহৎ গৃহপরিবেশে পারিবারিক সভ্যদের আন্তঃসম্পর্ক (Inter-relationships) জটিল। এইরূপ গৃহে শৃঙ্খলার মান সাধারণত নিম্ন পর্যায়ের এবং একাধিক নেতৃত্বযুক্ত। এইরূপ পরিবারে সামান্য কারণে পারিবারিক শৃঙ্খলার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সাধারণত একান্নবর্তী পরিবারে বৃহৎ গৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

[গ] শিক্ষিত গৃহ (Literate home): গৃহ ক্ষুদ্রই হোক বা বৃহৎ হোক, পারিবারিক সভ্যদের শিক্ষার মান অনুযায়ী গৃহকে শিক্ষিত গৃহ বা অশিক্ষিত গৃহ বলা চলে। শিক্ষিত গৃহের সাংস্কৃতিক মান উচ্চ পর্যায়ের এবং শিক্ষার জন্য সভ্যদের উপযোজন (Adjustment) ক্ষমতাও বেশি।

[ঘ] অশিক্ষিত গৃহ (Illiterate home): অশিক্ষিত গৃহপরিবেশের সাংস্কৃতিক মান নিম্ন পর্যায়ের। পারিবারিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আচরণে ও কথায় শালীনতার অভাব দেখা যায়।

[ঙ] উপরোক্ত বিভাগগুলি ছাড়া গৃহকে **উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত** এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। শিশুর শারীরিক ও শিক্ষাগত উন্নতির সুযোগ পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। উচ্চবিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে সুযোগ পেতে পারে, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব হয় না।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা গৃহপরিবেশকে নানাভাবে ভাগ করলেও একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, গৃহের একটি শাশ্বত আবেদন আছে।

শিক্ষার একটি ক্ষেত্র হিসাবে গৃহের স্থান

শিশুর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর স্থান হল তার গৃহ। ইংরাজী কবিতায় আমরা পড়ি—'Home, home, sweet home, there's no place like home.'। অথবা বাংলা কবিতা—'সর্বতীর্থসার, তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।' জীবনের আনন্দময় অংশের শুরু হয় এখান থেকেই। গৃহেই প্রথমে শিক্ষার বীজ রোপিত হয়—বৃহত্তর জগতের লৌকিক শিক্ষার পূর্বে। গৃহে পিতামাতাই শিশুর শিক্ষক এবং পিতামাতাকে কেন্দ্র করে গৃহপরিবেশে শিশুর লালন-পালন ও বিকাশ ঘটে থাকে। পারিবারিক আবহাওয়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। জন ডিউই-এর মতে সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ গৃহেই ঘটে থাকে।

গৃহপরিবেশে শিশু খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে যেমন শারীরিক শক্তি লাভ করে, তেমনি তার অভ্যাস, আগ্রহ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রভৃতি মানসিক শক্তির বিকাশও ঘটে এই সময় থেকে। গৃহপরিবেশেই শিশু প্রথমে বুঝতে শেখে, কোন কিছু সঠিকভাবে দেখতে শেখে এবং বস্তু ব্যবহারের জ্ঞান লাভ করে। গৃহপরিবেশেই সে নিজের মাতৃভাষার জ্ঞান অর্জন করে থাকে।

পরিবর্তনশীল জীবনধারার প্রভাব সমাজের সব কিছুর সঙ্গেই দেখা যায়। পরিবারের উপরেও এই পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়। তাই অতীতের গৃহ তথা পরিবার সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের জীবনে নানা রকম পরিবর্তন ঘটেছে, সভ্যতার চরম উন্নতির দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে আজকের জগৎ। তবে এত পরিবর্তন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে গৃহের মূল্য বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। কারণ শিশু জন্মগ্রহণ করে একটি পরিবারের মধ্যে এবং এ কারণেই কেবলমাত্র গৃহপরিবেশই পারে শিশুর প্রাথমিক ভাবপ্রকাশকে পরিস্ফুট করতে। গৃহের শিক্ষার সাহায্যেই শিশু তার চারিদিককার পরিবেশকে আয়ত্ত করতে শেখে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার অভ্যাস, শৃঙ্খলাবোধ, সহানুভূতি, বিচার ক্ষমতা প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ ঘটে থাকে বাল্যকালে। একটি আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে চিন্তা, অনুভূতি, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তির স্তর রচিত হয়। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড মনে করেন যে, পিতামাতার প্রতি প্রাথমিক মনোভাবই ক্রমশ শিশুর মধ্যে বিভিন্ন আবেগানুভূতির সামঞ্জস্য বিধান করে এবং ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে, শিশুর ব্যক্তিত্বকে একটি সংহত রূপ দান করে থাকে। শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত গৃহই শিশুর শিক্ষা ও জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই বর্তমান সময়ে যদিও জীবন ক্রমশ উন্নততর ও জটিলতর এবং নানা প্রকার সমস্যার দ্বারা জর্জরিত—তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, **এখন পর্যন্ত শিশুর শিক্ষার উন্মেষকালের প্রধান শক্তি গৃহই।**

গৃহের ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচনা ঃ শিশুর শিক্ষায় গৃহের ভূমিকা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। গৃহের পরিবেশ যদি আদর্শ হয়, তাহলেই কেবলমাত্র গৃহের বিশেষ ভূমিকাকে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, তেমন আদর্শ গৃহ আমাদের সমাজে নেই, যে গৃহের পরিবেশে শিশুর সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর কিছু। ইহাদের প্রত্যেকেব ঘরের রকম-সকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরের ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটি ছাপ পাইতে থাকে।

"জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকার-প্রকার লইয়া মানুষ এক একটা কোঠায বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু বালকেবা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসাবে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাদেব পক্ষে কল্যাণকব নয়।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাহরণ দিয়েছেন—

"ধনীর ছেলে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোন প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ এই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মাযেব উচিত গোড়ায় সাধাবণ মনুষ্যত্বে পাকা কবিয়া তাহার পবে আবশ্যক মতো ছেলেকে ধনার সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না। সে সম্পূর্ণরূপে মানব সন্তান হইতে শিখিবাব পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানব জন্মেব অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পডিযা যায়।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "বাল্যকাল হইতেই লোকলজ্জার ভয়ে ধনীর ছেলে যে কেবল অনাবশ্যক শাসনে আবদ্ধ হইযা পডে তা নয। সে সুখভোগের লোভে নিজেব সামান্য প্রযোজনগুলি এমনভাবে বাড়াইয়া তোলে যে, ভবিষ্যতে তাহাব পক্ষে ত্যাগ স্বীকার অসাধ্য হয। কষ্ট স্বীকার কবা অসম্ভব হইযা পডে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন, "যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছা-পূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয়, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু শিশুবা, যাহারা ধূলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ—নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই—তাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতা-মাতার দ্বারাই সম্ভব। সেই পিতা-মাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।"

আমাদের সমাজে যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় মানুষ হয়েছেন তাঁরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরও ঐভাবে মানুষ করতে চান। তার কারণ এই যে, এর ফলে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের কোন ক্ষতি হচ্ছে—এই জিনিসটি তাঁরা তেমন বুঝতে পারেন না। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সকল বিশেষ বিকৃতি আছে, তার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন। পিতামাতা নিজেদের বিকৃত রুচি ও চিন্তার দ্বারা শিশুর মনুষ্যত্ব লাভে বাধা সৃষ্টি করবেন—এটি বর্তমানে কোন ক্রমেই ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। অনেকে মনে করেন, পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ, দ্বেষ, অন্যায় পক্ষপাত, বিবাদ, বিরোধ, নিন্দা, গ্লানি, কুঅভ্যাস, কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকলেও পরিবার থেকে দূরে যাওয়া ছেলেদের পক্ষে বিশেষ বিপদ। তার কারণ আমরা যার মধ্যে মানুষ হয়েছি তার মধ্যে আর কেউ মানুষ হলে ক্ষতি আছে—একথা আমাদের মনেও আসে না। এজন্য ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমাদের আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।

বিদ্যালয়

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, **গৃহ** শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে একটি উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই—তবে গৃহ যেন **আদর্শ গৃহ** হয়। নানা কারণে আমাদের দেশে আদর্শ গৃহ পাওয়া কঠিন। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতির প্রভাব আমাদের দেশের অধিকাংশ গৃহেই বর্তমান। এ অবস্থায় একমাত্র গৃহের উপর শিশুর শিক্ষার ভার দেওয়া যায় না। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। কারণ সমাজব্যবস্থার জটিলতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, গৃহের পক্ষে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করা ততই কঠিন হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস

বিদ্যালয়ের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন যুগে শিক্ষার ভার ছিল পুরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর। তথাকথিত বিদ্যালয় আরম্ভ হয় মানুষের লিখিত ভাষা আবিষ্কারের পর থেকে। কিন্তু প্রাচীন যুগের বিদ্যালয়ের সংগঠন বা রূপ বর্তমান যুগে একেবারে অচল। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে সমাজব্যবস্থা আরও জটিলতর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধাঁচের পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে নতুন ধাঁচের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। বর্তমানে বিদ্যালয় সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। সভ্যসমাজ ও বিদ্যালয় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সমাজ আছে অথচ বিদ্যালয় নেই—একথা আজ ভাবা যায় না।

বিদ্যালয়ের তাৎপর্য

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের তাৎপর্য কি? বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের বেষ্টনী, যেখানে পরিবেশকে শিশুদের উপযোগী করে সরলীকৃত করা হয়েছে। এই সরলীকৃত পরিবেশে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিশুদিগকে

জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত সামাজিক প্রলোভন বাধা সৃষ্টি করে, বিদ্যালয় সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে থেকে শিশুকে ঐ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং শিশুর সুষম বিকাশের অনুকূলে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন পরিবেশের প্রভাবেই শিশু সক্রিয়তার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ লাভ করে থাকে। বিদ্যালয় জ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সরলীকৃতভাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপিত করে যাতে শিশু সহজেই জ্ঞানের মূল বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে পারে। সমাজে বিদ্যালয়ের স্থান হল বাগানের মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বিশেষ পরিবেশের মতো যেখানে মালী চারাগাছগুলিকে বাইরের জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আগলে রাখে।

বিদ্যালয়ের কাজ

বিদ্যালয়ের কাজগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,—

১. বিদ্যালয় শিশুকে প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় ঘটায়।

২. বিদ্যালয় শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে একটি সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে সাহায্য করে।

৩ বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুর যুক্তি-শক্তি ও বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ সাধনে এবং নতুন বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষমতা দান করে।

৪. বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুকে ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খলভাবে জ্ঞান লাভে সাহায্য করে এবং নতুন ক্ষেত্রে নবলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে থাকে।

৫. বিদ্যালয় একটি সুসম সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এই সমাজজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিকতা গুণের বিকাশ ঘটায়।

৬. বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয় অতিরিক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুব সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে।

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বিদ্যালয়ের কাজ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন। এইগুলি হল—

১ **বিদ্যালয়ের কাজ গৃহের কাজের পরিপূরক**ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর ও অবস্থার গৃহ থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ে আসবার পূর্বে গৃহ থেকে তারা অনেক বিষয় শিখে আসে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন মানের পরিবারের প্রভাব বিভিন্ন, এই কারণে বিদ্যালয়ে যে সকল শিশু আসে তারা বিভিন্ন মানের শিক্ষা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ের কাজ হল পারিবারিক শিক্ষার **পরিপূরক** হিসাবে কাজ করা। গৃহ থেকে শিশু যে শিক্ষালাভ করে তা নানা দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর গৃহের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।

২. **বিদ্যালয়ের কাজ সংশোধনমূলক**ঃ শিশু গৃহে যে শিক্ষা লাভ করে তা যেমন সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়, তেমনি ঐ শিক্ষার মধ্যে নানা ত্রুটি থাকে। বিদ্যালয়ের কাজ হল

গৃহ থেকে শিশু যে শিক্ষা লাভ করে তাকে সংশোধন করে প্রকৃত শিক্ষা দান করা। গৃহের পরিবেশ ও পিতামাতার অজ্ঞতা হেতু গৃহ থেকে শিশুরা অনেক সময়ে অনেক কুশিক্ষা নিয়ে আসে। বিদ্যালয়ের কাজ হল ঐগুলি সংশোধন করে শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দান করা।

৩ **বিদ্যালয়ের প্রতিরোধমূলক কাজঃ** গৃহ থেকে শিশুরা যেমন অনেক কু-অভ্যাস নিয়ে আসে, তেমনি আচরণগত এবং মাতৃভাষাব উচ্চারণগত অনেক ত্রুটিও দেখা যায়। বিদ্যালয়ের কাজ হল শিশুর কু-অভ্যাস ও কুশিক্ষাকে প্রতিরোধ করা এবং শিশুকে সঠিকভাবে শিক্ষা দান করা।

৪. **বিদ্যালয়ের কাজ হল সমন্বয় সাধন করাঃ** বিদ্যালয়ের কাজ হল, শিশুর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধন কবা। শিশু গৃহ, সমাজ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে শিক্ষা লাভ কবে বিদ্যালয় ঐ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৫. **বিদ্যালয়ের কাজ হল তত্ত্বাবধানমূলকঃ** আমাদের বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এটা বংশপরম্পরা অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল বিষযগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট স্থানান্তরিত করে। তবে অবশ্য প্রাচীনকালের সকল বিষযই বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যালয় কেবলমাত্র জাতীয় ঐতিহ্যের সেই বিষয়গুলিই শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করে, যেগুলি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। উদাহবণ স্বরূপ বলা যায় যে, সমাজের একটি অবস্থায় জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন ছিল, সমাজের বিভিন্ন কাজ ভাগ করে সম্পাদন করবার জন্য। কিন্তু বর্তমানে ঐ প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা ভারতের গণতান্ত্রিক নীতি ও নিয়মের বিরুদ্ধে। এই কারণে বিদ্যালয় যেমন জাতিভেদ প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করে, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রেম ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের জন্য চেষ্টা করে।

৬. **সৃজনমূলক কাজের সুযোগ দানঃ** বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হল ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনমূলক কাজে উৎসাহিত কবা। বিদ্যালয় শিশুদের নানা ধরনেব কাজ করবার জন্য সুযোগ দিয়ে থাকে এবং ঐরূপ কাজে অংশ গ্রহণ করে শিশুরা নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। বিদ্যালয়ের কাজ শুধু পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো নয়, বিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ শিশুদের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা। সৃজনমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে শিশুরা যেমন নিজেদের শক্তিকে আবিষ্কার করে, তেমনি কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের নৈপুণ্যকে উন্নত করে।

৭. **উদ্দীপনা ও প্রেরণাদায়ক কাজঃ** বিদ্যালয়েব বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে শিশুরা উদ্দীপনা ও প্রেরণা লাভ করে থাকে। বিদ্যালযে শিশুদেব জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম এমনভাবে সরলীকৃত করা হয় যে, প্রত্যেকটি শিশু নিজেদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে শিশুরা যখন সাফল্য লাভ করে, তখন তা তাদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং

তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে। পরবর্তীকালে শিশু যখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তখন বিদ্যালয়লব্ধ অভিজ্ঞতা তাকে পরবর্তী জীবনে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগায়।

৮. **মূল্যায়নের শক্তি দান ঃ** বিদ্যালয়ের সার্থক কার্যক্রম শিশুদের ভালমন্দ বিচারের শক্তি দান করে। তারা সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে ও সুশিক্ষার এবং কুশিক্ষার তফাত নির্ণয় করতে পারে।

বিদ্যালয়-সমাজের বৈশিষ্ট্য

বিদ্যালয় একটি সরলীকৃত (Simplified) সমাজ। বিদ্যালয় সমাজের দুটি রূপ বিদ্যমান। প্রথমত, এটি বৃহত্তর সমাজের অংশ। এই হিসাবে বিদ্যালয়-সমাজ আমাদের প্রকৃত সমাজের অংশ। কিন্তু তা আবার বৃহত্তর সমাজের একটি সরলীকৃত বেষ্টনী। এই কারণে বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে আছে কৃত্রিমতা। এই বিষয়টি নিয়ে স্যার পারসি নান সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"বিদ্যালয় অবশ্যই একটি সমাজ। তবে তা একটি বিশেষ ধরনের সমাজ। এটা এই অর্থে প্রকৃত সমাজ যে, বিদ্যালয় পরিবেশ ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের জীবনযাত্রার অবস্থার মধ্যে কোনরূপ ভয়ঙ্কর ছেদ থাকে না। কিন্তু অন্য পক্ষে বিদ্যালয় হল একটি কৃত্রিম সমাজ। কারণ এর জীবনযাত্রার মধ্যে বৃহত্তর সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ ঘটে থাকলেও, সমাজের সেই বিষয়গুলিই মাত্র এটি নির্বাচন করে যেগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজের যা কিছু উত্তম এবং জীবনীশক্তিযুক্ত তারই প্রতিফলন এখানে ঘটে থাকে।"*

আমরা পূর্বে বলেছি, মানুষ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিন্তু সামাজিক সর্বপ্রকার গুণ থাকা সত্ত্বেও এই বিদ্যালয় পরিবেশের একটি কৃত্রিমতার ভাব আছে। শিশু-জীবনে এই কৃত্রিমতা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ দুঃখজনক। এই কৃত্রিমতার জন্য বিদ্যাশিক্ষা শিশুর জীবনে গৃহ থেকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে মনে হয়। বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের গৃহ এক জায়গায়, বিদ্যালয় আর এক জায়গায়, প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে! কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে। সুতরাং এই বিধানকে কোন মতেই আমরা চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। আমাদের বলতেই হবে যে, শিশু-শিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিকমতো সমাধান করা হয় নি। তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েছে। পাখির ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষিমাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা পায়। সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নায় এই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।"

---

*The School must be a society, must be a society of special character. It must be a natural society in the sense that there should be no violent break between the conditions of life within and without it. But on the other hand, a school must be an artificial society in the sense that while it should reflect the outer world truly, it should reflect only what is best and most vital there."
Sir Percy Nunn: Education, its Data and First Principles, Page 250.

বিদ্যালয়ের নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়কে আমরা সমাজজীবন থেকে বাদ দিতে পারি না। বিদ্যালয় আমাদের জীবনে অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান। শিশুর ক্রমবর্ধমান জগতে তিনটি পরিমণ্ডল বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়—গৃহ, বিদ্যালয় এবং সমাজ। এই তিনটির মধ্যে একমাত্র শিক্ষাই পারে পারস্পরিক সম্পর্ক আনতে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হয় যে, বিদ্যালয়ের মধ্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ সমাজ বিশাল ও জটিল। কিন্তু শিক্ষার উন্মেষ কালে বিদ্যালয়ে যদি নানারকম বৈচিত্র্য আনা যায়, এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, সমাজের সঙ্গে শিশুর সামঞ্জস্য বিধান করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

শিশুর জীবনে বিদ্যালয়ের স্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় পারে শিশুকে সুষ্ঠু জীবনবোধের সন্ধান দিতে এবং সুনাগরিকতার ট্রেনিং দিতে। কারণ একমাত্র তাহলেই ভবিষ্যতে শিশুর পক্ষে সমাজকে সঠিকভাবে সেবা করা সম্ভব।

এই জন্যই বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুর মানসিক রুচি ও ভাবনা দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। আর এই শিক্ষা পদ্ধতি সুসংহত হওয়া উচিত। এই কারণে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার আদর্শগত দিকের প্রতি বিদ্যালয়ের যেমন লক্ষ্য থাকবে, তেমনি তার ব্যবহারিক দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে যেমন ব্যবহারিক দিক থেকে শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে, তেমনি দিতে হবে নৈতিক শিক্ষা। কারণ সমগ্র শিক্ষার ভিত্তির উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন দাঁড়িয়ে আছে। এই জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের মূলধন।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ ঃ জন্মলাভের পর থেকেই শিশুকে জীবনের নানা স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এগুলি শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন। সুতরাং শিশুর জীবন পরিক্রমার স্তর অনুযায়ী বিদ্যালয়ের রূপও হবে বিভিন্ন। শিশুর জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন স্তরের চাহিদার দিক থেকে বিদ্যালয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—১. নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়. ৪. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫. উচ্চতর শিক্ষালয়।

নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়

বর্তমান জটিল সমাজজীবনে নার্সারী বা প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ স্থান সকলেই স্বীকার করেন। সাধারণত ২½ বৎসর থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য এই শিক্ষা নির্দিষ্ট। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে যেখানে মা ও বাবা দুজনেই বাইরে কাজ করেন, সেখানে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা বা শিক্ষা দেবার জন্য নার্সারী বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্য শিশুদের সঙ্গে দল বেঁধে খেলাধুলা করা, নানারকম কাজ করা এবং ফাঁকে ফাঁকে অল্প কিছু লেখাপড়া করানো নার্সারী বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ছেলেমেয়েদের নানাবিধ সু-অভ্যাস গঠন

করা, নিজের কাজ নিজে করবার ক্ষমতা অর্জন করা, নিজের শরীরের যত্ন নিতে শেখানো প্রভৃতিও নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নার্সারী বিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষ কাজ হল শিশুর সামাজিকতা গুণের বিকাশ ঘটানো।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, শহর অঞ্চলের ন্যায় গ্রাম অঞ্চলেও নার্সারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ গ্রাম অঞ্চলে অশিক্ষিতের হার বেশি এবং অধিকাংশ পিতামাতা নিরক্ষব। সুতরাং পরিবারের পক্ষে শিশুর শিক্ষার ভাব নেওয়া সম্ভব নয়। নার্সারী স্কুল এই দায়িত্ব খানিকটা পালন করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ নার্সারী বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয। শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা দেবার মতো আয়োজনও তাদের নেই। শিক্ষকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নন। প্রকৃত আদর্শ নার্সারা বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় এগুলি সেরকম নয়। এগুলির অধিকাংশই চলে মালিকানা ও লাভের ভিত্তিতে। সরকারী শিক্ষা দপ্তরেব অধীনে এগুলি আনবার কোন ব্যবস্থা নেই এবং সরকারী কোনরূপ অনুদানও এদেব জন্য নির্দিষ্ট নেই। এই কারণে এই ধরনের অনুপযুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষালয় না বলে 'শিক্ষা দেবার দোকান' (**Teaching shops**) বলাই সঙ্গত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিশুদিগকে সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের উপযুক্ত হবাব শিক্ষা দেয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা। সাধারণত ৬ থেকে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদেব জন্য এই শিক্ষা। আজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিকাংশ দেশেই বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ভাবতে নানা কাবণে এটি এখনও করা সম্ভব হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাব পাঠ্যক্রমে সাধাবণত মৌল বিষযগুলি শিক্ষা দেওয়া হয় অর্থাৎ লেখা, পড়া ও গণিতের জ্ঞান। শিশুকে পবিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে উপযোজনের জন্য এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান বিশেষ প্রযোজন। এছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য দরকার প্রকৃতি পাঠ, ভূগোল এবং ইতিহাসের জ্ঞান। স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক নীতি ও হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে। অনেক ছেলেমেয়ের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার পর আর অন্য কোন শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে না। তাদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যেই সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঠিকভাবে মানিয়ে চলতে হয়। এই কারণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেকে 'গণতন্ত্রের শিক্ষা' বলে থাকেন। কারণ জনসাধারণ গণতন্ত্রেব মূল নীতিগুলি এই শিক্ষার সাহায্যেই লাভ করে থাকে। আমাদেব দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে এখন পর্যন্ত সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে বর্তমান সবকারী নীতি হল প্রাথমিক শিক্ষাকে দ্রুত সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক শিক্ষা হল, প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী ও উচ্চ শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা হল, বালক-বালিকাদের কৈশোর কালের শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়র কমিশন)-এর মতে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—১. ভারতের

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা। ২. ছাত্ররা যাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ব্যবহারিক কাজ ও বৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। ৩. ছাত্রদের সাহিত্য, চারুকলা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগ্রহ জন্মানো, যাতে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে লক্ষ্যের কথা বলেছেন—তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা এবং এই শিক্ষা ছাত্ররা লাভ করবে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী। জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নতিব কথা বিবেচনা করে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিযন্ত্রিত করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উপযোগী কবে ছাত্রদের প্রস্তুত করা।

দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালযগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদাযেব শিক্ষার প্রযোজনের কথা বিবেচনা কে মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১ **মধ্য-বিদ্যালয় (Middle schools) অথবা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Junior secondary schools) ঃ** এইরূপ বিদ্যালয়ে থাকবে তিনটি মাত্র শ্রেণী ; সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার পব তিন বৎসরে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করা যাবে।

২. **উচ্চ বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Secondary schools) ঃ এগুলি হবে দশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়। এগুলি হল পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কোটারি কমিশনের মতে এইরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালযগুলিতে একই ধরনের পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শারীরিক শিক্ষা, কর্মশিক্ষা প্রভৃতি এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হবে।

৩. **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Higher secondary schools) ঃ এই শ্রেণীর বিদ্যালয়েব পাঠের কাল হবে দুই বৎসর। এই স্তরে বহুমুখী পাঠ্যক্রম চালু করা হবে যাতে ছাত্রবা তাদেব যোগ্যতা, প্রবণতা ও সুযোগ অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে পাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পুবাতন ইনটারমিডিয়েট শিক্ষা যেন এই নতুন ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে পুনরায় চালু করা হচ্ছে।

৪. **কারিগরী বিদ্যালয়** (Technical schools) ঃ ব্যাপক কারিগরী শিক্ষা আমাদের দেশের সার্থক শিল্পায়নের জন্য অত্যন্ত প্রযোজন। আমাদের বর্তমানের পলিটেকনিক বিদ্যালয়গুলি এই পর্যাযের অন্তর্গত। মুদালিয়র কমিশনের মতে দেশের শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে আঞ্চলিক শিল্পের প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সম্ভব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পের সহযোগিতা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে।

৫. **কৃষি বিদ্যালয়** (Agricultural schools) ঃ ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। এইরূপ বিদ্যালয় গ্রামে স্থাপন করা উচিত এবং পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে কৃষি ছাড়া উদ্যান নির্মাণ, পশুপালন, এবং কুটীর শিল্প শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৬. **পাবলিক স্কুল** (Public schools) ঃ পাবলিক স্কুলগুলি হল এক বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় যেখানে একমাত্র দেশের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের ধরনে ভারতেও কিছু সংখ্যক পাবলিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। পাবলিক স্কুলগুলি আবাসিক এবং শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের এলাকায় বাস করেন। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর চরিত্র বিকাশের উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর এই ধরনের বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মুদালিয়র কমিশন তাঁদের রিপোর্টে দেশের বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে পাবলিক স্কুলগুলির সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা এই মন্তব্যও করেছেন যে, স্কুলগুলিকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং এগুলি যাতে আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসাবে পুনর্গঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কমিশন আরও মন্তব্য করেছেন যে, এই বিদ্যালয়গুলিতে সকল শ্রেণীর প্রতিভাবান ছেলেরা পড়বার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আবাসিক বিদ্যালয়

যে সমস্ত ব্যক্তি বদলির চাকরি করেন বা সামরিক বিভাগে বা বৈদেশিক বিভাগে চাকরি করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় বিশেষ প্রয়োজন। অনেক দেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে এইগুলি পরিচালিত হয়। এই ধরনের বিদ্যালয়গুলির প্রধান অসুবিধা এই যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়তে হয় এবং শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচনে অসুবিধা দেখা দেয়। ভারতে বর্তমানে এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী অথবা হিন্দি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী স্তরের শিক্ষা হল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। এই স্তরের শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কোন এক বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নতুন সত্য উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়।

সমাজ শিক্ষালাভের একটি ক্ষেত্র

শিক্ষালাভের একটি ক্ষেত্র হিসাবে সমাজের একটি বিশেষ স্থান আছে। শিক্ষা ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। সমাজ তার বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছে সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের

শিক্ষিত করবার জন্য। সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নতি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। আবার উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব সমাজের। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ব্রিটিশ আমলে আমরা যে ধরনের শিক্ষায় সন্তুষ্ট ছিলাম এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আমরা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা চিন্তা করছি।

শিক্ষা হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার কাজ। সমাজ তার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাধ্যমে এই শিক্ষাকার্য পরিচালনা করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কখন এককভাবে, কখনও সম্মিলিতভাবে এই কাজ করে থাকে। সমাজের যে প্রতিষ্ঠানগুলি এই শিক্ষাকার্য পরিচালনা করে থাকে, তার মধ্যে প্রধান হল—পরিবার, বিদ্যালয়, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, সংবাদপত্র, যুব সংগঠন, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে দেখা যায়, সমাজের সংগঠিত প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে গৃহ বা পরিবারই প্রাচীনতম। প্রাচীন যুগে গৃহই ছিল বিদ্যালয়, আর পিতামাতা ছিলেন শিক্ষক। ক্রমশ সমাজের উন্নতি ও জীবনের চাহিদা অনুযায়ী নানা পরিবর্তন দেখা গেল। ফলে পরিবারের পক্ষে সমাজের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই সময় থেকেই শিক্ষা সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এর পরেই ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, পরিবারের পরেই ধর্মের স্থান। ধর্মানুমোদিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মনুষ্যগোষ্ঠী নানা প্রকার ধর্মায়তন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সেই কারণে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার সংগঠন ও পদ্ধতি ধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ-বিহারগুলি শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো। ধর্মযাজকেরা ছিলেন এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক।

অপর দিকে আমাদের দেশের যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, পাঁচালী, কবিগান, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা অগ্রসর হত। সেই কারণে মেলা, পূজা-পার্বণ ও নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষার বিশেষ সহায়করূপে জনশিক্ষার-দায়িত্ব গ্রহণ করতো। সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষায় এদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকে রেনেসাঁসের ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের প্রভাবে জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেকখানি বদলে গেল। বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে পারলৌকিক চিন্তার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে হ্রাস পেল এবং মানুষ ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হল। ফলে ধর্মায়তনগুলি আগের মত জীবন ও শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করতে পারলো না।

সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যা পরোক্ষভাবে শিক্ষাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। খেলাধূলার ক্লাব, ব্যায়ামাগার,

সাধারণ পাঠাগার, সাংস্কৃতিক সংঘ, সাহিত্যচক্র, বিজ্ঞান আলোচনার আসর, রাজনৈতিক দল, অর্থনৈতিক সংস্থা প্রভৃতি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সভ্যদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান ও ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা-লাভের পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে থাকে। শিক্ষা জীবনের একটি প্রধান সম্পদ। এই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি নানাভাবে ব্যক্তির জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকার মূল্যবান তথ্য, পুস্তক প্রভৃতি সরকারের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এইগুলির সাহায্যে ব্যক্তি বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এ ছাড়া নানাবিধ সমস্যার আলোচনা, সম্মেলন প্রভৃতির দ্বারাও সরকার অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সমাজের বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতিও ব্যক্তিকে তার ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। এইগুলি প্রগতিশীল শিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাবিধান করলেও এদের অন্যরকম দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। কাজেই বিদ্যালয়ই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার চরম লক্ষ্য রূপায়িত হয়।

৪

শিক্ষার উপাদান : শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক

FACTORS OF EDUCATION: CHILD, CURRICULUM AND TEACHER

স্যার জন অ্যাডাম্‌স্ শিক্ষাকে বলেছেন, **একটি দ্বিমেরু যুক্ত প্রক্রিয়া** (a bipolar process)। শিক্ষা প্রক্রিয়ার একদিকে রয়েছেন শিক্ষক, অন্যদিকে রয়েছে শিক্ষার্থী। কিন্তু এই দুটি বিষয় ছাড়া অন্য একটি বিষয়ের কথাও আমাদেব চিন্তা করতে হবে। সেটি হল পাঠ্যক্রম বা পাঠের বিষয়বস্তু। শিক্ষাবিদগণ এই তিনটি বিষয়কে শিক্ষার উপাদান বলেন।

শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষককে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?

শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাধারণত তিনটি বিষয়কে নিয়ে শিক্ষার কাজ। এই শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান হল শিশু বা শিক্ষার্থীর অংশ। শিশুকে বাদ দিয়ে কোন ক্রমেই শিক্ষার কথা ভাবা যায় না। রামকে বাদ দিয়ে যেমন রামায়ণ হয় না, তেমনি শিশুকে বাদ দিয়ে কোনরূপ শিক্ষার পরিকল্পনা করা চলে না। উপাদান বলতে আমবা বুঝি কোন জিনিসের অংশ অর্থাৎ কোন জিনিস যে সকল বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত হয়, ঐ সকল বস্তুকে নির্দিষ্ট জিনিসটির উপাদান বলে। আমরা জানি বায়ুর উপাদান হল, অক্সিজেন. নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস, জলের উপাদান হল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস। তেমনি শিক্ষার উপাদান হল শিশু, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষাদানের উপযোগী পরিবেশ।

আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো এই দিকে প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়বস্তু অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের প্রাধান্য ছিল। শিশুর স্থান ছিল গৌণ। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। এই কারণে বর্তমান যুগকে বলে **শিশু-শতাব্দী**।

শিক্ষাব উপাদানের কথা আলোচনা করতে হলে শিশুর পরেই আসে পাঠ্যক্রমের স্থান। পূর্বে শিশুকে পুন পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করতে হত। পাঠ্যক্রম ছিল নির্দিষ্ট। আধুনিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রম পরিবর্তনশীল, শিশুর প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। পাঠ্যক্রম নির্বাচনের জন্য শিশুর বয়স, বুদ্ধি, প্রবণতা ও প্রয়োজনের কথা চিন্তা করা হয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের মারফত শিশুর শিক্ষা পরিচালিত হয়। এই কারণে শিক্ষার অন্যতম উপাদান হল পাঠ্যক্রম।

শিক্ষককেও শিক্ষার উপাদান বলা হয়। শিক্ষক হলেন শিক্ষাকার্যক্রমের পরিচালক। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাড়া শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। একজন শিক্ষক হলেন প্রদীপের জলন্ত শিখার ন্যায়, যিনি তাঁর জ্ঞানের শিখার দ্বারা শিশুর অপরিণত মনের প্রদীপ শিখাকে প্রজ্জলিত করেন। শিক্ষক হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, উপদেশদাতা ও পরিচালক। এই কারণে শিক্ষককেও শিক্ষার উপাদান বলা হয়। শিক্ষার চতুর্থ উপাদানটি হল শিক্ষার পরিবেশ।

পূর্বে গৃহে পিতামাতার নিকটে শিশু লেখাপড়া করতো, নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষালাভ করতো। গৃহই ছিল শিক্ষালাভের প্রধান পরিবেশ। পরবর্তীকালে গৃহের স্থান দখল করেছে বিদ্যালয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুগৃহ ছিল শিক্ষালাভের স্থান। বৌদ্ধযুগে বিহারগুলিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হত। বর্তমানে বিদ্যালয় হল শিশুর শিক্ষালাভের পরিবেশ। শিক্ষাতাত্ত্বিকদের মতে বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই শিশুর পরিবেশের অংশ। সুতরাং শিক্ষকও শিশুর পরিবেশের অংশ। শিক্ষক শিশুর বিদ্যালয়ের যেমন অংশ, তেমনি তিনি আবার পরিবেশের পরিবর্তনকারী। অনুপযুক্ত পরিবেশে শিশু শিক্ষালাভ করতে পারে না। পরিবেশ যেন শিশুকে শিক্ষালাভে উৎসাহ দেয়, পরিবেশ যেন এমন হয় যে, শিশু পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষালাভে উৎসাহ বোধ করে।

শিশু

শিশুমনের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে না জানলে শিশু শিক্ষার পথ নির্দেশ করা কঠিন। শিশুই শিক্ষার প্রধান উপাদান। পূর্বে শিশুদের মনে করা হত ছোটমাপের বড় মানুষ, অর্থাৎ শিশুদের মনে করা হত বড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো প্রথমে ঘোষণা করেন যে, শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে তার প্রকৃতি অনুযায়ী। শিশু বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। কিভাবে জন্মের পর থেকে অস্থির প্রকৃতির চঞ্চল শিশু বিকাশের নানা ধাপ অতিক্রম করে স্থির ও যৌক্তিক বুদ্ধিযুক্ত পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়, তা আমাদের সকলেরই জানা উচিত। এই সম্পর্কে আর্নেস্ট জোন্স এর গবেষণা এবং তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের নিকট মূল্যবান দলিল বিশেষ। আর্নেস্ট জোন্স-এর মতে শিশু জন্মের পর থেকে চারটি স্তর অতিক্রম করে পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। একটি বীজ থেকে যেমন ক্ষুদ্র চারা গাছ জন্মে এবং চারাগাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যেমন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি জন্মলাভের পর থেকে ক্ষুদ্র মানবশিশু জীবনের নানা ধাপ অতিক্রম করে বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। আর্নেস্ট জোন্স শিশুর জীবন পরিক্রমাকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। ঐগুলি হল: (১) শৈশব কাল: ০—৫ বৎসর। (২) বালক বা বালিকা কাল: ৬—১২ বৎসর, (৩) বয়ঃসন্ধি বা নবযৌবন কাল: ১৩—১৮ বৎসর, (৪) বয়স্ককাল: ১৮+ বৎসর।

আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে জন্ম থেকে শিশুর শিক্ষা শুরু। শিশুর জীবনের প্রতি-

মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তার মনকে নতুন জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। প্রথম জীবনে শিশু থাকে দুর্বল ও পরনির্ভর। এই অবস্থায় তার একমাত্র নির্ভর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহের উপর। এই স্নেহ-পরিবেষ্টনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বস্তুর সঙ্গে শিশুর পরিচয় আরম্ভ হয়। শিক্ষাবিদগণ শিশুমনের এই পর্যায়কে বলেছেন 'বিস্ময়ের পর্যায়' (Wonder stage)

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, শিশুর প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ তার পরবর্তী জীবনকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং শিশুকে একটি সুস্থ পরিবেশের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিশুর প্রথম জীবনে যদি ভাবের সমীরণ ও চিরানন্দলোক হতে আলোক ও আশীর্বাদ ধারা নিপতিত হয়, তবেই তার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল, সরস ও পরিণত হতে পারে।

শৈশবকালে শিশুর আচরণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় **সহজাত প্রবৃত্তির** দ্বারা। সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শিশুর দাবি হল তাৎক্ষণিক সুখভোগের দিকে। বড়দের সঙ্গে শিশুর পার্থক্য এইখানে। বয়স্করা তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিবৃত্তি ও ভালমন্দ বিবেচনা দ্বারা। কিন্তু শিশুর এই বিবেচনাবোধ জন্মে ধীরে ধীরে। ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু বুঝতে পারে যে, সমাজে সঠিকভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্য আচরণকে সংযত করতে হয়।

শিশুজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল **পরনির্ভরতা**। শিশুর এই পরনির্ভরতা একমাত্র নিজের শারীরিক প্রয়োজন বা চাহিদাকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। এটি শিশু ধরেই নেয় যে, তার এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মা সদাসর্বদা সচেষ্ট আছেন। কিন্তু শিশু তার প্রাক্ষোভিক চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। শিক্ষার কাজ হল শিশুর পরনির্ভরতাকে আত্মনির্ভরতায় পরিবর্তিত করা। সঠিক শিক্ষা শিশুকে আত্মনির্ভর করে।

শিশুজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'কল্পনা বিলাস'। শৈশব কাল হল উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনার কাল। এই উদ্ভট কল্পনাকে আমরা বলি ফ্যানটাসি। এই ফ্যানটাসি বা অসম্ভব কল্পনাবিলাসের নায়ক হল শিশু নিজে। এর কারণ, শিশু দেখে বাইরের বাস্তব জগতে সে বড়দের তুলনায় শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল। সে চায় বড়দের মত শক্ত কাজ করতে, সাহসের কাজ করতে। কিন্তু শিশুর শারীরিক শক্তির অভাব আছে। তাই শিশু কল্পনাবিলাসের আশ্রয় নেয় নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে সার্থক করতে। সংসারের সকল কাজই তার অনুভূতিতে সাড়া জাগায়। কল্পনার সাহায্যে বিভিন্ন কাজে সে অংশ গ্রহণ করে। শিশু কল্পনার সাহায্যে আপনাকে বীর মনে করে। কল্পনার সাহায্যে সে নিজেকে রাজপুত্র ভাবে এবং কল্পনা করে রাক্ষস মেরে সে বন্দী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনছে।

প্রথম জীবনে শিশু একা একা খেলতে ভালবাসে। কিন্তু একটু বড়ো হলে অর্থাৎ বালককালে সে অন্য সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। এই দলবাঁধার প্রবৃত্তিকে

মনোবিজ্ঞানে **যৌথচারিতা প্রবৃত্তি** বলে। যেহেতু শিশুরা অন্য সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে এই কারণে আমরা সহজেই তাদের একত্র করে একটি শ্রেণী গঠন করতে পারি।

বালককালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, শিশুর **বহির্বৃত্ত প্রকৃতি** (Outward look)। দশ-এগারো বৎসরের বালকেরা স্বভাবতই **বহির্বৃত্ত** (Extrovert)। এদের মনোযোগ বাইরের বস্তুর দিকে নিবদ্ধ হয় বেশী। বাইরের বিষয় সম্পর্কে এরা সবিশেষ উৎসুক। এরা দলবেঁধে খেলাধুলা করতে ভালবাসে। এদের আগ্রহ ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিভাবে কাজ করে এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ের রহস্য সম্পর্কে এদের খুব অনুসন্ধিৎসা। এই সকল বিষয় সম্পর্কে তারা এমন সব বিবরণ সংগ্রহ করে যেগুলি মাঝে মাঝে বয়স্ক অভিভাবকদেরও অবাক করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বালককালে শিশুরা হয় এক একজন ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক।

১২/১৩ বৎসর থেকে ২১/২২ বৎসর পর্যন্ত শিশুর জীবনের একটি বিষম কাল। এটি বয়ঃসন্ধির কালও বটে। এই বয়স থেকে শিশুরা বালক জীবনের ধাপ পার হয়ে নতুন জীবনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। নবযৌবন কালকে শিক্ষাবিদগণ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম নবযৌবন (Early adolescence) এবং পরবর্তী নবযৌবন (Later adolescence)। প্রথম নবযৌবন কাল ১২ থেকে ১৮ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পরবর্তী নবযৌবন কাল ১৮ থেকে ২২ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত। শিশুর প্রথম নবযৌবন কাল একটি বিষম কাল। এটি হল বালক কাল ও যৌবন কালের বয়ঃসন্ধি কাল। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী কাল যেমন না-শীত না-গ্রীষ্মের কাল, নবযৌবন কালও তেমনি না-বালক না-যৌবনের কাল। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী কাল যেমন কালবৈশাখী ও ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল, কৈশোরও তেমনি মনুষ্য হৃদয়ের চঞ্চলতা ও অব্যবস্থার কাল। এই বয়সে বালক বয়সের অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে যায় এবং জীবনের নতুন কোন মূল্যমান গড়ে উঠে না।

নবযৌবন কালে বালক-বালিকাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মনে এরূপ এক পরিবর্তন আসে যে, তারা নিজেরাই বিস্মিত হয়। বালক কালে যে মানসিক স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের ভাব থাকে নবযৌবন কালে তা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বালক-বালিকারা নিজেদের এক অদ্ভুত জগতের অধিবাসী বলে মনে করে।

প্রাক্ষোভিক আচরণ : নবযৌবন কালে বালক-বালিকারা এক তীব্র প্রাক্ষোভিক অবস্থার মধ্যে থাকে। পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানে সংকট দেখা দেয়।

কল্পনা : নবযৌবন কাল শিশুর জীবনের দ্বিতীয় ফ্যান্টাসীর কাল। বালক কালে শিশু বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ অনুভব করে, কিন্তু নবযৌবন কালে শিশুর দৃষ্টি বাহির থেকে আপন শরীর ও মনের দিকে নিবিষ্ট হয়। সে বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মনগড়া মনোরাজ্যে বাস করে।

নবযৌবন কালে যে বিষয়টি প্রধান এবং শিশুর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তা হল শিশুর যৌনবোধের বিকাশ। এই সময়ে শিশুকে একটি মহৎ আদর্শের দিকে পরিচালিত করা উচিত।

বংশগতি ও পরিবেশ
Heredity and Environment

রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, অনেক লোক তীর্থে যায়—কিন্তু সবাই পুণ্য পায় না। তেমনি অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসে, কিন্তু সকলে বিদ্যা পায় না। কেন শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা যায়—এই প্রশ্নের সমাধান করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো, কেন সকল শিশু সমানভাবে বিদ্যা পায় না। মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে **বংশগতি ও পরিবেশের** প্রভাব রয়েছে। এই কারণে শিক্ষার একটি উপাদান হিসাবে শিশুর গুরুত্ব পর্যালোচনার জন্য আমাদের আলোচনা করতে হবে, শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে।

মাতৃক্রোড়ে গৃহপরিবেশে শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি একটি সূত্রের সাহায্যে এইভাবে প্রকাশ করা যায়।

শিশুর বিকাশ = বংশগতি × পরিবেশ

বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের সম্মিলিত প্রভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

বংশগতি

জীবন বিজ্ঞানীরা জীবন বিকাশে বংশগতির প্রভাবকে একটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। **প্রথম সূত্রটি হল—"একই জাতীয় প্রাণী থেকে ঐ একই জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়"** অর্থাৎ **Like begets like**। এই সূত্রের অর্থ হল যে, বিড়াল থেকে যে বাচ্চা জন্মাবে তারা বিড়ালই হবে। মানুষ থেকে মনুষ্য শিশুই জন্মগ্রহণ করবে। এর বিপরীত সূত্রটি সত্য নয় অর্থাৎ মানুষ থেকে বিড়াল জন্মায় না। ('সাতভাই চম্পা' রূপকথাটিতে হিংসুটে রাণীরা রাজাকে বলেছিল যে, ছোটরাণীর পেটে কুকুরের বাচ্চা জন্মেছে। রাজা সেটি বিশ্বাস করেছিলেন।)

এই সূত্রটির অন্য তাৎপর্য এই যে, মানুষের ছেলে মানুষ হবে; তবে তার দেহগঠনে, গায়ের রং-এ, চুলের বৈশিষ্ট্যে, বাবা-মায়ের চেহারার প্রভাব পড়ে থাকে। বাবা ও মায়ের রং যদি ফর্সা হয়, তবে ছেলে বা মেয়ের রংও ফর্সা হতে পারে। বুদ্ধি ও মেজাজের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এর অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমটি প্রকাশ করবার জন্য আমাদের একটি দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োজন।

বংশগতির দ্বিতীয় সূত্র: প্রাণী সকল সময়ে পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত হয় না। অনেক সময়ে কোন পূর্বপুরুষ অর্থাৎ ঠাকুরদা বা ঠাকুরমার গুণ পেয়ে থাকে। এই নিয়ে

গবেষণা করেছেন মেণ্ডেল। এইজন্য এই দ্বিতীয় সূত্রকে বলা হয় মেণ্ডেলের সূত্র। মেণ্ডেল ছিলেন একজন পাদ্রী, তিনি মটর বীজ নিয়ে পরীক্ষা করে এই সূত্রটি গঠন করেন।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করেছেন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস গলটন। এই গবেষণা থেকে গলটনের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্তির জীবনের বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা।

পরিবেশবাদ

পরিবেশবাদীদের মতে বংশধারার চেয়ে পরিবেশের প্রভাবেই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। এই সম্পর্কে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করেন। বিখ্যাত আচরণবাদী জে বি. ওয়াটসনের মতে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশের প্রভাবই বেশী। পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্নতি করা যায়।

মানসিক গুণের উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে উন্নততর পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিভাগ

বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে তাদের সম্পর্কে প্রকৃত পরিচয় শিক্ষককে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকলে তার শিক্ষাগত ক্ষমতা ও প্রয়োজন বোঝা যায় না। এখানে আমরা শিক্ষালাভের ক্ষমতা অনুযায়ী শিশুকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করছি।

১. **প্রতিভাশালী শিশু (Gifted children) :** বিদ্যালয়ে অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন কোন শিশু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। এই শিশুরা কাজে ও পড়াশোনায় অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় বিশেষ গুণের অধিকারী হয়। এদের বুদ্ধি যেমন বেশী তেমন সকল কাজই এরা দক্ষতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের প্রদত্ত কাজ এরা খুব দ্রুতভাবে করবার ক্ষমতা রাখে। মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের মতে এইরূপ প্রতিভাশালী শিশুরা উচ্চতা ওজন, স্বাস্থ্য, চেহারা, সামাজিক ও প্রক্ষোভগত গুণের দিক থেকে সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত।

প্রতিভাবান শিশুরা প্রত্যেক দেশের সম্পদ, প্রত্যেক জাতির পক্ষে গৌরবের। সুতরাং শিক্ষকদের উচিত এদের দিকে সবিশেষ নজর দেওয়া। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে একজন নিউটন, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন সি ভি. রমন দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমাদের দেশে অন্য দেশের মত প্রতিভাবানদের জন্য উন্নত পাঠ্যক্রমের

ব্যবস্থা নেই। তবে শিক্ষকদের উচিত অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা করে এদের কাজ করবার শক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা।

২. উনমানস শিশু (Feeble minded children) **:** যাদের বুদ্ধি কম অর্থাৎ আই কিউ. ৭০-এর নিচে, তাদের বলা হয় উনমানস শিশু। শিশুর শারীরিক ও মানসিক অসম্পূর্ণ বিকাশ উনমানসিকতার অন্যতম কারণ হতে পারে। উনমানসিকতা কোনরূপ মানসিক রোগ নয়। মনোবিজ্ঞানীরা উনমানস শিশুদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা—জড়বী (Idiots), ক্ষীণবুদ্ধি (Imbeciles) এবং মহামূর্খ (Morons)। উনমানস শিশুদের লেখাপড়া সামান্যই হতে পারে। তবে এদের দিয়ে কিছু কিছু হাতের কাজ করানো যেতে পারে।

৩. অনগ্রসর শিশু (Backward children) **:** বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী নানা কারণে অনগ্রসর হতে পারে। দেখা যায়, কেউ বা হয় গণিতে অনগ্রসর, কেউ বা হয় সাহিত্যে অনগ্রসর বা কোন কোন শিক্ষার্থী হয় সকল বিষয়েই অনগ্রসর। এক বা একাধিক পাঠ্য বিষয়ে যখন কোন শিশু অনগ্রসর হয়, তখন এই ধরনের শিশুদের বলে **অনগ্রসর শিশু**। নানা কারণে অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। প্রধান কারণগুলি হল—

(ক) সাধারণ বুদ্ধির অভাব : সাধারণ বুদ্ধির অভাব হেতু অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষা লাভে সবিশেষ কার্যকরী। বুদ্ধির অভাব হেতু যে অনগ্রসরতা তা প্রধানত সকল বিষয়েই সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি খুব কম, তারা প্রায় সকল বিষয়েই অনগ্রসর হয়।

(খ) বিদ্যালয়ে দীর্ঘ অনুপস্থিতি : অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাধারণত ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হয়। গণিতের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধারাবাহিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতির জন্য শিশুর পক্ষে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের পরবর্তী পাঠসমূহ বোঝা সম্ভব হয় না। তখন ঐ শিশু, শ্রেণীকক্ষে যখন পরবর্তী পাঠগুলি আলোচনা করা হয়, তখন কোন আনন্দ পায় না এবং কোনরূপ মনোসংযোগ করতে পারে না। ফলে সে ঐ সকল বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে।

গ) ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্তন : অভিভাবকের যদি বদলীর চাকুরি হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে বেশী দিন পড়া সম্ভব হয় না। নতুন বিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যপুস্তক পড়তে হয়। এর ফলে পাঠ যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে অনগ্রসরতা জন্মে।

(ঘ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি : ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির জন্য অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে। যদি কোন শিক্ষক ছাত্রদের মুখস্থ শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভর করতে বলেন এবং পাঠ্যবিষয় ছাত্রদের বোধশক্তির বাইরে থাকে, তখন ঐ বিষয়ে ছাত্রদের

অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে। অনেক সময় সিলেবাস যদি অতিরিক্ত দীর্ঘ হয় তবে শিক্ষার্থীর মনে জটিলতা দেখা দেয় এবং শিক্ষার্থী বিষয়টি সম্পর্কে ভয় পেতে পারে। ফলে অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রাথমিক, শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে।

(ঙ) **মনোযোগের অভাব ঃ** অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর মনোসংযোগের অভাব হেতু অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে। শারীরিক ত্রুটি যেমন, দৃষ্টির স্বল্পতা, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি প্রভৃতি কারণেও মনোসংযোগের অভাব দেখা দেয় এবং অনগ্রসরতা জন্মাতে পারে।

৪. **লাজুক শিশু বা ভীরু শিশু ঃ** বিদ্যালয়ে এমন অনেক শিশু দেখা যায় যারা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। এরা সাধারণত শ্রেণীকক্ষের শেষ লাইনে বসে এবং শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করে। শিক্ষকেরা এদের 'খারাপ ছাত্র' বলে মনে করেন। এদের মধ্যে অনেক উচ্চবুদ্ধিযুক্ত ছাত্রও থাকতে পারে যারা বিভিন্ন কারণে স্বভাব-ভীরুতার পরিচয় দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, গৃহে এইসব ছেলেরা এমন একটি শাস্তিমূলক আবহাওয়ায় থাকে যে, তার প্রভাবের ফলে এদের চরিত্রে ভীরুতা দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পিতামাতার মধ্যে কেউ রাগী স্বভাবের হলে এবং অকাবণে ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেবার প্রবণতা থাকলে, ঐ পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণত শাস্তি এড়ানোর উপায় হিসাবে কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং এই কারণে ভীরু স্বভাববিশিষ্ট হয়ে থাকে। এই শাস্তিমূলক ভয়ের পরিবেশে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম ও সুস্থ বিকাশ ঘটতে পারে না। এইরূপ পরিবারের শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন প্রথমাবস্থায় তাদের স্বভাবের তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না।

এইরূপ শিশুদের সঙ্গে আচরণে শিক্ষকদের যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ধীরে ধীরে স্নেহশীল আচরণের মধ্য দিয়ে এদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করবার সময়ে এদের এমনভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন যে, তারা যেন প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহ বোধ করে। এইভাবে বিভিন্ন আচরণের ভিতর দিয়ে শিক্ষক চেষ্টা করবেন এদের আস্থা অর্জন করতে এবং ধীরে ধীরে স্বভাবের ভীরুতা দূর করতে চেষ্টা করবেন।

৫. **আত্মসচেতন বা অহঙ্কারী শিশু ঃ** এই ধরনের শিশুরা সাধারণত ভীরু বা লাজুক শিশুদের বিপরীতধর্মী। শ্রেণীকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে সাধারণত এরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চায়। শিক্ষক যখন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এরা সবসময়েই উত্তর দিতে চায়। এই কারণে অনেক শিক্ষক এদের বলেন 'ভালছেলে'। এদের প্রধান দোষ এরা সদাসর্বদা নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত এবং শ্রেণীকক্ষের গণতান্ত্রিক আবহাওয়া এরা নষ্ট করে অন্যদের প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে।

শিক্ষকদের উচিত এদের আত্মজাহির করবার মনোভাবকে ধীরে ধীরে হ্রাস করবার চেষ্টা করা। এদের আত্মসচেতন বা অহঙ্কারী মনোভাবের কারণ হিসাবে বলা যায়

যে এদের গৃহ পরিবেশে এমন কোন ব্যক্তির আচরণ এদের চরিত্রের উপর এরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে যে, এরা পরবর্তীকালে নিজেদের অন্যদের চেয়ে পৃথক শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা-ভোগী হিসাবে দেখতে সচেতন হয়। গৃহে ঠাকুরদা বা ঠাকুরমার নয়নের মণি বা অবস্থাপন্ন পিতামাতার একমাত্র সন্তান হিসাবে যারা বড় হয় এবং নিজেদের ইচ্ছা-পূরণে কোনরূপ বাধা পায় না, তারা বিদ্যালয় পরিবেশেও এইরূপ মনোভাব বহন করে আনে এবং অন্যদের অধিকারকে কোনরূপ মান্য করবার প্রয়োজন বোধ করে না।

৬. **অপরাধপ্রবণ বা দুষ্ক্রিয় শিশু** : যে সকল শিশু সমাজবিরোধী আচরণে অভ্যস্ত তাদের বলা হয় দুষ্ক্রিয় শিশু। বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আসে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ লেখাপড়া শেখবার জন্য। কিন্তু এদের মধ্যে যদি কোন ছাত্র বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি মেনে কাজ করতে না চায় এবং কোন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাদের এরূপ আচরণকে বলা হয় 'দুষ্ক্রিয়তা' (Delinquency)। দুষ্ক্রিয়তাকে বিচার করা হয় সামাজিক নিয়মনীতির মাপকাঠিতে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে দুষ্ক্রিয় আচরণের পশ্চাতে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব। সাধারণ স্নায়বিক ক্রিয়াজনিত মানসিক কমপ্লেক্স বা জটের প্রকাশ হল দুষ্ক্রিয়তা। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানারূপ দুষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। যেমন, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি অমান্য করা, ক্লাশ থেকে বা বাড়ী থেকে পালানো, মারামারি করা, দেওয়ালে অশ্লীল কথা লেখা, পরীক্ষার হলে বই দেখে লেখা বা চুরি করে লেখা, শিক্ষকদের অসম্মান করা ইত্যাদি। পূর্বে মনে করা হত দুষ্ক্রিয়তা দুষ্ট ছেলেমেয়েদের ইচ্ছাকৃত কাজ এবং এই কারণে তা সংশোধনের একমাত্র পদ্ধতি হল কঠোর শাস্তি দেওয়া, অর্থাৎ **'Spare the rod, spoil the child'**। এই নীতি অনুসারে শাস্তির কঠোরতা যত বেশী হবে, ততই অপরাধী নিজেকে সংশোধনে সচেষ্ট হবে। যদি অপরাধীকে দয়া দেখানো হয় এবং অপরাধকে তাচ্ছিল্য করা হয়, তাহলে ছাত্রদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। কিন্তু মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক অপরাধ ও দুষ্ক্রিয়তার পিছনে রয়েছে স্নায়বিক ক্রিয়াজনিত কমপ্লেক্স। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত শিশুর এই অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা। এই কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছাত্রের গৃহপরিবেশ ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দুষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণগুলি নির্ণয় করতে হবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

৭. **যে শিশুরা বাঁ হাত দিয়ে লেখে** (Left handed children) : যে শিশুরা বাঁ হাত দিয়ে লেখে তাদের বলা হয় 'বাঁহাতি শিশু' বা **Left handed children**। মনোবিজ্ঞানীদের মতে বাঁ হাত দিয়ে লেখার অভ্যাসকে কোনরূপ দোষ হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। এই অভ্যাসের পিছনে থাকে কোন মানসিক জট। জোর করে এই অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করলে শিশুদের মানসিক ত্রুটি দেখা দিতে

পারে। সুতরাং শিক্ষকদের জানা উচিত কোন ছেলেমেয়ের এইরূপ অভ্যাস থাকলে তা পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত হবে না।

৮. দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি যে সকল শিশুদের কম: বিদ্যালয়ে এরূপ কোন কোন ছেলেমেয়ে দেখা যায় যারা চোখে কম দেখে বা কানে কম শোনে। এদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি স্বভাবী (Normal) ছেলেমেয়েদের মত নয়। এই ধরনের ছেলেমেয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের আলোচনা ভালভাবে বুঝতে পারে না বা বোর্ডের লেখা পড়তে পারে না। ফলে দৈনন্দিন পাঠে এরা অনগ্রসর থাকে এবং এদের উন্নতি ব্যাহত হয়। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে কোন ছাত্রছাত্রীর এরূপ ত্রুটি ধরা পড়লে তাঁদের অভিভাবকদের নিকট খবর পাঠাতে হবে এবং তাদের বলবেন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে।

পাঠ্যক্রম

"প্রত্যেক দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতম লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ এবং উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। এই লক্ষ্য থেকেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি"—(রবীন্দ্রনাথ)। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের প্রয়োজনও এই কারণে।

পাঠ্যক্রম কি? সাধারণ অর্থে বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল বিষয় বা বিষয়ের সমবায় আমরা ছাত্রদের পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করি, যেগুলি আয়ত্ত করে ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট পরাক্ষায় পাস করে সার্টিফিকেট পেতে পারে তাকে অর্থাৎ ঐ বিষয়গুলির সমবায়কে পাঠ্যক্রম বলে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শিশুরা চার বৎসর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবার পর চতুর্থ শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিয়ে থাকে। ঐ পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পাবার জন্য শিশুরা নির্দিষ্ট যে সকল বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে তাদের একত্রযোগে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বলে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আমাদের কতকগুলি বিষয় পাঠ করতে এবং ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে হয়। ঐ বিষয়গুলির সমবায়ই হল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম।

কিভাবে পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়?

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই কারণে পাঠ্যক্রম সংগঠনের জন্য ঐ সকল বিষয়গুলি শিক্ষাবিদদের মনে রাখতে হয়। মানুষের জ্ঞান অখণ্ড। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করে অনেকগুলি বিষয়ে ভাগ করেছি। এই বিষয় বা Subjects-গুলিই পাঠ্যক্রমের বিষয় নির্দেশ করে। একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে।

১. জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ। ২. মাতৃভাষার প্রাধান্য। ৩. মানববিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ের সমন্বয়। ৪. জাতীয় অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের সঙ্গে যোগ।

৫. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সঙ্গে যোগ।

আধুনিক সমাজে সভ্য মানুষকে ঠিকভাবে বাঁচতে গেলে তাকে নানা ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। এই উদ্দেশ্যে মানুষকে সম্পর্ক রাখতে হয় প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে এবং নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার জন্য আমাদের শিখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি। মানুষ ও সমাজজীবনের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্য আমাদের জানতে হবে সমাজবিজ্ঞান অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং এছাড়া জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্য। প্রকৃত মূল্যবোধ অর্জনের জন্য মানুষকে জানতে হবে চারুকলা, নীতিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি।

আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি। যেমন— (১) প্রাথমিক শিক্ষা, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং (৩) উচ্চতর শিক্ষা। এই তিন প্রকারের শিক্ষাব পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতিও হবে আলাদা। আমরা এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংগঠনের মূল নীতি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

পাঠ্যক্রম সংগঠনের মূলনীতি

উপরে আমরা পাঠ্যক্রম সংগঠনের কয়েকটা নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। ঐ নীতিগুলি বিশ্লেষণ কবে আমরা পাঠ্যক্রম সংগঠনের কয়েকটি মূলনীতি নির্ধারণ করতে পারি। সেগুলি হল :

১. শিক্ষা একটি শক্তি। যে পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির উন্নতি ঘটাতে পারে সেগুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২ বিকাশই হচ্ছে জীবনের ধর্ম। যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করতে পারে, সেগুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩ শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ কবে, কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে হয়। ঐগুলি হল সমাজ, প্রকৃতি ও আত্মমানস। যে বিষয়গুলি শিশুকে ঐ পরিবেশগুলির সঙ্গে সার্থক উপযোজনে সাহায্য করে, সেগুলিকে পাঠ্যক্রমেব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. জীবন পরিক্রমায় শিশুকে কয়েকটি স্তর পার হয়ে বয়স্ক স্তরে উপনীত হতে হয়। ঐ স্তরগুলি হল শৈশব, বাল্য ও নবযৌবন বা কৈশোর। সুতরাং বয়স ভেদে ও শিক্ষার প্রকৃতি ভেদে পাঠ্যক্রমের বিষয়েরও পরিবর্তন হবে।

৫. শিক্ষা একটি সামাজিক বিজ্ঞান। প্রত্যেক দেশেই সমাজের চাহিদা অনুসারে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করা হয়। সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদা এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা উভয়েরই প্রভাব আছে পাঠ্যক্রমের উপর। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার কাজ হল 'মানব-মূলধন' (**Human resources**) সৃষ্টি।

আবার অনেকের মতে শিক্ষার কাজ হল মানবশক্তিকে ট্রেনিং (**Man power training**) দেওয়া।

উপরে বর্ণিত পাঠ্যক্রম সংগঠনের সূত্রগুলি আমরা সাধারণভাবে শিক্ষার সর্বস্তরের জন্য গ্রহণ করতে পারি। তবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম সংগঠন আরও কয়েকটি শর্তের অধীন। এইগুলি আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৬ থেকে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট। অধিকাংশ দেশে এই স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক। প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ :

১. শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অর্থাৎ সামাজিক, ভৌত বা প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে উপযোজনের শক্তি অর্জনে সাহায্য করা।

২. নিজের স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করতে হয় এবং সাধাবণভাবে সুস্থ জীবন যাপনের নিয়মনীতি শিক্ষালাভ করা।

৩. সমাজজীবনের সর্বনিম্ন চাহিদা মিটানোর উপযুক্ত করে শিশুকে গড়ে তোলা।

৪. যে সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষার শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে তাদের ঐ স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিকাশই জীবনের ধর্ম। পবিবেশের সঙ্গে সার্থক উপযোজনের মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশ ঘটে থাকে এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ হয়। এখন এই উপযোজন কিভাবে ঘটে থাকে? শিশু ভাষা আয়ত্তের মাধ্যমে এবং মনের ভাব আদান-প্রদানের সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি স্থাপন করতে পারে। সুতরাং যে সকল বিষয় এইভাবে মনের ভাব আদান-প্রদানে শিশুকে সাহায্য করে তার সবই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মাতৃভাষা : মনের ভাব আদান-প্রদানের সাহায্যকারী বিষয় হল ভাষার জ্ঞান। এই ভাষা অবশ্যই হবে শিশুর মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃভাষাই হল মাতৃদুগ্ধ।' এই ভাষার জ্ঞানলাভের জন্য শিশুকে তিনটি বিষয় শিখতে হয়; সেগুলি হল :

সঠিকভাবে **কথা** বলতে শেখা; **পড়বার** শক্তি অর্জন করা এবং **লেখবার** কৌশল আয়ত্ত করা।

সুতরাং শিশুর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক উপযোজনের জন্য দরকার কথা বলা, পড়তে শেখা এবং লিখতে শেখা।

কিন্তু এই ভাব বিনিময়ের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে, যদি না শিশু অন্য একটি বিষয় অর্থাৎ গণিতের জ্ঞান লাভ করে। গণিত এক ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাষা, যার সাহায্যে শিশু পরিবেশের সঙ্গে সঠিক হিসাবের মাধ্যমে উপযোজনের শক্তি অর্জন করে।

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রধান তিনটি বিষয় হল—পড়া, লেখা এবং গণিতের জ্ঞান। ইংরাজীতে এদের সংক্ষিপ্ত করে বলা হয় 3 R's অর্থাৎ Reading, Writing and Arithmetic। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল ভিত্তি এই জ্ঞানই স্থাপন করে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের এরাই হল মূল বিষয় (Core subjects)।

কিন্তু শিশু বড হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের প্রয়োজন বোধ করে। শিশুর পরিবেশ বহুবিচিত্র। পারিবারিক তথা সামাজিক পরিবেশ ছাড়া অন্য যে পরিবেশটি শিশুব মনে নানাবিধ প্রশ্ন জাগ্রত করে সেটি হল প্রাকৃতিক পরিবেশ। দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র, ফুল-গাছ-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, সমস্ত কিছুই শিশুর অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করবে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে না পাবলে শিশুর তৃপ্তি হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঠিক উপযোজন হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য শিশুকে জানতে হবে—

প্রকৃতি পাঠ : প্রকৃতি পাঠ শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করে। শিশুর প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উন্মেষ হয় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

কিন্তু শিশু কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশেই বাস করে না; সে ভৌগোলিক পরিবেশেও বাস করে। দিন-রাত্রি কেমন করে হয়? ঋতু পরিবর্তন কিভাবে হয়? গ্রীষ্মকালে দিন বড কেন? শীতকালে দিন ছোট কেন? কোন্ মাসে দিন-রাত্রি সমান হয়? আমরা যে সকল জিনিস-পত্র ব্যবহার করি ঐগুলি কোথা থেকে আমরা পাই? কোন্‌গুলি এদেশে প্রস্তুত হয়? কোন্‌গুলি বিদেশ থেকে আসে?—এই প্রকার নানা প্রশ্নের উত্তর শিশু দাবি করে। এই জন্য শিশুর প্রয়োজন **ভৌগোলিক পরিবেশের জ্ঞান**। সুতরাং শিশুকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দিতে হবে—

প্রাথমিক ভূগোল : এই ভূগোলের বিষয়বস্তু নিতে হবে শিশুর আপন দেশ থেকে। এটি হবে জাতীয় ভূগোল। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ভূগোলের জ্ঞান দিতে হবে স্থানীয ভূগোলকে (Home geography) কেন্দ্র করে।

কিন্তু ভূগোলের জ্ঞান থাকে অসম্পূর্ণ, যদি না শিশু স্থানীয় ঐতিহাসিক পরিবেশের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পাবে। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে শিশুকে শিখতে হবে—

প্রাথমিক ইতিহাস : স্থানীয় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে শিশুকে শেখাতে হবে জাতীয় ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে দেশের প্রকৃত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই সকল দেশ ভাগ্যবান যারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যে খুজিয়া পায়।"

এতক্ষণ আমরা পাঠ্যক্রম সংগঠনে শিশুর উপযোজনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছি। কিন্তু শিক্ষা যদি শক্তি হয় তবে শিশুর পক্ষে সেই শক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব হতে পারে, যদি সে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হয়। শিশুকে বিদ্যালয়ে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষাব প্রাথমিক নিয়মগুলি শেখাতে হবে তেমনি তাকে জানাতে হবে কিভাবে নীরোগ জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে সুঅভ্যাস গঠন করা যায়। এই জন্য শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে **স্বাস্থ্যবিদ্যা, শরীর চর্চা ও খেলাধুলা**।

উপরের বিষয়গুলি ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, হস্তশিল্প প্রভৃতিও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতের কাজের উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়। আমাদের মনে হয় এটি একটি সঠিক পদ্ধতি। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হবে—

সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্প : এই সকল বিষয়ের মাধ্যমে শিশুর আবেগ, অনুভূতি, সৃজনীশক্তি ইত্যাদি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে থাকে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে সম্ভব ক্ষেত্রে সকল বিষয় শেখাতে হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। এই সক্রিয়তা বিভিন্ন বিষয় অনুসারে পৃথকভাবে পরিকল্পনা করা যেতে পারে, আবার গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্পকেন্দ্রিক সক্রিয়তার নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

আর একটি বিষয় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংগঠনের নীতি ও পদ্ধতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত না করলেও, প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব যথেষ্ট। সেটি হল—প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার সকলের জন্মগত অধিকার।

কিন্তু নানা কারণে আজও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভারত আজ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকারী প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৩%। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার আলোক দেশের সকল স্থানে ছড়িয়ে দিতে না পারলে গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে পূর্বপৃষ্ঠার আলোচনার সারাংশ এইভাবে দেখানো যেতে পারে :

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। মধ্যশিক্ষা প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যবর্তী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষা নানা প্রকারের হতে পারে। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করতে হবে। তবে মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতি এখানে আলোচনা করা হল।

১. **মুল বিষয় (Core subjects) ও প্রান্তস্থ বিষয় (Periphery)-সমূহ :** মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের দুটি অংশ থাকে। মূল বিষয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে বুনিয়াদী বিষয়গুলি, যে বিষয়সমূহের জ্ঞান সকলকেই আয়ত্ত করতে হবে। প্রান্তস্থ বিষয়সমূহের জ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করবে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী।

২. **জটিলতর পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন :** প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের মধ্যে পাঠ্যক্রমের পার্থক্য এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু যেরূপ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐগুলি অবশ্যই থাকবে, তবে মাধ্যমিক স্তরে ঐগুলির গভীরতা ও ব্যাপকতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় পরিবেশগুলি ছাড়া অন্য যে পরিবেশটির সঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে পরিচিত হতে হবে সেটি হল অর্থনৈতিক পরিবেশ। তা ছাড়া যে বয়সে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে থাকে সেটি হল তাদের বয়ঃসন্ধি কাল। এই বয়সে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের নতুনভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম স্থির করতে হবে।

৩. **উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে থাকে ; এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে উচ্চ শিক্ষা লাভে সুবিধা হবে, এরূপ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. **জাতীয় সংস্কৃতি ঃ** মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটাবে। এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি? "ইহা শিক্ষার্থীর মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করিয়া লয়।" (রবীন্দ্রনাথ)

৫. **দায়িত্বশীল নাগরিকতার শিক্ষা ঃ** মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা ভবিষ্যতে সমাজজীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের একটি **রূপরেখা** এখানে দেওয়া হল ঃ

১. **ভাষা ঃ** [ক] মাতৃভাষা, [খ] ইংরাজী ভাষা বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা, [গ] সংস্কৃত ভাষা বা অন্য কোন প্রাচীন ভাষা বা কোন ভাবতীয় ভাষা।

মন্তব্য ঃ প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভাষা রূপ নেবে সাহিত্যের। সুসাহিত্য মনের প্রানিন্ পদার্থে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ভাষাব সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবাব উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের ও প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশেব মনের মুখোমুখি করাবার কাজে।"

২. **গণিত**, ৩. **বিজ্ঞান ঃ** [ক] প্রাকৃতিক বা ভৌত বিজ্ঞান, [খ] জীবন বিজ্ঞান ;
৪ **সমাজ বিজ্ঞান ঃ** [ক] ইতিহাস, [খ] ভূগোল, [গ] অর্থনীতি।

মন্তব্য ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে জাতীয়তাবোধের উপর ভিত্তি করে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস, ভূগোলের মধ্যে' দেশের প্রকৃত পবিচয় থাকা প্রয়োজন। ভারতেব প্রকৃত ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষেয় সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করবে।

৫. **কলা ঃ** [ক] শিল্প, [খ] সঙ্গীত, [গ] নৃত্য।

মন্তব্য ঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ দেশের সংস্কৃতির বিচিত্র ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সংযোগ স্থাপন করা। শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে এই সংস্কৃতির সীমা নির্দেশ করলে 'শিক্ষাব লক্ষ্য'কে সংকীর্ণ করা হয়। সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় প্রভৃতিকে এই সংস্কৃতির অংশ হিসাবে আমাদেব বিদ্যায়তনে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। কারণ, শিক্ষার্থীর চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই সমস্তেরই প্রয়োজন।

জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখবার জন্য সঙ্গীতকেও অবশ্যই বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। সঙ্গীতের অন্য শিক্ষাগত মূল্যও আছে। সেই বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে। ডাঃ মন্তেসরী বলেন, "শিশুর চরিত্রের উপর সঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট। সুরের খেলা শিশুমনে শৃঙ্খলা বোধ সৃষ্টি করে এবং শিশুর চরিত্রে একটা সামঞ্জস্য আনে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

"মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানব-সম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে। শিক্ষার্থী যারা তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক এই কামনা করি। শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ করে সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালবেসেছি ভালবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তিদান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা অমৃত অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।" (শিক্ষার ধারা, পৃঃ ৫৯)

৬ **সমাজসেবা ঃ** সমাজ ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ।

৭ **শরীর চর্চা ঃ** [ক] ব্যায়াম, [খ] যৌগিক আসন, [গ] খেলাধুলা, [ঘ] এন সি সি, [ঙ] স্কাউট আন্দোলন, [চ] ব্রতচারী ইত্যাদি।

৮ **অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ ঃ** শিক্ষার্থী নিজেদের যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযাযা এক বা একাধিক অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ করতে পারে। এই বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা হবে স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কি বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় তার ভিত্তিতে।

উপরে আমরা পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা, পাঠ্যক্রম সংগঠনের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা পাঠ্যক্রমকে তার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই বিভাগ সকলে যে গ্রহণ করবে এমন নয় এবং এই বিভাগের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও অনেক শিক্ষাবিদদের সন্দেহ আছে। তবে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ করবার জন্য এখানে ঐ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

পাঠ্যক্রমের শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ পাঠ্যক্রমকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন :

১ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (**Activity Curriculum**)

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (**Experience Curriculum**)

৩. চাহিদাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (**Need Based Curriculum**)

৪. জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (**Life Centered Curriculum**)

৫. মূল বিষয় সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম (Core Curriculum)
৬. বহুমুখী পাঠ্যক্রম (Diversified Curriculum)
৭. যুক্ত (অবিভাজ্য) পাঠ্যক্রম (Integrated Curriculum)

উপরের তালিকার মধ্যে প্রথম চারটি বিভাগ একই ধরনের পাঠ্যক্রম নির্দেশ করছে বলা যেতে পারে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের কথা যখন বলা হয়, তখন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ মনে হয়। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন কর্মেরই ফলস্বরূপ। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলতে বোঝা যায় পাঠ্যক্রমের সেই অংশটি যা শেখবার জন্য শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে কোন কাজে অংশ গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি আমরা একটি প্রোজেক্ট সংগঠনের ভিতর দিয়ে পাঠ্যক্রমের কোন কোন বিষয় শিখতে চাই তখন এটিকে বলা যায় কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম। গান্ধীজীর বুনিয়াদী পরিকল্পনায় পুস্তক পাঠকে গৌণ হিসাবে ধরে হাতের কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটিও একটি কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদাহরণ। ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরী পদ্ধতিতে নানা শ্রেণীর বস্তু ও যন্ত্রের সাহায্যে নানা বিষয় শেখানো হয়। একে আমরা কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম মূলত একই ধরনের পাঠ্যক্রম নির্দেশ করে। কারণ কর্ম ছাড়া কোনরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়। মন্তেসরী তাঁর পদ্ধতিতে নানারূপ যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর রং-এর অভিজ্ঞতা, শব্দের অভিজ্ঞতা, মসৃণ ও অমসৃণ তলের (Surface) অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা কোন কর্মেরই ফলস্বরূপ। তবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম নির্বাচনে আমাদের স্থির করতে হবে, কি ধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য আমাদের শিশুর বয়স ও চাহিদার কথা ভাবতে হবে। বিভিন্ন বয়সভেদে শিশুর চাহিদা বিভিন্ন এবং শিশুর চাহিদা অনুযায়ী অভিজ্ঞতাও হবে বিভিন্ন। শিশুর প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনরূপ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। এই আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, শিশুর কর্ম, অভিজ্ঞতা ও চাহিদা এক ধরনের পাঠ্যক্রম নির্দেশক।

জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুর জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু স্থির করতে হবে। আবার আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন বয়স স্তরে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদা পৃথক। সুতরাং জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম প্রকৃতপক্ষে শিশুর চাহিদাভিত্তিক পাঠ্যক্রম।

শিশুর শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর প্রধান চাহিদা হল আত্মপ্রকাশের। এই কারণে এই স্তরে শিশুর মাতৃভাষা, গণিত, প্রাথমিক ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান শিশুর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু কৈশোরকালে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকট হয়। শিশু তার জীবনের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী এই স্তরে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে চায়। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর

প্রয়োজন, ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়। এই ধরনের পাঠ্যক্রমকে বলা হয় **বহুমুখী পাঠ্যক্রম**। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমের একটি অংশ সবাইকে পড়তে হয়। সকলের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের এই অংশটুকুকে বলা হয় পাঠ্যক্রমের মূল বিষয় (Core subjects)।

বর্তমানে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একই ধরনের অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই ধরনের পাঠ্যক্রমে প্রধান সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কারণে এইরূপ পাঠ্যক্রমকে বলা হয়—যুক্ত বা অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী
Co-curricular' Activities

বিদ্যালয়ে শ্রেণীভেদে শিক্ষার্থীকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় অধ্যয়ন করতে হয় এবং ঐ বিষয়গুলি সংক্রান্ত পাঠের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সমবায়কে বলে পাঠ্যক্রম। শিক্ষাবিদগণ লক্ষ্য করেছেন যে, পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন সম্ভব হয় না। সাধারণত পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি জ্ঞানমূলক ও পুস্তককেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত উন্নতি এই বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে আমরা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে গ্রহণ করেছি। সুতরাং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়পাঠের দ্বারা সম্ভব নয়। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলতে বোঝা যায় শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলতে বোঝা যায় শিশুর জ্ঞানমূলক, প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক ও শারীরিক উন্নতি। অর্থাৎ শিক্ষার ফলে শিশু যেমন নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, তেমনি তার সামাজিকতা, প্রক্ষোভমূলক গুণ অর্থাৎ স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভূতি, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণেরও বিকাশ ঘটবে।

এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় অতিরিক্ত পরীক্ষার আওতার বাইরে এমন কিছু কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীর চরিত্রে স্নেহ-ভালবাসা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিকতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের বিকাশ হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যায়, প্রাচীনকালে গুরুগৃহে যখন কোন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করতো, তখন দৈনন্দিন পুস্তক পাঠের সঙ্গে তাকে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করতে হত। গোধন পালন, কাষ্ঠ সংগ্রহ, কৃষিকার্যে সাহায্য, গুরু সেবা প্রভৃতি কার্যে শিক্ষার্থীকে নিযুক্ত থাকতে হত। এর ফলে তারা যেমন ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতি জ্ঞানমূলক বিষয় শিক্ষালাভ করত, তেমনি তারা লাভ করত সামাজিক ও সাংসারিক নানা অভিজ্ঞতা। এইভাবে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটত।

বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় অতিরিক্ত নানা ধরনের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে,—যেমন নানা ধরনের খেলাধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অভিনয়, বিতর্কসভা,

বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি। এই ধরনের কার্যাবলীকে বলা হয় অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। অবশ্য বর্তমানে এদের বলা হয় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। কারণ বিদ্যালয়ে শিশু যে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করে—তাকে অবশ্যই পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বিভিন্ন রূপ

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নানা ধরনের হতে পারে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ব্যবস্থা করা সম্ভব এখানে আমরা সেগুলি আলোচনা করছি।

১ **সাহিত্য-চর্চা বিষয়ক কার্যাবলী ঃ** এর মধ্যে পড়বে বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্যসভা, বিতর্কসভা ইত্যাদি।

২. **খেলাধুলা ও শরীর চর্চা ঃ** এর মধ্যে পড়বে নানা ধরনের খেলাধুলা, সমবেত ব্যায়াম, ড্রিল ইত্যাদি।

৩ **আমোদ-প্রমোদ ঃ** এর মধ্যে পড়বে অভিনয়, নাটক, প্রদর্শনী, সঙ্গীতের আসর, বনভোজন বা চড়ুইভাতি ইত্যাদি।

৪. **সাংস্কৃতিক ও জাতীয় কার্যাবলী ঃ** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, মহাপুরুষদের স্মরণসভা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি।

৫. **সমাজসেবা ও ছাত্রকল্যাণকর কার্যাবলী ঃ** এর মধ্যে পড়বে বিদ্যালয় সাফাই, পল্লী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সেবামূলক কার্য, স্কাউট আন্দোলন, ব্রতচারী, এন সি. সি সংগঠন ইত্যাদি।

৬. **শিক্ষামূলক দেশভ্রমণ ঃ** দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ এই পর্যায়ে পড়বে।

৭. **বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনমূলক কাজ ঃ** বিদ্যালযের কোন কোন কাজ ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেবাই দায়িত্ব নিয়ে করবে। এর মধ্যে পড়বে বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছাত্রসংঘ গঠন করা ইত্যাদি।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর শিক্ষাগত মূল্য ঃ

আমরা পূর্বেই বলেছি, বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় পড়ানো হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ঐ বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভগত গুণ, সামাজিকতা, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ক্ষমতা, নেতৃত্বদান, আদেশ পালনের ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে পারে না। এই সকল গুণ বিকাশের জন্য নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে, পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়সমূহের সঙ্গে এইরূপ সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আশা করা যায়।

কিভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন করা যায় ?

কিভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়ে সংগঠন করা হবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে এই শ্রেণীর কাজে ছাত্রদের দায়িত্ব প্রধান। যেরূপ ব্যবস্থা দ্বারা সকল ছাত্ররা এই ব্যাপারে উৎসাহী হয় তার ব্যবস্থা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। সাধারণত দুইভাবে এই সংগঠন করা যায়। প্রথমত বিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত প্রধান শিক্ষক শ্রেণী-শিক্ষকদের মাধ্যমে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিবাচন কবে এই সংগঠন গডে তুলতে পারেন। এখানে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা হল।

মনে করা যাক, একটি বিদ্যালয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক শাব কমিটির মিটিং ডাকা হল এবং আলোচনায় ঐ কমিটির উপর পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হল। ঐ কমিটি তখন অধিকাংশ সভ্যদের ভোটে একজন সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদক নির্বাচন করল। কমিটি প্রত্যেক শ্রেণীর সভ্যদের মাবফত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট আবেদন করল, পত্রিকার জন্য উপযুক্ত রচনা জমা দেবাব জন্য। ঐ রচনাগুলি সংগ্রহ করে সাবকমিটির সভ্যগণ উপযুক্ত রচনাগুলি বাছাই কববে পত্রিকার জন্য। অবশ্য সমস্ত কার্যক্রমই প্রধান শিক্ষক বা একজন দায়িত্বশীল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এই সকল কাজে অংশ গ্রহণ করে ছাত্ররা যে সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করল তা হল—(১) কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনায উৎসাহ বোধ করা। এইভাবে ছাত্রদের রচনা শক্তির বিকাশ ঘটবে। (২) বিভিন্ন ধরনের রচনা থেকে উপযুক্ত মানের রচনা বাছাই করা, এর দ্বারা তারা যেমন ভাল রচনা ও মন্দ রচনা বাছাই করতে শিখবে, তেমনি উন্নত মানের রচনার মান সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবে। (৩) কিভাবে প্রেসে পত্রিকা ছাপানো হয় এবং বিদ্যালয় পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে গেলে কিভাবে সাজাতে হয়, কিভাবে উপযুক্ত টাইপ নির্বাচন করতে হয়, কিভাবে মেকআপ্ করতে হয় তা তারা বুঝতে পারবে।

এই কাজের ভিতর দিযে ছাত্রদের যে সকল স্তরে বিকাশ আশা করা যায়, তা হল—(১) নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, (২) ভাল রচনা, মন্দ রচনা বাছাই করবার ক্ষমতা, (৩) সৌন্দর্যবোধ, (৪) ছাপাখানার বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পরিচয়, (৫) সকলে মিলে এক সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতার উন্মেষ ইত্যাদি।

শিক্ষক

শিক্ষায় অন্যতম উপাদান হলেন শিক্ষক। শিক্ষককে শিক্ষার উপাদান বলা হয়, কারণ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য সম্ভব নয়।

শিক্ষা দেওয়া এমন একটি কাজ, যার সাহায্যে একটি অপরিস্ফুট মন অন্য একটি মনের আলোকে প্রস্ফুটিত হয়। একটি প্রদীপ থেকে যেমন অন্য একটি প্রদীপ জ্বলে, তেমনি এই কাজে একটি মন আর একটি মনের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। যে ব্যক্তির নিকট থেকে

জ্ঞানের শিখা অন্য মানুষে সঞ্চালিত হয়, তাকে আমরা শিক্ষক নামে অভিহিত করি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ এক মাত্র মানুষের নিকট থেকেই শিখতে পারে, যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, যেমন প্রাণ থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হয়।"

শিক্ষকের কাজকে প্রকৃতপক্ষে একজন শিল্পীর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একজন শিল্পী যেমন কাদামাটি দিয়ে বা পাথর কেটে নতুন শিল্প সৃষ্টি করেন, শিক্ষকও তেমনি অপরিণত অর্বাচীন শিশুকে পরিণত সুস্থ জীবনের দীক্ষাদান করেন। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে শিক্ষক একজন শিল্পী ছাড়া কিছুই নন। শিক্ষকের কাজের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। প্রকৃত শিক্ষকের কাজের ফল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা না গেলেও জাতীয় জীবনে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। এই কারণে বলা হয়, ওয়াটরলুব যুদ্ধ জয় হয়েছিল ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা। আবার এই কথাও বলা হয়, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেভানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার জয়লাভের মূলে রয়েছে জার্মানীর স্কুল শিক্ষকেরা। ভারতেও বর্তমান সভ্যতার পিছনে রয়েছে প্রাচীন কালের ভারতীয় ঋষিদের দান।

শিক্ষাদান কার্য একটি মহৎ সৃষ্টিমূলক কর্ম। গুরু-শিষ্যের উপযুক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের উপরেই শিক্ষকতা কার্যের কার্যকারিতা নির্ভর করে। শিক্ষাবিদ অ্যাডাম্‌সের মন্তব্য 'শিক্ষা একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া (Teaching is a bipolar process)। শিক্ষাদান কার্যের একদিকে রয়েছেন শিক্ষক আর অন্য প্রান্তে রয়েছে শিক্ষার্থী। হৃদয়ের প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করে শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যাদান করবেন। শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মনন শক্তির সঞ্চার হবে।

শিক্ষকের কাজ (Functions of Teachers)

শিক্ষকদের কাজকে বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

[ক] শিক্ষা দান বা শেখানো, [খ] নির্দেশন ও [গ] প্রেরণা দান ও উৎসাহ দান।

[ক] শিক্ষাদান বা শেখানো

শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ। শিক্ষক এই শব্দটি থেকে কাজটির প্রাধান্য সুপরিস্ফুট। শিক্ষাদান একটি জটিল কাজ। অনুপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঠিকভাবে এই কাজ করা সম্ভব নয়। স্যার জন অ্যাডাম্‌স বলেছেন, শিক্ষা দেওয়া ক্রিয়াটির দুটি কর্ম। একটি ছাত্র, অন্যটি বিষয়। 'শিক্ষক ছাত্রকে গণিত শিক্ষা দেন'—এই বাক্যটিতে কর্ম দুটি হল ছাত্র ও গণিত। পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়ের প্রাধান্য ছিল বেশি; আধুনিক শিক্ষায় ছাত্রের প্রাধান্য বেশি। সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে যেমন বিষয় জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে শিক্ষার্থীকে। কারণ শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, বুদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান না থাকলে তার পক্ষে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

বিষয়ের জ্ঞান: শিক্ষক কিভাবে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করবেন? কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে যেমন তিনি ডিগ্রী লাভ করবেন, তেমনি পরবর্তী কালে বিষয়টি সম্পর্কে তার প্রাণবন্ত যোগাযোগ রাখতে হবে। শিক্ষককে বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করবার জন্য যেমন নানা প্রামাণিক পুস্তকের সাহায্য লাভ করতে হবে, তেমনি তার প্রিয় বিষয়টি সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, বিভিন্ন গবেষণা-পত্র-পত্রিকার মারফত।

বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া শিক্ষককে জানতে হবে আধুনিক **শিক্ষা পদ্ধতি**। পদ্ধতি বিজ্ঞান একটি আধুনিক বিষয়। পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে শিক্ষাদান সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না। প্রজেক্ট পদ্ধতি, ডলটন প্লান, ল্যাবরেটরী প্লান প্রভৃতি কি ভাবে সংগঠন করতে হয় এবং কিভাবে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করা যায়, শিক্ষককে অবশ্য সেই বিষয় জানতে হবে। ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিভাবে 'পাঠটীকা' (Lesson plans) রচনা করতে হয়, সেই জ্ঞানও তাকে অর্জন করতে হবে।

শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ঃ শিক্ষকের পক্ষে বিষয়ের জ্ঞান ছাড়াও প্রয়োজন **শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান**। শিক্ষার্থীকে ঠিকভাবে জানতে হলে ঐ জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষককে জানতে হবে শিশুরা কিভাবে শিক্ষা লাভ করে। বুদ্ধি, প্রবণতা, যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যে পার্থক্য আছে তা কিভাবে শিক্ষাদানের কাজে লাগানো যায়? বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান কিভাবে সাহায্য করতে পারে? শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান কিভাবে ছাত্রদের নির্দেশনের কাজে লাগানো যায়? এই সকল বিষয় শিক্ষকদের জানতে হবে।

শিক্ষককে শিক্ষার্থীকে দুইভাবে জানতে হবে। প্রথমত, একজন ব্যক্তি হিসাবে তার গুণাগুণ সম্পর্কে, দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর একজন ছাত্র হিসাবে। ব্যক্তি হিসাবে বিদ্যার্থীকে জানবার জন্য তার বয়স, পরিবার, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, পিতার পেশা, কি ধরনের গৃহে বাস, ভ্রাতা-ভগ্নীদের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় জানতে হবে, তেমনিভাবে জানতে হবে তার বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে। শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বই-এর একটি মাত্র রোল নম্বর নয়। তার যে ব্যক্তিত্ব আছে, প্রবণতা আছে, বুদ্ধির মান আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, এই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। কোন্ বিষয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বেশি, কোন বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক, শিক্ষার্থীর বিশেষ হবি বা শখ কি—সেই সম্পর্কে শিক্ষককে জানতে হবে। এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ জানলেই তবে 'ব্যক্তি হিসাবে' ছাত্রকে জানা সম্ভব হতে পারে।

ছাত্রকে অন্যভাবে জানতে হবে বিদ্যালয় সমাজ তথা শ্রেণী বা ক্লাসের একজন সভ্য হিসাবে। ব্যক্তি মানুষ (**Individual man**) এবং সামাজিক মানুষের (**Social man**) মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এটি শিক্ষককে বুঝতে হবে। শিক্ষার অন্য উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ (**Socialisation**)। শ্রেণী কক্ষে বা শিক্ষার্থী সমাবেশে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন। এইগুলি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে ছাত্রদের শিক্ষা

দিতে হবে। কোন ছাত্র হয় আত্মকেন্দ্রিক, কোন ছাত্র হয় সামাজিক, কোন ছাত্র জ্ঞানমুখী বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, কোন ছাত্র হাতের কাজে পারদর্শী। এই বিষয়গুলি শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

শ্রেণীর একজন সভ্য হিসাবে যখন ছাত্রকে দেখা হয়, তখন তাদের বিভিন্ন টাইপে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, কোন শিশু প্রতিভাবান (Gifted), কোন শিশু অনগ্রসর, কোন শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, কোন শিশু শারীরিক ত্রুটি যুক্ত ইত্যাদি। শিক্ষককে ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিচার করে তাদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে। যে শিক্ষক ছাত্রদের ঠিকভাবে চেনেন, তাদের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করেন, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং পাঠ্য বিষয়ের উপর গভীর দখল আছে, তিনি প্রকৃত শিক্ষক হিসাবে অভিহিত হবার যোগ্য এবং শিক্ষকতা কার্যে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

[খ] নির্দেশন

শিক্ষকের দ্বিতীয় কাজ হল, ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ে যথোপযোগী নির্দেশ দান। প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাব পার্থক্য এই যে পূর্বে শিক্ষক কেবল মাত্র বিষয়বস্তু শিক্ষা দিতেন, ছাত্রদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা করতেন না। আধুনিক শিক্ষক ছাত্রদের বুদ্ধি, রুচি প্রভৃতি বিচার করে ছাত্রদের 'ব্যক্তি বৈষম্য' (Individual differences) অনুযায়ী শিক্ষা দেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক যেমন শ্রেণী কক্ষে বিভিন্ন ছাত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন, তেমনি পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত কর্মে বিভিন্ন ছাত্রের দক্ষতা সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করবেন। ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করে তদনুযায়ী তাদেব উপদেশ ও নির্দেশ দেবেন। শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশন আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানেব একটি প্রধান বিষয়। কিভাবে এই নির্দেশন দিতে হয় এবং এই নির্দেশন দানের জন্য মনোবিজ্ঞানী, অভিভাবক, সমাজ-কর্মী প্রভৃতির সঙ্গে কিভাবে এক যোগে কাজ করতে হয়, সেই সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষককে লাভ করতে হবে।

[গ] প্রেরণা দান

শিক্ষা দান বা শেখানো একটি যান্ত্রিক কাজ নয়। এই কাজে শিক্ষার্থীর মনন শক্তিকে ঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। এটা কোনরূপ বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা আনবার জন্য শিক্ষককে নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে। তবে এই কাজের সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদ সবিশেষ যুক্ত। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে ছাত্রদের উপকার করবার জন্য তিনি শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। এই কাজ তিনি গ্রহণ করেছেন আদর্শবাদের প্রেরণা থেকে। একমাত্র এই বোধ থেকেই তার পক্ষে ছাত্রদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি সম্ভবপর। আজ শিক্ষককে মাস্টার না হয়ে গুরুর আসনে বসতে হবে। একমাত্র তাহলেই তার পক্ষে ছাত্রদের মঙ্গল কর্মে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি সুন্দর করে বলেছেন—

"তবুও নানা প্রকারের প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষক আছেন যারা দেনা-পাওনার সম্পর্ক ছাড়াইয়া উঠেন, নিজেদের বিশেষ মাহাত্ম্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন, তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধিত করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন ও তবেই তিনি এমন জিনিস দান করিতে পারেন, যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধি-বিধানের বাঁধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।" (শিক্ষা পৃঃ ৬৬)

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী

একজন আদর্শ শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব না থাকলে শিক্ষকের পক্ষে ঠিকভাবে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। যদিও মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণে ভিন্নমত পোষণ করেন, তথাপি ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বিশেষ গুণ সম্পর্কে তাঁরা একমত।

ডাঃ কে. এল. ক্লাপ শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের দশটি গুণের কথা বলেছেন। এইগুলি হল—১. উত্তম শরীর, ২. আশাবাদ, ৩. সংযত চরিত্র, ৪. উৎসাহ, ৫. ন্যায়পরায়ণতা, ৬. সততা, ৭. সহানুভূতি, ৮. প্রাণবন্ততা (Vitality), ৯. বিদ্যাবত্তা, ১০. ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা।

ব্যাগ্‌লে (Bagley) ও কিথ (Keith)-ও অনুরূপ একটি তালিকা দিয়েছেন এবং এর সঙ্গে কৌশল, বিচক্ষণতা, উত্তম কণ্ঠস্বর ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গুণগুলি যুক্ত করেছেন। অধ্যাপক সিয়ার্স (Sears) শিক্ষকদের উত্তম ভাষা জ্ঞানও থাকা উচিত, এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক বসিং (Bossing) ছাত্রদের মতামত বিচার করে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—রসবোধ ও ছাত্রদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখবার ক্ষমতা। ডাঃ ব্যালার্ড মনে করেন—কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার শারীরিক গুণের উপর নির্ভরশীল নয়, তা তার আত্মার সঙ্গে যুক্ত, ব্যক্তির অর্জিত গুণাবলীর উপর তা তেমনি নির্ভরশীল নয়, এটি নির্ভরশীল ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণের উপর; এটি ব্যক্তির স্বভাবের অমার্জিত আচরণের চেয়ে ব্যক্তির সূক্ষ্মবোধের দ্বারা প্রভাবিত। অধ্যাপক রেমণ্ট মনে করেন যে, শিক্ষকদের চরিত্রে মানব চরিত্রের সকল গুণেরই সমাবেশ বাঞ্ছনীয়। অনন্ত ধৈর্যশীলতা, নির্ভুল বিচক্ষণতা এবং সর্বাবস্থায় স্থির মানসিক প্রশান্তি শিক্ষকদের চরিত্রের আবশ্যিক গুণ। ক্ষুদ্র ও নিচ মনোভাব এবং দলাদলি তার পক্ষে সর্বদা পরিত্যাজ্য।

শিক্ষকের জীবন দর্শন

শিক্ষকদের পক্ষে তাদের কর্তব্য সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য প্রযোজন একটি সুস্পষ্ট জীবন দর্শনের। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি শিক্ষকেব মনকে, প্রতিনিযত এমনভাবে আঘাত করে যে, তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন কবা অসম্ভব হযে ওঠে। এবট্ ও উড্ রিপোর্টে (১৯৩৬) শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেব দরকার এমন একটি **মানসিক শক্তির** যার সাহায্যে তারা তাদের কর্তব্যে অনন্যচিত্তে টিকে থাকতে পারেন। উক্ত রিপোর্টে এই শক্তিকে বলা হয়েছে **টিকে থাকবার ক্ষমতা** (**Staying power**)। শিক্ষকদেব মনে ঐ শক্তিকে কি ভাবে জাগ্রত করা যায়? কারণ, চারদিকের দিগন্ত প্রসাবিত লোভ ও অর্থলোলুপতা দিনে নিশীথে অলক্ষভাবে তাকে আকর্ষণ করে এবং ধীবে ধীবে শিক্ষকেব জীবন আদর্শের সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সঙ্গে সমভূম করে আনে। সুতবাং শিক্ষকদেব আজ দবকার তাদেব আদর্শেব প্রতি অনন্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকেই আমরা শিক্ষকের জীবন দর্শন বলে বর্ণনা করতে পারি। রাস্ক বলেছেন—'বোধ হয় সমাজে শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন কর্মী নেই, যাদেব কার্য-পদ্ধতি তাদের জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং শিক্ষকেব পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে একটি উপযুক্ত সুস্পষ্ট জীবন দর্শনের। শিক্ষার প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানেই এব প্রয়োজন রয়েছে। জীবনই হোক বা শিক্ষাই হোক—দর্শনের প্রভাব থেকে কোন ক্রমেই ছাড়া নেই। যারা দর্শনকে তুচ্ছ কবে নিজেব অহঙ্কারকে জাহিব করতে চায়,—তারাও একটি বিশেষ দর্শনের অনুসরণ করে থাকেন—তবে সেটি হল একটি অপূর্ণ দর্শন।'

শিক্ষকের কাজ কেবল মাত্র ব্যাকরণ শেখানো বা বীজগণিতের কযেকটি সূত্রেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষককেও দেশ ও কালের উর্ধ্বে তার মনকে প্রসারিত কবতে হবে, কারণ তিনি আজ যাদের শেখাবেন—তারা যখন পরবর্তীকালে সংসারে প্রবেশ করবে—তখনকার সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেন সফল জীবন যাপনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই কারণে শিক্ষককে কেবল বিষয়বস্তু জানলে চলবে না, তাকে অধিকার করতে হবে এমন এক জীবন দর্শনের, যার আলো তাব চিত্তকে সাময়িক লোভের উর্ধ্বে রেখে একটি উচ্চ আদর্শের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকদের চরিত্রে বহুগুণের সমাবেশ আশা করেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকও একজন মানুষ। অন্যান্য ব্যক্তি মানুষের দোষগুণ তার চরিত্রে আশা করা অস্বাভাবিক নয়। তবে শিক্ষকতাকে যারা বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাদের চরিত্রে এমন কিছু বিশেষ গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় যা তাদের বৃত্তি উপযোগী কর্তব্য পালনে সাহায্য করবে।

উত্তম স্বাস্থ্য

শিক্ষকেরা যে ধরনের কাজ করেন, তাতে উত্তম স্বাস্থ্য তাদের সবিশেষ প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে তাদের পক্ষে সঠিকভাবে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা

করা সম্ভবপর হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই মোটামুটিভাবে সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন, 'জীবনের সফলতা লাভের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, সুস্থ জীব হওয়া'। জন লক্ বলেছেন, 'সুস্থ শরীরেই থাকে সুস্থ মন।' কিন্তু শুধু মাত্র সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলেই শিক্ষকের চলে না, তাকে সুস্থ মনেরও অধিকারী হতে হবে।

উত্তম কণ্ঠস্বর

শিক্ষকের কণ্ঠস্বরও উত্তম হওয়া প্রয়োজন। শ্রেণী কক্ষের সকল অংশ থেকেই যেন তার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়। উচ্চারণে স্পষ্টতা, কণ্ঠস্বরে উদাত্তভাব, প্রয়োজন মত স্বরের উচ্চনিচ তরঙ্গ অভিক্ষেপের ক্ষমতার অধিকারী হলে শিক্ষকের পক্ষে সহজেই শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষকতা কার্যে সফলতার জন্য সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর বিশেষ প্রয়োজন।

ধৈর্য

জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে ঠিকভাবে বিতরণের জন্য শিক্ষককে হতে হবে ধৈর্যবান। ছেলেমেয়েদের প্রতি স্বভাবতই যাদের স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথাই এই যে, যাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া অনায়াসে সম্ভব। শিক্ষকতা কাজে শুধু ধৈর্য প্রয়োজন নয়, শিক্ষককে মাতা-পিতার স্থান গ্রহণ করতে হয়। মাতা-পিতার মত ধৈর্যে, স্নেহে, প্রেমে ছাত্রকে মানুষ করবার চেষ্টা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি এইভাবে বলেছেন—

"গুরুকে পিতা-মাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ, প্রেম ও ভক্তিদ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করতে পারি।"

শিক্ষককে ছাত্রদের মনের প্রকৃতিটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হবে

শিক্ষাদান কার্য সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে ছাত্রদের ব্যবহার ও আচরণে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদেরও যথেষ্ট সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য শিক্ষককে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ছাত্ররা সজীব মানুষ এবং একটি বিশেষ প্রকৃতির অধিকারী। আবার মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করে গড়া। সুতরাং শিক্ষককে ছাত্রদের মনের প্রকৃতিটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হবে। এইজন্য শিক্ষকের মনের চরিত্রও ছাত্রদের অনুরূপ হওয়া চাই। অর্থাৎ শিক্ষকদের অন্তরের ছেলেমানুষি ভাবটি বজায় রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে এইভাবে আলোচনা করেছেন—

"গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তাহলে তিনি

ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে-বাঁয়ে কতকগুলি বুড়োবুড়ো উপনদীযোগেই তিনি পূর্ণ নন। তার প্রথম আবম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলির মধ্যে হারিয়ে যায়নি। যিনি জাত শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটি আপনি ছুটে আসে।"

শিক্ষাদান শিক্ষকের আপন সাধনার অঙ্গ

প্রকৃত শিক্ষককে শিক্ষাদান ও বিদ্যাচর্চাকে নিজ সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি হৃদয়ের প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করে ছাত্রদের বিদ্যাদান করবেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মনন শক্তির সঞ্চার হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই তবে ছাত্রদের পক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব। শিক্ষককে ঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য তাঁর অন্তরের জ্ঞানের প্রদীপটিকে ঠিকভাবে প্রজ্বলিত রাখতে হবে। যে আলো নিজে জ্বলে না, তা অন্য আলো জ্বালাতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষককে জ্ঞানের আধুনিক ধারার সঙ্গে তার মনকে যুক্ত রাখতে হবে। যে শিক্ষক কেবল মাত্র নোটের বোঝা, তিনি কোনক্রমেই ছাত্রদের মনে প্রেরণা জাগাতে পারেন না।

প্রথম পত্র

• দ্বিতীয় খণ্ড •

৫

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

EDUCATION IN INDIA : AIMS AND OBJECTIVES

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা

আধুনিক শিক্ষার ধারাকে বুঝবার জন্য ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—১. ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা, ২. বৌদ্ধ শিক্ষা, এবং ৩. মুসলিম শিক্ষা। এখানে আমরা ঐ শিক্ষাব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

আমাদের ভারতবর্ষ একটি মহান দেশ। যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তার প্রাকৃতিক দৃশ্য, তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আজকের ভারতকে বুঝতে হলে যেমন আমাদের জানতে হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতকে, তেমনি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাবকে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি জানা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভারতীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটিকে জানিতে হইলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-প্রশাখা যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় সহজ হইতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চার শাখায় বিভক্ত। ভারত চিত্ত গঙ্গোত্রী থেকে এর উদ্ভব। কিন্তু দেশে যে নদী বহিতেছে—কেবল সেই দেশের জলে সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে; তাহা আমাদের ভাষায়, আচারে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি যুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে।" সুতরাং ভারতীয় শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে হলে নতুন করে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকের ভারতবর্ষ হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, জৈন, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান

ধর্মাবলম্বীর নয়। এটি আজ একান্তভাবে ভারতবাসীর। এই সম্মিলিত শিক্ষার ধারা যোগে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবোধ অভিষিক্ত।

মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি হল তার শিক্ষাব্যবস্থা। পৃথিবীর অন্যতম, প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। এই দেশে আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারত ছিল সুসভ্য একটি দেশ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের অবদান অনেকখানি। প্রাগার্য যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা এদেশে প্রবাহিত ছিল, আর্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সেই প্রাচীন ধারা মিলিত হয়ে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারার সৃষ্টি হয়—যা একান্তভাবে ভারতীয়।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা (Brahmanic System of Education)

পণ্ডিতেরা মনে করেন, খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। আর্যদের আগমনের প্রকৃত তারিখ অবশ্য জানা যায় না। বহু বৎসর ধরে আর্যরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের সর্বত্র ছড়িযে পড়ে-নানা রাজ্য ও জনপদ গঠন করেন। আর্যদের মধ্যে যে সম্প্রদাযের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় অর্থাৎ আর্যদের পুরোহিত সম্প্রদায। ভারতের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সমাজগঠনে এই আর্য-পুরোহিতদের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল বর্ণাশ্রম প্রভাবিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ দ্বারা ভারতীয় সমাজ পরিচালিত হত। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই বর্ণ বিভাগের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হত ব্রাহ্মণ; তারপরে, ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্থান ছিল। সমাজে প্রত্যেক সম্প্রদাযই তাদের সমাজ নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে জীবিকা অর্জন করতো।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ছিল গুরুকেন্দ্রিক। গুরুগৃহ বা আশ্রম ছিল শিক্ষালাভের স্থান। শিক্ষার্থীর উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা শুরু হত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব উন্নত যুগে শিক্ষার্থীদের শিখতে হত চতুর্বেদ, যজ্ঞের মন্ত্রাদি এবং ধর্মসংক্রান্ত তত্ত্বমূলক বিষয়।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা (Buddhist System of Education)

বুদ্ধদেবের প্রচলিত ধর্মের নাম হল বৌদ্ধধর্ম। হিন্দুধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্মের মূল পার্থক্য হল এই যে, বৌদ্ধদর্শন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং জন্মান্তর মানুষের কর্মফলের অধীন। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, বৌদ্ধদর্শন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী এবং বেদের প্রভাব এরা স্বীকার করেন না। যদিও বৌদ্ধধর্মের অনেক বিষয় পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের মধ্যে গৃহীত হয়, তবুও হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর মূলগত

বিরোধিতার জন্য ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত হযে যায়। তবুও ১৫০০ বৎসরের অধিক কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাবের সঙ্গে বজায় ছিল এবং এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের একটি নিজস্ব শিক্ষানীতি ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি? ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার মত বেদের প্রাধান্য স্বীকার করা হয় নি এবং অধ্যাপকেরা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদাযভুক্ত ছিলেন না। অন্য সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তিরাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলে শিক্ষাদানের অধিকারী হতেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই শিক্ষার অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র উচ্চ তিন বর্ণের ছাত্ররাই শিক্ষালাভের অধিকারী হত। অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে কঠোরতা পালন করা হত, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাব বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। সাধারণ মানুষের অধিকার বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায স্বীকার করে নেওয়া হযেছিল।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বিহার বা সংঘভিত্তিক। যে কোন ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। তবে কযেকটি শর্ত ছিল। সেগুলি হল, আবেদনকারীর কোন রোগ থাকবে না, কারও ক্রীতদাস নয, ঋণগ্রস্ত নয এবং রাজকর্মচারী নয়। যদি আবেদনকাবী সাবালক না হত তবে পিতা-মাতার মত গ্রহণ করতে হত।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের জন্য প্রথম করণীয ব্রত হল প্রব্রজ্যা এবং যারা প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে আসতেন তাদেব বলা হত 'নবভিক্ষু'। প্রব্রজ্যা ব্রতের পর সম্পূর্ণ দীক্ষাব জন্য ভিক্ষুকে উপসম্পদ ব্রত পালন করতে হত। ভিক্ষুদের জীবনযাপন প্রণালী ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এদের দবিদ্র এবং পবিত্র জীবন যাপন করতে হত।
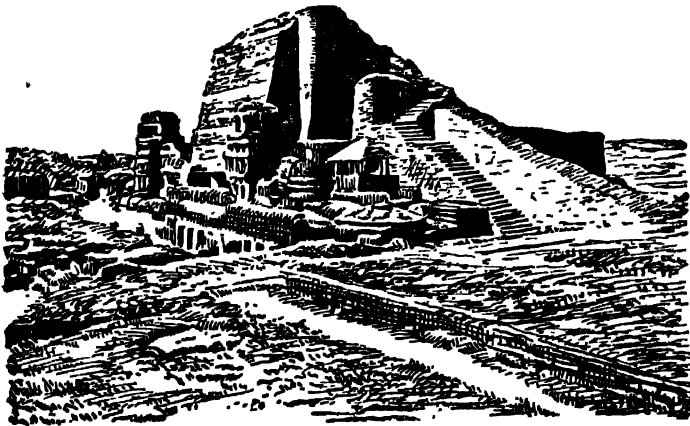
নালন্দা

সাংসারিক সুখ, ভোগ-লালসা, খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতির বিলাস থেকে এদের মুক্ত থাকতে হত। ভিক্ষুরা ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতো।

বৌদ্ধ বিহারে বা বৌদ্ধ সংঘে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে ছাত্রকে শিক্ষালাভ করতে হত। আচার্য ছিলেন ছাত্রের নিকট সুপরামর্শদাতা, নির্দেশক ও বন্ধু।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধশিক্ষা গড়ে উঠেছিল কোন বিহার বা সংঘারামকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী কালে এই বৌদ্ধ বিহারগুলি এক একটি শিক্ষাকেন্দ্র বা বিহারে পরিণত হয়েছিল। এরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **নালন্দা**। বিহারের রাজগীরের নিকট এখনও নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা আসতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য। নালন্দা ছাড়া বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বহু শিক্ষাকেন্দ্র এই যুগে গড়ে উঠেছিল।

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা (Muslim System of Education)

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারতে মুসলমান শাসনের পত্তন হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থাও ধর্মায়তনের সঙ্গে যুক্ত থাকত। মুসলমানী বিদ্যায়তনগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—মক্তব ও মাদ্রাসা। মক্তবগুলি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সীভাষা। তবে আরবী ভাষা শিক্ষাও বাধ্যতা-মূলক ছিল। বৌদ্ধশিক্ষার আমলে যেমন বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মুসলিম আমলে সেরূপ দেখা যায় না। তবে রাজদরবারে চাকুরি লাভের জন্য বহু হিন্দু এই সময়ে ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করতেন। ভারতে মুসলিম শাসনকালে উর্দুভাষার সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশের কয়েকজন সুলতান বাংলাভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। বাংলার ভাষা ও সাহিত্য এই যুগে উন্নতি লাভ করে। হুসেন শাহের সময়ে বাংলাভাষায় রামায়ণ-মহাভারত রচিত হয়েছিল। এই সময়ে মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন।

মুসলিম শাসনকালে ভারতে দুটি শিক্ষার ধারা দেখা যায়। একটি হিন্দু ধারা এবং অন্যটি মুসলিম ধারা। হিন্দু ধারায় শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠান ছিল টোল ও পাঠশালা এবং মুসলিম ধারায় ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি হল মক্তব ও মাদ্রাসা। মুসলিম আমলের শেষ দিকে ভারতে দেখা যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এই অস্থিরতার সুযোগে য়ুরোপীয় বণিকদের মানদণ্ড পলাশী যুদ্ধের পর রাজদণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে শুরু হয় আধুনিক যুগ তথা ঔপনিবেশিক যুগ।

ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—**১. প্রাথমিক শিক্ষা**, **২. মাধ্যমিক শিক্ষা** এবং **৩. উচ্চশিক্ষা**। এ ছাড়া রয়েছে বিশেষ শ্রেণীর ও বিশেষ ধরনের শিক্ষা। যেমন—নারী-শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা বা সামাজিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ইত্যাদি। আমরা বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব।

১. প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় 'গণতন্ত্রের শিক্ষা'। সাধারণত ৬ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য এই শিক্ষা নির্দিষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যেই শিশু প্রকৃত শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের সমাজ জীবনের উপযুক্ত হবার শিক্ষা দেয়। অধিকাংশ আধুনিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। কারণ যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, সেখানে গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের স্বেচ্ছায় জাতীয় মঙ্গল কর্মে অংশ গ্রহণের উপর। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো কোনক্রমেই গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন ভারতে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মোটামুটি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে, তার একমাত্র কারণ বোধহয় ভারতীয় জনসাধারণের সাধারণ নীতিবোধ। এই নীতিবোধকে আরও উজ্জ্বল ও স্থায়ীভাবে গঠন করা সম্ভব হতে পারে, যদি আমরা ভারতে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সর্বত্রই মোটামুটিভাবে এক। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সাধারণত মৌল বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই মৌল বিষয়গুলি হল **লেখা, পড়া ও গণিতের জ্ঞান**। শিশুকে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে সঙ্গতি বিধানের জন্য এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু শিশু কেবল মাত্র সমাজ তথা পাবিবারিক পরিবেশেই বাস করে না। শিশুর চতুর্দিকে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পরিবেশ। এই তিনটি পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতি পাঠের (Nature study) জ্ঞান, ভূগোলের জ্ঞান এবং প্রাথমিক ইতিহাসের জ্ঞান। স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক নীতি ও হাতের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে। অনেক ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার পর আর উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে না। তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যেই সমাজ জীবনে সুষ্ঠুভাবে মানিযে চলতে হয। প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যেই আমরা মোটামুটিভাবে সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারি। খবরের কাগজ পাঠ করে, ভারতের তথা বিশ্বের খবর সংগ্রহ করতে পারি। জাতীয় ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য পাঠ করে আমাদের ধর্মীয় ও প্রাচীন সমাজজীবনের পরিচয় লাভ করতে পারি। সর্বোপরি জাতীয় বিভিন্ন মঙ্গল কর্মে অংশগ্রহণ করে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে বাস করতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

প্রত্যেক স্বাধীন দেশে **প্রাথমিক শিক্ষা** জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ অংশ। ইংরাজীতে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় Primary education,

পূর্বে এই শিক্ষাকে বলা হত Elementary education। elementary Education শব্দটির মধ্যে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। এর বাংলা প্রতিশব্দ করা যায় 'সামান্য শিক্ষা'। কিন্তু Primary education কথাটির মধ্যে আছে প্রাথমিক প্রয়োজনের কথা। সুতরাং Elementary education শব্দটির পরিবর্তে Primary education শব্দটি ব্যবহার সমর্থনযোগ্য।

প্রত্যেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য মোটামুটি একই প্রকারের। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের শিক্ষা। আধুনিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার ছেলেমেয়েদের জন্মগত অধিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। দেশের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব হল স্থানীয় সরকারের। এমন কি কোন শিশুর পিতামাতা যদি সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে অবহেলা দেখান তা হলে দেশের আইনের চোখে তিনি অপরাধী বিবেচিত এবং এর জন্য তাঁর শাস্তি হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়।

(১) শিশুদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দানের জন্য 3 R's অর্থাৎ পড়া, লেখা ও গণিতের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা।

(২) কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 4 H-এর ট্রেনিং দেওয়া অর্থাৎ Training of head, Training of heart, Training of hand and Training of health-এর ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ জ্ঞানের শিক্ষা, হৃদয় অর্থাৎ আবেগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা, হাতের নিপুণতা বৃদ্ধির শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুন পালনে শিক্ষা দান।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করা।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে শিশুর বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তির উন্মেষ সাধিত হয় এবং সঠিকভাবে কোন সমস্যা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে নানাবিধ যৌথ কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়। ঐ সকল কাজে অংশ গ্রহণ করে শিশুদের সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে থাকে।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু তার অবসর বিনোদনের কৌশল সম্পর্কে সঠিক ধারণালাভ করতে পারে।

(৭) প্রত্যেক শিশুই যে সমাজ-জীবনের একটি অংশ এবং প্রত্যেককেই কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে, এই বোধ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা লাভ করে।

(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর গৃহের কাজের পরিপূরক। বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহ থেকে শিশুরা এসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রত্যেক গৃহের নৈতিক বোধ, আচরণের সঙ্গতি এবং সাংস্কৃতিক মান পৃথক। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের মানসিক ও নৈতিক বোধের মধ্যে সমতা আনয়ন করে।

(৯) শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা পরিচালিত হয় সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। সামাজিক ও নৈতিক বোধ তাদের তেমন জোরালো থাকে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধীরে ধীরে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে শেখায় এবং সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শিক্ষা দেয়।

(১০) প্রাথমিক শিক্ষা যদি সঠিকভাবে দেওয়া যায়, তহলে তা শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহ্য করবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ অর্জনে সাহায্য করে।

(১১) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা কুসংস্কার, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে।

(১২) যে সকল ছাত্র উচ্চতর জ্ঞান লাভ করবে প্রাথমিক শিক্ষা তাদের সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষালযে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, এ নিয়ে দুটি চিন্তাধারা দেখা যায়। কারও কারও মতে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে পুস্তককে ভিত্তি করে। এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আনন্দের কথা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করেছেন এবং ঐগুলি ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিতীয় মত হল, প্রাথমিক বিদ্যালযের শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক হবে না, হবে কর্মকেন্দ্রিক এবং শিশুর অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক। সুতরাং প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতিতে কর্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ শিল্প কেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছেন। ডাঃ মন্তেসরী যে শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছেন তা যদিও প্রাক প্রাথমিক স্তরের উপযুক্ত, তথাপি কোন কোন বিষয়ে এই পদ্ধতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের উপযোগী এরূপ অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ পুস্তক পাঠ ও কর্মের সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

আমাদের মনে হয়, প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় সক্রিয়তার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। সক্রিয়তা পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নতুন নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়। কিভাবে কাজের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ঃ ১. শিশুরা মাটি দিয়ে রিলিফ্ ম্যাপ তৈরি করবে, পাহাড়-পর্বত, নদী-উপত্যকার মডেল প্রস্তুত করবে, ২. বিভিন্ন ঋতুতে স্থানীয় গাছপালা, ফলফুলের কি পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় বিবরণ লিখবে; ৩. বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে রোজকার আবহাওয়ার রিপোর্ট লিখবে, ইত্যাদি।

ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিঃ পুস্তকে লিপিবদ্ধ ইতিহাসের বিবরণ ছাত্ররা যেমন শিখবে, তেমনি নানাবিধ কাজের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

১. ইতিহাসের ছবি সংগ্রহ করে ইতিহাসের খাতায় আটকে রাখবে, ২. স্থানীয় পুরাতন অট্টালিকা, দুর্গ, মন্দির, মসজিদ পর্যবেক্ষণ করবে এবং ঐ সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করবে, ইত্যাদি।

এইভাবে কাজের মাধ্যমে সামান্য কিছু অদলবদল করে প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য যে সকল কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাবিদগণ আলোচনা করেছেন, সেগুলি হল— ক) গান্ধীজীর শিল্পকেন্দ্রিক পদ্ধতি বা ওয়ার্ধা পদ্ধতি (একে বুনিয়াদী পদ্ধতি বা নৈতালিমও বলা হয়)। খ) প্রোজেক্ট পদ্ধতি বা সমস্যা পদ্ধতি। (গ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও পরীক্ষণ পদ্ধতি।

প্রাথমিক শিক্ষার রূপ

প্রাথমিক শিক্ষা হল সার্বজনীন শিক্ষা। জাতি, ধর্ম, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে এই শিক্ষার অধিকার। আজকাল প্রায় সকল দেশেই, যেখানে গণতন্ত্র প্রচলিত, সকলের জন্য একই প্রকারের বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলছে। একে বলা হয় Common School Movement। অর্থাৎ সকলের জন্য একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষালাভের আন্দোলন। আমাদের ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাতিভেদ প্রথা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আবার ভারত উপমহাদেশে নানা ভাষা প্রচলিত এবং অঞ্চল ভেদে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধারও পার্থক্য আছে। বিষয়টি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক। কলিকাতা নগরী পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের অন্যতম প্রধান নগরী। এই কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা কিরূপ? কলিকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক বাস করে। স্কুলে যায় বা যেতে পারে এরূপ ছেলেমেয়ের সংখ্যা যদি শতকরা ১০ জন ধরা হয় তাহলে প্রায় ৬ লক্ষ ছেলেমেয়ের জন্য এই অঞ্চলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কলিকাতা ও তার আশেপাশে অনেক প্রাথমিক স্কুল আছে। এই স্কুলগুলির বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কলিকাতায় যেমন ধনী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের জন্য বেশী খরচের বিদ্যালয় আছে, তেমনি মুটে, মজুর ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্যও বিদ্যালয় আছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্য যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদেয় বেতনের হার খুব বেশী, সাধারণ বিত্তশ্রেণীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃভাষা নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা। যে

সকল বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, সেখানে অবশ্য কোন বেতন লাগে না। কিন্তু দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ সকল বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠানো সম্ভব হয় না। কারণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ পরীক্ষা বা **Admission test**-এর বাধা পার হয়ে অশিক্ষিত পিতামাতার অসহায় ছেলেমেয়েরা কোনভাবেই প্রবেশাধিকার পায় না।। কারণ ঐ সকল ছেলেমেয়ে যে সকল পরিবারে এবং যেরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয় সেখানে কোনরূপ পূর্বপ্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকে না।

স্নতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষালাভেব স্নযোগ এক নয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের স্নযোগ বেশী। দরিদ্র মুটে, মজুর শ্রেণীর জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

দ্বিতীয়ত, আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কত বৎসরের শিক্ষাকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বলবো? ৭ থেকে ১০, না, ৭ থেকে ১১, না ৭ থেকে ১৪ বৎসব। আমাদের সংবিধানে নির্দেশক নীতির মধ্যে ৭ থেকে ১৪-কে প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মধ্যে ধরা হয়েছে। গান্ধীজীও তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ৭ থেকে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের বুনিয়াদী শিক্ষার আওতায় আনবার কথা বলেছেন। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলিতেও ১০/১১ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের মধ্যে ধরা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক বয়স বিভিন্ন।

তৃতীয়ত যে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম। অবস্থাপন্ন শ্রেণীর স্কুলে মাতৃ ভাষার পরিবর্তে ইংরাজীভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্য মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট নীতি চালু করতে পারিনি।

প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি প্রধান সমস্যা: প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে যেগুলিতে শিক্ষাবিদগণ বেশী জোর প্রদান করেন, তাব মধ্যে প্রধান দুটি সমস্যা হল: (১) **অনুন্নতি** (Stagnation) ও (২) **অপচয়** (Wastage)। আমরা বিষয় দুটি নিয়ে এখানে আলোচনা করছি।

অনুন্নতি (Stagnation)

প্রাথমিক শিক্ষায় অনুন্নতি একটা প্রধান সমস্যা। শিক্ষায এই অনুন্নতি কথাটির তাৎপর্য আলোচনা প্রয়োজন। অনুন্নতির অর্থ হল বিভিন্ন কারণে কোন কোন ছাত্র এক শ্রেণীতে বছরের পর বছর পড়ে থাকে ; উচ্চতর ক্লাশে উঠতে পারে না। পরে অবশ্য বিরক্ত হয়ে এরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শিক্ষাবিদগণ অনুন্নতির কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করেছেন।

১. **বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি:** বিদ্যালয়ে নানা কারণে ছেলেমেয়েরা

উপস্থিত হতে পারে না। ফলে শ্রেণীকক্ষে যে সকল পাঠ আলোচিত হয় তা ঠিক মতো বুঝতে পারে না। বিশেষ করে গণিতের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা বেশী করে দেখা দেয়। কারণ গণিতের বিভিন্ন বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। মধ্যবর্তী কোন একটি দক্ষতা শিখতে না পারলে পরবর্তী দক্ষতা (Skills)-গুলি শেখা যায় না। ফলে ছাত্র গণিতে পাস করতে পারে না।

২. **অনুপযুক্ত দরদহীন শিক্ষক এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি :** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও বিভিন্ন কাজকর্মে ছাত্রদের মনকে আকর্ষণ করবার যোগ্যতা সকল শিক্ষকের থাকে না। যেহেতু বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলি সরকার চালান, এই কারণে রাজনৈতিক কারণে তারা নিজেদেব দলের কর্মীদের চাকুরি প্রদান কবে থাকেন। এদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষকতা কার্যেব উপযোগী নব এবং শিক্ষকতা কার্যে এদেব দরদবোধও তেমন থাকে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণী-কক্ষের বিভিন্ন কাজে কোন আনন্দ পায না। এই কারণে অনুন্নতি দেখা দেয এবং ছাত্রবা পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন পায না।

৩. **ত্রুটি যুক্ত পাঠ্যক্রম :** প্রাথমিক বিদ্যালযেব বিভিন্ন পাঠ্যবিষযগুলি এমন হবে যে, তাবা ঐগুলি আযত্ত করতে আনন্দ পায়। পাঠ্যপুস্তকগুলি যেন শিশু পাঠকদেব মন কেড়ে নিতে পারে। সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালযগুলিতে সেই সকল বিষয শিক্ষা দেওযা হয, যাব সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পবিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেব প্রাথমিক বিদ্যালযেও পাঠ্যক্রমের প্যাটার্ন একই ধরনেব। তবে ভারতের মত উন্নতিশীল দেশগুলিতে একটি বিপদ এই যে, আমরা ছাত্রদেব উপব একটি বিদেশী ভাষা অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা চাপিযে দিযে থাকি। ফলে শিক্ষার আসল বিষযেব সঙ্গে শিশুরা পবিচয়ের সময পায না ; বেশী সময নষ্ট হয ঐ বিদেশী ভাষা শিখতে।

৪. **ভ্রান্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা :** আমাদের দেশের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-নিযন্ত্রিত। আমাদের দেশে পরীক্ষায় পাস করাকেই বিদ্যালাভ বলে। ছাত্ররা পরীক্ষায ফেল করলে আমরা তাদের একই ক্লাশে রেখে দিই। নতুন শ্রেণীতে প্রমোশন দিই না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন নিম্নশ্রেণীতে পরীক্ষা গ্রহণ না করাই সমীচীন। কারণ পরীক্ষায পাস না করলে ছাত্রদের মনে প্রথম থেকেই হীনমন্যতা বোধ জন্মে এবং ফলে অনুন্নতি দেখা যায। গান্ধীজী মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালযে চিরাচরিত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে শ্রেণী-পাঠের ও শ্রেণী কাজেব উন্নতির মান বিবেচনা করে ছেলেমেযেদের শিক্ষার মান যাচাই করা উচিত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীর পরে একটি পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হযে থাকে। একে বলা হয 'বৃত্তি-পরীক্ষা'। এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষানীতির দিক থেকে যুক্তিযুক্ত মনে হয না।

অনুন্নতির হার এড়ানোর জন্য আমাদের শিক্ষকদের ও শিক্ষা বিভাগের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হল **অপচয়** (Wastage)।

অপচয় (Wastage)

অপচয় কাকে বলে ? অপচয়ের অর্থ হল ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এক বৎসর বা দুই বৎসর বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করবার পরেই নানা কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অক্ষম হয় এবং প্রথম কয়েক বৎসরে যেটুকু বিদ্যা লাভ করেছিল পরবর্তী কয়েক বৎসরে চর্চার অভাবে তা বিস্মৃত হয়। এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পিছনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় করা হয়েছিল তা নষ্ট হয়। প্রাথমিক শিক্ষার এইরূপ ক্ষতিকে **অপচয়** বলে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড বাংলাদেশে তৎকালীন বাংলাদেশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তাতে দেখা যায়, ৪ শ্রেণী বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯,৮৫৩ জন ছাত্রের মধ্যে শিক্ষার অপচয় অত্যন্ত বেশী দেখা যায়। নিম্নলিখিত সারণি থেকে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে।

শিশু শ্রেণী	২১ জন
প্রথম শ্রেণী	৬·৫ ”
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪·৫ ”
তৃতীয় শ্রেণী	২·০ „
চতুর্থ শ্রেণী	১·৫ „

অর্থাৎ শিশু শ্রেণীর ২১ জন ছাত্রের মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীতে উঠেছে মাত্র ১·৫ জন। অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৯ জন। এ থেকে সিদ্ধান্ত এই যে, ৪ শ্রেণীর পাঠ শেষ না করলে শিশুদের মধ্যে 'সাক্ষরতা' স্থায়ী হয় না। প্রাথমিক শ্রেণীর মাত্র দুই তিন শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করে পড়া ছেড়ে দিলে ছাত্রদের পক্ষে স্থায়ীভাবে লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয় না।

কোঠারী কমিশন এই সম্পর্কে যে বিবরণ সংগ্রহ করেছেন তা দেওয়া হল। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৯৬০-১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের একটি অঞ্চলের সমীক্ষা করে তাঁরা নিম্নলিখিত উপাত্তগুলি দিয়েছেন।

অপচয়ের হার

	শ্রেণী				
	১	২	৩	৪	৫
বালক	১০০	৬১	৫১	৪৪	৩৮
বালিকা	১০০	৫৭	৪৫	৩৮	২৯
মোট	১০০	৯৫	৪৯	৭২	৩৫

এই সারণিটি থেকে দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীতে ১০০ জন ভর্তি হলে পঞ্চম শ্রেণীতে থাকে প্রায় ৩৫ জন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে অপচয়ের হার তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যর্থ হবে যদি না আমরা অপচয় ও অনুন্নতি বন্ধ করতে পারি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের অন্তত চার বৎসর কাল শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যিক। চার বৎসরের কম শিক্ষা গ্রহণ করলে 'সাক্ষরতা' স্থায়ী হতে পারে না। উপরের উপাত্তগুলি থেকে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাক্ষরতা স্থায়ী হতে পারেনি এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এটি একটি মারাত্মক ক্ষতি।

অপচয়ের কারণ

১. **বিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী অপচয়ঃ** বিদ্যালয়ের মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) অনুযায়ী অপচয়ের হার কমবেশী হতে পারে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা যে সকল বিদ্যালয়ে পড়ে, সেখানে অপচয়ের হার কম।

২. **অপচয়ের হার সেই সকল পরিবারে কম যেখানে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১ বা ২ জন।**

৩. **সাধারণত অপচয় নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভরশীল।**

(ক) অসুস্থতা, (খ) মানসিক ত্রুটি, (গ) সঙ্গতি বিধানে অক্ষমতা, (ঘ) প্রাক্ষোভিক কারণ, (ঙ) পারিবারিক সমস্যা, (চ) বিদ্যালয়ের নিম্ন মান ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যদিও প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই দেশের মাতৃভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু ভারতের মত আধা-ঔপনিবেশিক দেশে একমাত্র মাতৃভাষাকে মাধ্যম করবার অসুবিধা আছে। কারণ ২০০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইংরাজী ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তাই দেখি প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এই কলকাতা শহরেই কয়েকটি ভাষা প্রচলিত। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জন্য যে সকল উচ্চ বেতনের বিদ্যালয় এখানে আছে, সেগুলির মাধ্যম সর্বতো-ভাবেই ইংরাজী ভাষা। অবশ্য কোন কোন স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী। যদিও বাংলা ভাষা মাধ্যম রয়েছে এরূপ স্কুলের সংখ্যা কলকাতায় বেশী, তা হলেও অধিকাংশ বাবা-মায়ের ঝোঁক ইংরাজী স্কুলের দিকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, ইংরাজী ভাষা শিখলে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ বেশী থাকে, চাকুরির বাজারে বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। অবশ্য এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়। বেশীর ভাগ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম হয় এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে উত্তম ইংরাজী ভাষা জানা ব্যক্তির চাকুরি পেতে সুবিধা হয়। অন্য আর একটি কারণে ইংরাজী ভাষার দিকে অভিভাবকদের ঝোঁক দেখা যায়। তা হল এই

যে, আমরা অভিভাবকেরা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করেছি এবং আমরা যেভাবে লেখাপড়া করেছি, সেই পদ্ধতিটি খারাপ হতে পারে এই ধারণা আমাদের মনে আসে না। একে আমরা বলি Conditioning বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে প্রকৃত শিক্ষা লাভের জন্য, শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি উন্নয়নের জন্য, সুচরিত্র গঠনের জন্য এবং ব্যবহারিক কাজে মৌলিকতা ও সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম সর্বতোভাবে মাতৃভাষা হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের মারফত এইরূপ ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং অন্য কোন ভাষা (অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা) শিক্ষা দেওয়া যাবে না। শিক্ষা-নীতির দিক থেকে এই ভাষানীতি সর্বতোভাবেই গ্রহণযোগ্য।

প্রাথমিক শিক্ষায় দুই ভাষার প্রভাব : প্রাথমিক শিক্ষায় দুটি ভাষা শিক্ষা দিলে শিশুর ভাষা বিকাশ তথা চিন্তার রাজ্যে জটিলতা দেখা যায়। ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য শিশুকে আত্মপ্রকাশের জন্য অধিক ক্ষমতা দেওয়া। শিশু নিজেকে প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। একই সঙ্গে যদি মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে শিশুর ভাষায় শব্দের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং শিশু নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য দুটি ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুকে বলা হল 'বিড়াল' শব্দটি লেখ। শিশু লিখল—'**Bড়াল**'। অর্থাৎ ইংরাজী বর্ণমালার B শব্দটির সঙ্গে বাংলায় 'ড়াল' যোগ করে শিশু বিড়াল শব্দটি লিখল। শিশুর গৃহের ভাষা ও বিদ্যালয়ের ভাষা পৃথক হলে শিশুর পক্ষে বিদ্যালয়ের পরিবেশে সঙ্গতি বিধান করা অসুবিধা-জনক হয়। বিদেশী ভাষায় শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে শিশুর সুসম ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। শিশুর বিদ্যালয়ের ভাষা যদি উচ্চমানের কোন ভাষা হয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গের ও ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা, তা হলে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাব সৃষ্টি হয় এবং এর ফল স্বরূপ হীনমন্যতা বোধ জন্মে। ইংরাজীতে এরূপ অবস্থাকে বলে Bi-lingualism। উভয় ভাষার পরিবেশে যদি শিশু বাস করে তবে শিশুর সহজ আত্মপ্রকাশে অসুবিধা দেখা দেয়। উভয় ভাষার শব্দ মিশিয়ে হাস্যকরভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। ইংরাজী ভাষার দিকে জোর দিলে, শিশুর মৌলিকতা গুণ নষ্ট হয়। সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রায় ২০০ বৎসর ধরে ইংরাজী শিখে আমরা অফিসের আজ্ঞাবহ কেরানী হয়েছি বটে, কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক সৃষ্টি করতে পারিনি। এই কারণে শিক্ষাবিদদের মতে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মাতৃভাষা ভালভাবে শেখালে, মাধ্যমিক স্তরে বিদেশী ভাষা সহজেই শেখা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ : আমাদের পশ্চিমবঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার এতকাল কোন সুসম্বদ্ধনীতি গড়ে উঠে নি। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য কয়েকটি আইন ছিল বটে, কিন্তু সঠিক নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এখন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠে নি। তবে আশার কথা এই যে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মাধ্যমে সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সার্বজনীন করা সম্ভব হবে। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনটিতে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আইনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের যেমন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির কাজে টানবার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি সমগ্র দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকারী দায়িত্বও স্বীকার করা হয়েছে।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। এই প্রতিনিধিদের কার্যকাল হবে চার বৎসর। নির্বাচিত সদস্য ছাড়া কয়েকজন থাকবেন মনোনীত সদস্য। বোর্ড অনেকগুলি কমিটি তৈরি করে তাদের মাধ্যমে কাজ করবেন।

প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ডের অধীনে থাকবে জেলা প্রাইমারী স্কুল কাউন্সিল। এই কাউন্সিল ও জেলা পরিদর্শক, সামাজিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এই কাউন্সিলের উপরেই স্থানীয় বিদ্যালয়ের অনুদান, বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রভৃতি বিষয়ের ভার থাকবে। এই কাউন্সিলের উপর ভার থাকবে স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বালক-বালিকাদের তালিকা প্রণয়ন।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আইনটিতে বালক-বালিকাদের অভিভাবকদের উপর আদেশ জারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালযে পাঠান। যদি কোন অভিভাবক তাঁর ছেলেমেযেকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার এই আইনে রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রধান বাধা

প্রায় দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসনকালে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে তেমন জোর দেওয়া হয়নি। ফলে তখন শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৮/১০ জন মাত্র। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়েছে, জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার তেমন উন্নতি হয় নি। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩০ জনের কাছাকাছি মাত্র। যে সকল কারণে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হয়নি, সেগুলি সাধারণভাবে এখানে উল্লেখ করা হল।

১. **অর্থাভাবঃ** অর্থের অভাবই যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির পথে প্রধান বাধা—এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাজেটের একটি সামান্য অংশই মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। বর্তমানে ব্যয়ের

পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় করা হয় সরকারী বরাদ্দ থেকে। অন্যান্য উৎস থেকে আসে শতকরা ২০ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশের ইনকাম ট্যাক্সের একটি অংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে। জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন তার শিক্ষা বিষয়ক সাব কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য ভারতের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ অর্থ থেকে একটি অংশ ব্যয় করবার সুপারিশ করেন।

২. **বিদ্যালয় গৃহ ও শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণের অভাব :** আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে উপযুক্ত বিদ্যালয় গৃহ নেই। পূর্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বৈঠকখানায়, মন্দির প্রাঙ্গণে এবং গাছতলায় বিদ্যালয় বসতো। বর্তমানে অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামাঞ্চলেও আজকাল বিদ্যালয়ের জন্য পাকাবাড়ী তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন খুব অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যালয়ের গৃহ সমস্যা তেমন কোন বড় সমস্যা নয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গাছতলায় ক্লাস বসাতেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। স্থানীয়ভাবে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করে গৃহনির্মাণ করা হয়, সেগুলি ব্যবহার করে বিদ্যালয় গৃহ তৈরি করা যেতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অংশে ঝড়বৃষ্টি ও বন্যা হয়, সেই অঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহ পাকাভাবে তৈরি না করলে, ঝড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সকল বাড়ী এমন-ভাবে তৈরি করতে হবে যে, বন্যার সময়ে স্থানীয় স্কুল বাড়ী জনসাধারণের আশ্রয়স্থল হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় গৃহ তৈরি করা হবে তা যেন শিশুদের মন আকর্ষণ করতে পারে। প্রাথমিক স্কুলের গঠন বৈশিষ্ট্য এরূপ হবে যে, স্থানীয় শিশুরা যেন বিদ্যালয় পরিবেশকে ভয়ের বিষয় হিসাবে মনে না করে।

কেবল মাত্র বেতন না লাগলেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি হয় না। ঠিকভাবে লেখাপড়া করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চাই পাঠ্যপুস্তক, খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল, শ্লেট ইত্যাদি। এই সমস্ত উপকরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৩. **শিক্ষক সমস্যা :** শুধু মাত্র বিদ্যালয় গৃহ থাকলেই এবং পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারলেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষাদানের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টার বিজ্ঞাপন দিলেই মেলে, কিন্তু শিক্ষক পাওয়া সহজ নয়। আমাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মোটামুটি থাকলেও (অবশ্য অনেক ননম্যাট্রিক ও স্কুল ফাইনাল ফেল শিক্ষক আছেন) শিক্ষার প্রতি দরদ বোধ অতিঅল্প শিক্ষকেরই আছে। তার প্রথম কারণ হল যে, অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষকতাকে চাকুরি হিসাবে দেখেন, একটি জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে

শিক্ষক নিয়োগ করা হয় রাজনৈতিক দলের প্রভাবে, ফলে শিক্ষক বেশী ব্যস্ত থাকেন রাজনৈতিক কাজে, শিক্ষকতা কাজটিকে গৌণ-কাজ হিসাবে দেখেন। তৃতীয়ত, অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁদের শিক্ষকতা কাজটি হল আংশিক বৃত্তি (**Part time work**), তাদের প্রধান কাজ হল কোন ব্যবসা বা বাড়ীর চাষবাস দেখা। এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, (১) পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত শিক্ষক-সার্ভিস কমিশনের মারফত। এই কমিটিতে থাকবেন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ। যারা ব্যক্তির আদর্শ, প্রবণতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্বের গঠন ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষক নির্বাচন করবেন। (২) শিক্ষকদের চাকুরিকে সরকারী চাকুরি হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। (৩) রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব থেকে শিক্ষকদের মুক্ত রাখবার জন্য প্রয়োজন মত বদলির ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৪) ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষা উপযুক্ত মহিলা শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করতে হবে। অ্যাবট ও উড্ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে শিক্ষকদের নির্বাচন করা হবে তারা যেন বিবাহিতা ও সন্তানবতী হন। তাহলে নিজেদের সন্তানকে তাঁরা যেভাবে ভালবাসেন, সেইভাবে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদেরও ভালবাসবেন। (৫) শিক্ষকদের যেমন থাকবে সাধারণ শিক্ষা, তেমনি তাদের শিক্ষকতা সম্পর্কে ট্রেনিং নিতে হবে। (৬) প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। (৭) ২৫/৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে একটি 'বিদ্যালয় কমপ্লেক্স' গঠন করতে হবে, যেখানে শিক্ষকেরা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করবেন, শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, খেলাধূলা বিষয়ে উন্নতির জন্য। (৮) প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৎসরে অন্তত দুইবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অবৈতনিক পরিদর্শক হিসাবে মনোনীত করা যেতে পারে। (৯) শিক্ষকেরা যাতে শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন এবং শিক্ষা সমস্যার সমাধানে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের উৎসাহ দিতে হবে এবং সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। (১০) প্রাথমিক শিক্ষকদের রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে।

৪. প্রশাসনিক সমস্যা : ইংরাজ-শাসনের কাল থেকেই আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। সেই ব্যবস্থা মোটামুটি-ভাবে এখনও চলছে। বর্তমানে প্রচলিত আইনের বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাবিদগণ মনে করেন দরদী দক্ষ প্রশাসকের হাতে এই আইনের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি করা যায়। কিন্তু নানা কারণে এটা যে সম্ভব হচ্ছে না, তার কারণ হিসাবে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, আমাদের শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষা সমস্যার সরাসরি যোগাযোগ নেই। এই সকল অফিসার প্রাথমিক শিক্ষকদের তেমন সম্মান দিতে চান না। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির

জন্য যে সকল সমস্যা আছে, সেগুলি কিভাবে দূর করা যায়, এই সম্পর্কে তারা তেমন চিন্তা করেন না। যদিও রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে এরা চাকুরি করেন, এরা নিজেদের চাকুরিকে White coloured job হিসাবে মনে করেন। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা তাদের মানসিক গঠন থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, জনসাধারণের জন্য অধিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং বর্তমান শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রেখে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ব্যাপক ও সর্বজনীন করা সম্ভব নয়।

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

বর্তমানে ভারতে নাম লিখতে পড়তে পারে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩০ জনের কাছাকাছি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পরে তিন দশকের বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার এই অগ্রগতির হার আশাব্যঞ্জক নয়। অথচ ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ছাড়া দারিদ্র্য থেকে ভারতের মুক্তি নেই। আজ শিক্ষাবিদদের, জাতীয় নেতৃবর্গের চিন্তা করতে হবে ভারতকে অশিক্ষার বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত করা যায়। ভারতের মত অন্যান্য যে সকল দেশ আছে তারা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছে জানতে হবে।

তবে একথা ঠিক যে, আজ আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। 'সকলের জন্য শিক্ষা চাই' শিক্ষার এই সার্বজনীন আন্দোলন শহরে-গ্রামে একসঙ্গে আরম্ভ করতে হবে। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমনকে শিক্ষার জন্য সচেতন করতে হবে। দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অগ্রণী হতে হবে দেশে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য। তবেই হয়তো ভবিষ্যতে এর সমাধান আমরা করতে পারবো।

২. বুনিয়াদী শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার কথা শেষ হবে না যদি আমরা 'বুনিয়াদী শিক্ষা' সম্পর্কে আলোচনা না করি। বুনিয়াদী শিক্ষাকে নানা নামে অভিহিত করা হয়, যেমন, নঈতালিম (New education), ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ইত্যাদি। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা মহাত্মা গান্ধীর এক অপূর্ব শিক্ষা পরিকল্পনা। দুঃখের বিষয় ভারত এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, গান্ধীজী পরিকল্পিত শিক্ষানীতি আমাদের প্রতিবেশী কোন কোন দেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে নিজেদের দেশের শিক্ষা ও বেকার সমস্যার সমাধানে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা গান্ধীজীর সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপহার। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, দেশের মুক্তির জন্য, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নবমূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার। দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে তিনি দেশবাসীর নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন এবং তাদের জীবনের প্রচণ্ড দারিদ্র্য ও

অসহায়তা দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন সত্য, তবে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি মর্মাহত হয়েছিলেন দেশবাসীর আত্মিক দারিদ্র্য দেখে। যে আত্মিক দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায় হল, সর্বাঙ্গীণ, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে। যে শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে, তা তাদের নিজের মাটি থেকে উৎখাত করেছে, এবং নিজস্ব পরিবেশ থেকে দূরে সরিযে দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে, ইংরাজী ভাষাকে অবলম্বন করে তারা নিজের দেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রযে যায় এবং নিজদেশে প্রবাসীর মত আচরণ করতে শেখে। গান্ধীজী বুঝেছিলেন, শিক্ষাকে বাস্তবসম্মত করতে হলে তাকে অবশ্যই কর্ম ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হতে হবে। তিনি আরও দেখেছিলেন ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। অন্যান্য দেশেব মতো ভারতবর্ষ এই ধরনের সক্রিযতামূলক শিক্ষার ব্যযভার বহনে সমর্থ হবে না। সুতরাং তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে চেযেছিলেন যা এই দেশের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেই শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য প্রযোজনীয নানা ধরনেব সক্রিযতার ব্যবস্থা করতে পারে। সে সময এটাও স্পষ্ট হযে উঠেছিল যে, ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে, শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র কাযিক শ্রমকেই শিক্ষিত সমাজ এড়িয়ে চলতো না, যে সব মানুষ তাদের দুটি হাত দিযে কাজ করে এবং তাদের শ্রমদ্বারা সম্পদ সৃষ্টি করে, সেই সব শ্রমজীবী মেহনতি মানুষগুলিও তথাকথিত শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত নিচু শ্রেণীর বলে পরিগণিত হত।

এই নতুন পরিকল্পনা নিযে গান্ধীজী অনেকদিন ধরে ভেবেছেন, তিনি ভারতের শিক্ষাগত সমস্যা নিযেও অনেক চিন্তা করেছেন। অবশেষে তিনি এমন একটি নতুন ধরনের সমাজ সৃষ্টির প্রযোজনীযতা উপলব্ধি করলেন যেখানে শ্রেণীবৈষম্য বলতে কিছু থাকবে না, যে সমাজে সাধারণ মানুষ ও বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, যে সমাজে প্রতিটি মানুষই তার নিজের হাতে কাজ করবে। এইভাবেই তিনি বুঝলেন যে, কর্মকেই করতে হবে সুষ্ঠ-সুন্দর জীবন-যাপন প্রণালীর সামাজিক গঠনের ভিত্তিস্বরূপ।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এই সময়েই 'হরিজন' পত্রিকায 'শিক্ষায অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিপ্লব' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয। এই লেখায শিক্ষার প্রযোজনীয়তা, নতুন ধরনের শিক্ষার পরিকল্পনা এবং আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজী অনেক কথা বলেন। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির পরিপ্রেক্ষিতে কম খরচে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এরই পটভূমিকায় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সকলেই উৎসুক হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেযেদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে, কায়িক শ্রমমূলক উৎপাদন

কেন্দ্রিক আত্মনির্ভর, ৭ বছরের সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই সম্মেলনেই গান্ধীজী তাঁর এই নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার দরুন অগণিত অশিক্ষিত দেশবাসী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে একটা স্থায়ী ব্যবধান গড়ে উঠেছে, যা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের অপচয় ঘটেছে, কারণ শিক্ষার্থী যা শিখছে জীবনের প্রয়োজনে তা লাগছে না বলে কিছুদিনের মধ্যেই তা ভুলে যাচ্ছে। এই নতুন শিক্ষায় যে বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা একসঙ্গে একাধিক প্রয়োজন সিদ্ধ করবে। বালক-বালিকার সর্বাঙ্গীণ বিকাশমূলক এই শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহীত বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থী তার উৎপাদিত বস্তুর সাহায্যে তার পড়ার খরচ যেমন চালিয়ে নেবে তেমনি সেই সঙ্গে সে যখন পূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হবে তখন এই বৃত্তিই তাকে তার জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করবে। এর পর এই সম্মেলন থেকে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য। কমিটি এই পরিকল্পনার পক্ষে রায় দিয়ে বলেন, ৭ বছরের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক মাতৃভাষা-ভিত্তিক এই পরিকল্পনা উৎপাদনকেন্দ্রিক ও শিশুর পক্ষে সুষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশমূলক। এরপর এই শিক্ষা সম্মেলন থেকেই ডঃ জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি সমীক্ষা কমিটি গঠন করা হয় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার একটি পাঠ্যক্রম রচনা করার জন্য। ১৯৩৭ সালের ২রা ডিসেম্বর এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, কোন একটি শিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হবে। এই শিল্পকে কেন্দ্র করেই এই শিল্প সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি থাকবে, যাতে করে শিক্ষার্থী হাতে-কলমে একটি থেকে আর একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আত্মনির্ভরশীল এই শিক্ষা পরিকল্পনা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ব্যয়ভারই শুধু বহন করবে না, তার ভবিষ্যৎ জীবনকেও আত্মনির্ভর করে তুলবে। শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশ, তার পারিপার্শ্বিকতার পরিপূরক। গ্রামীণ শিল্প ও পেশার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকবে এই শিক্ষা। এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তুলবে তাদের নাগরিক কর্তব্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এবং সমবায়মূলক সমাজের মানুষদের মধ্যে সমাজ সেবার পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এই শিক্ষার পাঠ্যক্রমে থাকবে—১ **মূলশিল্প**—সূতা কাটা, বয়ন শিল্প; কৃষি, চর্মশিল্প, ফল ও তরিতরকারির বাগান তৈরি, ছুতোরের কাজ—ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি অথবা যে কোন শিক্ষা যা স্থানীয় ও ভৌগোলিক শর্তাদির দিক থেকে অনুকূল এবং যার মধ্যে শিক্ষাগত সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে আছে। ২. **সূতা কাটা ও বয়ন শিল্প** সম্বন্ধে নিম্নতম জ্ঞান অর্জন, ৩ **মাতৃভাষা**, ৪ **গণিত**, ৫ **সমাজ-বিজ্ঞান** (ভারতের ঐতিহাসিক রূপরেখা, ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ);

৬. **সাধারণ বিজ্ঞান**; ৭. সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিযে আবেগ, অনুভূতি ও সৃজনীশক্তির প্রকাশ, ৮. **হিন্দুস্থানী** (উর্দু এবং দেবনাগরী লিপির মাধ্যমে)।

জাকীর হোসেন কমিটির মতে—সর্বতোমুখী পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাদানই উৎকৃষ্ট উপায। এই শিক্ষা বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাকে সৃজনশীল করে তোলে। দৈহিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে যে অসামাজিক অনভিপ্রেত ব্যবধান আছে এই শিক্ষা সেই ব্যবধানকে দূর করবে এবং শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলবে। এই শিক্ষা পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিকটিও খুব কার্যকরী। এই পরিকল্পনার শিক্ষাগত মূল্য অপরিসীম। কার্যকরী শিল্পভিত্তিক এই শিক্ষা অনেকখানি বাস্তবধর্মী ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং স্বযংনির্ভর।

বি. জি. খের কমিটি

জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বুনিযাদী শিক্ষার উপব আরও সমীক্ষাব জন্য বি. জি. খের-এব নেতৃত্বে আর একটি কমিটি গঠিত হয। খের কমিটি সুপাবিশ কবেন, মাতৃভাষা-ভিত্তিক এই শিক্ষা ৬ থেকে ১৪ বছবের জন্য বাধ্যতামূলক-ভাবে প্রবর্তন করা উচিত। ৫ বছর বযস্ক শিশুও প্রবেশাধিকাব পেতে পারে: ভিন্নমুখী অন্যান্য বিদ্যালযগুলিতে ৫ম শ্রেণীব পাঠ শেষ করে (কিংবা ১১+ বযসেব পর) ছাত্রদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওযা হবে। কোন বহিঃপরীক্ষা গ্রহণ কবা হবে না। বিদ্যালযেব অভ্যন্তরীণ পবীক্ষাব উপর ভিত্তি করে ছাত্রদের বিদ্যালয পরিত্যাগকালীন সার্টিফিকেট দেওযা হবে।

খের কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে, বুনিযাদী শিক্ষাকালকে ২ ভাগে বিভক্ত করে ৫ বছরের নিম্ন বুনিযাদী এবং ৩ বছরের উচ্চ বুনিযাদী স্তরে ভাগ কবা উচিত। এছাড়া উচ্চতর শিক্ষা এবং শিল্প-বাণিজ্যে যোগদানেব উপযোগী ৫ বছরের প্রাথমিকোত্তর পাঠদানের কথাও খেব কমিটি বলেন।

১৯৩৯ সালে পুনা এবং ১৯৪১ সালে জামিযানগব শিক্ষা সম্মেলনে বুনিযাদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে আরও একটু উন্নত রূপ দেওয়া হয়, এবং ১৯৪৫ সালে ওযার্ধায অনুষ্ঠিত জাতীয শিক্ষাসম্মেলনে প্রাক্ প্রাথমিক স্তব থেকে উচ্চশিক্ষা ও গণশিক্ষাব স্তব পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ বুনিযাদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়।

এর আগে ১৯৪২ সালেব আন্দোলনের পর গান্ধীজী বুনিযাদী শিক্ষা সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দেন, তিনি বলেন, বুনিযাদী শিক্ষা শুধুমাত্র শিশুদেব শিক্ষা নয, এ শিক্ষা সারা জীবনের জন্যই শিক্ষা। এইভাবেই বুনিযাদী শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায শুরু হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনেব প্রতিটি স্তবেব শিক্ষাই হল বুনিযাদী শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন, শিশুর ৭ বছব থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষাই শুধু নয, এই নঈ-তালিম বা নতুন শিক্ষাব ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে মাতৃজঠর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। সেজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা জীবনের চারটি স্তর অর্থাৎ শৈশব থেকে পরিণত বয়স্ক পর্যন্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। এজন্য [ক] বযস্ক শিক্ষা, [খ] ৭ বছরের নিম্ন বয়স্কদের জন্য

প্রাক বুনিয়াদী শিক্ষা, (গ) ৭ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য বুনিযাদী শিক্ষা এবং [ঘ] কিশোর বয়স্কদের জন্য (যারা বুনিযাদী স্তর সম্পূর্ণ করেছে) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা। এজন্য ডঃ জাকীর হোসেন কমিটিকৃত পাঠ্যক্রমের সংস্কার করা হয়। এই সংস্কারের ফলে ঠিক হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে কর্ম-অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ৮ বছরের সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাসূচী এবং গ্রামীণ বয়স্কদের ১০ বছরের শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রযোজনীয জ্ঞান, অভ্যাস, প্রবণতা ও দক্ষতা গঠন, নাগরিকত্বের শিক্ষণ (ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক) দেওযা হবে। এছাড়া ইতিহাস পাঠ, ভূগোল পাঠ, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিক জ্ঞান অর্জন, খাদ্য-বস্ত্র ও আশ্রয সংক্রান্ত আত্মনির্ভরতার শিক্ষালাভ, কৃষি, বাগান তৈরি, সূতা কাটা এবং বস্ত্র-বয়ন, কাঠের কাজ, গৃহ-নির্মাণ ও মেরামতি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন (যে কোন ১টি), সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত, ইত্যাদি সমবায় হবে পাঠ্য বিষয।

বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত মূল্যাযন কমিটি সম্প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন যে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজীকে ঐচ্ছিক বিষয হিসাবে পাঠ্যক্রমে রাখা উচিত (যেখানে উচ্চ বিদ্যালয বা এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্য ইংরাজীর প্রযোজন হয়)। হিন্দীকে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে, যেখানে হিন্দী আঞ্চলিক ভাষা নয সেখানে আবশ্যিক করা উচিত।

বুনিযাদী বিদ্যালযের গৃহ সম্বন্ধে বলা হযেছে—৮ শ্রেণীর বুনিযাদী বিদ্যালযে কম করে ৬০০ স্কোযার ফিট আযতন বিশিষ্ট ৫টি শ্রেণী কক্ষ থাকবে। বাকি শ্রেণীগুলি উন্মুক্ত স্থানে হবে। এছাড়া বিদ্যালযে থাকবে একটি পাঠাগার ও পাঠকক্ষ, প্রধান শিক্ষকের অফিসঘর, শিক্ষকদের কক্ষ, একটি প্রদর্শনী-কক্ষ, এবং একটি ১০০০ স্কোযার ফিট আযতনের বৃহৎ কক্ষ।

বুনিযাদী বিদ্যালযের শিক্ষক সম্বন্ধে বলা হযেছে—একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ আটজন শিক্ষকের প্রযোজন। শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে—উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা এবং বুনিযাদী শিক্ষণে ডিপ্লোমা লাভ। একটি শ্রেণীতে ৩০ জনের বেশি ছাত্র রাখা উচিত হবে না। বিদ্যালযের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধন, যৌথ পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক ক্রিযাকলাপ, বিদ্যালয পত্রিকার প্রকাশন, গ্রাম রক্ষীদল সংগঠন, দলগত আহার, আত্মবিশ্লেষণ, নির্দিষ্ট স্থানের মানচিত্র অঙ্কন, শিল্প-কৌশলগত ক্রিযাকলাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবাসিক বুনিযাদী বিদ্যালযের অনুষ্ঠান সূচী দিনে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী হওযা উচিত। অনাবাসিক বুনিযাদী বিদ্যালযে সকালে ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এবং বিকেলে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাজ হবে।

বুনিয়াদা বিদ্যালয়ের বিবরণী

বুনিযাদী বিদ্যালযে নিম্নোক্ত ধরনের বিবরণী রাখা উচিত—

১. শিক্ষকের বিবরণী : [ক] বার্ষিক পরিকল্পনা, [খ] মাসিক পরিকল্পনা, [গ] দৈনিক পাঠ টীকা, [ঘ] মাসিক অগ্রগতি বা উন্নতি, [ঙ] সামাজিক

ক্রিয়াকলাপের বিবরণী, [চ] আত্মসমীক্ষণগত টীকা, [ছ] শিল্প সংক্রান্ত যৌথ বিবরণী, [জ] ব্যক্তিগত শিল্পসংক্রান্ত দিনলিপি।

২. শিক্ষার্থীর বিবরণী : [ক] দিনলিপি পরিকল্পনা, [খ] দৈনিক অগ্রগতি বা উন্নতির বিবরণী, [গ] শিল্পের বিবরণী, [ঘ] আত্মসমীক্ষণগত টীকা, [ঙ] অগ্রগতি বা উন্নতির বিবরণী।

৩. বিদ্যালয়ের বিবরণী : [ক] তালিকা লিপিবদ্ধ করা, [খ] উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা, [গ] মজুত জিনিসপত্রের হিসাবের খাতা, [ঘ] মাল সরবরাহের হুকুম টুকে নেওয়ার খাতা, [ঙ] বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বিবরণী, [চ] অগ্রগতির মূল্যায়নের বিবরণী, [ছ] রাজ্য বিভাগীয় বিবরণী, [জ] পাঠাগারে সরবরাহ-খাতা, মাল সরবরাহের হিসাব খাতা এবং পুস্তক তালিকা, [ঝ] মাহিনা সংক্রান্ত তালিকা।

বুনিয়াদী শিক্ষাসম্পর্কে 'সার্জেন্ট রিপোর্টে' বলা হয় যে, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করা হোক।

ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সমীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি সুপারিশ করেন—১. স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্যগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ২. শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা উচিত, ৩. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। শিল্প শিক্ষার জন্য কোন রকম দ্বিধা না করেই, শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও শুধু দক্ষ কারিগর হলেই বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের শিল্প-শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারবে।

সমালোচনা : বুনিয়াদী শিক্ষার সমালোচনা প্রসঙ্গে অনেকে শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। ছাত্র শিক্ষকের কাছে হবে রুটি-রোজগারের উপকরণ। জীবনের শুরুতেই অর্থকরী বিদ্যার দিকে এই প্রবণতা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে বলে অনেকের ধারণা।—এ সমালোচনা অর্থহীন নয়, গান্ধীজীও পরে বলেছেন, উৎপাদন দ্বারা ছাত্রদের কিছু খরচ মিটলেও মূল ব্যয়ভার রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। সার্জেন্ট রিপোর্টে এবং জাকীর হোসেন কমিটিও এই পরিকল্পনার আর্থিক দিকটি উপেক্ষা করে শিক্ষাগত মূল্যের দিকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বর্তমানে তাই বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক না হয়ে কর্মকেন্দ্রিক হয়েছে। পাঠ্যসূচীও কর্মকেন্দ্রিক রূপ নিয়েছে।

অনুবন্ধ নীতি

বুনিয়াদী শিক্ষার অনুবন্ধ নীতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একক শিল্পকেন্দ্রিক এই শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত দুরূহ। এই অনুবন্ধ প্রণালী হল, যেমন—সুতা কাটাকে একটি

শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হল। এর সঙ্গে সঙ্গে জমি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন, তুলোর বীজ কিভাবে বপন করতে হবে, জমি চাষ কি করে করতে হবে ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন, কোথায় তুলো জন্মায়, সেখানকার আবহাওয়া, মাটির উপাদান, ইত্যাদি সম্পর্কিত ভূবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন; সুতো তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সুতো ও চরকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে এই যে জ্ঞান অর্জন, একেই বলা হয় অনুবন্ধ প্রণালী।

বর্তমানে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে অনুবন্ধের কেন্দ্রে গ্রহণের ফলে শিক্ষা পদ্ধতি সহজ ও গতিশীল হয়েছে। জাকীর হোসেন কমিটিও অনুবন্ধ নীতিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। পুনা সম্মেলনে বলা হয়েছে—শিক্ষাদানকে শুধুমাত্র মৌল শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত না করে শিশুর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেও সংযুক্ত করা উচিত।

বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন বুনিয়াদী শিক্ষা বলা হয় তার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'বুনিয়াদী' কথাটি খুবই উপযুক্ত হয়েছে, কারণ এই শিক্ষা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ। জাতি, বর্ণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে এই শিক্ষা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। এই শিক্ষা বুনিয়াদী, কারণ এই শিক্ষা শিশুর জীবনের প্রাথমিক চাহিদা এবং আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই শিক্ষা সমাজ জীবনের প্রাথমিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িত। সুতরাং এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী বলা খুবই যুক্তিযুক্ত।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে এই সকল আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, এই নতুন শিক্ষা দেশের চলতি শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পাদপ্রদীপের সামনে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় শিক্ষার সমস্যাগুলিকে উন্নততর পরিকল্পনায় উত্তরণ ঘটিয়েছে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে গড়ে ওঠার পথ এই শিক্ষাব্যবস্থাই নির্দেশ করেছে।

কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটি গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেনি। কোন কোন প্রদেশে পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী নাম দিয়ে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থাই চালু রেখেছেন। ডঃ জাকীর হোসেন এবং ডঃ শ্রীমালীর মতো প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদদের মতে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার এই অসাফল্যের মূলে রয়েছে প্রশাসন বিভাগের অবহেলা, কারণ তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে, শিল্পকাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান কি করে সম্ভব। যদিও এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে রুশো থেকে ডিউই পর্যন্ত সকল শিক্ষাবিদই অনেক আশা পোষণ করেছেন—তথাপি আমাদের দেশে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক হওয়ার পথে প্রধান বাধা কোঠারী কমিশনের মতে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার অভাব। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সাহায্যে পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই

শিক্ষাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যাঁরা নিজের সন্তানকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান, প্রধানত তাঁরাই বুনিয়াদী শিক্ষার গুণগান করেন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি উত্তর বুনিয়াদী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে প্রবেশাধিকার দিতে চায় না, কারণ তাদের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন। এর ফলে অনেকে মনে করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় গ্রামের পক্ষে হয়ত কিছু ভাল, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার দায়িত্ব এখন পুরোপুরি ভারতীয় রাষ্ট্র ও জনগণের হাতে।

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা

ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারতে একটি শিক্ষার ধারা প্রচলিত ছিল বটে, তবে তাতে পৃথকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন দেশীয় পাঠশালায় জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অনুসারে লেখা, পড়া ও গণিতের জ্ঞান দেওয়া হত এবং পরবর্তীকালে শেখানো হত 'পত্রদলিল লিখন শিক্ষা' এবং ব্যবসায়িক ও কৃষি সংক্রান্ত হিসাব। এই সম্পর্কে শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করানো হত। এই শুভঙ্কর সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না, তবে তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ গাণিতিক ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ধাপ হল মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী স্তরকে বলা হয় **মাধ্যমিক শিক্ষা**। মাধ্যমিক শিক্ষা হল কৈশোর কালের শিক্ষা। আমাদের দেশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হয়। পরবর্তী দুই শ্রেণীর অর্থাৎ ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পার্থক্য এই যে. প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় সার্বজনীন শিক্ষা এবং এটি গণতন্ত্রের শিক্ষাও বটে। প্রত্যেক আধুনিক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার জনসাধারণের জন্মগত অধিকার হিসাবেই মান্য করা হয়। কিন্তু বহুদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক। আনন্দের কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গেও বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বর্তমানে অবৈতনিক রূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমরা পূর্বে বলেছি যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর কালের শিক্ষা। কৈশোর কালের ছাত্রজীবনের বৈশিষ্ট্য কি? কৈশোর কালের ছাত্রজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (Individual differences) প্রকট হয়। পাঠ্যক্রমের কোন কোন গ্রুপের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ বা পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ পায়। কেউ বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পছন্দ করে, কেউ পছন্দ করে হিউম্যানিটিজ (মানব বিদ্যা), কেউ বা কমার্স। এই সকল কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। পূর্বে যখন বহুমুখী

পাঠ্যক্রম চালু ছিল, তখন এই সুযোগ বেশী ছিল। এখন উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পৃথক হওয়ায় মাধ্যমিক স্তরে এই সুযোগ তেমন নেই। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পূর্বের মতো বিষয় নির্বাচনের সুবিধা আছে।

মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রম সংগঠনের একটি মূলনীতি হল এই যে, এই স্তরে পাঠ্যক্রমের বিষয়সমূহ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—মূল বিষয় (Core Subject) এবং প্রান্তস্থ বিষয় (Periphery)। মূল বিষয়ের জ্ঞান সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই আয়ত্ত করতে হবে। প্রান্তস্থ বিষয়ের জ্ঞান ছাত্ররা আয়ত্ত করবে তাদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী। বর্তমানে অবশ্য মাধ্যমিক স্তরে একটি বিষয় অতিরিক্ত নেওয়া যায়, এই প্রান্তস্থ বিষয়ের গ্রুপ থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে এই বিষয় নির্বাচনের সুযোগ বেশী।

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি

আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি আছে। এর কারণ এই যে, এক সময়ে যে সকল বিষয়গুলি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মনে হয়, পরবর্তীকালে সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুরাতন ব্যবস্থাগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ শিক্ষা একটি প্রগতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষাবিদগণ আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ মনে করেছেন :

১. **উদ্দেশ্য :** আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনরূপ স্পষ্টতা নেই। সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা বলা হয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার অর্থ এই যে, এই শিক্ষার পরে বহু বালক-বালিকা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয় না এবং এই রূপ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার পরে তারা যেন বিভিন্ন কর্ম প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ কলকারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, স্বাধীন ব্যবসা, কৃষিকার্য বা কোন রূপ অর্থকরী কাজে যোগ্যতার সঙ্গে নিযুক্ত হতে পারে। দুঃখের বিষয় আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়।

২. **চরিত্রগঠন ও সুনাগরিক সৃষ্টি :** মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রবান সু-নাগরিক গঠন করা। কিন্তু যেরূপ বিদ্যালয় পরিবেশ, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদানের মান এইরূপ চরিত্র গঠনে সক্ষম, আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার অভাব দেখা যায়।

৩ **সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের অভাব :** আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মূল কর্তব্য দেখা যায়, বই-এর বিষয়বস্তু মুখস্থ করানো এবং পরীক্ষায় পাসের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত করা। ছাত্ররা তোতাপাখীর মতো পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করে এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নানা ধরনের খেলাধূলা, শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ এবং বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা না করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এরূপ কাজের অভাব একটি মারাত্মক ত্রুটি।

৪ বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা: যে শিক্ষার বিষয়বস্তু বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তাতে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি উৎপাদনমূলক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে পড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি কর্মের ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে 'কর্মশিক্ষা ও কর্ম অভিজ্ঞতার' ব্যবস্থা রেখে। কিন্তু এর দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার সকল বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবের যোগ ঘটে না। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদদের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে এই সমন্বয় সাধন করা যায়।

৫ গুরুভার পাঠ্যক্রম: অল্প সময়ের মধ্যে বহু বিষয় শেখাতে গিয়ে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে গুরুভার করে ফেলেছি। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এমন অনেক বিষয় আছে যার নির্দিষ্ট কোর্স নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে আশার কথা এই যে, শিক্ষাবিদগণ এই বিষয়ে অবহিত হয়েছেন এবং পাঠ্যক্রমের ভার কমানোর চেষ্টা করছেন।

৬ পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা: অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবক মনে করেন, পরীক্ষা পাসই হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই কারণে শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক সমস্ত বিষয়ই পরীক্ষা পাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পুনর্গঠনের জন্য আমাদের উচিত এটি এমনভাবে সংস্কার করা, যাতে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এই উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

৭. প্রশাসন সমস্যা: প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিশাসন সমস্যা একটি বড় সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-অধিকার, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং স্থানীয় প্রশাসক এই তিনটি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটি সম্পর্কে বলা যায় যে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এদের কার্যধারা সন্দেহাতীত নয়। এরা এমনভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত রাখা সম্ভব হয় না। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি ব্যবস্থার সংস্কার না করলে এবং নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা না করলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান রূপ

স্বাধীনতার পর আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার ধরনকে দুইবার পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথমবার মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়বার কোঠারী কমিশনের নির্দেশ মত। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মতো মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—(১) দশ বৎসরের মাধ্যমিক কোর্স এবং (২) ২ বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স। দশ বৎসরে মাধ্যমিক কোর্সের পরে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবং এই পরীক্ষায় পাস করলে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে

ভর্তি হবে। উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সে দুই বৎসর পাঠের পর তারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর ছাত্র-ছাত্রীরা দুই বা তিন বৎসরের (অনার্স) নতুন ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

নতুন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম: পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে নতুন মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করেছেন তার রূপরেখা এখানে দেওয়া হল—

১. **প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা)**—২টি পত্র, ২০০ নম্বর।

২ **দ্বিতীয় ভাষা** (ইংরাজী অথবা ইংরাজী যাদের মাতৃভাষা তাদের জন্য বাংলা)—১টি পত্র ১০০ নম্বর।

৩ **তৃতীয় ভাষা** (যে কোন একটি প্রাচীন ভাষা অথবা একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা অথবা মাতৃভাষা বাদে অন্য একটি ভারতীয় ভাষা।)—১টি পত্র. ১০০ নম্বর।

৪. **গণিত:** ১০০ নম্বর।

৫. **বিজ্ঞান**—২০০ নম্বর, প্রথম পত্র—ভৌত বিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়ন), ১টি পত্র, ১০০ নম্বর। দ্বিতীয় পত্র—উদ্ভিদ বিদ্যা, জুলজি ও হিউম্যান ফিজিওলজি—মোট নম্বর ১০০।

৬. **ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান:** ২০০ নম্বর। প্রথম পত্র—ভারত ও তার অধিবাসী, ১০০ নম্বর। দ্বিতীয় পত্র—ভূগোল, ১০০ নম্বর।

৭. **কর্মশিক্ষা:** হাতের কাজ ৫০, শরীর শিক্ষা ৩০, সমাজ সেবা ও বিদ্যালয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজকর্ম ২০।

৮. **ঐচ্ছিক বিষয়:** ১০০ নম্বর—ইংরাজী, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানমূলক বিষয় অথবা বৃত্তিমূলক যে কোন বিষয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম: উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাকাল হল দুই বৎসর—১১শ ও ১২শ শ্রেণী। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম দুইভাগে বিভক্ত—(১) সাধারণ কোর্স (General stream courses) ও (২) পেশাগত প্রবাহ (Vocational stream courses)। সাধারণ প্রবাহের মধ্যে আছে ভাষা ও বিভিন্ন বিষয়। এ ছাড়া আছে কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, এন. সি. সি ও সমাজসেবা এবং কতকগুলি ঐচ্ছিক বিষয়। পেশাগত প্রবাহের মধ্যে আছে—(১) ৫টি ভাষা, (২) আটটি নির্বাচিত বিষয়, (৩) কৃষি, শিল্প, কারিগরী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে পেশাগত ট্রেনিং, (৪) কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, জাতীয় সামরিক শিক্ষা (N. C. C.) ও সমাজসেবা. (৫) সংযুক্তি সাধক বিষয়সমূহ (Bridge courses)।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

মাধ্যমিক শিক্ষা হল কৈশোর কালের শিক্ষা। এই শিক্ষা হল তাদের জন্য যারা বালকত্ব বা বালিকাত্ব পরিহার করে যৌবনের প্রাঙ্গণে পা বাড়াচ্ছে। এই বয়সে

বিভিন্ন দিকে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রকাশ পায়। কেউ দেখে সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন, কেউ দেখে বৈজ্ঞানিক হবার স্বপ্ন, কেউ দেখে ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন, কেউ দেখে রাজনীতিক হবার স্বপ্ন। জীবনের আদর্শ, ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ দেখা দেয়। শিক্ষার্থীর অবচেতন মনে ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে নতুন চিন্তা দেখা দেয়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় যে বিষয়গুলি প্রধান, তা হল—(১) বস্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, (২) মানুষ ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, (৩) আদর্শ, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশু যেভাবে বস্তু ও প্রকৃতি বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, মাধ্যমিক স্তরে তার পরিবর্তন হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রভৃতি প্রবল হয়। কৈশোর কালের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন হতে পারে বিজ্ঞান পাঠ ও ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

কৈশোর কালে শিশু সমাজকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে। কৈশোর কালের বালক-বালিকা সম্পর্ক (Boy-girl relationship) ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অপূর্ব রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। মাধ্যমিক শিক্ষায় সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের ভিতর দিয়ে সমাজে মানুষের সঙ্গে একটি সত্য সম্পর্ক শিশু আবিষ্কার করতে পারে। কৈশোর কালের অন্যতম চাহিদা অর্থনীতির চাহিদা। এই বয়সে শিশু চিন্তা করে ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও বৃত্তি নির্বাচন সম্পর্কে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষা। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর। এই শিক্ষা সাধারণত ১১+ থেকে ১৭/১৮ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা **মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য** হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারি।

১. শিক্ষার্থীদের দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টি করা, যাতে তারা ভবিষ্যতের সমাজজীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক রূপে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

২. জীবিকা অর্জনের উপযোগী যোগ্যতা অর্জন (Vocational efficiency)।

৩. শিক্ষার্থীর সুসম ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of personality)।

৪. ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ঐতিহ্য, দেশ ও জাতি সম্পর্কে গৌরববোধ সৃষ্টি করা।

৫. শিক্ষার্থীর মনে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন প্রবৃত্তির উদ্বোধন।

৬. সংস্কৃতবান মানুষ সৃষ্টি। এই সংস্কৃতি বা কালচার হল চিন্তার সক্রিয়তা, সৌন্দর্য ও মানবিকতা সম্পর্কে সূক্ষ্মবোধ।

৪. উচ্চ শিক্ষা

বর্তমানে কলেজের শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা বলা হয। উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারত চিরকালই প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে তক্ষশিলা, বারাণসী, নবদ্বীপ প্রভৃতি কেন্দ্র উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধযুগে নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধি ছিল সারা দেশ জুড়ে। চীন, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা নালন্দায় সমবেত হতেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যতীত, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, তর্কবিদ্যা ও বিভিন্ন দর্শন শিক্ষা দেওয়া হত।

মুসলমান শাসনে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছিল মাদ্রাসা। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ছন্দ, আইন, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালযের সৃষ্টি হয ইংরাজ শাসনের সমযে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধেব পর থেকে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী শিক্ষার জন্য কিছুই কবেনি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের ডেসপ্যাচে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনের প্রস্তাব করা হয এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে কলিকাতায, পবে বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হয। এই বিশ্ববিদ্যালযগুলি গঠিত হয লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ

প্রত্যেক দেশেই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত গবেষণার জন্য প্রত্যেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালযগুলিকে মর্যাদা দেওযা হয। প্রকৃতপক্ষে দেশ ও জাতিব গৌরব বৃদ্ধি পায় বিশ্ববিদ্যালযগুলির মৌলিক গবেষণাব মাধ্যমে। এই কারণে প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই বিশ্ববিদ্যালযগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। কোন সমস্যা যদি দেশ ও জাতিকে পীড়িত করে, তার সমাধানের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ : কার্যক্রম ও প্রশাসনিক ধবন অনুযাযী ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কযেকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায। যেমন—(১) এফিলিয়েটিং, (২) ইউনিটারী ও (৩) ফেডারেল।

ইউনিটারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল একক বিশ্ববিদ্যালয। এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোন অনুমোদিত কলেজ থাকে না। এই ধবনের বিশ্ববিদ্যালযের প্রশাসন, শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সবকিছুরই উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। পশ্চিম বাংলায যাদবপুর, বিশ্বভারতী এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়।

ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন অনেক কলেজ থাকে, যেগুলি শিক্ষাদান কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তবে পরীক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ইউনিট নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

এফিলিয়েটিং বা অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হল, সেই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় যারা প্রধানত তাদের অধীন কলেজগুলিকে বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনের অনুমতি দিয়ে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন তার কাজ ছিল প্রধানত অনুমোদন দান ও পরীক্ষা গ্রহণের। পরীক্ষা নেওয়া ও ডিগ্রীদানই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। অবশ্য বর্তমানে শিক্ষাদান কার্য ও গবেষণাকে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমরা বাংলা তথা ভারতের গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী।

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চ শিক্ষারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের)-এর মতে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—

১. নতুন জ্ঞান অর্জন, সত্যানুসন্ধান এবং নতুন শিক্ষার আলোকে পুরাতন জ্ঞানের পরিমার্জন।

২. তরুণ প্রতিভা আবিষ্কার করে তাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত নেতা হিসাবে গড়ে তোলা।

৩. বিজ্ঞান, কলা, ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতির জ্ঞান ও জীবনের বিভিন্ন কর্মের ক্ষেত্রের জন্য সামাজিক চেতনা সম্পন্ন সুদক্ষ কর্মী তৈরি করা।

৪. গণশিক্ষার মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর করা।

৫. ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত উদ্যোগে দেশের সঠিক উন্নতি সাধন করা।

৬. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসারে চলার উপযুক্ত সহনশীলতা ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে জাতীয় তথা বিশ্বজীবনের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা, ভারতের জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করা এবং এই উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

৭. ডাঃ কোঠারীর মতে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ নাগরিক তৈরি করা, সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি, জাতীয় সংহতি বিধান এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেশের উন্নতিতে সাহায্য করা।

ভারতের উচ্চ শিক্ষার অবস্থা

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের ডেসপ্যাচে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ঐ প্রস্তাব অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত দ্রুত উচ্চ শিক্ষার প্রসার হয় এবং এই উদ্দেশ্যে বহু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। ঐ কমিশনের সভাপতির নাম অনুসারে তা হাণ্টার কমিশন নামে

বিখ্যাত। হান্টার কমিশন উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী উত্তমকে উৎসাহিত করবার সুপারিশ করেন। ফলে উচ্চ শিক্ষা অতি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে।

লর্ড কার্জন যখন ভারতের ভাইসরয় তখন উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকল্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় (১৯০২)। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণযন করা হয়। ঐ সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) পাস করা হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠিত হয়। উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের জন্য এই কমিশন অনেকগুলি সুপারিশ করেন। তার মধ্যে একটি প্রধান সুপারিশ হল, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বভার অন্য একটি পৃথক বোর্ড অর্থাৎ সেকেণ্ডারী শিক্ষা বোর্ডের উপর স্থাপন করা। এই সময়ে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যেমন, ঢাকা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০), আলিগড় ও লক্ষ্ণৌ (১৯২১), দিল্লী (১৯২২), নাগপুর (১৯২৩), আগ্রা (১৯২৭), উৎকল (১৯৪৩) ইত্যাদি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয। স্বাধীনতার পরে ভারতে আরও নতুন ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হযেছে। এই বিশ্ববিদ্যালযগুলি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার অনুরূপ আরও ৮টি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

বর্তমানে ভারতে ৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। ভারতের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা এই প্রতিষ্ঠানগুলি মেটাচ্ছে।

পূর্বে মনে করা হত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ হল শিক্ষাদান ও গবেষণা এবং বিভিন্ন কলেজকে অনুমোদন দান করা। কিন্তু বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালযের ভূমিকা আরও ব্যাপক ও গভীব। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মনে করা হয একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হল বিশ্ববিদ্যালযগুলি। অতএব জাতীয় জীবনের প্রধান গতিবেগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নীতি নির্ধারণ করতে হবে, কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, কারিগর, সাক্ষর, নিরক্ষর —জনসাধাবণের সকল অংশের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালযকে সংযোগ রেখে চলতে হবে। সুতরাং স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চারটি প্রধান কাজ হবে শিক্ষাদান, গবেষণা, অনুমোদন ও সম্প্রসারণ। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে শিক্ষাদান। আধুনিক জগতের সঙ্গে তাল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যেমন যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে, তেমনি উপযুক্ত

গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার উৎকর্ষ নির্ভর করে গবেষণার উপর। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম দুর্বলতা হল জনসংযোগ বিচ্ছিন্নতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। এটা কখনই গতিহীন জড়ের মতো থাকতে পারে না। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ থাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যমণি। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা। তা একমাত্র হতে পারে উপযুক্ত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে।

ভারতে বর্তমানে ৭৪টি বিশ্ববিদ্যালয এবং ১৪টি ইনষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হলেও উচ্চ শিক্ষার চাহিদার তুলনায় তা আশানুরূপ নয়। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমূল সংস্কার প্রযোজন। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আজ শুধু বক্তৃতার প্রাধান্য। পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরীর সুযোগ সুবিধা খুবই কম। বিজ্ঞান বিষয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ কম। আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আর্থিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালযের প্রশাসন যন্ত্রও নানা ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং এতগুলি অসুবিধার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে ?

বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিক্ষাবিদগণ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করবার সুপারিশ করেছেন। তবে ভারত একটি বহুভাষাভাষী দেশ, বহুধর্ম, ভাষা ও জাতি, বর্ণ নিয়ে ভারত উপমহাদেশ সংগঠিত। সুতরাং স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা প্রযোজন। মোটামুটিভাবে এরূপ দেখা যাচ্ছে যে, স্নাতক স্তরে বহু বিশ্ববিদ্যালয স্থানীয় ভাষাকেই শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবাংলার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আমরা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ও বাংলা ভাষা. উভয়ের প্রাধান্য মেনে নিয়েছি। উত্তর ভারতের বিশ্ববিদ্যালযগুলিতে হিন্দী ভাষাকেই একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষা স্তরে ভাষা সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের বক্তব্য হল—১. আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ২. স্নাতকোত্তর স্তরে কিছু কাল ইংরাজীর ব্যবহার চলবে, কিন্তু স্নাতক স্তরে মাতৃভাষাকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ৩. শিক্ষকদের উভয় ভাষায় পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ৪. ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে প্রাচীন ও ইংরাজী ভাষা পড়বার সুযোগ থাকবে। ৫. অন্যান্য বিদেশী ভাষা, যেমন—রুশভাষা, জার্মান ভাষা প্রভৃতি পড়বার সুযোগ থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সমস্যা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন, কিছু রাজ্য সরকারের অধীন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বপ্রকার পরিচালন ভার কেন্দ্রীয়

সরকারের উপর ন্যস্ত। অপর পক্ষে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা ও আংশিক দায়িত্ব ভার রাজ্য সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃতি, গঠন ও অধিকার সম্পর্কে রাজ্য আইনসভায় স্থিরীকৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল নিয়মবিধি প্রণয়ন করেন তা অনুমোদন করেন রাজ্য সরকার। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজ্যকে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন ইউ. জি. সি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব যে সঠিকভাবে পালন করতে পারছে না, এতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৃষ্টির মূলেই এই ত্রুটি নিহিত। প্রাচীনকালে তক্ষশীলা, নালন্দা যেমন জাতীয় প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেইভাবে গড়ে ওঠেনি। এদের পিছনে ছিল বৈদেশিক স্বার্থ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠতে পারে নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি না হতে পেরেছে পাশ্চাত্যের নকল, না হতে পেরেছে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার মত পুরোপুরি ভারতীয়। এই কারণে এগুলি আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারছে না।

তবে একথা ঠিক, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমাদের মাতৃভূমির যে অগ্রগতি বা উন্নতি হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে আমাদের শিক্ষিত দেশবাসীর দ্বারা।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University)

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। ভারতের উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিশন নানাবিধ পরামর্শ দেন। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন কয়েকটি নতুন ধরনের সুপারিশ করেন। ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। এই কারণে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। গ্রামের ছেলে শহরে এসে দুপাতা ইংরাজী পড়ে আর পিতৃ-পিতামহের বৃত্তি গ্রহণ করতে চায় না। যে হাতে কলম ধরে লেখা-পড়া শিখেছে, সে হাতে লাঙ্গল ধরতে তার সম্মানে বাধে। আমাদের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শহরকে কেন্দ্র করে। এই কারণে কমিশন শিক্ষাকে গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার সুপারিশ করেন। এই প্রসঙ্গে কমিশন গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে আরও সম্প্রসারিত করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত একটি গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন। কমিশন উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে গ্রামীণ উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কথা বলেন। স্থানীয় জীবনধারাকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষা গড়ে উঠবে। এই ধরনের কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে এক-একটি গ্রামীণ কলেজ গড়ে উঠবে। কলেজের পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে থাকবে গ্রাম-জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই ধরনের কলেজগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়। এই গ্রামীণ শিক্ষাপাঠ্যক্রমে থাকবে ৭/৮ বৎসর ব্যাপী নিম্ন ও উচ্চ

বুনিয়াদী শিক্ষা, ৩/৪ বৎসর ব্যাপী উত্তর বুনিয়াদী, ৩ বৎসরের স্নাতক স্তর ও ২ বৎসরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা। এই সম্পর্কে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় উচ্চ শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের পরামর্শে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য সমগ্র ভারতে ১৪টি গ্রামীণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলি হল—১. শ্রীনিকেতন (পশ্চিমবঙ্গ), ২. গান্ধীগ্রাম (মাদ্রাজ), ৩. জামিয়া নগর (দিল্লী), ৪. উদয়পুর (রাজস্থান) ৫. বিরৌনি (বিহার), ৬. বিচপুরি (ইউ. পি.), ৭ মানোয়ারা (গুজরাট) ৮. কোয়েম্বাটুর (মাদ্রাজ), ৯. গারগোটি (মহারাষ্ট্র), ১০. রায়পুর (পাঞ্জাব) ১১. ওয়ার্ধা (মহারাষ্ট্র), ১২. হনমনামতী (মহীশূর), ১৩. থাবানোর (কেরল) এবং ১৪. ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ)।

এগুলির উদ্দেশ্য হল, গ্রামাঞ্চলের চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন। এগুলিতে গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজনীতি ও সমষ্টি উন্নয়নের উপর স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হবে। এই শিক্ষার মান মাস্টার ডিগ্রীর সমতুল্য। এ ছাড়া সিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা, সাধারণ শিক্ষার উপর তিন বৎসরের ডিপ্লোমা, স্যানিটারী ইনস্পেক্টর ও কৃষি বিজ্ঞান কোর্সের উপর ২ বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হবে।

৬

আধুনিক ভারতের শিক্ষা সমস্যা

ISSUES IN EDUCATION OF MODERN INDIA

১. সাক্ষরতা

সাক্ষরতা শব্দটির সাধারণ অর্থ হল নাম লিখতে পড়তে পারা। এক সময়ে 'সাক্ষরতা'কে শিক্ষার সমার্থক মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। শুধুমাত্র অক্ষর পরিচয়কে বর্তমান যুগে শিক্ষা বলা চলে না। সাক্ষরতা কথাটি বর্তমানে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা—ব্যবহারিক সাক্ষরতা (Functional literacy) এবং আনুষ্ঠানিক সাক্ষরতা (Formal literacy)। ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলতে বোঝায় কাজের শিক্ষা। স্কুল-কলেজে না পড়েও অনেকে কাজের শিক্ষা পেতে পারে; কিন্তু আনুষ্ঠানিক সাক্ষরতার অর্থ হল স্কুলে-পাঠশালায় পডে আমরা যে বিদ্যা পাই।

কিন্তু এক সময় ছিল, যখন স্কুল-কলেজে পড়বার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দেশ জুড়ে একটি নৈতিক শিক্ষার জাল পাতা ছিল। এটি ছিল সমাজের একটি বিশেষ কর্তব্য। বিদ্যা সেই যুগে কেবলমাত্র বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না। বিদ্যা তখন আবশ্যিক না হতে পারে, কিন্তু তা ছিল স্বৈচ্ছিক। সে বিদ্যা সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হত আইনের জোরে নয়, তার চলাচল ছিল আমাদের দেহে রক্ত চলাচলের মত।

কিন্তু নানা কারণে সে অবস্থা আর নেই। দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকেই স্কুল-কলেজের বিদ্যার দিকে আমাদের ঝোঁক বেড়েছে। ফলে যে আলো দেশের সর্বস্তরের অন্ধকার দূর করবার জন্য সচেষ্ট ছিল, সেটি জ্বালা রইল একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যবানের জন্য।

উইলিয়াম অ্যাডামসের রিপোর্ট : ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এই দেশ অধিকার করে, তখন তৎকালীন বিভিন্ন বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, সারা দেশ জুড়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ বিস্তৃত ছিল। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম অ্যাডামসের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, তৎকালীন বাংলাদেশ ও বিহার প্রদেশে প্রায় ১ লক্ষ পাঠশালা বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রতি তিনটি গ্রামের জন্য ছিল একটি বিদ্যালয়। তৎকালীন লোকসংখ্যা হিসাব করে বলা যায় যে, প্রতি ৪০০ জনের জন্য ছিল একটি বিদ্যালয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

দিকে সরকারী প্রচেষ্টায় যে সার্ভে করা হয়েছিল, তা থেকে দেখা যায়, মাদ্রাজ শহরে বালকদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায় এরূপ তাদের অনুপাত হল প্রতি ৩৪ জনে একজন, ঐ সময়ে বাংলাদেশে ঐ অনুপাত ছিল ৩৬ জনে একজন এবং বোম্বাইতে ঐ সংখ্যা ছিল প্রতি ৬২ জনে একজন।

ভারতের নিরক্ষরতার অবস্থা: ভারতে তথা অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল **নিরক্ষরতা**। ব্রিটিশ আমলে ভারতের সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ১০। স্বাধীনতার পর অবশ্য ঐ হার ক্রমশ বাড়ছে। এজন্য দেশের জনসাধারণ ও জাতীয় সরকার প্রভৃত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ভারত সরকারের রিপোর্টে (India 1975) দেখা যায়, ১৯৫১ সালে ভারতের সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ১৬·৬। পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৭১ সালে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৯·৪৫। এই উন্নতি প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই।

সাক্ষরতার সমস্যা

সাক্ষরতার সমস্যাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ্ করা যায়। প্রথমটি হল, যে সব ছেলেমেয়ের স্কুলে যাবার বয়স আছে, কিন্তু নানা কারণে স্কুলে পড়বার সুযোগ পায় নি তাদের অক্ষয় পরিচয় প্রদান করা; দ্বিতীয়টি হল, যাদের স্কুলে যাবার বয়স নেই তাদের সাক্ষরতার সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে সাক্ষরতার সমস্যা হল বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার সমস্যা। বর্তমানে সমস্যাটিকে অন্যভাবে বিচার করা হচ্ছে, অর্থাৎ বয়স্কদের শিক্ষা না বলে বলা হচ্ছে **সামাজিক শিক্ষা** (Social education)।

আমরা ভারতের বয়স্কদের নিরক্ষরতার সমস্যাটিই এখানে আলোচনা করছি।

ভারতের লোকসংখ্যা সারা বিশ্বের লোকসংখ্যার প্রায় ১৫%। ১৯৭১ সালের লোক গণনার হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ভারতের মোট লোকসংখ্যা হল ৫৮·১৫ কোটি। এই বিশাল জনসমষ্টির মাত্র ২৯·৪৫% সাক্ষর অর্থাৎ লেখাপড়া জানে। ভারতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই হার হল শতকরা ১২·৮ জন এবং পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৩·৯ জন।

ভারতে বয়স্কদের সাক্ষরতা আন্দোলন বেশি দিনের নয়। ১৯৩০ সালে যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় গভর্নমেণ্ট কাজ শুরু করেন, তখন থেকেই বলা যায়, দেশের সাক্ষরতা আন্দোলন আরম্ভ হয়। তার পূর্বে অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে ব্যক্তিগত আন্দোলন প্রচেষ্টায় কেউ কেউ বয়স্ক শিক্ষার জন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার জন্য এই আন্দোলন ব্যাহত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। পরে ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন এই আন্দোলন নতুনভাবে আরম্ভ করা হয়। ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে একটি জনসভায় মৌলানা আজাদ (তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী) ঘোষণা করেন যে, বয়স্কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাদের এমন শিক্ষা

দিতে হবে যে, তারা যেন সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে সমাজ ও জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

নতুন কার্যক্রম

শিক্ষাবিদগণ বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে নতুন কার্যক্রম স্থির করেছেন সেগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :

১. বয়স্কদের অক্ষর পরিচয় দেওয়া, অর্থাৎ লিখতে-পড়তে শেখানো।

২. স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন করা।

৩. বয়স্কদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে এরূপ কাজের শিক্ষা প্রদান করা।

৪. নাগরিক হিসাবে নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

৫. অবসরকালীন সময় কাটাবার জন্য যথাযোগ্য ট্রেনিং দেওয়া।

৬. সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি সাধন এবং জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠু ভাবে নির্বাহের জন্য একটি উত্তম আদর্শের অনুসারী হতে সাহায্য করা।

সাক্ষরতা আন্দোলনের তিনটি উদ্দেশ্য

জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে সাক্ষরতা আন্দোলনের তিনটি উদ্দেশ্য থাকবে যথা—

[ক] **সামাজিক সংহতি** (Social cohesion) : বর্তমান যুগে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দ্বারা আমরা বিশেষভাবে আক্রান্ত। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা এই বিচ্ছন্নতার মনোভাবকে বহুলাংশে দূর করতে পারে। অশিক্ষিত ব্যক্তিরা নানাভাবে নানা কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষা এই কুসংস্কার দূর করে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে উপযুক্ত সম্প্রীতির মনোভাব গঠনে সাহায্য করতে পারে।

[খ] **জাতীয় যোগ্যতা** (National effciency) : বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিনের মন্তব্য এই যে, সমাজতন্ত্র কখনই অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠন করা যায় না। কারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থচিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে। জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুই তারা উপলব্ধি করতে পারে না। এইভাবে আমরা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদেরও চিন্তা করা দরকার যে, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসমষ্টির সাহায্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন এই যে, সুখী জীবন গঠনের জন্য আমাদের দেশের উৎপাদনকারী শক্তিকে আরও উন্নত করা প্রয়োজন। এটি একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি আমরা জনসাধারণকে ঠিকভাবে শিক্ষিত করতে পারি। কারণ শিক্ষিত শ্রমিক, কৃষক ও কারিগরেরা, নতুন প্রণালী অবলম্বন করে উৎপাদনকে যথাযথভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

[গ] জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন (Development of national resources) : উন্নয়নশীল দেশগুলির আর একটি প্রধান সমস্যা হল জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন। যেমন, আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা ভূমির ক্ষয় নিবারণ এবং বন সম্পদ সংরক্ষণ। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক নিরক্ষরতার জন্য জনসাধারণ এই দুটি সমস্যার সঠিক সমাধানে তেমন সচেষ্ট নয়। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত এই দুটি ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করা। অনুরূপভাবে বলা যায় বন্যজন্তু সংরক্ষণও আমাদের আর একটি সমস্যা। ভূমিক্ষয় নিবারণ ও বন সংরক্ষণের মতো এই সমস্যাটি সম্পর্কেও জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যেই জনসাধারণকে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

বয়স্ক মনস্তত্ত্ব

সাক্ষরতা আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দরকার বয়স্ক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জানতে হবে বয়স্কদের মূল আগ্রহসমূহ (Basic interests), কাজ করবার তাগিদসমূহ (Urges) এবং সাধারণ যোগ্যতার (Capacities) বৈশিষ্ট্যগুলি। এই বিষয়গুলি সঠিকভাবে জেনে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে বয়স্কদের সাক্ষরতা আন্দোলনের মধ্যে আনা যাবে না।

বয়স্কদের চাহিদাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের আচরণ কয়েকটি বিশেষ ধরনের চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বয়স্কদের প্রধান চাহিদাগুলি হল :

১. শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর চাহিদা। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য সংগ্রহের চাহিদা, আশ্রয়ের চাহিদা, পোশাক-পরিচ্ছদের চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা ইত্যাদি।

২. অপত্য স্নেহের চাহিদা।

৩. অবসর বিনোদনের চাহিদা অর্থাৎ খেলাধূলার চাহিদা, আনন্দ উপভোগের চাহিদা ইত্যাদি।

৪. দল বাঁধবার চাহিদা, বন্ধুর চাহিদা।

৫. অহংভাব তৃপ্তির চাহিদা ; অর্থাৎ পরিবেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন, সামাজিক পরিচিতি এবং যশের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, শারীরিক ও সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা। এই অহংভাবের জন্যই ব্যক্তি জীবনের সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে স্পর্শকাতর হয়।

৬. আগ্রহ মেটানোর চাহিদা। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্ক ব্যক্তিদের দুপ্রকারের আগ্রহ দেখা যায় ; যথা—[ক] বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের আগ্রহ ও [খ] বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার মধ্যে সমন্বয়ের আগ্রহ। ব্যক্তি চেষ্টা করে, ব্যক্তি, দল ও জাতীয় আগ্রহের মধ্যে একটি মিল খুঁজে বের করতে। ব্যক্তির অন্য আগ্রহ

থাকে নিজের ও সমাজের কার্যকলাপকে ন্যায়নীতি ও নৈতিক ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে।

উপরোক্ত চাহিদাগুলি অবশ্য সব বয়সে সমানভাবে দেখা যায় না। ঐগুলি ব্যক্তির নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ঐগুলি হল—

১. **বয়স :** বয়স অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদা ও আগ্রহের পরিবর্তন হয়। যেমন, খেলাধুলার আগ্রহ, আমোদ-প্রমোদের আগ্রহ বয়সের উপর নির্ভরশীল। তবে কিছু আগ্রহ আছে যেগুলির তেমন পরিবর্তন হয় না। যেমন পুস্তক পাঠের আগ্রহ, খবরের কাগজ পড়বার আগ্রহ ইত্যাদি। বয়স্করা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিকতর খুঁতখুঁতে থাকে। বয়স্ককালে সকলেই সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের সেবা পছন্দ করে এবং একটু আরামে থাকতে ভালবাসে।

২. **পরিবেশ :** গৃহ-পরিবেশ ও প্রিয়জনের সাহচর্য ব্যক্তির মানসিক সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩. **আর্থিক অবস্থা :** যুবক বয়সে আর্থিক নিরাপত্তার চাহিদা ব্যক্তির একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। এই সময়ে সকলে কোন কোন কাজ বা চাকরি চায়। এর অভাব হলে ব্যক্তির মানসিক ব্যর্থতা জন্মাতে পারে। বয়স্ককালে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে সামঞ্জস্যহীন করে তোলে।

৪. **রাজনৈতিক প্রভাব :** রাজনীতির প্রভাব কিভাবে জনচিত্তকে উদ্বেলিত করে, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যখন আমরা ভারতের প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের কথা চিন্তা করি।

৫. **পারিবারিক জীবন :** বয়স্কদের জীবনে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করে।

বয়স্কদের ও শিশুদের আচরণের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, বয়স্কদের আচরণ তার অহং (Ego) ভাব দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে তার অহং ভাবটি তেমন বিকশিত নয়। সুতরাং বয়স্ক শিক্ষার জন্য দরকার একটি উপযুক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া।

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব

বয়স্ক শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একদল উপযুক্ত শিক্ষকের। শিক্ষকদের কেবলমাত্র বিষয়ের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তাদের বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেই চলবে না, তাদের আরও কয়েকটি গুণের অধিকারী হতে হবে।

প্রথমত, শিক্ষকদের থাকবে দরদবোধ ও উৎসাহ। উত্তম শিক্ষক হবেন সর্বদাই তার কাজে আগ্রহশীল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষককে সর্বদাই ছাত্রদের মধ্যে—'আমরা-ভাব'টি (We-feeling) জাগ্রত করতে হবে। ছাত্রদের মনে একটি যৌথ মনোভাব

সৃষ্টি করতে পারলে, কাজটি অনেক সহজ হয়। তৃতীয়ত, সব কাজের মধ্যে একটি নৈতিকবোধ জাগ্রত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের উপরে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার উপকরণ

সাক্ষরতা আন্দোলনকে সার্থক করবার জন্য উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার প্রয়োজন। মডেল, ছবি, চার্ট, গ্রাফ্, ম্যাপ প্রভৃতি প্রয়োজন ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার করতে হবে, তেমনি এপিডিয়াস্কোপ, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ফিল্ম প্রভৃতির মারফত বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক করতে হবে। মাঝে মাঝে কোন স্থান দল বেঁধে পরিদর্শন করা, মিউজিয়াম পরিদর্শন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে বিষয় পাঠটি চিত্তাকর্ষক করবার জন্য।

বয়স্ক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক

বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলিতে কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। পুস্তকের বিষয়বস্তু হবে বয়স্কদের উপযোগী। সাধারণত, ধর্মীয় বিষয়, মহাপুরুষদের জীবন কথা, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, পুরাণের গল্প, বয়স্কদের জীবিকার কাজে সাহায্য করতে পারে, এরূপ বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপূর্ণ বিষয় প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন, গ্রামাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক-গুলিতে থাকবে চাষবাসের কথা, কিভাবে জমিতে সার দিতে হয়, কিভাবে সার প্রস্তুত করতে হয়, ইত্যাদি। শহরাঞ্চলের জন্য অবশ্য অন্যবৃত্তির উপযোগী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বইগুলির ছাপা ও কাগজ চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই এবং যথেষ্ট ছবির ব্যবস্থা রাখা চাই। বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাষা হবে সরল এবং বয়স্কেরা যে অঞ্চলে বাস করে তার সাংস্কৃতিক মান অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করতে হবে। শব্দ নির্বাচন করতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে। প্রথম দিকে বিভিন্ন পাঠে এক বা একাধিক শব্দের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহলে শব্দগুলির ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে পারে।

শিক্ষা পদ্ধতি

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। তবে কি বিষয় শেখাবো, তা স্থির করে পদ্ধতি নির্বাচন করা উচিত। সাধারণত বয়স্ক শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়ের জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যথা—অক্ষর পরিচয় প্রদান করা, অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিষয়বস্তুর জ্ঞান দান, নতুন কৌশল শেখানো কোন সমস্যা সমাধানের জন্য; সঠিন মনোভাব তৈরি করা, কোন বিষয় উপলব্ধি করতে শেখানো, উপযুক্ত অভ্যাস গঠন ইত্যাদি।

বয়স্ক শিক্ষায় যে বিষয়গুলি শেখানোর দিকে বেশি জোর দিতে হবে, সেগুলি

হল, লেখা ও পড়া শেখানো, সাধারণ গণিতের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। 'পড়া একটি অতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। অঙ্কের লিখিত বিষয় ঠিক মতো বোঝবার জন্য প্রত্যেকেরই এই কৌশল জানা প্রয়োজন। পড়া শেখানোর জন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। যে বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সেইরূপ বিষয় নির্বাচন করা উচিত। অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মতো বয়স্কদের পড়া শেখানো উচিত নয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনের একটি সঠিক পদ্ধতি হল দৈনন্দিন ঘটনার বিষয়গুলি সহজ ভাষায় পড়তে ও লিখতে সাহায্য করা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যেমন সরকারী বিভাগ থাকা উচিত, তেমনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সম্পর্কে উৎসাহিত করা উচিত।

বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্য : গান্ধীজী লিখেছেন, 'আমার মতে দেশবাসীর নিরক্ষরতার জন্য নয়, বরং অজ্ঞতার জন্য আমাদের লজ্জিত ও দুঃখিত হবার সঙ্গত কারণ আছে। যারা বয়স্ক এবং কোন না কোন পেশায় নিযুক্ত তাঁদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে লিখতে পডতে জানা। ব্যাপক নিরক্ষরতা ভারতের পাপ ও লজ্জার বিষয় এবং তাই এর নিরাকরণ অবশ্য কর্তব্য। তবে সাক্ষরতার আন্দোলন বর্ণ পরিচয়ে শুরু ও শেষ হবে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একাজ চলবে। তবে বয়স্কদের শিক্ষার একটি প্রধান সমস্যা হল কিভাবে প্রাপ্তবয়স্করা অর্জিত জ্ঞানকে স্থায়ী করতে পারে। যে যৎসামান্য সময়ের জন্য ওদের পডানো হয়, তাতে অধীত পাঠ ওদের পক্ষে ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে পঠিতব্য বিষয়ের অনুবন্ধ করার পরই মাত্র এই জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির হাত এডানো যেতে পারে। শুধু মোটামুটি লিখতে পডতে ও হিসাব করতে জানা আজ তো গ্রামীণ জীবনের স্থায়ী অঙ্গ নয়ই, ভবিষ্যতেও কোন দিন এ মর্যাদা পাবে না। গ্রামবাসীদের জ্ঞানদানের পদ্ধতি তাঁদের নিত্যকার জীবনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে। এটা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না। তাঁদের ভিতর এর জন্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা দরকার। আজ তাঁদের যা দেওয়া হয়, তার জন্য তাঁদের মনে চাহিদাও নেই এবং তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না। গ্রামবাসীদের গ্রাম্য গণিত, গ্রাম ভূগোল, এবং গ্রাম ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিন। যেটুকু সাহিত্যজ্ঞান তাদের নিত্য প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ চিঠিপত্র লিখতে পড়তে জানা ইত্যাদি, তাই তাদের শেখাবার ব্যবস্থা করুন। এই ধরনের জ্ঞান তাঁরা সযত্নে রক্ষা করবেন ও শিক্ষার পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। যে সব পুস্তক তাঁদের নিত্যকার জীবনে গ্রহণীয় কিছুই দিতে পারে না, তাঁদের তার প্রয়োজন নেই!"

[গান্ধী রচনা সম্ভার পৃঃ ৩৩২, পঞ্চম খণ্ড

২. সমাজ সেবা

শিক্ষা শিশুমনের সব রকম সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে প্রকৃত নাগরিক হতে সাহায্য করে। নাগরিক হিসাবে সে নিজের অধিকারসমূহ বুঝে নিতে সচেতনতা লাভ করে এবং অন্যদিকে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন ছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষার পরিধি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর যোগাযোগ রাখা এবং আঞ্চলিক অধিবাসীদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সেবা ও শ্রমদান করা তাদের পবিত্র কর্তব্য। কোঠারী কমিশনে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন—

১. জাতীয় সংহতি, ২. জাতীয় সেবা, ৩. নৈতিক ও সামাজিক মূল্য-বোধ, ৪. কর্মের অভ্যাস, ৫. উৎপাদনমূলক শিক্ষা, ৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাজ গঠন, ৭. বিদ্যালয়ের কর্মধারার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র স্থাপন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজজীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ একান্ত কাম্য। এই যোগাযোগের পথ দুটি। প্রথম ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অধিবাসীরা নিজেদের তাগিদে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবে, এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের সংস্পর্শে আসবে। অপর পক্ষে বিদ্যালয় এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করবে যাতে অঞ্চল, মহল্লা ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় যোগাযোগ সংগঠিত হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রথম পথটি থেকে দ্বিতীয় পথটি অনেক সহজ ও স্বাভাবিক। এরকম সম্পর্ক ছাত্রদের শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে এতে সন্দেহ নেই।

সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত। সুতরাং সবরকম সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে এই যোগাযোগ সহায়তা করবে। তাদের ধর্ম, আচার, ব্যবহার, মূল্যবোধ প্রভৃতির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটবে, জনজীবনের সঙ্গে এই ধরনের সংস্পর্শ স্থাপনের ফলে উভয়ের প্রতি উভয়ের সহানুভূতি ও সহনশীলতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এক কথায় 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—কবির এই আহ্বানের সাড়া জাগাতে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। এই যোগসূত্র জাতীয় সংহতির ভিত্তিপ্রস্তর।

অন্যদিকে যোগাযোগের পন্থা হিসাবে বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজজীবনের সঙ্গে যে সেতু-বন্ধন প্রয়োজন, তা সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়েই আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা কর্তৃক কর্মশিক্ষা চালু করা প্রসঙ্গে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে কমিউনিটি বা স্থানীয় গণজীবনের সঙ্গে যোগাযোগের পথ হিসাবে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেবা ও কর্ম মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পন্থা। সুতরাং আঞ্চলিক সমাজে সেবাদানের নীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

আঞ্চলিক সংস্কৃতি: যে জনসমষ্টির জন্য সেবা দান করা হবে, তাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, মানুষের প্রাথমিক চাহিদার সঙ্গে তার কালচারের যোগাযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্যদিকে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে কর্মী নিজের কালচার সম্পর্কেও সচেতন থাকবে। উভয়ের কালচারের মধ্যে যাতে কোন সংঘাত না ঘটে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আঞ্চলিক সেবাকার্য: আঞ্চলিক সেবাকার্যের নীতি হিসাবে বিভিন্ন দল, উপদল ও ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা-ভিত্তিক সেবাপ্রকল্প গ্রহণ করার নীতি বর্তমানে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যে সেবার চাহিদা নেই সেই ধরনের সেবাকার্যের পরিকল্পনা বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা উচিত হবে না। পক্ষান্তরে আঞ্চলিক অধিবাসীদের প্রয়োজন-ভিত্তিক সেবাপ্রকল্প ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণ করবে। অধিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে যেগুলির সম্ভাব্য সেবাকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা করতে পারবে, সেই ধরনের কাজ বিদ্যালয়কে বেছে নিতে হবে। এই নিয়মের বাইরে কাজ করলে সামাজিক সম্পদের অপচয় ঘটে এবং সেইসব সেবাকার্য জনসাধারণের মঙ্গলে নিয়োজিত হয় না। অপর দিকে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, আঞ্চলিক সেবাকার্য গ্রাহকের দিকে লক্ষ্য রেখে করা দরকার, এই সেবাকার্য দাতার তাগিদে সংগঠিত হয় না।

সেবার নীতি: যে কর্ম সম্পাদনে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্রতী হবে, অনুরূপ কার্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান প্রদান করে কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ একই ধরনের সেবা সকলেই যদি দিতে আগ্রহী হয়, তবে সেবার অন্যান্য ক্ষেত্র অবহেলিত থাকতে পারে, এবং অন্য ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট মানের কার্য অতি সহজেই প্রাধান্য পেতে পারে। সুতরাং সেবাকার্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু লক্ষ্য করে কাজ করতে হবে।

সেবা সম্পর্কিত শিক্ষণ: যারা সেবাকার্য সম্পাদন করবে তাদের সেবামূলক কাজে কিছু শিক্ষণ দরকার। আধুনিককালে জনসেবা ও জনমঙ্গলকর কাজ পেশাদারী বা প্রোফেশন্যাল দক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের কোনরূপ ট্রেনিং না দিয়ে সেবামূলক কাজে নিযুক্ত করা উচিত হবে না। অনেক ক্ষেত্রে এই মৌলিক-নীতিগুলি পালন করা হয় না বলে, সেবার নামে অনেকরকম অনিষ্টকর কাজ করা হয় এবং অর্থ ও জনশক্তির অপচয় ঘটে। সুতরাং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথ মেনে চলা উচিত।

সেবাকার্যের শিক্ষাগত মূল্য: এই সেবাকার্যের মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক। সমাজসেবার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী ও সমাজের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ নিবিড় হয়। এই যোগাযোগের ফলে শিক্ষার্থী সমাজকে এবং সমাজ শিক্ষার্থীকে ভালভাবে জানবার সুযোগ লাভ করে। সমাজসেবামূলক কার্যের মাধ্যমে

শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক জ্ঞান, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার জ্ঞান জন্মায়। অপর পক্ষে সমাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিমূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তোলে। সমাজের প্রতিটি স্তরের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীর মনের শ্রেণী-চেতনা দূরীভূত হয়। শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী সচেতন হয়ে ওঠে, তাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সেগুলি দূর করার উপায় সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই সামাজিক-সচেতনতার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী সমাজ তথা আপন দেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে।

সমাজসেবা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বিদ্যালয়কে স্থানীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে চেয়েছেন। পল্লীর বা নগরের স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ থাকবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ এমন হবে যার সমাধানে বিদ্যালয়ের সক্রিয় অংশ থাকবে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শিক্ষা কখনই জাতীয় প্রয়োজন ও স্থানীয় জনসাধারণের জীবন স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অর্থ-নৈতিক প্রয়োজন সমাজে মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে প্রভাবিত করে থাকে। কারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনই মানুষের জীবনের মূল ও সর্বজনীন প্রয়োজন। শিক্ষায়তনগুলিকে তাদের অস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে।'

গান্ধীজীর জীবন-দর্শন সমগ্রভাবে সেবামূলক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত বহুস্থানে প্রকাশ করেছেন। সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা বর্জন, মাদকদ্রব্য বর্জন, গ্রামের সাফাই আন্দোলন, বয়স্কদের শিক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, শিক্ষাদান প্রভৃতি গঠনমূলক কাজের কথা বলেছেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন, তারা অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িকতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করবে না। তারা অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র ও হরিজনদের সঙ্গে সত্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ অকস্মাৎ আহত বা অসুস্থ হলে তারা তাদের প্রাথমিক সেবা করবে। তারা গ্রামের ময়লা সাফাই করবে এবং শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

৩. নারী-শিক্ষা

সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। বৈদিক যুগে আমরা গার্গি, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদুষী নারীর উল্লেখ পাই। মুঘল যুগে নূরজাহান, জাহানারাও বিদুষী ছিলেন। তবে মধ্যযুগে এই নারী

শিক্ষার ধারাটি নানাভাবে ব্যাহত হয়। মধ্যযুগে পর্দা প্রথার জন্য মেয়েদের শিক্ষার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মিশনারীদের প্রচেষ্টা

আধুনিক নারী-শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল মিশনারীদের প্রচেষ্টায়। মিশনারীরাই প্রথমে এদেশে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রেভারেণ্ড মে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়াতে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে মেয়েরা নিজেরাই এগিয়ে আসতে পারে সেজন্য ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশনারীদের উদ্যোগে নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিলাত থেকে মিস এন. কুক ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে এসেই তিনি প্রথম বছরেই ৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব স্কুলে লেখা, পড়া, ইতিহাস, ভূগোল ও হাতের কাজ শেখানো হত। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের স্ত্রীদের প্রচেষ্টায় Ladies Society for Native Female Education নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২০ হাজার টাকার সাহায্যে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সেণ্ট্রাল স্কুল নামে মেয়েদের একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই স্কুলে শিক্ষিকাদের শিক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল।

এই সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও নারী-শিক্ষার প্রসার ঘটে। মাদ্রাজে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। বোম্বাইতে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। উত্তরপ্রদেশের বেনারস, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, বেরিলি প্রভৃতি স্থানেও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য মিশনারীরাই অগ্রণী ছিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তার এবং নারী শিক্ষার প্রতি তৎকালীন আধুনিক সমাজের আগ্রহ অবশ্য নারী-শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করেছিল। নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানও ছিল যথেষ্ট। রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মফঃস্বল অঞ্চলেও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ভারতে নারী-শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীরাই পথপ্রদর্শক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবুও নারী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবদান কম নয়। তাঁদের উদ্যোগে বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে পুনা আমেদাবাদ, বোম্বাইতে কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় Calcutta Female School বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন সাহেব এই বিদ্যালয়ের জন্য ১০ হাজার পাউণ্ড দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্কুলের নাম রাখা হয় বেথুন স্কুল। নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাও এই সময়ে উল্লেখযোগ্য।

উডের ডেস্‌প্যাচ

নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের যে কোন দায়িত্ব আছে, তা উডের ডেস্‌প্যাচের আগে স্বীকার করা হয়নি। এতদিন পর্যন্ত যা কিছু করা হয়েছে, সবই বেসরকারী উদ্যোগে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের ডেস্‌প্যাচেই নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্বের কথা স্বীকার করা হয়। ডেস্‌প্যাচে একথা বলা হয় যে, নারী-শিক্ষার প্রচার ওপ্রসার উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন আছে। এজন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময়ে ভারতে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাদ্রাজে ২৫৬, বোম্বাইয়ে ৬৫, বাংলায় ২৮৮, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৭টি। (উডের ডেস্‌প্যাচের পরিসংখ্যান অনুযায়ী।)

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হাণ্টার কমিশন ১৮৮২)

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নারী-শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। তাদের মতে ঐ সময়ে নারী-শিক্ষার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। নারী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে কমিশনের প্রস্তাব ছিল যে, এই সম্পর্কে জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন। এই কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার নারী-শিক্ষার জন্য আরও অধিক অর্থব্যয় করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সময়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেসরকারী স্তরে প্রভূত উৎসাহ দেখা দেয়। এই সময়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তবে ছাত্রীসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বাড়ে নি।

১৯০২ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ: এই সময়ে নারী-শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় মেয়েদের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই সময়ে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পিছনে ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় আন্দোলন সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে মেয়েরা নানারূপ বৃত্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি।

গান্ধীজীর সর্বোদয় আন্দোলন নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

নারী-শিক্ষা কমিশন

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভাপতিত্বে 'নারী-শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন:

১. কয়েক বছরের জন্য নারী-শিক্ষাকে একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

২. নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি উপদেষ্টা কমিটি নিযুক্ত করতে হবে।

৩. প্রতি রাজ্যে একজন মহিলাকে 'শিক্ষা অধিকর্তা' হিসাবে নিযুক্ত করতে হবে।

৪. বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের জন্য একই প্রকার পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে; কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মেয়েদের জন্য আলাদা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বয়স্ক মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে।

মুদালিয়র কমিশন

মুদালিয়র কমিশন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য পৃথক দুটি পাঠ্যক্রম চালু করার প্রস্তাব করেন। এ দুটি হল গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science) এবং চারুকলা (Fine Arts)। এ দুটি বিভাগ খোলার উদ্দেশ্য হল, মেয়েদের স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষার ঐচ্ছিক বিষয় ঠিক করা।

বর্তমানে অবশ্য কোঠারী কমিশন দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সাধারণ শিক্ষা দেবার সুপারিশ করেছেন। পরবর্তী দুই শ্রেণীতে অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিশেষ শিক্ষা দেবার সুপারিশ করেছেন।

উপরে আমরা নারী-শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারাটি আলোচনা করেছি। কিন্তু শিক্ষার একটি তাত্ত্বিক দিক আছে। মেয়েদের শিক্ষার ধরন কেমন হবে, উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত,—এই সকল বিষয় নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করি নি। এই সম্পর্কে আমরা দুজন ভারতীয় মনীষীর মন্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

গান্ধীজীর মতামতঃ গান্ধীজী লিখেছেন, 'পুরুষদের মত নারীদেরও শিক্ষা প্রয়োজন। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, নারীদের পুরুষদের ধরনের শিক্ষা দিতে হবে। পুরুষ ও নারী উভয়ে সমশ্রেণীর; তবে দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিক থেকে পরস্পরের হুবহু অনুরূপ নয়। পুরুষ ও নারী এক অনবদ্য যুগল ও একে অপরের পরিপূরক। একে অপরকে সাহায্য করে বলে একজন বিনা অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।...বিবাহিত দম্পতির মধ্যে পুরুষের উপর থাকে বাইরের দায়িত্ব, সুতরাং এক্ষেত্রে পুরুষের অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে গৃহস্থালির ভিতর নারীর একচ্ছত্র আধিপত্য। অতএব গৃহস্থালির ব্যাপারে ও শিশুপালন এবং তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নারীর অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানকে অবশ্য পরস্পর সম্পর্করহিত ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বিভক্ত করার কথা বলা হচ্ছে না। একথাও বলা হচ্ছে না যে, জ্ঞান-রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ কারও কাছে

অনধিগম্য থাকবে। তবে পূর্বোক্ত মৌলিক নীতি অনুসরণে পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাক্রম নির্ধারিত না হলে নর বা নারীর জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতামত: 'যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা। তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয় জানিবার জন্যই।'

'মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এই জন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানব প্রকৃতিকেই দুর্বল করি।'

'বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন। এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল মাস্টার কিংবা টেকস্‌ট বুক কমিটি তাহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি কান্ট-হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর ছাই করিবে না।'

তবে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষা প্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কিছু পার্থক্য থাকা উচিত। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা জানিতে দোষ কী।'

৪. জাতীয় সংহতি

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। কিন্তু ভারতীয় দেশাত্মবোধের উদ্বোধন নানাবিধ জটিল জাতীয় সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। এই কারণে শিক্ষা কিভাবে এই জাতীয় সংহতিবোধের উদ্বোধন করতে পারে তার আগে আমাদের উচিত ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ধারাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা।

বহু সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ বহু গোষ্ঠী, বহু ভূখণ্ড, বহু ধর্ম ও বহু স্বার্থের দ্বারা বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে-কলহে লিপ্ত ছিল। প্রথমে দেখা যায়, অশোক ও

হর্ষবর্ধন ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। অনুরূপ চেষ্টা দেখি আকবর ও ঔরঙ্গজীবের সময়। কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের সকলের মাতৃভূমি, আমরা সবাই ভারতবাসী, এই বোধ তখনও জাগ্রত হয় নি। তার কারণ বোধ হয় ভারতবাসীর প্রকৃত শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল না। ইংরেজের অধীনে এক প্রবল কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা শাসিত হয়ে একই আইন ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার অধীন হয়ে সমগ্র দেশে একটি ঐক্যবোধ দেখা দেয়। কিন্তু এই ঐক্যবোধের মধ্যে গভীরতার অভাব ছিল; কারণ দেশে তখনও শিক্ষাচেতনা জন্মায় নি।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনারও বিকাশ হয় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে—ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড দেশ ও আমরা ভারতবাসী একটি অখণ্ড জাতি। এই জাতীয়তাবোধের ফলে ভারতবাসীর মনে যে অসন্তোষ জন্মে তার প্রথম প্রকাশ হয় সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। তারপরে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি, স্বদেশী আন্দোলন ও সর্বশেষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন বিদেশী শাসকদের বাধ্য করে এই দেশ ত্যাগ করতে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দিন। এইদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সেদিনই বোধ হয় আমরা প্রথম অনুভব করলাম, বাঙালী, আসামী, উড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠী, সিন্ধি—আমাদের বহু পার্থক্য থাকলেও আমরা সকলেই ভারতবাসী, আমরা সকলেই এক জাতি। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্ম-বোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দেশের সকল মানুষের মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি ও প্রত্যয় যে আমরা সকলে এক।

জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে এই যে প্রত্যয় বা অনুভূতি এর পেছনে রয়েছে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব। ভারতবর্ষের বিদেশী শাসকেরা নিশ্চয়ই এ অবস্থার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন নি; কারণ পরবর্তী কালে ইংরাজ শাসকেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনকে—A great political miscalculation, বলে বর্ণনা করেছেন।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। কিন্তু প্রত্যেক দেশের সমাজব্যবস্থায় এমন কতক-গুলি পরস্পরবিরোধী স্বার্থ কাজ করে যে, ব্রিটিশ শাসনকালের ঐক্যবোধ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রাদেশিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে।

শিক্ষা কিভাবে জাতীয় সংহতি আনতে পারে তা আলোচনা করার পূর্বে আমাদের আলোচনা করার দরকার আমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ মনোভাব এই সংহতির বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করছে। সেগুলি হল:

১. **রাজ্যগত বিরোধ:** ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সাধারণত ভাষার ভিত্তিতে এই রাজ্যগুলি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ এক দেশ হওয়ায় অন্য

ভাষাভাষী বহু লোক প্রত্যেক রাজ্যেই রয়ে গিয়েছে। ভাষায় ভিত্তিতে রাজ্যগুলি বিভক্ত হওয়ায় ভাষার স্বার্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমানা নিয়ে, নদীর জল নিয়ে, সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। যেমন, কাবেরী নদীর জল নিয়ে তামিলনাড়ু ও মহীশূরের মধ্যে বিরোধ।

২. **ভাষাগত বিরোধ :** নিজের মাতৃভাষাকে সকলেই ভালবাসে। ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী দেশ। ভাষার প্রাধান্য নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু সংঘাত দেখা যাচ্ছে। ভাষাগত বিরোধের একটি বিশেষ দিক হল, এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে পারে। ভাষাগত বিরোধের তাৎপর্য বোঝবার জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ১৪টি প্রধান ভাষা ছাড়াও ভারতে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর লোকেরা প্রায় ৩০০-এর বেশি ভাষায় কথা বলে। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ) ভাষা নিয়ে সংঘর্ষ ঘটার ফলেই বর্তমানে পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

৩. **ধর্মগত বিরোধ :** জাতীয় সংহতির সবচেয়ে বড় শত্রু হল ধর্মগত বিরোধ। সবদেশেই মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজেও ধর্মের প্রভাব প্রাচীনকালের তুলনায় একটুও কমে নি। ইংল্যাণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের দ্বন্দ্ব আজও চলছে। ভারতের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা হল চরমতম অভিশাপ। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের ফলে জাতীয় অগ্রগতি নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। ফল—দেশবিভাগ ও পাকিস্তানের সৃষ্টি।'

৪. **অর্থনৈতিক বিরোধ :** অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ দেখা দেয় এবং জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে পারে। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে বিত্তঘটিত বৈষম্যের জন্য শ্রেণীসংগ্রাম খুব তীব্র ও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরূপ বৈষম্য জাতীয় সংহতির বিশেষ পরিপন্থী।

৫. **রাজনৈতিক বিরোধ :** বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে সংঘাত দেখা দেয় সেগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদই সবচেয়ে তীব্র। এই রাজনৈতিক মত বিরোধের ফলেই আজ জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংঘাত একটি রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কারণে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন যে রাজনৈতিক বিরোধও জাতীয় সংহতির পরিপন্থী।

জাতীয় সংহতি বোধ ও শিক্ষা

জাতির গঠন ও সমৃদ্ধি সাধন দুইই সম্পূর্ণ নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষার উপর। প্রকৃত শিক্ষাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে সংঘাতের যে কারণ থাকে তাকে দূর করে জাতিকে বাঁচাতে পারে। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু যে মন্তব্য করেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভ করে

ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সংহতি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ভাবগত সংহতি অত্যাবশ্যক তা থেকে আমরা অনেক দূরে রয়ে গেছি। প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আন্তরিকভাবে সাহসের সঙ্গে জাতীয় সংহতি বিধানের চেষ্টা করতে হবে।

জাতীয় সংহতি ও ভাবগত ঐক্য কিভাবে সাধিত হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অন্যান্য বহু ব্যবস্থার মধ্যে একটি ছিল এই সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করা, এই কমিটি তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে দেশের সামনে সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হল কি করে 'জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় মন সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা কতকগুলি পথ নির্দেশ করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হিসাবে সাহসের সঙ্গে ও আন্তরিকতার সঙ্গে পুনর্গঠন করা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে, এই দেশ আমাদের, এই দেশের্য উন্নতি অবনতির সঙ্গে আমাদের সকলের কল্যাণ-অকল্যাণ যুক্ত। শিক্ষার মধ দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনে এই ধারণাও সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে যে, এই ভাবগত সংহতি বিধানের জন্য আমাদের প্রত্যেককে কাজ করতে হবে, স্বার্থত্যাগ করতে হবে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস সংশোধন করতে হবে।)

জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় সংহতি

জাতীয় সংহতি বিধানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে কি দাযিত্ব আছে সে বিষয়ে মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারী কমিশন কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তবে এ সম্পর্কে জাতীয় ও প্রাক্ষোভিক সংহতি বিধায়ক কমিটি যে সুপারিশগুলি করেছেন সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ হল উচ্চতর মানসিক ভাব বা সেন্টিমেন্ট। এই ভাব বা ধারণা উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন যে, দেশের শিশুদের মনে এই ভাব সঠিকভাবে বিকশিত করার জন্য দরকার সুশিক্ষার। জাতীয় সংহতি বিধায়ক কমিটি জাতীয় সংহতি বিধানের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি করেছেন। প্রথমত, তাঁরা মনে করেন, শিক্ষার্থীদের মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ বিকাশের জন্য দরকার নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক, যার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে। দ্বিতীয়ত, পাঠ্যপুস্তক থেকে সংকীর্ণ ধর্মমত, প্রাদেশিকতা, অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বিসর্জন দিতে হবে। তৃতীয়ত, পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের সাধনা বা বহুর মধ্যে ঐক্যের সাধনা' এই বাণীটি সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে।

চতুর্থত, ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা জাতীয় ঐক্য ও মর্যাদার প্রতীক। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকার প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। শপথের বাণীটি এইরূপ: 'ভারতবর্ষ আমার দেশ, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভ্রাতা ও ভগিনী এবং আমি ভারতের বিচিত্র ও অপরিমেয় সম্পদের জন্য গর্বিত। আমি যাতে এই গৌরবময় ঐতিহ্যের উপযুক্ত হতে পারি সেজন্য আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।'

পঞ্চমত, আলোচনা, অভিনয় ও সিনেমার ভিতর দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সাহিত্য, শিল্প, লোকগাথা, বিভিন্ন রীতিনীতি, বিভিন্ন ধর্মের উদার মানব প্রেমের ভাবগুলি ছাত্রদের সামনে জীবন্ত করে তুলতে হবে।

ষষ্ঠত, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন, ভ্রমণ প্রভৃতির দ্বারা জাতীয় প্রাচীন কীর্তি, পর্বত, নদী ইত্যাদি সুন্দর প্রাকৃতির দৃশ্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করাতে হবে।

জাতীয় সংহতিবিধায়ক কমিটি আরো প্রস্তাব করেছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় করতে হবে। এর দ্বারা ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হবে এবং ভাবসংহতির কাজ সহজ হবে। বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত কোঠারী কমিশনও এই সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান ও বাস্তব উপায় নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হল সকলের জন্য একই শ্রেণীর বিদ্যালয় অর্থাৎ Common School System প্রবর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন সমাজ ও জাতীয় সেবার কাজ করতে হবে। তৃতীয়ত, দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাকে সমান যত্নের সঙ্গে বিকাশ ও বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে। সর্বপ্রযত্নে জাতীয় চেতনা উন্মেষের চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করে আমাদের গৌরবময় উত্তরাধিকার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, জাতীয় সংহতি বোধের সহায়ক হিসাবে শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কখনই সম্পূর্ণ হবে না যদি না এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হয়।

৫. ব্যক্তীয় দক্ষতার বিকাশ

ভারত আজ স্বাধীন। আজ শিক্ষার প্রধান কাজ ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ থেকে অনেকগুলি গুণ দাবি করে। নাগরিকদের অভ্যাস, মনোভাব, চারিত্রিক গুণ এরূপ হবে যে, এগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী জন্মাতে পারে। এটি একমাত্র দিতে পারে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। বিভিন্ন সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও ভারত একটি দরিদ্র দেশ। ভারতের জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ আর্থিক দিক থেকে অমনুষ্যজনোচিত জীবন যাপন করে। এ কারণে বর্তমানে ভারতের একটি প্রধান সমস্যা হল জনসাধারণের অর্থনৈতিক উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে না পারলে জাতীয় দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপক ও গভীর দারিদ্র্যের কারণে দেশে শিক্ষার সুযোগ দুঃখজনকভাবে সীমিত এবং জনসাধারণের একটি প্রধান অংশ দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের চাপে এত দূর ব্যস্ত থাকে যে তাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক কাজে মনঃসংযোগ করা আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যে, এর মাধ্যমে দেশে যেন একটা সাংস্কৃতিক জাগরণ আরম্ভ হতে পারে।

শিক্ষার কাজ বৃত্তিগত দক্ষতার উন্নতি সাধন

শিক্ষার একটি প্রধান দায়িত্ব হল দেশের বৃত্তীয় দক্ষতার উন্নতি সাধন করা। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন যে, শিক্ষা দেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করবে যার ফলে আমাদের উৎপাদন-ক্ষমতা, যান্ত্রিক-দক্ষতা ও বৃত্তীয় দক্ষতার (vocational efficiency) বিকাশ হতে পারে। বৃত্তীয় দক্ষতার উন্নতির অর্থ এই নয় যে, এর সাহায্যে কাজ সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হবে; এর প্রকৃত অর্থ হল, কাজ যে ধরনের হোক না কেন, সেই সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধার ভাব জন্মানো, এবং কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনে দৃঢ় ইচ্ছা সৃষ্টি করা। এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের মনে এই মনোভাব সৃষ্টি করা যে, ব্যক্তির পূর্ণতা লাভ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি একমাত্র কাজের মাধ্যমেই সম্ভব। তাদের মনে এই বিশ্বাসও জাগাতে হবে যে, শিক্ষিত মানুষ যখন কোন কাজের ভার গ্রহণ করবে, তা যেন তারা যোগ্যতার সঙ্গে, নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদনে সক্ষম হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এই মনোভাব সৃষ্টি বিদ্যালয়ের একটি প্রধান দায়িত্ব এবং শিক্ষকেরা যেন বিদ্যালয়ের সকল কাজের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের মনে এই মনোভাব জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কাজ সম্পর্কে যে মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে তা হল এই যে, তারা সকল কর্মে যেন নিজেদের নিকট চরম শ্রেষ্ঠতা বা পরোৎকর্ষ (Perfection) দাবি করে এবং তাদের উপর ন্যস্ত সকল কাজই যেন তারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মনোভাব লাভ করে। শিক্ষকদেরও উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের অযোগ্য কার্যগুলিকে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করা, তবে এই সমালোচনা যেন সহানুভূতি মিশ্রিত হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের প্রতি সুষ্ঠু মনোভাব তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার প্রতি স্তরে তাদের যান্ত্রিক-দক্ষতা এবং সাধারণ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে

সাহায্য করা। এর ফলে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন ও যান্ত্রিক উন্নতিতে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত কর্মী পাওয়া সম্ভব হবে।

পূর্বে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, কোনরূপ ব্যবহারিক, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা ছিল পুস্তককেন্দ্রিক, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্করহিত। এ কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে জাতীয় অর্থনীতি ও শিল্পোন্নয়নে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয় নি। মুদালিয়র কমিশন তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন যে, এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার এবং ব্যবহারিক কাজের উপর অধিক জোর প্রদান করা উচিত।

কোঠারী কমিশন ছাত্রদের বৃত্তীয় যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অনেকগুলি সুপারিশ করেছেন। প্রথমত, সমগ্র বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা যেন বিজ্ঞানভিত্তিক হয়। কারণ, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজকের জগতে বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া আমাদের এক পাও অগ্রসর হবার সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান হবে একমুখী এবং জীবনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ হবে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, স্কুল শিক্ষার প্রতি-স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মশিক্ষার (Work education) ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ একমাত্র জ্ঞানমুখী বা পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চারটি বিষয়ের বা চারটি H এর ট্রেনিং দরকার ; এই চারটি বিষয় হল মস্তিষ্ক (Head), হৃদয় (Heart), হস্ত (Hand) ও স্বাস্থ্য (Health)। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমাদের চাই মস্তিষ্কের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, হাতের কাজের নিপুণতা বৃদ্ধি, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি শিক্ষা। কোঠারী কমিশন এই কারণে সাধারণ জ্ঞানমুখী শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব শিক্ষা বা ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেছেন এবং সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দানের কথা বলেছেন।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎপাদন যোগ্যতা

শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন-ক্ষমতার যোগ খুব নিবিড়। শিক্ষাকে আজ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এটি সম্ভব হতে পারে যদি শিক্ষার প্রতি স্তরে কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে যোগ করা হয়। গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ বা একটি শিল্পের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার অনুবন্ধ স্থাপন করেছিলেন। কাজের সঙ্গে শিক্ষার যদি যোগসূত্র স্থাপন করা যায়, তাহলে দেশের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতারও প্রসার হবে এবং এর ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আবার জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জন্য অধিকতর ব্যয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কোঠারী কমিশন বলেছেন, শিক্ষা ও উৎপাদন-ক্ষমতা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, একটির উন্নতির সঙ্গে অন্যটির উন্নতি যুক্ত এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উৎপাদন-ক্ষমতা ও শিক্ষার পারস্পরিক

সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায়, যদি আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা নিম্নলিখি কার্যক্রম গ্রহণ করি। যথা—

১. আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ।

২. সাধারণ শিক্ষার একটি অংশ হিসাবে 'কর্ম অভিজ্ঞতা' শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

৩. শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, কৃষি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজ অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী (Vocationalization) করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান, যান্ত্রিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থ করা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি মূল বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থ করা ঃ আধুনিক সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রি বিদ্যার বিস্তার এবং ঐ বিদ্যা কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণে প্রয়োগ অনগ্রসর সমাজে শিল্পের উৎপাদন নির্ভরশীল ছিল কর্মীদের নিপুণতা ও অভিজ্ঞতা উপর। কর্মীরা এই নিপুণতা লাভ করতো প্রচেষ্টা ও ভুলতত্ত্বের মাধ্যমে। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সম্ভবত, প্রথমে বিজলী শিল্প বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে; পরবর্তী স্তরে আসে রসায়ন শিল্পের পালা বর্তমানে উন্নতিশীল দেশে কৃষি শিল্প দ্রুত বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং বিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক শাখা হিসাবে বিস্তার লাভ করছে আধুনিক জগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার আন্তঃনির্ভরতা বর্তমান দশকে অনেক দেশের জাতীয় গড় উৎপাদন (G.N.P.) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের সাহায্যে। আধুনিক দেশসমূহ বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা বা টেকনোলজি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। আমাদের দেশেও আমরা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের কথা চিন্তা করছি। সুতরাং বিজ্ঞানের শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের একটি প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান বিষয়টি কেবলমাত্র বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে না। এটি অন্য বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদেরও অবশ্য পাঠ্য বিষয় হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর মনে অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, পরীক্ষণ, সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টাকে জাগ্রত করা। বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করা এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ও সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা।

কর্ম-অভিজ্ঞতা

কোঠারী কমিশনের দ্বিতীয় সুপারিশ হল, বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যতম বিষয় হিসাবে 'কর্ম-অভিজ্ঞতা'কে যুক্ত করা। তাহলে শিক্ষাকে জীবন ও উৎপাদন শক্তির সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতাকে কেবলমাত্র বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে

যুক্ত করা হবে না, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গেও একে যুক্ত করতে হবে। এখন এই কর্ম অভিজ্ঞতা বিষয়টি কি? কোঠারী কমিশন কর্ম-অভিজ্ঞতার সংজ্ঞাটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

'বিদ্যালয়ে, গৃহে, কর্মশালায়, কৃষি-খামারে, কল-কারখানায় অথবা যে কোন প্রতিষ্ঠানে যেখানে কিছু না কিছু প্রস্তুত হয়, সেখানে কোন গঠনমূলক বা সৃষ্টিমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষালাভকে বলে **কর্ম-অভিজ্ঞতা**।'

কর্ম-অভিজ্ঞতা হল এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে কাজকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটি একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা এতে সন্দেহ নেই। কারণ যে সমস্ত আধুনিক দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরী জ্ঞানকে সামাজিক উন্নতির উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাদের বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। যে সমস্ত সমাজে প্রাচীন প্রথায় উৎপাদনের কাজ চলে, সেখানে কাজ ও শিক্ষার মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ ঐরূপ সমাজে উৎপাদন প্রণালী অত্যন্ত সরল ধরনের এবং উৎপাদনে উন্নতির জন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আরও একটি কারণ এই যে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কাজগুলি প্রধানত শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, পারিশ্রমিক খুব অল্প, কাজগুলি একঘেয়ে এবং কাজে নিযুক্ত কর্মীরা প্রায় সকলেই আসে দরিদ্র শ্রেণী থেকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিপরীত বিষয়টি দেখা যায়। শিক্ষা এখানে উচ্চ শ্রেণীর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ঐ শ্রেণীর জীবন দর্শনও পৃথক। তাদের শিক্ষা প্রধানত জীবিকার জন্য নয়, তাদের শিক্ষা জীবনকে উপভোগ করবার জন্য। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বাস করে সমাজের অন্যদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরভোজী উদ্ভিদের মত।

কিন্তু আধুনিক দেশ তাদের শিল্পোন্নয়নে ব্যবহার করে আধুনিক জটিল যন্ত্রপাতি। জটিল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য সমাজকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হয়। উচ্চতর যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তাদের দরকার হয় এ সম্পর্কে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা। আধুনিক শিল্পে নিম্নস্তরে যে সকল ব্যক্তি কাজ করে সেখানেও দরকার বুদ্ধি-শক্তি, প্রাচীন ব্যবস্থার মত সেখানে কেবলমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারা তেমন কাজ চলে না।

কর্ম-অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে নতুন কিছুই নেই। জন্মের পর থেকেই শিশুকে নানা খেলা ও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। শিশু খেলাধুলা করে, জিনিসপত্র গড়তে, ভাঙতে ভালবাসে। প্রথম জীবনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দক্ষতা কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই লাভ করে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় একমাত্র পুঁথির শিক্ষাকেই শিক্ষা হিসাবে ধরা হয়। শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা হয় একটি কৃত্রিম পরিবেশ এবং শিশুদের এমন সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যার সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনের কোন মিল নেই। মানুষ কেবলমাত্র ভাবের রাজ্যে বাস করে না, মানুষের আছে একটি জীবিকার রাজ্য বা

কাজের রাজ্য (World of work)। ভাবের রাজ্য ও কাজের রাজ্য এই দুই রাজ্যেই মানুষের বিচরণ। শুধু মাত্র জীবিকার রাজ্যে বাস করেও শিক্ষিত মানুষের চলে না। সার্থক জীবনযাত্রা নির্ভর করে এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কোঠারী কমিশন মনে করেন মানুষকে সার্থক জীবনের জন্য এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের শিক্ষা দিতে হবে।

কর্ম-অভিজ্ঞতা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে কর্মের যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি হবে একটি আবশ্যিক বিষয়। কারণ যে সমস্ত আধুনিক দেশ বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প ব্যবস্থা চালু করতে চায়, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রচলন ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এই ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের দুটি সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রথমত, আমাদের সমাজব্যবস্থায় কাজের সঙ্গে শিক্ষার একটি কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করে যে জাতিভেদ বজায় রাখা হয়েছে, এই ব্যবস্থা তা দূর করতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির উপযোগী করবার জন্য প্রথম থেকেই 'কর্ম-অভিজ্ঞতা' প্রদানের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। অনেকে কর্ম-অভিজ্ঞতাকে বলেন হাতের কাজ। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা নতুন নয়। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় শিষ্যকে গুরুগৃহে বহু প্রকারের কাজ করতে হত। সমিধ আহরণ, গোধনপালন, কৃষিকার্যে সাহায্য প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ শিষ্যদের অবশ্য করণীয় ছিল। বর্তমান যুগে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা, জাতির জনক, মহাত্মা গান্ধী তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার যে অভিনব পরিকল্পনা করেছিলেন, তা অন্যদেশে সার্থকভাবে চালু করলেও নানা কারণে আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি নি।

আমাদের শিক্ষালয়ে 'কর্ম-অভিজ্ঞতা' শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমত, এটি আমাদের সমাজে হাতের কাজ সম্পর্কে বর্তমান ধারণার পরিবর্তন আনতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

গান্ধীজী আশা করেছিলেন তাঁর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা যে শিল্প প্রস্তুত করবে, তা বাজারে বিক্রি করে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারবে। নতুন কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষা পরিকল্পনায় অনুরূপভাবে আশা করা যায়, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে ছাত্রদের আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রবর্তনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা আয় ও শিক্ষা (Earn and learn)-কে একসঙ্গে যুক্ত করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'হাতের কাজ' সম্পর্কে একটি মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে। তখন তারা হাতের কাজকে একটি উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সঙ্গে যোগ করতে উৎসাহী হবে।

বৃত্তিমুখীনতা

অন্য একটি ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষাকে জাতীয় উৎপাদন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিমুখীন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার স্তরে কৃষি ও যান্ত্রিক শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া। এতকাল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের তরুণ-তরুণীরা শ্বেতকলার যুক্ত বৃত্তির (White collard profession) জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই বিষয়টি লক্ষ্য করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে এরূপ ভাবে পুনর্গঠন করতে বললেন যে, শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু তখন ঐ সুপারিশের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের অধিকাংশ ছাত্রই কোন না কোন কোর্স গ্রহণ করে; ঐগুলি মুখ্যত সাহিত্যমুখী (Literary)। বর্তমানেও ঐ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কর্ম-অভিজ্ঞতা

কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা উচিত শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী। কোঠারী কমিশন মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীগুলিতে **হাতের কাজ** শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কর্ম-অভিজ্ঞতা দানের প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। নিম্ন প্রাথমিক স্তরে হাতের কাজ শেখানোর উদ্দেশ্য হল হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটানো।

প্রাথমিক বিদ্যালযের উচ্চশ্রেণীগুলিতে কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিতে হবে একটি শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে। এই স্তরে শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর যান্ত্রিক বা কারিগরী বিষয় সংক্রান্ত সুষ্ঠু চিন্তার সুযোগ দেওয়া এবং তাদের গঠনমূলক ক্ষমতার উন্নযন। এই স্তরে অবশ্য স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বাস্তব শিল্প বিষযেও ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে। যেমন, তারা কৃষিকার্যের ধারা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অর্থাৎ কিভাবে বিভিন্ন শস্য জমিতে চাষ করা হয়, কিভাবে শস্যাদি সংগ্রহ করা হয় এবং অঞ্চলটিতে কোন্ কুটির শিল্প কিভাবে প্রস্তুত করা হয়, ঐগুলি তারা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। যে সকল বিদ্যালয়ে কর্মশালার (Workshop) ব্যবস্থা আছে, সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মশালায় নানা কাজ করবার সুযোগ পেতে পারে।

উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে কর্ম-অভিজ্ঞতা শিক্ষা দিতে হবে বিদ্যালয় কর্মশালায়, নিকটবর্তী কৃষিফার্মগুলিতে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। কর্ম-অভিজ্ঞতা কার্যক্রম চালু করবার সময়ে একটি কথা সবিশেষ মনে রাখতে হবে স্থানীয বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে

কর্ম-অভিজ্ঞতা প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। ঐ সম্পর্কে খরচের দিকটিও মনে রাখতে হবে।

কর্ম-অভিজ্ঞতা ও বুনিয়াদী শিক্ষা

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে 'কর্ম-অভিজ্ঞতা' শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির অনেক মিল দেখা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং এর ফলে শিক্ষার্থী একটি সুষ্ঠু কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। তবে শিল্পটি যে সাধারণত বুনিয়াদী শিক্ষায় নির্বাচন করা হয় তা একটি কুটির শিল্প এবং একান্তভাবে গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী। যদি বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিটিকে পরিবর্তিত করে আধুনিক শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজের উপযোগী করে পুনর্গঠন করা যায়, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সঠিকভাবে আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের উপযোগী করা যায়।

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে কৃষি শিল্পকে একটি উৎপাদনশীল শিল্প হিসাবে সঠিকভাবে গ্রহণ করা যায়। তবে যেখানে বিদ্যালযে কর্মশালা আছে সেখানে আধুনিক যন্ত্র-অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত। তবে যেখানে বিদ্যালয়ে কর্মশালার সুযোগ নেই সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ অবশ্যই তাদের দিতে হবে। শহর অঞ্চলেও সম্ভব ক্ষেত্রে 'উদ্যান-নির্মাণ' প্রকল্পটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক কৃষিকাজের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে।

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ

গান্ধীজী একস্থানে লিখেছেন, 'মানুষের জন্ম হয়েছে কাজ করবার জন্য। কাজ ছাড়া মানুষের বাঁচবার কোন উপায় নেই। যত রকম কাজ আছে তার মধ্যে মানুষের জীবিকা অর্জনের সঙ্গে যে কাজ যুক্ত সেই কাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকা অর্জন করতেই হবে।' সেই জন্য আমরা দেখি, গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষাকে একটি উৎপাদনশীল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন।

বৃত্তিগত যোগ্যতা বিকাশের ধারা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ব্যক্তির বৃত্তিগত যোগ্যতা বিকাশের ধারা কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা—

[ক] শিক্ষাগত যোগ্যতা, [খ] সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ, [গ] মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, যথা—বুদ্ধি (Intelligence), প্রবণতা (Aptitude), মনোভাব (Attitudes), ব্যক্তিত্ব (Personality), [ঘ] শারীরিক যোগ্যতা—উচ্চতা, স্বাস্থ্য, চোখ, কান প্রভৃতির তীক্ষ্ণতা।

ক. শিক্ষাগত যোগ্যতা: বর্তমান যুগ বিজ্ঞান-নির্ভর। বর্তমান যুগে কৃষি-ক্ষেত্রেই হোক বা শিল্প-কারখানাই হোক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ সর্বত্র দেখা

যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শিক্ষিত বেকারদের তুলনায় অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বেশি। আবার শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে দেখা যায় যে, যারা কোনরূপ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী নয়, তারাই অধিক সংখ্যায় বেকার থাকে। দেশে শিল্পায়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে, ঐ প্রচেষ্টায় যে সব বিশেষ ধরনের শিক্ষা দরকার দেশের যুবক সমাজের মধ্যে যারা ঐ সকল প্রয়োজনীয় কাজের শিক্ষা লাভ করেছে, তাদের কাজ পাবার সুযোগ বেশি থাকে।

ভারতের বৃত্তিগত পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যক্তি যারা অক্ষর-পরিচয়হীন—তারা দুইরকম কাজে নিযুক্ত থাকে। এদের বেশির ভাগ চাষী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্রাচীনকালের নিয়ম অনুযায়ী এরা কাঠের লাঙল দিয়ে চাষ করে থাকে। সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতি অনেকেরই জানা থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা যাদের গ্রামে উপযুক্ত চাষের জমির অভাব, তারা শহরে আসে কলকারখানায় অশিক্ষিত শ্রমিক হিসাবে কাজ করবার জন্য।

খ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ: শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই নতুন বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার যদি অভাব থাকে তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন কাজে লাগে না। এই কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থানীয়ভাবে বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে সুবিধা হতে পারে।

গ. মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন। সকলের পক্ষে সবরকমের কাজ করা সম্ভব হয় না। বৃত্তি নির্বাচনে যেমন পারম্পরিক ঐতিহ্য প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি ব্যক্তির বুদ্ধি, প্রবণতা, মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের ধরন বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করে।

ঘ. শারীরিক যোগ্যতা: ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা অনুযায়ীও বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগের সুযোগ থাকে। কল-কারখানায় বিভিন্ন কাজে উচ্চমানের শারীরিক যোগ্যতা প্রয়োজন। যেমন লৌহ কারখানায় ব্লাস্ট ফারনেসের অত্যধিক উত্তাপে যে ধরনের উচ্চমানের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন, মেসিন টুল ফ্যাক্টরীতে হয়তো তেমন হয় না। ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির মান, সাধারণ শারীরিক যোগ্যতা প্রভৃতি বিচার করা হয়, বিভিন্ন বৃত্তিতে কর্মী নির্বাচনে। যেমন, রেলওয়েতে গার্ড প্রভৃতি বৃত্তিতে কর্মপ্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং যে সকল ব্যক্তি বর্ণান্ধ তারা কোনভাবেই এই কাজের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয় না।

বৃত্তির বিবর্তন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তির প্রকৃতি ও ধরনের নানা বিবর্তন হচ্ছে। যেমন, আদিমকালে মানুষ ছিল অসভ্য বনচারী, তখন জীবজন্তু শিকার করে তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। তখন মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত।

পরে সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃষিকাজ করতে শিখল এবং তখন তাদের মধ্যে বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টাও দেখা দিল। এই সময়ে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নানাবিধ শিল্পকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করল, নানাবিধ শিল্প সৃষ্টি করতে শখল। তারা শিখল কাপড় বুনতে, নানাবিধ মাটি ও ধাতুর পাত্র তৈয়ারি করতে। মানুষের জীবনধারা বোধ হয় মোটামুটি একটানা বয়ে চলতো যদি না মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার করতে শিখতো। ইতিহাসে এই যুগকে বলে **শিল্প বিপ্লবের যুগ** (Age of Industrial Revolution)। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল। স্টীম ইন্‌জিন আবিষ্কারের পর মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা যে পর্যায়ে উন্নতি লাভ করেছিল, বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর থেকে তা আরও উন্নততর হল এবং বর্তমানে আণবিক শক্তি আবিষ্কার করে মানুষ যেমন চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, তেমনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত করে সুস্থ, সবল জীবন যাপনের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের উৎপাদন প্রতিভার উন্নয়ন মানুষকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী নানাবিধ বৃত্তির সুযোগ খুলে দিয়েছে।

পূর্বে আমরা ভারত-রাষ্ট্রের নানাবিধ বৃত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। তা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যতোই আমরা আমাদের শিল্পোন্নয়নে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে পারবো এবং আধুনিক শক্তি সূত্রকে (Sources of energy) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারবো, ততই আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে এবং বিভিন্ন বৃত্তির দ্বার আমাদের দেশের নরনারীদের সামনে খুলে যাবে।

প্রথম পত্র / ব্যবহারিক অংশ

শিক্ষা-অনুসন্ধান বা সার্ভে

১

শিক্ষা-অনুসন্ধান বা সার্ভে কাকে বলে ? শিক্ষা-অনুসন্ধান একটি আধুনিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষাবিষয়ক নানাবিধ উপাত্ত (Data) সংগ্রহ করা হয়, যেগুলির ভিত্তিতে ঐ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

শিক্ষা সার্ভে একক কাজ নয়। একাধিক ব্যক্তির সমবায়ে একটি সার্ভে কমিটি গঠন করা হয় এবং যে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা হবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মনে করা যাক, সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি, স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করে বা মনোনীত করে একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে যে বিবরণ দরকার সেগুলি নিয়ে একটি প্রশ্নতালিকা প্রস্তুত করবে। পরে ঐ প্রশ্নতালিকা অনুযায়ী স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষক, সরকারের আদমশুমার বিভাগ, মিউনিসিপ্যালিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে প্রশ্নতালিকা অনুযায়ী বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

মনে করা যাক, A একটি অঞ্চল। A অঞ্চলটিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হল। স্থানীয় অঞ্চলটি বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার কি কি সুযোগ-সুবিধা আছে, মোট সংখ্যার কত জন বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে কত টাকা ব্যয় হচ্ছে, কতজন অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করে শিক্ষাবিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। এখানে একটি প্রশ্ন তালিকার নমুনা উল্লেখ করা হল।

প্রশ্ন-তালিকা

১. অঞ্চলটির মোট ক্ষেত্রফল কত ?

২. অঞ্চলটিতে মোট লোকসংখ্যা কত ?

৩. জনসংখ্যার কতজন পুরুষ, কতজন স্ত্রীলোক ?

৪. বিদ্যালয়ে পড়বার উপযুক্ত বালক-বালিকার সংখ্যা কত ?

৫. স্থানীয় ব্যক্তিদের জীবিকা সম্পর্কে অনুসন্ধান।

জীবিকা	মোট সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা হার	মন্তব্য
[ক] কৃষিকার্য	...	...	
[খ] ছোট দোকানদার	...	...	
[গ] দিনমজুর	...		
[ঘ] চাকুরি	...	...	
[ঙ] বিভিন্ন পারিবারিক ব্যবসা [ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, জেলে ইত্যাদি]	...	...	
[চ] বিবিধ	..	...	

৬ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা	বয়স স্তর	বর্তমানে যারা স্কুলে যায় তাদের সংখ্যা ও শতকরা হার	বর্তমানে যারা স্কুলে যায় না তাদের সংখ্যা ও শতকরা হার	মন্তব্য
I প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর	১—৩ ব. ৫	—	—	
II প্রাক্ প্রাথমিক স্তর	৩— ৫	—	—	
III প্রাথমিক স্তর	৬— ১০	—	—	
IV মাধ্যমিক স্তর	১১— ১৬	—	—	
V উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	১৭— ১৮	-	—	
VI কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর	১৯— ২১	—	- -	
	২২— ২৩	- -	- -	

শিক্ষা বিষয়ক সার্ভেকে সাধারণত **তিনটি ভাগে** ভাগ করা হয়। যথা —

১. **আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে** অনুসন্ধান,

২. **শিশুদের সম্পর্কে অনুসন্ধান** এবং

৩. **অর্থনৈতিক বিষয়ে অনুসন্ধান।**

আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য

কোন অঞ্চলের শিক্ষা বিষয়ক সার্ভের প্রথম কাজ হল স্থানীয় সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুসন্ধান। সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষার উন্নতির প্রশ্ন জড়িত। আমাদের মনে রাখা দরকার, প্রত্যেকটি কম্যুনিটি বা সামাজিক গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেন আরও পাঁচটি সামাজিক গোষ্ঠীর মত। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এদের

ভিতরকার পার্থক্য ধরা পড়ে। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এদের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও স্পষ্টতর হতে পারে। দুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন যথেষ্ট পার্থক্য আছে (যদিও আপাত-দৃষ্টিতে একরকম মনে হয়) তেমনি দুটি কম্যুনিটি বা সামাজিক গোষ্ঠীকে মোটামুটি-ভাবে এক মনে হলেও, এদের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলে যথেষ্ট পার্থক্য ধরা পড়তে পারে। পার্থক্য অনুযায়ী দুটি কম্যুনিটির শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাও পৃথক হতে পারে।

কোন সামাজিক গোষ্ঠীর শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনার সফলতা নির্ভর করে, তার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন ধারার উপর। অর্থাৎ গোষ্ঠীটির জীবনযাত্রায় ভবিষ্যতে কি কি ধরনের পরিবর্তন আশা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এরূপ দেখা গেল যে, একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মধ্যে গ্রাম্য চরিত্র থেকে নাগরিক জীবন ধারার দিকে বেশী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, অথবা একটি সামাজিক গোষ্ঠী কৃষিভিত্তিক, উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শিল্পভিত্তিক উৎপাদনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে অথবা ক্ষুদ্র জনসমষ্টি থেকে বৃহৎ জনসমষ্টিতে পরিবর্তিত হচ্ছে।

সামাজিক গোষ্ঠীর শিক্ষাগত প্রয়োজন

কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য এবং যে দিকে ঐ গোষ্ঠীর পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করে ঐ গোষ্ঠীর শিক্ষাগত প্রয়োজন। অন্যপক্ষে কোন গোষ্ঠীর শিক্ষাগত প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ঐ অঞ্চলের বিদ্যালয় সংখ্যা, শিক্ষাখাতে অর্থব্যয় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। সুতরাং শিক্ষাগত অনুসন্ধান পরিকল্পনা (Educational Survey Programme) নির্ভর করছে গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ধারা ও লোকসংখ্যার উপর।

সামাজিক গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ভিত্তি

যে সামাজিক গোষ্ঠীর শিক্ষাগত অনুসন্ধান করা হবে—প্রথমেই দরকার ঐ অঞ্চলের এবং ঐ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা। আলোচ্য গোষ্ঠীটি কত বৎসর পূর্বে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে, ঐ অঞ্চলে প্রথম বিদ্যালয় কোন সময়ে স্থাপিত হয়, এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির আনুমানিক স্থাপনাব্দ এই প্রসঙ্গে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অঞ্চলটিতে বিদ্যালয় স্থাপনে জনসাধারণের আগ্রহ কিরূপ? পূর্বের বিদ্যালয়গুলি কবে কারা প্রথম স্থাপন করেন, স্থানীয় জমিদার, না সরকার, না জন-সাধারণ? এই প্রসঙ্গে সেই সকল বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে।

আঞ্চলিক ইতিহাসকে দুটি অংশে ভাগ করা যায় যথা, স্থানীয় ইতিহাস এবং বিদ্যালয় তথা শিক্ষার ইতিহাস।

স্থানীয় ইতিহাস সংকলনের পর সার্ভে কমিটির দ্বিতীয় দায়িত্ব হল, স্থানীয় জন-সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান। স্থানীয় অর্থনীতি তিনভাবে

শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে। যথা—১. বৃত্তিগত সুযোগের প্রয়োজন অনুযায়ী, ২. বিভিন্ন প্রকারের ট্রেনিং ও বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং ৩. শিক্ষার খাতে ব্যয় করবার ক্ষমতা অনুযায়ী।

স্থানীয় অর্থনৈতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রথম কাজ হল স্থানীয় শিল্প ও কলকারখানার তালিকা প্রণয়ন এবং স্থানীয় কারখানায় কি কি ধরনের বস্তু প্রস্তুত করা হয়, কত সংখ্যক ব্যক্তি ঐ সকল কারখানায় চাকুরি করে, সেই সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা। স্থানীয় কারখানায় যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তার কাঁচামাল কোথা থেকে আসে এবং স্থানীয়ভাবে তার কতখানি সংগ্রহ করা যায়—সেই সম্পের্কও বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। এই সকল বিবরণ থেকে স্থানীয় অঞ্চলের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।

স্থানীয় অঞ্চলের শতকরা কত জন উচ্চবৃত্তিতে নিযুক্ত (অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী), কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে কত জন ইত্যাদি বিবরণও এই সম্পর্কে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সকল বিবরণ থেকে স্থানীয় অঞ্চলের একটি অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় বৃত্তির প্রয়োজনের দিক থেকে কি ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পুনর্গঠন করা যেতে পারে, সেই সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত এই সকল বিবরণের ভিত্তিতে করা যেতে পারে।

স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ

স্থানীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও বিবরণ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের জাতি ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রধান।

১. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সংখ্যা ও শতকরা হার।
২. স্থানীয় জন্ম হার।
৩. স্থানীয় মৃত্যু হার।
৪. ১৮ বৎসর বয়সের কম শিক্ষাযোগ্য বালক-বালিকাদের সংখ্যা।
৫. বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এরূপ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা।

শিশুদের সম্পর্কে অনুসন্ধান

শিক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধান বা সার্ভের একটি প্রধান বিষয় হল স্থানীয় শিশুদের সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সংখ্যা গণনা। শিশুদের সংখ্যার সঙ্গে আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষভাবে জড়িত। যে অঞ্চলটি সার্ভে করা হবে শিশুদের সম্পর্কে প্রথমেই সেখানে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ শিশুদের সংখ্যার সঙ্গে আঞ্চলিক শিক্ষা-পরিকল্পনা বিশেষভাবে জড়িত। যে অঞ্চলটি সার্ভে করা হবে সেই অঞ্চলের স্কুলে পড়বার যোগ্য শিশুদের এবং যারা স্কুলে ভর্তি হবে তাদের একটি নির্ভরযোগ্য

গণনার রিপোর্ট স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য বিশেষ দরকার। শিশুদের গণনার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

১. **প্রাক্ বিদ্যালয় শিশু :** এই স্তরেব শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উপযুক্ত হয়নি ; এদেব বয়স সাধাবণত ৫/৬ বৎসবেব কম।

২. **বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এমন শিশু :** এ দলে থাকবে এমন সব ছেলে-মেয়ে যাবা বিদ্যালয়ে ভর্তি হযেছে।

৩. **বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায়নি এরূপ শিশু :** এই দলেব শিশুদের বিদ্যালয়ে পডবার বয়স হযেছে, কিন্তু নানা কাবণে বিদ্যালযে পডবাব সুযোগ পায়নি।

৪. **স্থানীয় অঞ্চলটিতে শিশুজন্মের হার :** প্রাক্ বিদ্যালয় স্তরের অনেক শিশু ভবিষ্যতে বিদ্যালযে ভর্তি হবে এবং তাদের সংখ্যাব উপর নির্ভর কবে ভবিষ্যৎ শিক্ষা পবিকল্পনা। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সকল ছেলেমেযেদেব স্কুলে আনতে হলে অঞ্চলটিব ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পবিকল্পনা তদনুসাবে স্থিব কবতে হবে। শিশুদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণেব জন্য বহু কর্মীব সহযোগিতাব প্রয়োজন। যদি কোন অঞ্চলের স্কুলে যায় না এরূপ ছাত্রসংখ্যা বেশী হয, তবে শিক্ষা পবিকল্পনাও সেই অনুসাবে স্থির করা প্রযোজন।

শিশু সেনসাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

শিশু সেনসাসেব জন্য নিম্নলিখিত উপকবণগুলি প্রযোজন হবে।

১. যে অঞ্চলেব শিশু-সেনসাস গ্রহণ কবা হবে, সেই অঞ্চলেব একখানি ম্যাপ বা একাধিক ম্যাপ প্রযোজন হবে। ম্যাপগুলি প্রস্তুত কবতে হবে স্থানীয় অঞ্চলের স্কুল স্থাপনেব উপযুক্ত স্থান নির্বাচনেব জন্য।

২. স্থানীয় অঞ্চলেব পবিবাব প্রতি শিশুব সংখ্যা নির্ণযের জন্য সেনসাস্ কর্তৃপক্ষেব উচিত অনেকগুলি কার্ড প্রস্তুত কবা। যেমন বিদ্যালয়ে পড়ে না এরূপ শিশুদের জন্য গোলাপী কার্ড, যাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে তাদের জন্য সাদা কার্ড, যাবা মাধ্যমিক বিদ্যালযে পড়ে তাদেব জন্য সবুজ কার্ড এবং যাবা টেকনিক্যাল স্কুলে বা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ে তাদেব জন্য ভিন্ন বংযেব কার্ডের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশুদের ধর্মগত বা অন্য কোন পার্থক্য নির্দেশেব জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীর কার্ডে পৃথক কোন নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া যেতে পাবে। এইভাবে কার্ডগুলির আলাদা রং বা চিহ্ন দেওয়ার পরে কার্ডগুলি সর্টিং বা পৃথক করবার সুবিধা হয়।

৩. যে অঞ্চলটি সার্ভে করা হবে, সেই অঞ্চলটিকে সুবিধামতো কয়েকটি অংশে ভাগ করা হবে এবং এক এক দল কর্মীব উপর ঐ অংশেব সার্ভের ভার দেওয়া হবে।

প্রত্যেকটি সার্ভে কার্ডে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে।

সার্ভে কার্ডের বিবরণঃ ১. শিশুর নাম, ২. জন্ম তারিখ ও বর্তমান বয়স, ৩. পিতার নাম ও পেশা, ৪. অভিভাবকের নাম, ৫. স্কুলের নাম, ৬. যে শ্রেণীতে পড়ে, ৭. যে ব্যক্তির নিকট থেকে বিবরণ পাওয়া গেল।

সার্ভের রিপোর্ট: নিম্নে একটি সার্ভে রিপোর্টের বিবরণ দেওয়া হল। এই রিপোর্টে শিশুদের স্কুলে ভর্তি হবার প্রথম বয়স ধরা হয়েছে ৬+ বৎসর।

সারণী ১

জন্ম বৎসর	যে শ্রেণীতে পড়ে	শিশুদের সংখ্যা	স্কুলে প্রথম ভর্তি হবার সময়
১৯৫০	১ম শ্রেণী	১৭২	১৯৫৬
১৯৪৯	২য় „	১৬০	১৯৫৫
১৯৪৮	৩য় „	১৮৫	১৯৫৪
১৯৪৭	৪র্থ „	১৯১	১৯৫৩
১৯৪৬	৫ম „	১৬৫	১৯৫২
১৯৪৫	৬ষ্ঠ „	১৫০	১৯৫১

কোন অঞ্চলে বালিকাদেব শিক্ষাগত সুযোগ সম্পর্কে বিববণ সংগ্রহেব জন্য যে সার্ভে করা হয়েছে সেই সম্পর্কিত বিপোর্ট নিচে দেওযা হল।

সারণী ২

বৎসর	স্কুলে পড়বার উপযুক্ত বালিকাদের সংখ্যা	স্কুলে পড়েছে এরূপ বালিকাদের সংখ্যা	শতকরা হার	মন্তব্য
১৯৬৪	১০১	৭৫	৭৫%	
১৯৬৫	১২১	৮০	৬৬%	
১৯৬৬	৯৭	৮২	৮৪.৬%	
১৯৬৭	৯০	৮০	৮৮.৮%	
১৯৬৮	১১২	৯০	৮০.৩%	
১৯৬৯	১২০	৯৬	৮০.০%	
১৯৭০	১০৫	৯৯	৯৪.২%	

একটি অঞ্চলের শিক্ষাগত ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান

শিক্ষা সার্ভের একটি প্রধান বিষয় হল অর্থনৈতিক সার্ভে। স্থানীয় অধিবাসী-

দের জীবিকার বিবরণ অর্থাৎ কোন বৃত্তিতে কত জন কাজ করে এবং তাদের শতকরা হার কত ইত্যাদি বিবরণ এই অনুসন্ধানের অন্তর্গত হবে।

সারণী ৩

পেশার বিবরণ	সংখ্যা	শতকরা হার	মন্তব্য
১. উচ্চবৃত্তিতে নিযুক্ত অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ইত্যাদি	৫২,৪২৬	২৬.২	
২. মধ্যবৃত্তিতে নিযুক্ত অর্থাৎ শিক্ষক, কবণিক ইত্যাদি	৩১,৪২২	১৫.৭	
৩. ক্ষুদ্র শিল্পে ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত কর্মী	৬,৫৯১	৩.৩	
৪. কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক	৮০,৮৯২	৪০.৫	
৫. কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি	১২,১৬০	৬.১	
৬. বেকাব	১৬,৫০৯	৮.২	
মোট জনসংখ্যা	২,০০,০০০	১০০.০	

উপবে সার্ভে বিপোর্টেব যে উপাত্তগুলি দেওযা হল সেগুলি থেকে একটি সংখ্যাগত (Statistical) বিববণ পাওযা গেলেও, বিষয়গুলি সম্পর্কে সবাসরি সঠিক ধাবণা কবা সম্ভব হয না। এই জন্য উপবেব উপাত্তগুলি **লেখচিত্রের** সাহায্যে প্রকাশ কবা উচিত।

সার্ভে উপাত্তকে লেখচিত্রে পরিবর্তন

সার্ভে বা শিক্ষা বিষযক অনুসন্ধান লব্ধ উপাত্তগুলিকে নানাবিধ লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ কবা হযে থাকে। গণিতে বিভিন্ন লেখকেব উদ্দেশ্য হল অনুসন্ধান লব্ধ উপাত্তগুলিকে চিত্রেব সাহায্যে প্রকাশ কবা। লেখচিত্রেব মাধ্যমে আমবা উপাত্তেব উত্থান-পতন বা বৃদ্ধি-অবনতিব প্রকৃতি সামগ্রিকভাবে একসঙ্গে দেখতে পাই এবং ফলে উপাত্তগুলিব প্রকৃতি আমাদেব নিকট স্পষ্ট হযে ওঠে।

লেখের শ্রেণীবিভাগ : গণিতে সাধাবণত দুই শ্রেণীব লেখ ব্যবহাব কবা হয়। পবিসাংখ্যিক লেখ (Statistical graphs) এবং অপেক্ষক লেখ (Functional graphs)। পরিসাংখ্যিক লেখ ব্যবহৃত হয বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুলনার জন্য বা বৃদ্ধিব হার বুঝবার জন্য বা কোন বিষযেব শতকবা কত অংশ কোন বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয় তা জানবাব জন্য। পবিসাংখ্যিক উদ্দেশ্যে সাধারণত তিন শ্রেণীর লেখ ব্যবহৃত হয়। এগুলি হল—(১) দণ্ড নকশা বা অনুচিত্র (The bar diagram),

(২) রেখা লেখ (Line graphs), এবং (৩) চক্র বা বৃত্ত লেখ (The pie diagram)।

উপরে যে সকল লেখ সম্পর্কে আলোচিত হল, এই ধরনের লেখ বা গ্রাফ আমরা নানা সূত্রে দেখে থাকি। উত্তাপ নির্দেশক চার্ট (Temperature chart) বা সংবাদ-পত্রের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত লেখ-এর সঙ্গে পরিচয় আমাদের নানা সূত্রে ঘটে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক দেকার্ত (Descartes)-এর নাম গ্রাফের সঙ্গে জড়িত। তিনিই প্রথম গ্রাফ্ আবিষ্কার করেন। তবে প্রাচীনকালে গ্রীকরাও গ্রাফের ব্যবহার জানতো।

বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে গ্রাফ্ বা লেখ ব্যবহৃত হয়।

১. লেখচিত্র-এর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা গণিতের মূল বিষয়টি বুঝতে পারে, কারণ লেখ সরাসরিভাবে দর্শন-ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে। চোখে দেখে কোন বিষয়ের পুরা চিত্রটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। এমনকি যখন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গণিতের সংখ্যার ব্যবহার বা প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার তত স্পষ্ট নয়, তখন লেখচিত্রের ব্যবহারের দ্বারা বিষয়টি অধিকতর বোধগম্য করা যায়।

২. একটি রাশির সঙ্গে অন্য রাশির পার্থক্য গ্রাফের সাহায্যে স্পষ্টতর করা যায়। পারসি নান বলেছেন, 'অপেক্ষকের আবিষ্কার' (Invention of variables) গণিতের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একটি প্রধান আবিষ্কার। সময়ের সঙ্গে কোন বিষয়ের উন্নতি বা অবনতি সময় লেখ (Time graph)-এর সাহায্যে দেখানো যায়। বিজ্ঞানের সকল শাখায় লেখের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এমন কি শিক্ষা বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রেও লেখ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনায় ও আলোচনায় ব্যবহার করা যায়।

৩. অনেক ক্ষেত্রে লেখচিত্রকে ' হিসাব নির্দেশক' (Ready reckoner) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দুইটি বিষয়ের মধ্যে তুলনার জন্য লেখচিত্র ব্যবহার করা যায়।

৪. লেখ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দণ্ড নকশা, বা স্তম্ভ-লেখ (Column graphs) অঙ্কন প্রথমে আরম্ভ করা উচিত। লেখ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত (Data) শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা বা প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে নেওয়া উচিত। যেমন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা, কোন এক জন ছাত্রের বিভিন্ন পরীক্ষায় লব্ধ নম্বর, অথবা বৎসরের বিভিন্ন মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি।

কিভাবে লেখ অঙ্কন করা হয় ?

দুইটি সরলরেখা এমনভাবে অঙ্কন কর যে, তারা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সমকোণে পরস্পরকে ছেদ করে (পরপৃষ্ঠার চিত্রটি লক্ষ্য কর) ঐ রেখা দুটিকে বলা হয় স্থানাঙ্ক (Co-ordinates)। যে সরলরেখাটি লম্বাকৃতি তাকে বলা হয় y-axis বা y-

অক্ষ এবং যেটি অনুভূমিক (Hoirzontal) তাকে বলা হয় x-অক্ষ বা x-axis। এই দুইটি সরলরেখা পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে মিলিত হয় অর্থাৎ একটি অপরটির
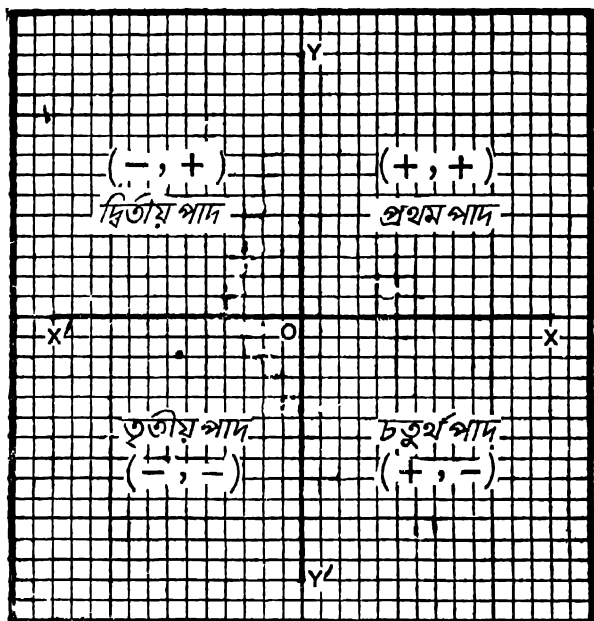
উপর লম্ব। যে বিন্দুতে সরলরেখা দুইটি মিলিত হয তাকে বলা হয় মূল বিন্দু বা origin। মূল বিন্দুটিকে ইংরাজী O অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

উপরের চিত্রটিতে মূল বিন্দুটি হল O অক্ষদ্বয়ের মিলন বিন্দু। O বিন্দুটি হল দুটি অক্ষেরই আরম্ভ বিন্দু (Starting point)। চিত্রটিতে যেমন দেখানো হয়েছে O বিন্দু থেকে X পর্যন্ত সরলরেখাটি ধনাত্মক (Positive) মান নির্দেশক এবং O থেকে X′ পর্যন্ত সরলরেখাটি ঋণাত্মক (Negative) মান নির্দেশক। অনুরূপভাবে OY ধনাত্মক মান নির্দেশক এবং OY′ ঋণাত্মক মান নির্দেশক। XX′ এবং YY′ O বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে এবং চারটি ভাগ (Divisions) বা পাদ বা চতুষ্কোণ অবস্থা (Quadrants) সৃষ্টি করেছে। উপরের প্রথম পাদে x ও y ধনাত্মক অর্থাৎ (+, +) মান নির্দেশ করে, দ্বিতীয় পাদে নির্দেশ করে (−, +) মান, তৃতীয় পাদে (−, −,) মান এবং চতুর্থ পাদে (+ −) মান।

মনে করা যাক, A একটি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক হল $x=4$ এবং $y=3$; A বিন্দুটি চিহ্নিত করতে হলে OX থেকে চার ঘর চিহ্নিত কর এবং OY লাইন বরাবর তিন ঘর চিহ্নিত কর এবং উভয় বিন্দু থেকে দুটি লম্ব যেখানে মিলিত হবে সেই বিন্দুটি হল

নির্দিষ্ট A বিন্দু। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বিন্দুর স্থানাঙ্ক অনুযায়ী বিন্দুটি লেখচিত্রে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে, সব শ্রেণীর লেখ অঙ্কনে উপরের নিয়ম অনুযায়ী লেখ অঙ্কন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকারের লেখ

১. **দণ্ড নকশা বা দণ্ড অনুচিত্র বা স্তম্ভ-লেখ (The Bar Diagram) :** লেখ অঙ্কন শেখানোর জন্য প্রথমেই স্তম্ভ-লেখ বা দণ্ড নকশা ব্যবহার করা উচিত। দুটি বা দুই-এর অধিক বিষয়গুলি তুলনার জন্য স্তম্ভ-লেখ অঙ্কন করা হয়। যেমন বালক/বালিকাদের শিক্ষার হার, বৎসরের বিভিন্ন মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি স্তম্ভ লেখের সাহায্যে দেখানো যায়।

যখন কোন উপাত্ত দণ্ড বা স্তম্ভের সাহায্যে দেখানো হয় তখন ঐরূপ লেখ চিত্রকে বলে স্তম্ভ-লেখ বা দণ্ড-লেখ বা নকশা। দণ্ড-লেখ দুই শ্রেণীর হতে পারে,
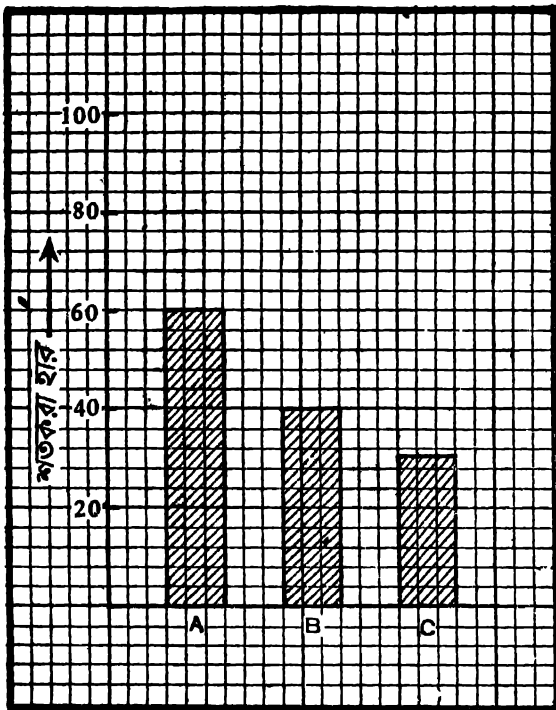
যথা [ক] আনুভূমিক (Horizontal) এবং [খ] লম্বাকৃতি (Vertical)। আনু-ভূমিক দণ্ড-লেখ X অক্ষরেখার সমান্তরালভাবে অঙ্কন করা হয় এবং লম্বাকৃতি

দণ্ড-লেখ Y অক্ষরেখার সমান্তরাল এবং X অক্ষরেখার উপর লম্বভাবে অবস্থান করে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। মনে করা যাক, কোন অঞ্চলেব A, B ও C ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের শিশুদের শতকরা ৬০, ৪০ ও ৩০ জন বিদ্যালয়ে পডবাব সুযোগ পেয়েছে। উপাত্তগুলি স্তম্ভ-লেখেব সাহায্যে প্রকাশ কব। X অক্ষরেখার উপর একটি সুবিধামতো প্রস্থ নিযে ৩টি স্তম্ভ অঙ্কন কব। স্তম্ভগুলির উচ্চতা যথাক্রমে ৬০, ৪০ ও ৩০ পরিমাপ অনুযায়ী অঙ্কন কব। স্তম্ভ-গুলি যথাক্রমে A, B ও C ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদেব শিশুদেব শতকরা হাব নির্দেশ করে।

অঙ্কিত স্তম্ভ-লেখটি লম্বাকৃতি (Vertical)। OY অক্ষবেখাটি শতকরা হাব নির্দেশক। স্তম্ভের উচ্চতা সবাসরি লেখচিত্র থেকে জানা যায়। লেখটি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, A দলেব শতকবা ৬০ জন, B দলেব শতকরা ৪০ জন এবং C দলের শতকরা ৩০ জন বিদ্যালয়ে পড়ে।

একটি আনুভূমিক (Horizontal) **স্তম্ভ-লেখের উদাহরণ :** একটি অঞ্চলে স্কুলে পড়ে এরূপ ছাত্রদের শতকবা হাব এবং শিশুদের পিতাব বৃত্তি সম্পর্কে উপাত্ত
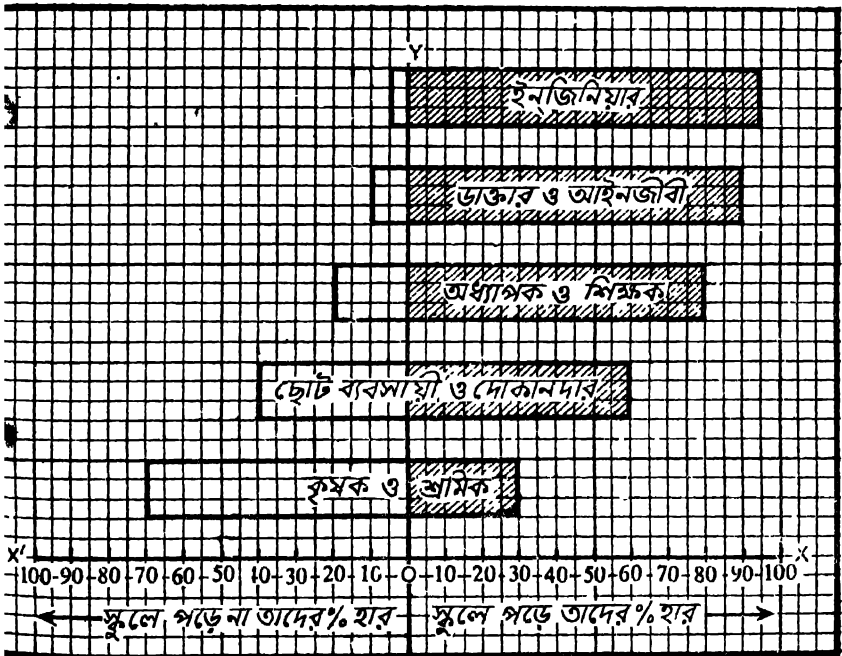
সংগ্রহ করা হল। ইঞ্জিনীয়ারদেব শতকবা ৯৫ জন শিশু স্কুলে পড়ে, ডাক্তার ও

আইনজীবীদের পড়ে শতকরা ৯০ জন। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের পড়ে শতকরা ৮০ জন এবং কৃষক ও শ্রমিকদের পড়ে শতকরা ৩০ জন। এই বিষয়গুলি আনুভূমিক স্তম্ভ-লেখের সাহায্যে দেখানো হল। লেখটি থেকে সহজেই জানতে পারা যায় শতকরা কত জন শিশু স্কুলে পড়বার সুযোগ পায় নি এবং কতজন পাচ্ছে এবং তাদের পিতা-মাতার পেশা কি?

আনুভূমিক স্তম্ভ-লেখ অঙ্কনের নিয়ম : XOX′ x অক্ষরেখাটিকে চিত্রটির অনুরূপভাবে ২০০ অংশে ভাগ কর। OX-কে ১০০ ভাগে ভাগ কর এবং OX′-কে অনুরূপভাবে ১০০ ভাগে ভাগ কর। স্কুলে যারা পড়ছে তাদের শতকরা হার লেখটির অনুরূপ OX রেখা বরাবর চিহ্নিত কর এবং যারা পড়ছে না তাদের OX′ রেখা
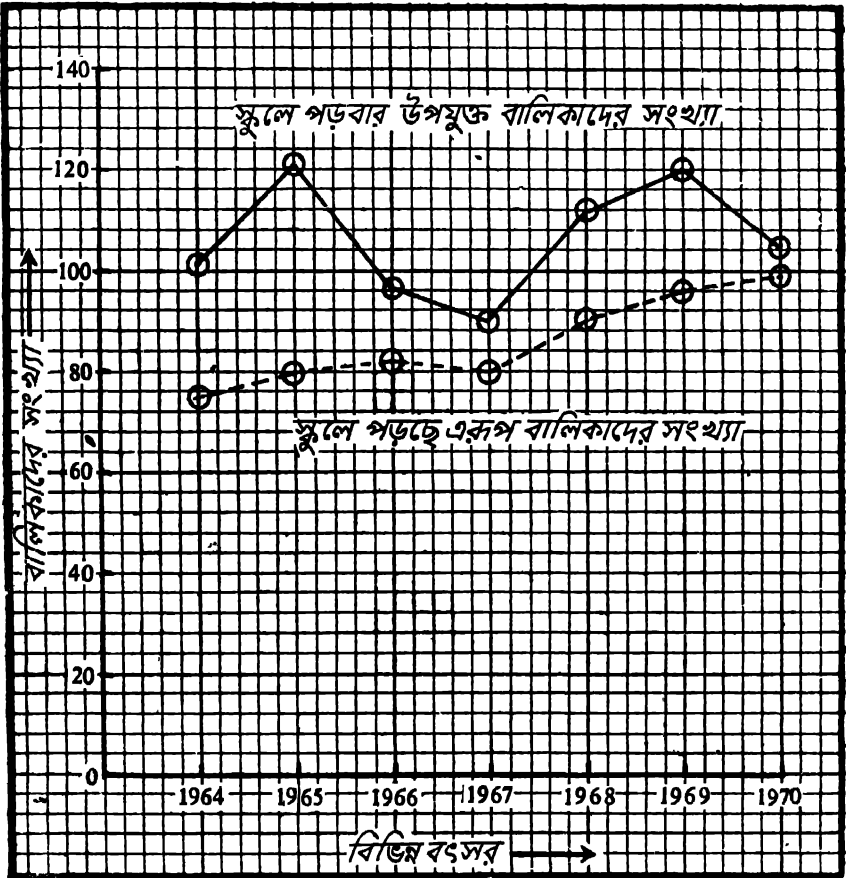
বরাবর দেখাও। দুটি অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য একটি অংশকে রং বা অন্য-ভাবে চিহ্নিত কর। OY অক্ষরেখাটি দুটি অংশকে পৃথকভাবে দেখাবে।

২. **রেখা-লেখ** (The Line Graph) : যখন কোন উপাত্তের উন্নতি-অবনতি বা পরিবর্তন (Variation) একটি রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে রেখা-লেখ বলে।

রেখা-লেখ অঙ্কনের নিয়ম

একটি উদাহরণেব সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা কবা যাক। ২নং সারণীতে প্রদত্ত উপাত্তগুলি লক্ষ্য কব। ঐ সাবণীতে বিভিন্ন বৎসরে কোন অঞ্চলেব স্কুলে পড়ে এবং পডবার উপযুক্ত বালিকাদেব সংখ্যা দেওযা হযেছে। X-অক্ষ বরাবর একটি নির্দিষ্ট দূবত্ব অনুযায়ী (মনে কব ১০ ঘব) কযেকটি বিন্দু চিহ্নিত কব এবং প্রত্যেক বিন্দুতে এক একটি বৎসর নির্দিষ্ট কব (পূর্বপৃষ্ঠাব চিত্র অনুযাযী)। Y অক্ষ বরাবর বালিকাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট কব। ২নং সাবণীব উপাত্তগুলিব মান চিহ্নিত কব এবং সরলবেখা দ্বারা পর পব বিন্দুগুলি সংযুক্ত কব। বৎসব ও মোট বালিকাদেব সংখ্যা এবং বৎসব ও বালিকাদেব সংখ্যা যারা স্কুলে ভর্তি হযেছে—এই দুই শ্রেণীব উপাত্ত নিয়ে দুটি লেখ অঙ্কিত কবা হ'ল।

লেখচিত্র বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কেবলমাত্র লেখচিত্র অঙ্কনেব দ্বাবাই উপাত্তগুলিব প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধাবণা কবা সম্ভবপব হয় না। লেখচিত্রগুলিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেই তবে উপাত্তগুলিব পবিবর্তনের ধাবা লক্ষ্য কবা যায এবং উপাত্তগুলির পিছনে যে মূল রহস্য আছে—তা জানতে পাবা যায। পূর্বপৃষ্ঠাব লেখচিত্রটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? প্রথম লেখচিত্রটি বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায যে, প্রতি বৎসবে স্কুলে পডবাব উপযুক্ত বালিকাদেব সংখ্যা একই বকম থাকছে না—কম বেশি হচ্ছে। লেখ-চিত্রটিতেও বিষযটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। এ থেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত কবা যায যে, অঞ্চলটিতে শিশু জন্মহাব একরূপ নয়, বালিকাদেব জন্মেব হারও এক এক বৎসব এক এক রকম। দ্বিতীয় লেখটি ভালভাবে লক্ষ্য কবলে বুঝতে পাবা যায় অঞ্চলটিতে বালিকাদের স্কুলে পডবাব সুযোগ ধীবে ধীবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে প্রযোজনের তুলনায এই সুযোগ কম। সমস্যাটিকে সঠিকভাবে জানতে হলে প্রদত্ত উপাত্ত-এব সঙ্গে আবও কয়েকটি বিষয় জানা দবকাব। সেগুলি হল অঞ্চলটিব বিভিন্ন অধিবাসীব পেশাগত বিবরণ এবং সাধারণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান। কারণ বালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে এই বিষয় দুটি সবিশেষ জডিত।

৫০টি শিশুর গড় স্মৃতিপ্রসব (Memory span) বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

বয়স :	৩	৩½	৪	৫	৭	৯	১২	১৫
স্মৃতিপ্রসর :	২	৩	৪	৪	৫	৬	৭	৮

উপরোক্ত উপাত্তগুলিকে রেখা-লেখচিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্য X অক্ষ বরাবর বয়সের সংখ্যাগুলিকে বসাতে হবে এবং Y-অক্ষ বরাবর স্মৃতিপ্রসরকে বসাতে হবে। (নিম্নের চিত্র অনুযায়ী) সরলরেখার দ্বারা পর পর বিন্দুগুলিকে সংযোগ করে নির্দিষ্ট লেখটি পাওয়া যায়।

লেখচিত্র বিশ্লেষণ

একবার মাত্র শুনে বা দেখে আমরা যে কয়টি সংখ্যা বা অক্ষর মনে রাখতে পারি
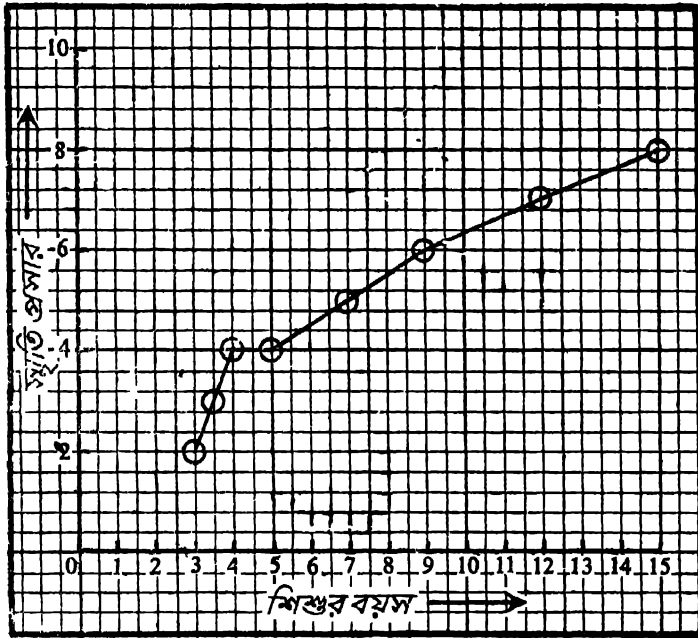
তাকে স্মৃতিপ্রসর বলা হয়। অঙ্কিত লেখটি থেকে স্মৃতিপ্রসর সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায়।

১. বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে স্মৃতিপ্রসরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

২. ১২/১৩ বৎসর থেকে স্মৃতির উন্নতির হার কম, তবে দুই বৎসর থেকে ৯/১০ বৎসর পর্যন্ত তার উন্নতির হার দ্রুত।

৩. বৃত্তলেখ বা চক্রলেখ (The Pie Diagram) : যখন একটি লেখচিত্রকে বৃত্তের আকারে দেখানো হয় এবং বৃত্তটির ক্ষেত্রফলকে অনুপাতিক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন উপাত্তগুলি (শতকরা হারে) নির্দেশ করা হয়, তখন তাকে বৃত্ত বা চক্রলেখ

(The pie diagram) বলে। যখন কোন উপাত্ত শতকরা হারে দেওয়া থাকে এবং বিভিন্ন উপাত্তের মধ্যে তুলনা করবার প্রয়োজন হয়, তখন চক্রলেখের সাহায্যে নেওয়া হয়।

একটি উদাহরণ: একটি শহরে ৬০% হিন্দু, ২৫% মুসলমান, এবং ১৫% অন্যান্য জাতি। চক্রলেখের সাহায্যে লোকসংখ্যার হার নির্দেশ কর।

চক্রলেখ অঙ্কনের নিয়ম: একটি বৃত্তকে ৩৬০° ডিগ্রীতে ভাগ করা যায়। দুটি ব্যাস এমনভাবে অঙ্কন করা হল যে, পরস্পরকে কেন্দ্রবিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করে, এবং তা হলে তা কেন্দ্র বিন্দুতে চারিটি সমকোণ উৎপন্ন করে। (চিত্রটি লক্ষ্য কর)।

উপরে উপাত্তগুলি চক্রলেখের সাহায্যে দেখানোর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

হিন্দুসংখ্যা ৬০%; ৩৬০°-এর ৬০% = ২১৬°। বৃত্তটি থেকে ২১৬° পৃথক করে দেখানো হল। পৃথক বৃত্তাংশটি হিন্দুদের সংখ্যা নির্দেশ করছে (২য় চিত্র) মুসলমানদের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ২৫%।
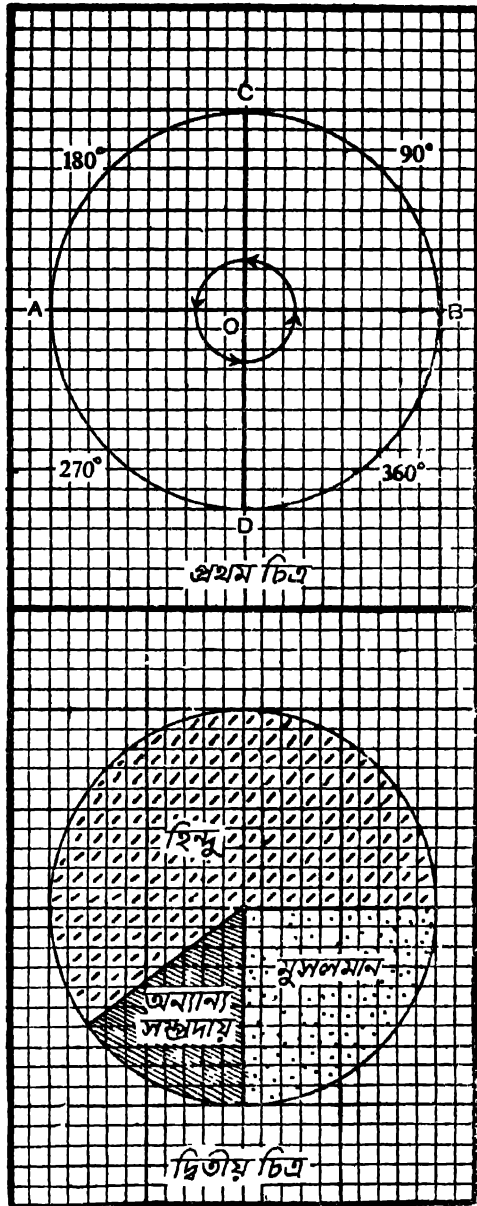
৩৬০°-এর ২৫% = ৯০° সুতরাং বৃত্তটির ৯০° পৃথক করে দেখানো হবে মুসলমানদের সংখ্যা দেখানোর জন্য। অন্যান্য জাতির সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ১৫%। ৩৬০°-এর ১৫% = ৫৪°। বৃত্তটি থেকে ৫৪° পৃথক করে অন্যান্য জাতির সংখ্যা দেখানো হবে।

ভূগোলের বা অর্থনীতিতে আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বৃত্তলেখ ব্যবহার করা হয়। বৃত্তলেখে ডিগ্রী পরিমাপের জন্য প্রোট্রাক্টর (Protractor) বা চাঁদার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। মোটামুটিভাবে দেখানোর জন্য আন্দাজে চোখে দেখেও ডিগ্রীর পরিমাণ ঠিক করা যেতে পারে।

লেখ অঙ্কন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন: ১. ৩নং সারণীতে প্রদত্ত উপাত্ত-গুলিকে স্তম্ভ-লেখের মাধ্যমে দেখাও। ২. একটি আঞ্চলিক সার্ভে থেকে দেখা গেল শিক্ষা-খাতে মোট ব্যয়ের ৭৫% আসে ছাত্র বেতন থেকে, ১৫% আসে সরকারী অনুদান থেকে এবং বাকি অংশ আসে বেসরকারী সাহায্য থেকে। উপাত্তগুলি বৃত্তলেখের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

৩ নিম্নলিখিত উপাত্তগুলি বোম্বাই নগরীর বিভিন্ন মাসে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের মান নির্দেশ করছে। স্তম্ভ-লেখের সাহায্যে বৃষ্টিপাত এবং রেখা-লেখের সাহায্যে উত্তাপের মান অঙ্কন কর।

	জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জুলা	আ	সে	অ	ন	ডি	বাৎসরিক গড়
উত্তাপ	৭৫	৭৫	৭৮	৮২	৮৫	৮২	৮০	৭৯	৭৯	৮১	৭৯	৭৬	৭৯
বৃষ্টিপাত	০	•	০·১	০	০·৭	১০·৬	১৭·৩	১৬·০	১১·৮	২·৪	০·৪	০	৭৯·৪।

কম্যুনিটি বা লোকশিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ ও চার্ট প্রস্তুত করা

Preparations of Charts and Aids for Community Education.

বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষাকে বলা হয় **সামাজিক শিক্ষা**। যখন কোন সামাজিক শিক্ষা প্রকল্প কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তখন তাকে বলা হয় কম্যুনিটি শিক্ষা। কম্যুনিটি শিক্ষাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা:

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা** (Formal education),

২. **লোকশিক্ষা** (Informal education)।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মারফত দেওয়া হয়। সেখানে শ্রেণীশিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ব্ল্যাক বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড, ছবি, মডেল, ডায়াগ্রাম, চার্ট, ম্যাপ শ্রেণীশিক্ষায় সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়।

লোকশিক্ষা হল বয়স্কদের জন্য অনিয়মিত শিক্ষা। অনিয়মিত শিক্ষাকে সাধারণ-ভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:

১. স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা (Health Education), ২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Professional Education), ৩. কৃষি বিষয়ক শিক্ষা (Agricultural Education), ৪. সাংস্কৃতিক শিক্ষা (Cultural Education), ৫. সামাজিক নীতি শিক্ষা (Social Education) ।

কম্যুনিটি শিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বয়স্কদের সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানারূপ উপকরণ ও চার্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। বয়স্ক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জানা উচিত কিভাবে ঐ সকল উপকবণ প্রস্তুত করা হয়। যে নিয়মে বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়—সেই নিয়মে বয়স্কদের শেখানো সম্ভব নয়। কাবণ বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক। বয়স্কদের অহংভাব প্রবল এবং তাদের কাজকর্ম সাধারণত তাদের অহংভাব (Ego)-এর দ্বারা পরিচালিত। এই কারণে শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করে বয়স্কদের জ্ঞান পরিবেশন করা সম্ভবপর নয়।

এই কারণে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ মনে কবেন, বয়স্ক শিক্ষার জন্য ঘরোয়াভাবে আলোচনা যেমন দরকার তেমনি দরকার নানাবিধ উপকরণের সাহায্য নেওয়া। যে ধরনের বিষয় আলোচনা করা হবে সেই সংক্রান্ত চার্ট বা উপকরণ প্রস্তুত করে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যবহাব কবা যেতে পারে। আলোচিত বিষয়ে একটি ছবি বা চার্ট পুনঃপুনঃ দেখার ফলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদেব কাছে স্পষ্ট হয় এবং ঐ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট প্রত্যয় তাদেব মনে সৃষ্টি হয়।

কম্যুনিটি শিক্ষার উপযোগী উপকরণগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিভক্ত করা যায়। যথা: **১. মডেল, ২. ছবি, ৩ চার্ট**।

ছোট ছোট ছবিগুলিকে বড় কবে দেখানোর জন্য যান্ত্রিক উপকরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এপিডিয়াস্কোপ (Epidiascope) ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করা যায়। আজকাল লোকশিক্ষার জন্য ফিল্মের সাহায্য নেওয়া হয়। ফিল্ম প্রজেক্টরের সাহায্যে লোকশিক্ষার উপযোগী ফিল্ম দেখানো যেতে পারে।

কিভাবে লোকশিক্ষার উপযোগী উপকরণগুলি প্রস্তুত কবা যায় এবং ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. মডেল

সাধারণত মাটি দিয়ে মডেল তৈরি করা হয়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল ও নানা-রকমের মডেল গঠন নৈপুণ্যে অতি উৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর বিদেশেও এইগুলি রপ্তানী হয়। মাটি ছাড়া কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করে তা দিয়েও হাল্কা ধরনের মডেল প্রস্তুত করা যায়। লোকশিক্ষার উপযোগী নানা বিষয় মডেলের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। কলিকাতার মিউজিয়ামে এবং নেহেরু শিশু মিউজিয়ামে মডেলের সাহায্যে

নানা বিষয় দেখানো হয়েছে। সেহেতু মিউজিয়ামে রামায়ণ-মহাভারতের মডেল-গুলির সাহায্যে সহজেই ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির আধার রামায়ণ-মহাভারতের পরিচয় সাক্ষর ও নিরক্ষর উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট সহজভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত শিক্ষাই হোক, কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই হোক, জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়বস্তুই হোক সহজভাবে চিত্তাকর্ষক রূপে তা জনমনের নিকট উপযুক্ত মডেলের সাহায্যে উপস্থাপিত করা যায়।

মডেলের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তা বাস্তব পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয়ের মান সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করতে পারে। মডেল কোন বিষয়কে ত্রি-মাত্রায় (Three dimensions) প্রকাশ করে। এই জন্য মডেলের সাহায্যে কোন বিষয়কে বাস্তবের অনুরূপভাবে দেখানো যায়।

মডেল প্রস্তুত কববার অসুবিধা এই যে, সঠিকভাবে উপকবণ ব্যবহারের নিয়ম জানা না থাকলে মডেল তৈবি কবা যায় না। এই জ্ঞান অর্জনেব জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেব ট্রেনিং দরকার হয়। তবে চেষ্টা করে এই সম্পর্কে কিছু নিপুণতা অর্জন কবা যেতে পারে।

২. ছবি

মডেলের পর ছবির স্থান। ছবির সাহায্যে লোকশিক্ষাব অনেক বিষয় সাধারণের নিকট সুন্দর করে প্রকাশ করা যায়। কোমিনিয়াস বলেছেন, 'গণ্ডার সম্পর্কে বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা গণ্ডারের একখানি ছবি দেখলে গণ্ডার সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বেশি পবিষ্কার ও যথাযথ হতে পারে। কম্যুনিটি শিক্ষায় ছবিকে যথেষ্ট লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। আমরা কম্যুনিটি শিক্ষাকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে ছবি যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহাব কবা যায়।

স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষায় ছবিকে নানাভাবে শিক্ষামূলক উপকবণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষায় **গ্রাম-সাফাই আন্দোলন** একটি প্রধান বিষয়। গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফাইকে একটি প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামেব স্বাস্থ্য নির্ভর করে গ্রাম্য-পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বজায় রাখবার মধ্যে।

গ্রাম-সাফাই আন্দোলন দুইভাবে পরিচালনা করতে হবে। প্রথমত,গৃহ ও গৃহ-পরিবেশেব সাফাই, দ্বিতীয়ত, গ্রাম-সাফাই। কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে বা গ্রাম-বাসীদের উপদেশ দিয়ে এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। এই জন্য দরকার চিত্রেব মাধ্যমে সমস্যাটি সদাসর্বদা গ্রামবাসীদের চোখের সামনে তুলে ধরা।

এই সম্পর্কে কয়েকটি আদর্শ চিত্রের নমুনা এখানে দেওয়া হল।

গ্রামাঞ্চলের কম্যুনিটি শিক্ষার একটি প্রধান বিষয় হল কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষা।

বৎসরের কোন সময়ে কি ধরনের ফসল চাষ করতে হয় কৃষকেরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। তবে স্থানীয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও জলসেচ ব্যবস্থার সঙ্গে কোন বিশেষ ধরনের শস্য বপনের সম্পর্ক খুব নিবিড়। এই কারণে কম্যুনিটি শিক্ষার

দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে, তাদের উচিত এই সম্পর্কে ছবি ও চার্ট প্রস্তুত করে কৃষকদের সামনে তুলে ধরা।

৩. চার্ট

চার্ট এক ধরনের চিত্র। চার্টের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয় লিখে জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা যায়। ছবির মতো চার্টও গণশিক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। অনেক সময়ে ছবি আঁকবার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু চার্ট অনেক সহজে প্রস্তুত করা যায়। বড বড অক্ষরের সাহায্যে চার্টের বিষয়বস্তু সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে চার্ট প্রস্তুত কবা যেতে পারে।

চার্টের শ্রেণীবিভাগ

কম্যুনিটি শিক্ষার উপযোগী চার্ট চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,—

১. **লেখ চার্ট** (Graphical chart);

২. **চিত্রযুক্ত চার্ট** (Pictorial chart);

৩. **ডায়াগ্রামচার্ট বা অনুচিত্র** (Diagrammatical chart);

এবং ৪. **কালানুক্রমিক চার্ট** (Chronological chart)।

লেখ চার্টঃ যখন কোন বিষয়বস্তু লেখ বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা
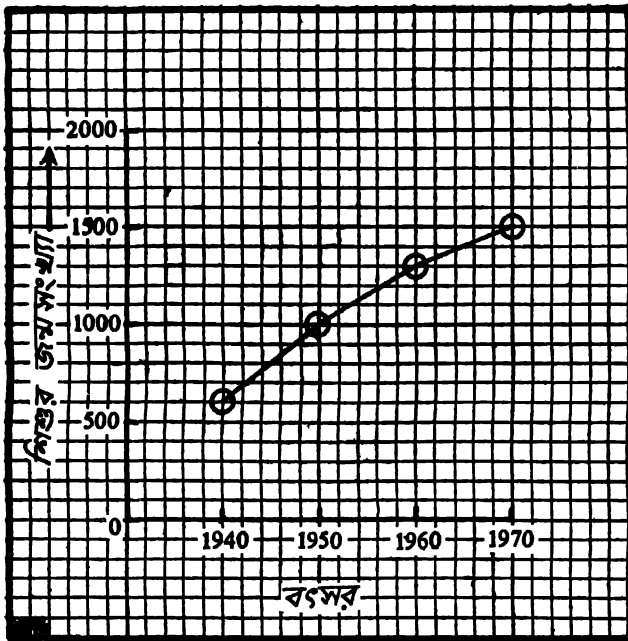
হয়, তখন তাকে লেখ চার্ট বলে। যেমন লোকসংখ্যার অনুপাতে শিশুর জন্মের হার বা কোন অঞ্চলের কৃষিপণ্যের উৎপন্ন হার প্রতি বৎসরে কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সম্পর্কে লেখ চার্ট প্রস্তুত করা যায়।

চিত্রযুক্ত চার্টঃ যখন কোন চার্ট চিত্র বা ছবির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় তখন তাকে চিত্রযুক্ত চার্ট বলে। পূর্বে আমরা ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্রযুক্ত চার্টের উদাহরণ দিয়েছি।

ডায়াগ্রাম চার্ট বা অনুচিত্রঃ ডায়াগ্রাম বা অনুচিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপকরণ। যে সকল বিষয়বস্তু কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করলে বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্বটি পরিষ্কার হয় না—সেখানে অনুচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অনুচিত্র সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় কৃষির অনেক বিষয়ও অনুচিত্রের মাধ্যমে লোকশিক্ষার জন্য উপস্থাপিত করা যায়। শিশু জন্মহারের সঙ্গে কৃষিপণ্যের উৎপাদনের হার, শিক্ষার চাহিদার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, প্রভৃতি বিষয় অনুচিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে দেখানো যায়। অনুচিত্র অঙ্কনে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের একটি সূত্র হল যে, প্রতীক চিহ্নটি যেন সহজেই জনসাধারণের নিকট বোধগম্য হয়। ছবির সাহায্যে ডায়াগ্রামের বিষয়বস্তু সহজেই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায়। ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যানগত বিবরণ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা যায়।

উদাহরণঃ মনে করা যাক, ভারত থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়। ঐ সম্পর্কিত উপাত্তগুলি নিচে উল্লেখ করা হল।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি

১.	যুক্তরাজ্য	১৫০০০,০০০ টাকা
২.	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৪০০০,০০০ ”
৩.	কানাডা	৮০০০,০০০ ”
৪.	জাপান	৭০০০,০০০ ”
৫.	অন্যান্য দেশ	২০০০০,০০০ ”
	মোট	৬৪০০০,০০০ ”

একটি চার্টের সাহায্যে উপরের বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

ভারত থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির অনুচিত্র বা ডায়াগ্রাম

সঙ্কেতঃ একটি বর্গক্ষেত্র ১,০০০,০০০ টাকা নির্দেশ করছে।

কালানুক্রমিক চার্ট (Chronological chart)ঃ অনেক সময়ে চার্টের সাহায্যে কোন বিষয় ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়। ইতিহাসের কোন রাজবংশের রাজত্বের ইতিহাস চার্টের মাধ্যমে সুন্দর করে দেখানো যায়। বিজ্ঞানে জীবনের ক্রমবিকাশ **জীবন বৃক্ষ** (Life tree) মারফত চিত্তাকর্ষকরূপে উপস্থাপিত করা যায়। এই ধরনের চার্টকে **কালানুক্রমিক চার্ট** বলে।

কিভাবে চার্ট প্রস্তুত করা হয় ?

চার্ট প্রস্তুত করবার জন্য সুবিধামতো আকারের মোটা কাগজ নিতে হবে। কাগজের রং সাদা বা অন্য যে কোন রং-এর হতে পারে। চার্টের বিষয়বস্তু আগে
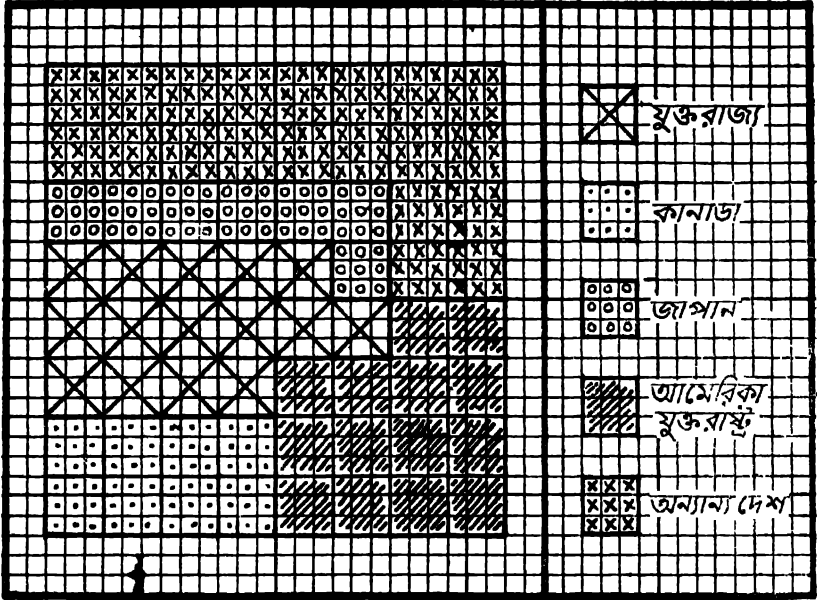
ঠিক করে নিয়ে 3H বা 5H পেন্সিলের সাহায্যে হাল্কা করে আঁকতে হয়। দরকার মতো আর্ট টিচারের সাহায্য নিতে হবে। হাল্কা করে আঁকবার পর রং পেন্সিল, বা ক্রেয়ন বা চাইনিজ কালি দিয়ে চার্টের বিষয়বস্তু ঘন করে আঁকতে হবে। এই অঙ্কনের জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দরকার হবে। যথা—(১) হার্ড পেনসিল (২) রংয়ের বাক্স, (৩) চাইনিজ কালি ও কলম, (৪) ইরেজার, (৫) কাগজ আটকাবার বোর্ড।

ডায়াগ্রামের একটি উদাহরণ। ডায়াগ্রামটিতে ভূস্তরের চ্যুতি দেখানো হয়েছে।
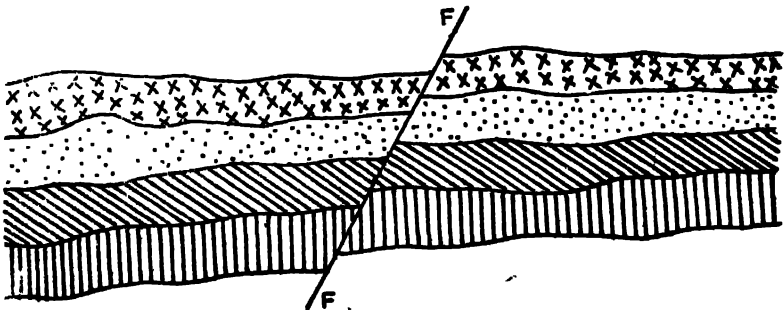
অনুশীলনী

১. ভারতের চারিটি শহরের লোকসংখ্যার হার নিচে দেওয়া হল ; উপাত্তগুলি দণ্ডলেখের সাহায্যে দেখাও।

শহর	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতি
ক	·৬৫	·৩০	·০৫
খ	·৬০	·১০	·৩০
গ	·৫০	·৪৫	.০৫
ঘ	·৩০	·১০	·৬০

২. তিনটি ছাত্রের পরীক্ষায় উন্নতির হার নিম্নলিখিত উপাত্তের মাধ্যমে দেওয়া হল। উপাত্তগুলি রেখা-লেখের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

ছাত্র	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬
A	৬০%	৬৫%	৭০%	৬০%	৭৫%	৫৫%	৭০%
B	৪০%	৫৫%	৬০%	৫৮%	৭০%	৬৫%	৬৫%
C	৫০%	৫৫%	৬০%	৬৫%	৭০%	৬৫%	৭০%

৩. একটি স্কুল বোর্ডের বিভিন্ন খাতে খরচ এইভাবে দেখানো হয়েছে। ঐগুলি বৃত্ত লেখে (Pie diagram)-এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রং-এ অঙ্কন কর।

ক.	শিক্ষকদের বেতন	৬৫৩০ টাকা
খ	স্কুলবাড়ী সারানো	১০৮০ „
গ.	অন্যান্য খরচ	৭৫০ „
ঘ.	লাইব্রেরী	২৭৩৫ „

উপাত্তগুলিকে শতকরা হারে পরিবর্তিত কর এবং বৃত্তলেখে বিভিন্ন অংশ নির্দেশ কর।

৪. ৩নং সারণীতে প্রদত্ত উপাত্তগুলিকে বৃত্তলেখে রূপান্তরিত কর।

৫. কম্যুনিটি শিক্ষা কাকে বলে? আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে এর পার্থক্য কি?

৬. কম্যুনিটি শিক্ষায় যে ধরনের উপকরণ সাধারণত ব্যবহার করা হয়, সেগুলি সম্পর্কে উল্লেখ কর এবং ঐগুলি কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় তা বর্ণনা কর।

৭. কম্যুনিটি শিক্ষাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং প্রত্যেক শ্রেণীর প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. ডায়াগ্রাম অঙ্কনের পদ্ধতি কি? কম্যুনিটি শিক্ষায় ডায়াগ্রামের প্রয়োজনীয়তা কি?

৯. চার্ট কাকে বলে? কয়টি ভাগে চার্টকে ভাগ করা যায়। অঙ্কনের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকার চার্টের একটি উদাহরণ দাও।

১০. মডেল কিভাবে প্রস্তুত করা যায়? মাটি দিয়ে পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও নদী প্রবাহের মডেল তৈরি কর।

১১. ছবি অঙ্কনের পদ্ধতি কি? কিভাবে কম্যুনিটি শিক্ষায় ছবি সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়।

১২. 'কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই' এবং 'বড় হওয়া ভালো, কিন্তু আরও বড় হল ভাল হওয়া'—এই দুটি বাক্য চার্টের মাধ্যমে কম্যুনিটি শিক্ষার উপযোগী করে প্রস্তুত কর।

১৩. ইতিহাসের যে কোন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে কালানুক্রমিক চার্ট প্রস্তুত কর।

১৪. শিশু সেনসাস কিভাবে নিতে হয়? কি ধরনের বিবরণ এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়? শিক্ষা সার্ভের সঙ্গে শিশু সেনসাসের সম্পর্ক কি?

উইল্‌হেল্‌ম ভুণ্ড
Wilhelm Wundt
১৮৩২-১৯২০

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লীপ্‌জীগ সহরে প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। মনোবিজ্ঞানের অবয়ববাদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।
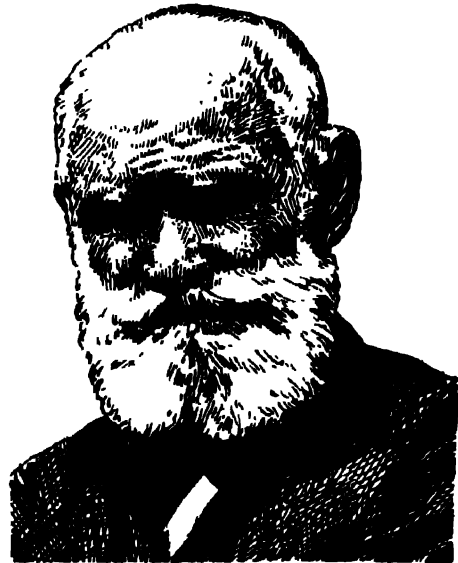
ইভান পেট্রোভিচ প্যাভলভ
Ivan Petrovitch Pavlov
১৮৪৯-১৯৩৬

বিখ্যাত রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভেষজবিদ্যা (medicine) সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পান। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত।

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড
Sigmund·Freud
১৮৫৬-১৯৩৯

মনোবিজ্ঞানের মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের আবিষ্কারক। তাঁর মতে, মানুষের নির্জ্ঞানমনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। একে গভীরতা মনোবিজ্ঞান বলা হয়।

রবার্ট এস্. উড্‌ওয়ার্থ
Robert S. Woodworth
১৮৭০-১৯৫৯

উড্‌ওয়ার্থকে বলা হয় গতীয় মনোবিদ্যার (Dynamic Psychology) সমর্থক। উড্‌ওয়ার্থের মতে মন গতিশীল এবং মানুষের আচরণ কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ।

উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল
William Mcdougall
১৮৭১-১৯৩৮

মনোবিজ্ঞানের হরমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। মানুষের সকল কাজই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং তা কখনই যান্ত্রিকভাবে ঘটে না—সেটাই হরমিক স্কুলের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এডওয়ার্ড লি থর্নডাইক
Edward Lee Thorndike
১৮৭৪-১৯৪৯

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী। বিশেষভাবে প্রাণী-মনোবিজ্ঞানীরূপে খ্যাত। প্রাণীদের শিখন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য ইনি খ্যাতি লাভ করেছেন।
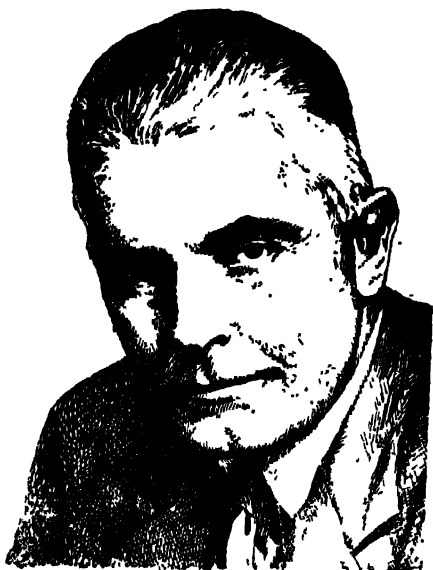
জে. বি. ওয়াট্‌সন
Joh Broadus Watson
১৮৭৮-১৯৫৮

মনোবিজ্ঞানেব আচবণবাদী স্কুলেব প্রতিষ্ঠাতা। মনোবিদ্যা ব্যক্তিব আচবণেব বিজ্ঞান। আচবণবাদীদেব মতে আচবণ হল উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া এককেব সমষ্টি।

উল্‌ফ গ্যাঙ্গ কোয়েলার
Wolf Gang Kohler
১৮৮৭-১৯৪৩

জার্মান মনোবিজ্ঞানী। মনোবিজ্ঞানে গেস্টাল্ট স্কুলেব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শিম্পাঞ্জীদের শিখন সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য বিখ্যাত।

দ্বিতীয় পত্র

● প্রথম খণ্ড ●

১. শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

২. শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা—শিশুর প্রক্ষোভ, আগ্রহ ও মনোভাব

৩. শিশুর শিখন : শিখনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন কৌশল

১

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

EDUCATION AND PSYCHOLOGY : EDUCATIONAL PSYCHOLOGY—ITS NATURE AND FUNCTIONS

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের জানতে হবে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে। শিক্ষার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য নিয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আলোচনা করছি মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

মনোবিজ্ঞান কথাটির মধ্যে 'বিজ্ঞান' শব্দটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা জানি, প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশের সুশৃঙ্খল আলোচনার নামই বিজ্ঞান। এরূপ সুশৃঙ্খল আলোচনার মাধ্যমেই আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে নিয়ম বা সাধারণ সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি।

প্রকৃতিকে আমরা সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা—১. জড়, ২. প্রাণ ও ৩. মন। কতকগুলি বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির আলোচনা করে। এগুলিকে আমরা বলি **জড় বিজ্ঞান** (Material Science), যেমন—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি। কতকগুলি বিজ্ঞান কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে, এগুলি হচ্ছে প্রাণিবিজ্ঞান (Biological Science)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, জীববিদ্যার নামোল্লেখ করা যায়। এছাড়া আর কতকগুলি বিজ্ঞান আছে যেগুলি মনের (Mind) প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে। এগুলিকে বলে মনের বিজ্ঞান বা মনঃসম্পর্কীয় বিজ্ঞান। আমাদের **মনোবিজ্ঞান** এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস

মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানাবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আমরা দেখি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল দর্শনের অন্তর্গত। অবশ্য প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে প্রায় সকল বিষয়ই দর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রাচীনযুগে মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ঐগুলির সমস্তটাই বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য না হলেও আমরা বর্তমানে ঐ মনীষীদের নিকট নানাভাবে ঋণী। প্রাচীনযুগে তাঁরা যে সকল তত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন, তার অনেকগুলি এখনও যথেষ্ট সমাদরের

সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ সেই যুগে মানুষের আচরণ নিয়ে সযত্ন ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের নিয়ম অজানা ছিল, মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের কথা সেইযুগে ওঠেই না।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। অবশ্য জীববিদ্যা (Biology) পৃথক ও স্বাধীন জীবন আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ ওয়েবার (Weber), ফেক্‌নার (Fechner), হেলম্‌-হোলজ্‌ (Helmholtz) এবং অল্ড হারিং (Ewald Hering) প্রভৃতির গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হল যে, মানুষের আচরণ তার শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অবশ্য শারীরতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের চুলচেরা পার্থক্য নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে, উভয় দলই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথা, কান, নাক ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিয়ে পরীক্ষা চালান এবং ঐগুলির কাজ সম্পর্কে নানা তথ্য আহবণ কবেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপ বোঝা গেল যে, শারীরতত্ত্ববিদেরা জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়েব কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য আহরণ কবেন, তবে ঐ ইন্দ্রিয়গুলি যখন জীবের নিজস্ব কাজকর্মেব সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থাৎ শারীরতত্ত্ববিদদের চর্চার বিষয় হল শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী অর্থাৎ শ্বসন প্রণালী (Respiration), রক্তচলাচল প্রক্রিয়া (Blood circulation), হজম প্রক্রিয়া (Digestion) প্রভৃতি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনাব বিষয় হল জীবের সামগ্রিক আচরণ অর্থাৎ যখন বাইরেব কোন উদ্দীপক জীবের উপব প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং আচরণটি ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময় কালেব মধ্যে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চর্চার জন্য মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগাব স্থাপন করেন। ৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দটি মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় কাল। ঐ বৎসবে জার্মানীর লাইফ্‌জীগ শহরে বিখ্যাত জার্মান মনোবিজ্ঞানী উইলহেলম্‌ ভুণ্ড (Wilhelm Wundt) মনোবিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। ভুণ্ডকে আধুনিক **ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের** জনক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ধীরে ধীরে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। সমাজবিজ্ঞানেব যে শাখাগুলি মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পডল তারা হল সমাজতত্ত্ব (Sociology), মানববিদ্যা (Anthropology) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political science)। এটি অবশ্য স্বাভাবিক পরিণতি, কারণ দেখা গেল মানুষের আচরণ প্রধানত সমাজ নির্ভর। উপরের আলোচনা থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের স্থান হল জীববিদ্যা (Biology) ও সমাজ বিজ্ঞানের (Social sciences) মাঝামাঝি। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে তার ঝোঁক নেই ; দুই দিকেই তার সমান সম্পর্ক। এই সম্পর্কের একদিকে রয়েছে শারীর-মনোবিজ্ঞান (Physiological psychology) এবং শারীর-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে যুক্ত করেছে জীববিদ্যার সঙ্গে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান যুক্ত রয়েছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ-মনোবিজ্ঞানের (Social psychology) মারফত।

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকে, মনোবিজ্ঞানের তেমন নির্দিষ্ট বিষয় আছে। মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিষয় হল মনের কার্যকলাপ। প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল, ঐ বিভাগেব বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত বা সার্বিক নিয়ম আবিষ্কাব কবা। মনোবিজ্ঞানও মন সম্বন্ধে সাধারণ বা সার্বিক নিয়ম আবিষ্কার করে থাকে। প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিব সাহায্যে যথানির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা কবে। মনোবিজ্ঞানও অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রয়োগ-পদ্ধতির মাধ্যমে সুশৃঙ্খল-ভাবে নিজ বিষয়ের আলোচনা করে। বিজ্ঞান যেমন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রসব হয় বলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কবতে পাবে, মনোবিজ্ঞানও তদ্রূপ অন্তর্দর্শন ও পযবেক্ষণের মিলিত প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে নিশ্চিত ফল বের করতে সচেষ্ট থাকে। এ ছাডা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিজ্ঞানও তার ফলগুলি গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে নিখুঁত কববার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে গণিত এবং পরি-সংখ্যানের বহুল প্রয়োগ হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সংজ্ঞার ক্রমবিকাশ

মন সম্বন্ধে বিদ্যাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞান। কাজেই মন বলতে আমরা কি বুঝি মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তার উপব নির্ভরশীল। মনেব ধারণা বদলাবাব সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে। আজ আমবা মনোবিজ্ঞানকে একটি প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র (**Established discipline**) হিসেবে দেখতে পাচ্ছি ঠিক এবং হাতের কাছে এই শাস্ত্রের একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞাও পেয়ে যাচ্ছি—এ কথাও সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে একদিনেই এই সংজ্ঞা গডে ওঠে নি। অনেক বাদ-প্রতিবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক মতান্তর ও মনান্তরেব মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে এই সংজ্ঞা। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে মনোবিজ্ঞানের নানারকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখন আমরা ক্রমবিকাশেব দিকে লক্ষ্য রেখে প্রধান সংজ্ঞাগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখব।

প্রথম পর্যায় : আত্মাসম্পর্কিত বিজ্ঞান

ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যাযে আমরা দেখতে পাই মনোবিজ্ঞানকে আত্মা-সম্পর্কিত বিজ্ঞান (**Science of the soul**) বলে অভিহিত করা হয়েছে। **Psychology** কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ **'Psyche'** এবং **'Logos'** থেকে। **Psyche** কথাটির অর্থ হল **Soul** বা আত্মা এবং **Logos** কথার অর্থ হল **Science** বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইংরাজী **Psychology** কথাটির অর্থ দাঁডাল—আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকরা এই সংজ্ঞার প্রবক্তা। এঁরা মনে করেন, মনোবিজ্ঞানের কাজ হল আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা। মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন বা অধিবিদ্যার (**Metaphysics**) অংশরূপে গণ্য করা

হয়েছে। এছাড়া মন ও আত্মা কখনই এক নয় এবং আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

দ্বিতীয় পর্যায় : মনঃসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান

ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে মনঃসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Science of the mind) বলে অভিহিত করা হয়েছে। হোফ্‌ডিং (Hoffding) প্রমুখ অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকরা এই মতের প্রবর্তক। এই সংজ্ঞাটিও গ্রহণীয় নয়, কারণ 'মন' কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং মন কাকে বলে, সে সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ নীরব। এ ছাড়া সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। মনোবিজ্ঞানকে মনঃসম্বন্ধীয় বিদ্যা বলে অভিহিত করলে নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব এগুলিকেও মনোবিজ্ঞান বলে মেনে নিতে হয়, কারণ এগুলি সবই মনের বিদ্যা। এ ছাড়া মনোবিজ্ঞান কি জাতীয় বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ (Positive) না, আদর্শনিষ্ঠ (Normative)—এই সংজ্ঞাতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মনোবিজ্ঞান হচ্ছে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান , মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেভাবে ঘটে, সেভাবে সেগুলি ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। কোন আদর্শেব (Norm) আলোকে মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করে না।

তৃতীয় পর্যায় : চেতনার বিজ্ঞান

তৃতীয় পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Science of the con ciousness) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দেকার্তে (Descartes) প্রমুখ দার্শনিকরা এই মতের পরিপোষক। এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ এতে মনোবিজ্ঞানকে শুধু মনের বিদ্যা বলে অস্পষ্ট রাখা হয়নি। এতে মনের স্বভাবের কথা পরিস্ফুটভাবে বলা হয়েছে। চেতনাই হচ্ছে মনেব স্বভাব। তবুও এই সংজ্ঞা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। মন বলতে কেবল চেতনাই বোঝায় না। চেতনাব নিম্নে মনের আরও কয়েকটি স্তর আছে, যারা মনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যেমন—অন্তর্জ্ঞান (Sub-conscious), আসংজ্ঞান (Pre-conscious) এবং নির্জ্ঞান (Unconscious)। এ ছাড়া মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যদি 'চেতনা' হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ (Positive) এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical) বলা চলে না, কেননা 'চেতনা' বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (Ob ervation and Experiment)-এর উপরই মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

চতুর্থ পর্যায় : আচরণ বিজ্ঞান

ক্রমবিকাশের চতুর্থ পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Science of human behaviour) বলে অভিহিত করা হয়েছে। ওয়াটসন (Watson) প্রমুখ আচরণবাদী মনোবৈজ্ঞানিকরা এই সংজ্ঞার নির্দেশক। এঁদের মতে মানুষের আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এঁরা নিছক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মানুষের এই আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এঁদের মতে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার

ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। এঁরা বলেন— আচরণের পশ্চাতে কোনই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা নেই। কাজেই উদ্দেশ্যমূলক কার্য-কারণ সম্পর্কের (Teleological causation) আশ্রয় গ্রহণ না করে যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের (Mechanical causation) মাধ্যমেই এঁরা জীবের আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য এই সংজ্ঞা ত্রুটিমুক্ত নয়। জীবের আচরণ কখনই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হতে পারে না, এর পেছনে উদ্দেশ্যাভিমুখিতা থাকবেই। এ ছাড়া এই সংজ্ঞাটি মনোবিজ্ঞান থেকে মন, চেতনা, অন্তর্দর্শন প্রভৃতিকে একেবারে নির্বাসিত করেছে।

পঞ্চম পর্যায় : বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান

পঞ্চম পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive science of the behaviour of living things আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকরা এই সংজ্ঞার নির্দেশক। এঁরা যান্ত্রিক আচরণবাদী নন, উদ্দেশ্যমুখী আচরণবাদী। এঁরা জীবের আচরণকে মনের বাহ্য প্রকাশরূপেই গ্রহণ করেন। এদের মতে জীবের প্রতিটি আচরণের পশ্চাতেই রয়েছে উদ্দেশ্যাভিমুখিতা। জীবের আচরণের ব্যাখ্যার জন্য এঁরা উদ্দেশ্যমূলক কার্য-কারণ সম্পর্কের (Teleological causation) আশ্রয় গ্রহণ করেন। এঁদের মতে জীবের আচরণের মাধ্যমে মনকে জানাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের কাজ। এই সংজ্ঞা বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য হলেও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। মনকে উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত রূপে গ্রহণ করায় মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা কিছুটা রহস্যাবৃত হয়ে পড়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায় : পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আচরণ বিজ্ঞান

ক্রমবিকাশের ষষ্ঠ পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Science of the activities of the individual in relation to his environment) বলে অভিহিত করা হয়েছে। উড্ওয়ার্থ (Woodworth) প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকরা এই ধরনের সংজ্ঞার প্রবর্তক। এঁদের মতে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। মানুষের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্যই প্রকাশ পায়, সেজন্য তার আচরণ বা ক্রিয়াকলাপকে বুঝতে হলে পারিপার্শ্বিককেও বুঝতে হবে। মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। 'ব্যক্তি' বলতে এঁরা শুধু দেহকে না বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বুঝেছেন। এঁদের মতে জীবনের যে কোন প্রকাশই ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত। বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য হলেও এই সংজ্ঞাকেও ঠিক পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না, কারণ এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করেছে বলে মনে হয়। অস্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান মানস অবস্থাগুলিকে মানসক্রিয়া বলা যায় কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এ ছাড়া স্নায়ুমণ্ডলী, পেশী, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ইত্যাদি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

মানসিক কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই সংজ্ঞাটিকে এ সম্পর্কে নীরব বলেই মনে হয়।

মনোবিজ্ঞানের গ্রহণীয় সংজ্ঞা

উপরে যে সংজ্ঞাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল তাদের কোনটিই সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক নয়। প্রত্যেকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু-না-কিছু গ্রহণযোগ্য সত্য নিহিত আছে। আবার প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটিও রয়েছে। এই সব গ্রহণযোগ্য সত্য ও বর্জনযোগ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মূল্যবান মতামতের আলোকে মনোবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা গঠনের চেষ্টা করা যেতে পারে। **মনোবিজ্ঞান হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে তার মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলিরও বর্ণনা করে।**

মনোবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ

মানসিক আচরণ সম্পর্কে চর্চা ও অনুসন্ধান একটি জটিল বিষয় সন্দেহ নেই এবং বহুবিধ বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত। চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্কের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শারীরতত্ত্বের সম্পর্ক খুব নিবিড়। আবার যখন আমরা মনোভাব (Attitudes), মতামত (Opinions) ও প্রচার (Propaganda) সম্পর্কে আলোচনা করি তখন দেখি মনোবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এই দুই প্রান্তসীমার মধ্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানাবিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছেন। মানুষের দক্ষতা (Ability), বুদ্ধি, প্রক্ষোভ, উদ্দেশ্য বা প্রেষ (Motive), স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব এবং শিশুর জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন ধারা এবং স্বভাবী ও অস্বভাবী শিশুদের আচরণ সম্পর্কে চর্চা সবই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য সীমার অন্তর্গত। মনোবিজ্ঞান মানব আচরণের বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আবার মানব আচরণের কোন কোন বিষয় বিশেষায়িতভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। মনোবিজ্ঞানকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী নানা শাখায় ভাগ করা হয়েছে। এইসকল শাখায় কোন কোন বিভাগে জোর দেওয়া হয়েছে তত্ত্ব ও প্রকল্পের দিকে, কোন কোন শাখার কাজ হচ্ছে ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। মনোবিজ্ঞানের যে শাখা আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে তাকে বলা হয় **ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান** (Applied psychology)। অবশ্য আমরা মনে করি না যে, বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Pure psychology) ও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের মধ্যে চুলচেরা কোন ভাগ করা যায়। আজ মনোবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলি তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে, কাল হয়তো তার প্রয়োজন হবে কোন ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের জন্য। মনোবিজ্ঞানের যে শাখাগুলি ব্যবহারিক (Practical) বিজ্ঞান হিসাবে প্রাধান্যলাভ করেছে সেগুলি হল মানসিক রোগচিকিৎসা সংক্রান্ত বা **নিদান মনোবিজ্ঞান**

(Clinical psychology) এবং শিল্পসংক্রান্ত মনোবিজ্ঞান (Industrial psychology)।

আধুনিক ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান যেসকল তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, প্রথম দিকে সেগুলি একমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়ে ছিল। আবার অন্যদিকে ব্যবহারের আলোকে মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পেরও পরিবর্তন করা হচ্ছে।

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **শারীর-মনোবিজ্ঞান** (Physiological Psychology): এই বিভাগে মনোবিজ্ঞানের সেইসব বিষয়গুলি আলোচনা হয়, যেগুলি আমাদের দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ, গ্রন্থি (Glands), বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense organs), কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতির কাজের সঙ্গে যুক্ত। শারীর-নির্ভর আচরণ বৈশিষ্ট্য এই বিভাগের আলোচনার বিষয়।

২ **তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান** (Comparative Psychology): মনোবিজ্ঞানের এই বিভাগে আলোচিত হয়, প্রাণিমনস্তত্ত্ব ও প্রাণীদের আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য প্রাণীরাই উপযুক্ত পাত্র (Subject)। কারণ প্রাণীদের পরীক্ষাগারের নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে সহজেই আনা যায়, যেটি মানুষকে নিয়ে করা সম্ভব নয়। এইভাবে পরীক্ষালব্ধ ফল বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণ: যেমন, থর্নডাইকের বিড়ালকে নিয়ে শিখন সম্পর্কিত পরীক্ষা, এবং কোয়েলারের শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে পরীক্ষা।

৩. **শিশু-মনোবিজ্ঞান** (Child Psychology): মনোবিজ্ঞানের এই বিভাগে শিশুর জন্ম থেকে কৈশোর কালের জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন ধাপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় এই বিভাগেও আলোচিত হয়। শিশুর শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, শিশুর ভাষা-বিকাশ, সকল বিকাশ-বৈশিষ্ট্যই এই বিভাগের অন্তর্গত।

৪ **জনি বা প্রচয় মনোবিজ্ঞান** (Developmental Psychology or Genetic Psychology): মনোবিজ্ঞানের এই শাখায় আলোচিত হয় জন্ম থেকে বয়স্কস্তর পর্যন্ত শিশুর আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। শিশু-মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় এই বিভাগেও আলোচনা করা হয়। শিশু মনোবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জনি মনোবিজ্ঞানের শাখা।

৫. **প্রয়োগিক মনোবিজ্ঞান** (Experimental Psychology): মনোবিজ্ঞানের যে বিভাগ ল্যাবরেটরীর কৃত্রিম পরিবেশে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করে এবং লব্ধ ফলগুলি আলোচনা করে, তাকে প্রয়োগিক মনোবিদ্যা বলে। তাত্ত্বিক মনোবিদ্যা নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় কোন কিছু পরীক্ষা

করে না'। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় প্রয়োগিক মনোবিদ্যার সূত্রপাত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভুণ্ডের মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপনের পর থেকে।

৬. **সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)**: সামাজিক মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মনোবিজ্ঞানের সেই অংশ যেখানে সামাজিক আচার-আচরণকে মনোবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। সামাজিক মনোবিজ্ঞানে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, রীতিনীতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

৭. **অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)**: পূর্বে অস্বভাবী ব্যক্তিদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করা হতো। মনে করা হত, রোগীকে ভূতে পেয়েছে এবং ভূতের রোঝা ডেকে ভূত তাড়াবার চেষ্টা করা হতো। নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র ও রোঝার সাহায্যে 'উত্তম-মধ্যম' দাওয়াই দিয়ে রোগ উপশমের চেষ্টা করা হতো। আধুনিক অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগীব অস্বাভাবিক আচরণের পিছনে রয়েছে মানসিক কোন কারণ। এই বিভাগে যে সকল মনোবিজ্ঞানী স্থায়ী কাজ ও গবেষণা করে নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, তাব মধ্যে সিগমণ্ড ফ্রয়েড, য়ুঙ্গ ও অ্যাড্‌লারের নাম উল্লেখযোগ্য।

৮ **শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)**: শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রয়োগিক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। এই বিভাগে শিখন (Learning) সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার নিয়ম বা সূত্রগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ কবা হয়। শৈশবকাল থেকে বয়স্কস্তর পর্যন্ত শিশুর বিকাশের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে এবং শিক্ষা কিভাবে এই বিকাশকে মার্জিত ও সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কবে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তাই আলোচনা করে।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণত পরিণত মন অপেক্ষা শিশু ও কিশোর মন নিয়ে বেশি আলোচনা করে। তবে আজকাল প্রত্যেক দেশেই সামাজিক শিক্ষা তথা বয়স্ক শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই হিসাবে বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব আলোচনাও আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচনার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে মনোবিজ্ঞানকে আরও বহুভাবে ভাগ করা হয়েছে, যেমন পার্থক্যজ্ঞাপক মনোবিজ্ঞান (Differential psychology), শিল্প মনোবিজ্ঞান (Industrial psychology), ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (Experimental psychology), ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞান (The psychology of personality), মহাশূন্যদেশ মনোবিজ্ঞান (Space psychology), বৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান (Vocational psychology), অভীক্ষা মনোবিজ্ঞান (Psychology of testing) ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা স্কুল*

উপরে আমরা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলোচনার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা বা বিভাগ গঠন করা হয়।

* উন্নততর পর্যায়ে অতিরিক্ত পাঠ্য।

কিন্তু অন্য একভাবে মনোবিজ্ঞানীদের ভাগ করা হয়। আলোচনার ধারা, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি বা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল ধারণা অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা স্কুল গঠিত হয়।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মোটামুটি কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ঐগুলি হল—১. অবয়ববাদী (Structuralist), ২. ক্রিয়াবাদী (Functionalist), ৩ আচরণবাদী (Behaviourist), গেস্টাণ্ট বা সমগ্রবাদী (Gestalist), ৫. উদ্দেশ্যবাদী (Hormic) এবং ৬. মনঃসমীক্ষণবাদী (Psychoanalyticalist)।

আমাদের শিক্ষাতত্ত্বে উপরের সম্প্রদায় বা স্কুলগুলির প্রভাব কম-বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে অবশ্য মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বা প্রভাব তেমন দেখা যায় না। কিন্তু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে তার ভিত্তিতে উপরোক্ত ৬টি সম্প্রদায় বা স্কুলের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

অবয়ববাদ (Structuralism): অবয়ববাদী স্কুলের পিছনে দুইজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর প্রভাব দেখা যায়। এরা হলেন উইলহেলম্ ভুণ্ড (Wilhelm Wundt) এবং টিচেনার (Edward Bradford Titchener)। ভুণ্ডকে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয়, কারণ তিনিই প্রথম জার্মানীর লাইফ্‌জিগ্‌ শহরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন। ভুণ্ডের নিকট মনোবিজ্ঞানের গবেষণা করবার জন্য বহুদেশের তরুণ মনোবিজ্ঞানীরা লাইফ্‌জিগে সমবেত হন। টিচেনার ছিলেন একজন ইংরেজ। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং বহু বৎসর ঐ পদে কাজ করেন।

ভুণ্ডের প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী টিচেনার যে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ স্কুল স্থাপন করেন তাকে বলা হয় অবয়ববাদ (Structuralism)। অবয়ববাদের অর্থ হল যে, মন একটি যৌগিক পদার্থ এবং কতকগুলি মূল অবয়ব বা অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। ভুণ্ড বলেন যে, মনোবিদ্যা হল আন্তর (Internal) অভিজ্ঞতার বিদ্যা। মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রতিরূপ (Image), চিন্তা এবং সংবেদন (Feeling)-এর আলোচনা করা এবং এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে মনের চেতনা (Consciousness) গঠিত হয়। ভুণ্ড ও তাঁর সহকর্মীরা আচরণের শারীরিক ভিত্তি, প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, প্রতিরূপ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

ক্রিয়াবাদ (Functionalism): ক্রিয়াবাদীরা মনের গঠন আলোচনা না করে তার কাজ বা ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। মনোবিজ্ঞানীরা মনকে একটি সত্তা হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী নন। তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের মনের **কাজটি** (Functions) প্রধান। ক্রিয়াবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন

উইলিয়াম জেমস্ এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষা-দার্শনিক জন ডিউই। ক্রিয়াবাদীদের মতে পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনই প্রাণীর প্রধান ধর্ম। সুতরাং মনোবিজ্ঞানীদের কাজ হল প্রাণী কিভাবে পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের চেষ্টা করে তা অনুসন্ধান করা। ক্রিয়াবাদীদের মতবাদ মনোবিজ্ঞানকে জীববিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করেছে। ক্রিয়াবাদীরা তাদের কার্যকলাপ প্রধানত শিখন প্রক্রিয়ার (**Learning processes**) মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

আচরণবাদ (**Behaviourism**) **:** এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জন বি ওয়াটসন (**John B. Watson, ১৯১৪**)। প্রকৃত পক্ষে ওয়াটসন ছিলেন জনস হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালযের একজন প্রাণী মনোবিজ্ঞানী। তিনি অবয়ববাদীদেব কার্যকলাপে অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে, মনোবিজ্ঞানকে অবয়ববাদীবা একটি সংকীর্ণ মতবাদের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। অবয়ববাদীদের অন্তর্দর্শন (**Introspection**) পদ্ধতি তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। ওয়াটসনের মতে মনোবিজ্ঞানীদের কাজ হল প্রাণীর আচবণ পর্যবেক্ষণ কবা (**to study behaviour**), চেতনা পরীক্ষা করা নয়। ওয়াটসনের মতে কোন প্রাণীব উপব উদ্দীপকের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কি, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হল মনোবিজ্ঞানেব কাজ। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা এবং কি ধবনের উদ্দীপক কি প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবে সেই সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করবেন। আচবণবাদীরা যে সকল বিষয় নিযে তাদেব পরীক্ষা কবেন তা হল শিখন (**Learning**), প্রেষণা (**Motivation**), প্রক্ষোভ (**Emotion**) এবং ব্যক্তির বিকাশেব ধারা। বিখ্যাত রাশিযান **শারীরতত্ত্ববিদ পাভলোভের** সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ সম্পর্কে পরীক্ষণ এই পর্যাযে পডে। ওযাটসন পাভলোভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতবাদ দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হন।

গেস্টাল্ট স্কুল (**Gestalt**) **:** গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞান অবয়ববাদ ও আচরণবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রসিদ্ধ জার্মান মনোবিজ্ঞানী কোয়েলার (**Wolfgang Kohler**), এবং কফ্‌কা (**Kurt Koffka**) হলেন গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রধান। গেস্টাল্টবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা ও আচবণকে চেতনার উপাদান হিসাবে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ কবা যায় না। আচরণবাদীদেব মত একে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার (**Stimulus-Response**) অর্থাৎ **S—R** সূত্রে একে ফেলা যায় না। গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন আচরণ ও অভিজ্ঞতা একটি সম্পূর্ণ বিষয় এবং একে পৃথক অংশে ভাগ করা যায় না। তবে অবশ্য একথা ঠিক যে সমগ্রের সঙ্গে অংশের একটি সম্পর্ক আছে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের কাজ প্রধানত তিনটি বিষয়ে, যথা প্রত্যক্ষণ, শিখন এবং চিন্তন।

মনঃসমীক্ষণবাদ (**Psychoanalysis**) **:** মনঃসমীক্ষণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফ্রয়েড (**Sigmund Freud**)। ফ্রয়েড ছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং যে তত্ত্ব প্রণয়ন করেন তাকেই মনঃসমীক্ষণ বলে। মনঃসমীক্ষণ মনোবিদ্যা যেমন ব্যক্তির

অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে, তেমনি মনের রোগের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করে। একে **গভীরতা মনোবিজ্ঞানও** (Deapth psychology) বলে। মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল ব্যক্তির অচেতন মন সম্পর্কে অনুসন্ধান। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব প্রদান করেছে। যথা— প্রেষণা (Motivation), ব্যক্তিত্বের গঠন, অস্বভাবী আচরণ ইত্যাদি। ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের পশ্চাতে যে নির্জ্ঞান মনের প্রভাব রয়েছে এবং ব্যক্তির আচরণের অসঙ্গতির কারণ যে তার নির্জ্ঞান মনস্তরে নিহিত মনঃসমীক্ষণ এই সকল বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

উদ্দেশ্যবাদী মনোবিজ্ঞান (Hormic Psychology): উইলিয়াম ম্যাকডুগাল উদ্দেশ্যবাদী মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সব আচরণের মূলে একটি উদ্দেশ্য আছে। আচরণেব অর্থ হল উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা। ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সকল প্রচেষ্টার পিছনে বয়েছে মৌলিক প্রেষ (Motive)। সহজাত প্রবৃত্তি (Instincts) হল প্রাণীর সকল প্রচেষ্টার মূল প্রেষক। সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রক্ষোভ।

ম্যাকডুগাল ১৪টি সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা দিয়েছেন। যেমন, পলায়ন একটি সহজাত প্রবৃত্তি, খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজাত প্রবৃত্তির অনেক পরিবর্তন ঘটে। একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি একত্র যোগে সেন্টিমেণ্ট বা রস গঠন করে। যেমন, 'দেশপ্রেম' একটি রস। রসটি গড়ে ওঠে কোন আদর্শকে কেন্দ্র করে। ম্যাকডুগাল উদ্দেশ্য অনুযায়ী মনোবিদ্যাকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেছেন, যেমন, সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social psychology), অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (Abnormal psychology) ইত্যাদি। শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবাদীদের যথেষ্ট অবদান আছে। কারণ শিশুর শিক্ষালাভের পিছনে সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের প্রভাব রয়েছে।

ম্যাকডুগাল যে ১৪টি সহজ প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি শিক্ষা-লাভের জন্য সবিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। যেমন যূথ প্রবৃত্তি। এই যূথ প্রবৃত্তির জন্য প্রাণীরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। আমরা স্কুলে যে ছেলে-মেয়েদের শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা করি, এর পেছনেও রয়েছে এই যূথ প্রবৃত্তি। সঞ্চয় প্রবৃত্তি আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। নানা জিনিস আমরা সংগ্রহ করতে ভালবাসি। শিশুরা নানা জিনিস সঞ্চয় করতে ভালবাসে এবং শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করেন, এই প্রবৃত্তির বশে শিশু যেমন বাল্যকালে ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, তেমনি পরবর্তীকালে বেঁচে থাকার জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করে। নির্মাণ প্রবৃত্তি হল কোন কিছু হাতে-কলমে গড়ে তোলবার প্রবৃত্তি। স্কুলে যে শিশুরা নানাবিধ হাতের কাজ করতে ভালবাসে, তার পিছনে এই প্রবৃত্তি কাজ করছে। বর্তমানে যে বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সপক্ষে বলা যায় যে, এটি শিশুদের নির্মাণ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করবে।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান : উভয়ের সম্বন্ধ

শিক্ষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করা হল। এখন আমরা দেখব এই দুয়ের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রাচীন চিন্তাবিদদের চিন্তাধারায় শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সংব্যাখ্যানে বলেন, শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের উপায় স্বরূপ মেনে নিলে, মানব-প্রকৃতির জ্ঞান ব্যতিরেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। তাঁর রিপাবলিক্ (Republic) গ্রন্থে তিনি মানব-প্রকৃতির একটি ব্যাখ্যা এবং সে প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর ব্যাখ্যা অনুসারে শিক্ষকের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সমানভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। যদিও বাস্তবক্ষেত্রে প্রাচীন শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কোন প্রভাবই স্বীকৃত হয়নি এবং যদিও তখন মনোবিজ্ঞান ছিল দর্শনেরই কুক্ষিগত তবুও প্রাচীন চিন্তানায়করা শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

আমরা জানি, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষা বলতে মানুষের আচরণের সার্থক, সংহত, বাঞ্ছিত ও সমাজসম্মত পরিবর্তনকেই বোঝায়। বলা বাহুল্য মনোবিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞান না থাকলে মানুষের আচরণে এইরূপ পরিবর্তন ঘটানো বা বাঞ্ছিত নতুন নতুন আচরণের সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ, মনোবিজ্ঞান হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। আচরণের মৌলিক সূত্রের জ্ঞান শিক্ষাশাস্ত্র মনোবিজ্ঞান থেকেই গ্রহণ করে এবং নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে প্রয়োগ করে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষাশাস্ত্র মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাশাস্ত্রের কাছে ঋণী। কারণ, মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিক্ষাশাস্ত্র মনোবিজ্ঞানের নীতি ও নিয়মগুলির যথার্থতা বিচার করে।

মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির জ্ঞান প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের কাছে অপরিহার্য। যে বিষয়টি শেখাতে হবে সেই বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট নয়। যাকে শেখাতে হবে তার সম্বন্ধেও শিক্ষকের জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থাৎ জনকে ল্যাটিন শেখাতে গেলে কেবল ল্যাটিন জানলেই চলবে না, জনকেও জানতে হবে (স্মরণীয়—"The teacher teaches John Latin."—Adams.)। জনের বুদ্ধিবৃত্তি, আগ্রহ, প্রবণতা, স্মৃতিশক্তি, মনোযোগের ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষক কখনই তাকে সুষ্ঠুভাবে ল্যাটিন শেখাতে পারবেন না। আর এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের তথ্যই তাঁকে সাহায্য করতে পারে। এখানে আর একটি কথা আছে। জনকে জানাটাও বোধ হয় শেষ কথা নয়। শিক্ষক নিজেকেও জানবেন। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'। সক্রেটিস বলেছেন, 'Know thyself'। এই আত্মজ্ঞানের সহায়ক মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান

অবশ্যই আত্মবিদ্যা নয়। কিন্তু আত্মবিজ্ঞান যে মনোবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে হতে পারে না এটাও ঠিক। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষাকে আমরা দুটি দিক থেকে ভেবে দেখতে পারি। একটি হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনার দিক (System of education) এবং অপরটি হচ্ছে এর প্রক্রিয়াগত দিক (Process of education)। শিক্ষার এই যে প্রক্রিয়ার দিক, এর সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই গভীর। মনোবিদ্যার সাহায্যেই শিক্ষা-প্রক্রিয়ার যথাযথ বিশ্লেষণ, শ্রেণীবিভাগ, গতি-প্রকৃতি নির্ণয় ও পরিণামের সংব্যাখ্যান সম্ভবপর। শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সত্যিই সহজ করে তুলেছে। মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া এবং নানা আচরণগত সমস্যার (Behaviour problems) গতি-প্রকৃতি আলোচনার দ্বারা মনোবিজ্ঞান সত্যিই শিক্ষা পদ্ধতির খুব সহায়ক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান-প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কমেনিয়াস, লক্, রুশো প্রমুখ চিন্তানায়করাই সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বমূলক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এঁরা সকলেই বলেন, কেবল বিষয়বস্তু জানলেই হবে না, শিক্ষকের পক্ষে তাঁর শিশুকেও জানা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে আবার রুশোই শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেন। শিক্ষাকে মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মূলে রুশোর অবদান সর্বজনবিদিত। কমেনিয়াস, লক্, রুশো—এঁরা সকলেই ছিলেন তাত্ত্বিক। এর পর আসেন পেস্টালৎসি। তাঁকেই আমরা মনোবিজ্ঞান-আন্দোলনের পুরোহিত বলে অভিহিত করতে পারি। তিনিই সর্বপ্রথম মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ করলেন এবং সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, শিক্ষকদের নিকট শিশুর মনই হল প্রধান বিষয় এবং শিক্ষা শিল্পটি মনোবিকাশের নিখুঁত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে স্থির করতে হবে (the mind of the pupil is the primary concern of the educator, and that the art of education must be based on an accurate knowledge of mental processes') এঁর পর যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁদের মধ্যে আমরা বিশেষ করে ফ্রীডরিক হারবার্ট ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরির নামোল্লেখ করতে পারি। বলা বাহুল্য, এই সব শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান আজ একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাকে আমরা আজ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে শিখেছি।

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

আমরা দেখেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে পৃথক বিষয় হিসেবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত ফলিত মনোবিজ্ঞানের

একটি শাখাবিশেষ। এতে বিশুদ্ধ অথবা সাধারণ মনোবিদ্যার নিয়ম ও সূত্রগুলির শিক্ষণ ব্যাপারে ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়। মানুষের আচরণ কি প্রকারে নতুন শিক্ষণীয় বস্তু জানাবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়ে ওঠে—এটাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আবার বিস্তীর্ণ পরিবেশ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতিই এর মুখ্য আলোচ্য, যদিও এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে বৃহত্তর বিশ্বই শিক্ষার প্রয়োগ-শালা। আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। মনোবিজ্ঞান আচরণের গতি-প্রকৃতি ও মৌলিক নিয়ম আবিষ্কারেই ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান চায় আচরণে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটাতে বা সম্ভাব্য স্থলে নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যে সব তথ্য ও নীতি সহায়ক, সেগুলির অনুশীলনই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাড্ বলেন, শৈশবকাল থেকে বয়স্ককাল পর্যন্ত শিশু নানাভাবে বিকাশ লাভ করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিশুব এই নানা বিকাশ বৈশিষ্ট্যের ধারাটি বর্ণনা করে এবং ব্যাখ্যা করে। যে সকল বিষয়গুলি শিশুর বিকাশে সাহায্য করে বা বাঁধা দেয় তাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যে তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করে, তা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনে সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

আমরা আগেই দেখেছি, মনোবিজ্ঞান আচরণের গতি-প্রকৃতি ও মৌলিক নিয়ম আবিষ্কারে ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কিভাবে আচরণে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিভাবে নতুন আচরণ সৃষ্টি করা যায় ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সাধারণ আচরণ সম্বন্ধীয় সূত্রগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে। বলাবাহুল্য, সূত্রগুলিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয় ও শিক্ষণের বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ধরা পড়ে। এগুলির সমাধান ও সংব্যাখ্যান ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে উদ্দেশ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কোন বিষয় সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে অল্পকালে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা কিরূপে দান করা যায়, এবং ঐ শিক্ষা গ্রহণকালে, শিশু মন ও কিশোর মন কিভাবে কাজ করে, তা আলোচনা করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ
Functions of Educational Psychology

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান কিভাবে শিক্ষককে শিক্ষাদান কার্যে সাহায্য করে? শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী শিক্ষাদান সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত। যদি আমরা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে বিচার করি, তা হলে আমরা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলি হল—

[ক] বিকাশ মনোবিজ্ঞান (**Psychology of development**);

[খ] **শেখানো ও শেখা প্রক্রিয়া** (Psychology of teaching-learning), [গ] **অভীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি** (Psychology of testing and evaluation); [ঘ] **সঙ্গতি বিধান ও নির্দেশনা** (Psychology of adjustment and guidance)।

[ক] **শিশুর বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ঃ** জন্মের পর থেকেই শিশু বিকাশ লাভ করে। শিশুর বিকাশধারাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন— শারীরিক বিকাশ (Physical development); মানসিক বিকাশ (Mental development) ; প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development); সামাজিক বিকাশ (Social development); ভাষার বিকাশ (Language development) ; নৈতিক বোধের বিকাশ (Ethical development); ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of personality);

শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুর এই সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিশুর শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি বিকাশধারা। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ধারা কিভাবে গড়ে ওঠে; শিক্ষা কিভাবে একে সাহায্য করে? শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব কি? শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সেটি হল ব্যক্তি বৈষম্য (Individual differences)। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিশুদের মধ্যে নানা বিষয়ে যে পার্থক্য আছে সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

[খ] **শেখানো ও শেখা প্রক্রিয়াঃ** শেখানো ও শেখা মনোবিজ্ঞান নিয়ে 'শিক্ষা মনোবিজ্ঞান' আলোচনা করে। এই পর্যায়ে আলোচিত হয়, শিক্ষক কি পদ্ধতিতে পড়াবেন? কিভাবে পাঠদান করলে শিশুরা সহজেই শিখতে পারে। শিশুরা কিভাবে শেখে? শিশুর শিক্ষালাভের বিভিন্ন প্রক্রিয়াই বা কি? আমরা দেখি শিশু অনুকরণের মাধ্যমে শেখে, পুনঃ পুনঃ চর্চা করে শেখে, মুখস্থ করে শেখে এবং হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শেখে। আবার শেখানোরও একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে। শিক্ষক যদি বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিনে সাজিয়ে পড়ান, জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে যান, তবেই তার শেখানো সঠিক-ভাবে হতে পারে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এই শেখানো ও শেখার মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে।

[গ] **অভীক্ষা ও মূল্যায়ন (পরীক্ষা) পদ্ধতিঃ** শিক্ষা প্রক্রিয়া তিনটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, যথা—শেখানো, শেখা ও পরীক্ষা বা মূল্যায়ন। এই কারণে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শেখানো ও শেখার ন্যায় মূল্যায়ন বা পরীক্ষার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে। সকল ছাত্রের শেখবার ক্ষমতা সমান থাকে না, বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়, ব্যক্তিত্বের গঠন সমান নয়। এগুলি পরীক্ষা করা হয় **পরিমাপ বা অভীক্ষা বিজ্ঞানের** সাহায্যে। আবার শিক্ষার্থীর বিকাশ বৈশিষ্ট্যের

উপর বিভিন্ন পাঠের (Lessons) প্রতিক্রিয়া কি ? বিভিন্ন বিষয় শেখবার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন আসে তা পরিমাপ করা হয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

[ঘ] **সঙ্গতি বিধান ও নির্দেশনা :** পরিবেশের সঙ্গে অর্থাৎ গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান প্রক্রিয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের পদ্ধতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অনেক শিশু গৃহ-পরিবেশ থেকে যখন বিদ্যালয় পরিবেশে আসে তখন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অনেক শিশুর নানাবিধ আচরণগত অসঙ্গতি দেখা যায়। মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, মারামারি করা, বিদ্যালয়ের নিয়মনীতি না মানার মনোভাব অনেক শিশুর মধ্যে দেখা যায়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এই আচরণগত ত্রুটির কারণ নির্দেশ করে এবং সেই অনুসারে সংশোধনের চেষ্টা করে।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কোন্ কোর্স পড়বে, ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের পাঠ্যক্রমে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করবে এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করবে—এই সকল বিষয় আলোচনা করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার নির্দেশনা (Guidance) অধ্যায়ে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, শিক্ষার সর্বস্তরেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হতে পারে, কিন্তু তা এখন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার প্রতি স্তরে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে (An independent discipline) গণ্য করেন।

সুতরাং আমরা দেখছি যেখানেই মানুষ, সেখানেই মনোবিজ্ঞানের কাজ রয়েছে। মানুষ কল-কারখানায় কাজ করতে পারে, সমাজজীবন যাপন করতে পারে, শিশু বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে পারে, এমনকি মহাশূন্যে নভোচারীরা বিচরণ করতে পারে। সর্বত্রই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছড়ানো। যখন আমরা কল-কারখানায় কাজ করি, তখন আমাদের মনোভাব ও কর্মদক্ষতা নিয়ে আলোচনা করে শিল্প মনোবিজ্ঞান (Industrial psychology)। যখন আমরা সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজে বাস করি, তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলে সেই সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social psychology)। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে নানা বিষয় শেখবার জন্য তখন তার উপর যে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, সেটি হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational psychology)।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোনভাবেই আমাদের মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে ছাড়া নেই। এই কারণে স্যার জন অ্যাডামস্ বলেছেন, 'আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রভাবিত' অর্থাৎ 'Psychology has captured Education'।

ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচীকে আমরা সংক্ষেপে এইভাবে আলোচনা করতে পারি।

শিশু-মনের প্রকৃতি : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিশু-মনের প্রকৃতি, স্বরূপ, তার নমনীয়তা (**Flexibility**) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। কারণ, শিক্ষা-বলয়ের কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে শিশু।

শিশুর বংশধারা ও পরিবেশ : শিশুর মনের উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কাজেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বংশধারা ও পরিবেশ এবং উভয়ের আপেক্ষিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি : শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ, অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া, যেমন—বুদ্ধি, অনুভূতি ইত্যাদির সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির সম্পর্ক নির্ণয়, সহজাত প্রবৃত্তির উন্নয়ন—এগুলিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিশুর মনোবিকাশের ধারা : শিশুর মন কেমন করে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কিশোর মনে পরিণতিলাভ করে, তা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। কারণ, বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায় ও ক্রমবিভাগের সম্পর্ক আছে।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষা : ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনকে কিভাবে শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। কারণ, অভিজ্ঞতা আহরণের পথ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য : শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা করে। অপসঙ্গতি, অপরাধপ্রবণতা বা আচরণগত সমস্যা থাকলে শিশু ঠিকভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

স্মৃতিশক্তি, কল্পনা ও অনুভূতি : শিক্ষার সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কল্পনা প্রবণতা ও অনুভূতির নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। তাই এগুলির আলোচনা করাও শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের কাজ।

বুদ্ধির পার্থক্য : বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষাদান ব্যাপারেও ভিন্নতা ঘটে। সুতরাং বুদ্ধি কি, তার পরিমাপ কিভাবে করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়েও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যাপৃত থাকে।

শিশুর গঠনমূলক কর্মশক্তি : বিভিন্ন খেলার মধ্য দিয়ে কর্মমুখর শিশুর মন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। খেলাধুলার মধ্যে শিশুর গঠনমূলক কর্মশক্তি (**Creativity**)-র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই ক্রীড়াচ্ছলে শিশুকে শিক্ষাদানের উপায় নিয়েও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

আগ্রহ, প্রবণতা ও ব্যক্তিত্ব : শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহ, প্রবণতা ও ব্যক্তিত্বের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই এগুলির পর্যালোচনা করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্যতম কাজ।

উত্তম শিক্ষা পদ্ধতি : শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে প্রধানত প্রকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির উপর। তাই শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান আলোচ্য

বিষয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষণের মূল নীতিগুলিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান গভীরভাবে পর্যালোচনা করে।

ক্লান্তি ও বিরক্তি: শিক্ষণের অন্তরায় হল ক্লান্তি (Fatigue) ও বিরক্তি (Boredom)। এগুলিকে কিভাবে দূর করে শিক্ষাপ্রদানের কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সেটাও বিচার করে।

দৈহিক ভিত্তি: স্নায়ুমণ্ডলী, পেশী, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ইত্যাদি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানসিক কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মানবজীবনের দৈহিক ভিত্তি নিয়েও আলোচনা করে থাকে।

ব্যক্তিগত বৈষম্য: বুদ্ধি, প্রবণতা, আবেগ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, কল্পনা, চিন্তন, মনোযোগ, স্মৃতি, দৈহিক গঠন ও পরিবেশের দিক দিয়ে বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন প্রকৃতির। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একেই বলা হয় **ব্যক্তিগত বৈষম্য** (Individual difference)। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এই ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতি নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করে।

শিক্ষার লক্ষ্য: শিক্ষাদর্শনই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে থাকে। তাই বলে কি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের কোন বক্তব্য নেই? শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করে দেবার পর শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান বিচার করে দেখে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব কিনা, এবং যদি সম্ভব হয় তবে তার জন্য কিরূপ পরিবেশ ও কিরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার?

শিক্ষার বিষয়বস্তু: শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে দর্শনই প্রধান সহায়ক। কিন্তু এখানেও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য আছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু মানসিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী কোন্ কোন্ বিষয় তাকে শেখাতে হবে এবং কতটা পরিমাণ শেখাতে হবে, এ সব বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে।

বৃত্তি নির্বাচন: বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দেখা দেয় ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা। সকলেই সকল বৃত্তির উপযোগী নয়। কে কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে, কোন্ বৃত্তিতে কার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে বা কোন্ বৃত্তি কার পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নয়, এ সব বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান তাই **বৃত্তিগত নির্দেশনা** (Vocational Guidance and Counselling) নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে থাকে।

২

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা—শিশুর প্রক্ষোভ, আগ্রহ ও মনোভাব

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF CHILDREN—THEIR EMOTIONS, INTERESTS AND ATTITUDES

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা

মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিপুষ্টি নির্ভর করে তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট না থাকলে স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিপুষ্টির ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে নিত্য পরিবর্তনশীল অসংখ্য চাহিদা। এই সমস্ত চাহিদার পরিতৃপ্তির মধ্যে দিয়েই তার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট থাকবার সুযোগ পায়। মানুষের কোন চাহিদা যদি অতৃপ্ত থাকে, তাহলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। কালক্রমে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জাগে অপসঙ্গতি। অপসঙ্গতি কথাটির অর্থ হল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধানের অক্ষমতা। বলা বাহুল্য, মানুষ মাত্রেরই সুষ্ঠু জীবন-যাত্রা সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই চাহিদাগুলিকে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং ঐগুলির পরিতৃপ্তির আয়োজন করা বিশেষ প্রয়োজন।

শিশুর চাহিদা কাকে বলে এবং তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই বা কি? অতঃপর আমরা চাহিদার মুখ্য শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করব।

চাহিদা কথাটির অর্থ হল অভাব-বোধ। জীবন ধারণের পক্ষে একান্তভাবে যা প্রয়োজন তার অথবা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অভাববোধই হল চাহিদা। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে, তখন তার মধ্যে সেই বস্তুটির চাহিদা জাগে। আর যখনই সেই বস্তুটি সে পেয়ে যায়, তখনই তার অভাববোধ দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না। ক্ষুধার সময় খাদ্যবস্তু পেলে, খাদ্যের অভাববোধ আর থাকে না। এ থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অভাব-বোধ থেকেই চাহিদার জন্ম অর্থাৎ প্রতিটি চাহিদার পেছনেই রয়েছে কোন না কোন প্রকার অভাব-বোধ।

চাহিদা ও আচরণ—উভয়ের সম্পর্ক: প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা মানব-আচরণের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্তিকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির সকল আচরণই তার প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের আচরণের বৈচিত্র্যের পেছনে রয়েছে তার বহুবিদ চাহিদা। তাঁরা বলেন, মানুষের আচরণ জটিল ও বৈচিত্র্যময়। এই জটিল ও বৈচিত্র্যময়

আচরণগুলিকে নিছক প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যে সব নিত্য পরিবর্তনশীল অসংখ্য চাহিদা প্রতিনিয়তই মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে একমাত্র সেগুলির সাহায্যেই তার আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর। কারণ, চাহিদাই আচরণের উৎস। চাহিদার ফলে আমাদের মধ্যে একটা মানসিক অস্বস্তি দেখা দেয়। যতই এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায়, ততই এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বেড়ে চলে এবং আমরাও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ করে চলি ও চেষ্টা করি তার দ্বারা অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদা মেটাতে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের চাহিদা ও তার আচরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চাহিদার বৈশিষ্ট্য ঃ মনোবিদ্‌রা আচরণগত দিক থেকে চাহিদার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. মানুষের মনে চাহিদা জাগলেই তার দেহমনোগত সাম্যাবস্থা (পূর্বে যা ছিল তা) নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ এই চাহিদা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ সে অস্বস্তিকর উত্তেজনায় পীড়িত হয়।

২. ব্যক্তির আচরণের তাগিদ তার চাহিদার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাহিদা যত তীব্র হয়, আচরণ করার তাগিদও তত বাড়তে থাকে।

৩. চাহিদা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে মানুষের মনে অস্বস্তিকর উত্তেজনা ক্রমশই বাড়তে থাকে।

৪. চাহিদার দ্বারা ব্যক্তি উদ্দেশ্যমুখী আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

৫. উদ্দেশ্য সাধন হলে অর্থাৎ চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটলে মানুষের মনে অস্বস্তিকর অনুভূতি আর থাকে না।

চাহিদার শ্রেণীবিভাগ ঃ মানুষের চাহিদাকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—[ক] জৈবিক চাহিদা এবং [খ] মানসিক চাহিদা।

[ক] জৈবিক চাহিদা ঃ যে সব চাহিদার পূর্তির উপর মানুষের দেহগত স্বাস্থ্য বজায় থাকে সেগুলিকে জৈবিক চাহিদা বলা হয়। আলো, বাতাস, বিশেষ একটা তাপমাত্রা, খাদ্য, জল—এগুলির উপর মানুষের দেহগত স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কাজেই এগুলির চাহিদাকে আমরা জৈবিক চাহিদা বলে অভিহিত করতে পারি। প্রাণী এই চাহিদাগুলি নিয়েই জন্মায় এবং এই চাহিদাগুলি মোটামুটি সার্বজনীন। সেইজন্য এগুলিকে মৌলিক চাহিদাও (Primary needs) বলা হয়ে থাকে। শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি প্রধানত এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

উপরে যে জৈবিক চাহিদাগুলির কথা বলা হল তা ছাড়া আরও একধরনের চাহিদা আছে, তা হচ্ছে মানসিক চাহিদা। মানসিক চাহিদাকে সামাজিক চাহিদাও বলা হয়ে থাকে। মানুষের জীবনে এই মানসিক চাহিদার প্রভাবই সব চাইতে বেশি। তাই আমরা এই মানসিক চাহিদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব একটু বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

[খ] মানসিক চাহিদা ঃ নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটা বড় পার্থক্য

হল এই যে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ কেবল দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ বাঁচে দুইভাবে—দেহগতভাবে এবং সমাজগতভাবে। তার মধ্যে রয়েছে দুটি সত্তা—দৈহিক সত্তা এবং সামাজিক সত্তা। কেবল দেহগত বা জৈবিক চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই তার চলে না। সামাজিকভাবে বাঁচার জন্য বা সামাজিক জীবন যাপন করবার জন্য তাকে আরও অনেক চাহিদা মেটাতে হয়। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাঁচার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং ততই তার নিত্য নতুন অভাববোধ দেখা দেয়। তার কাছে ক্রমশ জৈবিক চাহিদার চেয়ে এই সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্বই অধিক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে এই সামাজিক বা মানসিক চাহিদাগুলিই তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব মানসিক চাহিদার মধ্যে এমন কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলি তৃপ্ত না হলে শিশুর পক্ষে সুস্থভাবে জীবন ধারণ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তার সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তাই এই ধরনের মানসিক চাহিদাগুলিকে আমরা শিশুর মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

মানসিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তি না ঘটলে মানুষের মধ্যে নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই শিশুর চারিত্রিক বিকাশকে সুসম্পূর্ণ করতে হলে তার মানসিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তি বিধান আবশ্যক। কেন না, শিশুর মধ্যে যে সকল সমস্যামূলক ও অপরাধপ্রবণ আচরণ দেখা যায়, অধিকাংশক্ষেত্রে তার মূলে থাকে শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির অভাব।

এখন আমরা আলোচনা করে দেখব শিশুর প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদাগুলি কি এবং কিভাবে এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি বিধান করা যায়।

শিশুর প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদা

শিশুর মানসিক চাহিদা কয়টি, এ নিয়ে মনোবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ বহু সংখ্যক চাহিদার কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ মাত্র কয়েকটি চাহিদার উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নলিখিত চাহিদাগুলিকে শিশুর প্রধান মানসিক চাহিদা বলে উল্লেখ করতে পারি।

প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা: যে চাহিদাটি শিশুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভালবাসার চাহিদা। এটি একটি প্রক্ষোভমূলক চাহিদা। ভালোবাসার চাহিদাটি উভয়মুখী। শিশু অপরকে ভালবাসতে চায় এবং অপরের কাছ থেকে ভালবাসা পেতেও চায়। এই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না হলে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় গুরুতর প্রক্ষোভমূলক বিপর্যয়। শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশের (**Emotional development**) পক্ষে তাই 'ভালবাসার' ভূমিকা সর্বাধিক। যে সব শিশু অল্পবয়সে মা-বাবাকে হারায় বা কোনও কারণে তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তাদের ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা : একটু বড় হলেই শিশুর মধ্যে সামাজিক প্রবণতা দেখা দেয়। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে। শিশু যতই বড হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিতা-মাতা, বাড়ি, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা অধিকার-বোধ জাগতে থাকে। তাই সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদাকে অধিকৃতির চাহিদাও (Need for belongingness) বলা হয়ে থাকে। শিশু যে সমাজে বাস করে সেই সমাজে সে একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান খোঁজে। সমাজে যে সে পরিত্যক্ত নয়, বরং তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমাজেরই, এই ধারণা শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস ও ভরসা এনে দেয় এবং ফলে তার কোন প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি ঘটে না। শিশুর মনে সমাজে স্বীকৃতি লাভের এই যে চাহিদা এর পূর্তি হলে তার মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটে। কালক্রমে এ থেকেই জন্মায় স্বদেশ ও সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ।

দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা : দৈহিক নিরাপত্তাবোধ শিশুর মনের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়ের জন্য অপরিহার্য। এই চাহিদাটির পরিতৃপ্তি না ঘটলে শিশুর মধ্যে ভয়, দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। দৈহিক নিরাপত্তাবোধ গুরুতরভাবে ক্ষুন্ন হলে শিশুর মধ্যে মনোবিকার মূলক দুশ্চিন্তার (Anxiety-Neurosis) সৃষ্টি হতে পারে।

আত্মস্বীকৃতি বা প্রশংসালাভের চাহিদা : বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। অপরের কাছ থেকে সে এই মূল্যের স্বীকৃতি পেতে চায়। তাই দেখা যায়, শিশু তার কোন কাজের জন্য আমাদের কাছ থেকে প্রশংসার প্রত্যাশা করছে। এই চাহিদাটির তৃপ্তি থেকে শিশুর মধ্যে জাগে সন্তোষ, আত্মবিশ্বাস ও প্রক্ষোভমূলক সাম্য। প্রশংসা পেলে শিশুর আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। এই প্রশংসালাভের আশাতেই শিশু বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে চায়। পড়াশুনা, খেলাধুলা, গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মস্বীকৃতির চাহিদা পরিতৃপ্ত হলে তবেই তার আত্মসম্মান-বোধ, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বশক্তি ইত্যাদির সম্যক বিকাশ ঘটে। আর একটি কথা। জন্মের সময় শিশুর ইগো বা অহম্ পূর্ণ বিকশিত থাকে না। বাস্তবের সঙ্গে দৈনন্দিন সংঘাতের মধ্য দিয়েই তার ইগো ক্রমশ বল সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আত্মস্বীকৃতির চাহিদার পরিতৃপ্তি শিশুর এই অহমের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

সাফল্য লাভের চাহিদা : শিশুর মনের মধ্যে রয়েছে তার কাজে সাফল্যলাভের চাহিদা। এই চাহিদার পরিতৃপ্তি না ঘটলে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। ধারাবাহিক ব্যর্থতাবোধ তার মনের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। আগ্রহ, প্রবণতা ও অন্তর্নিহিত ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য না রেখে জোর করে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ শিশুর উপর চাপিয়ে দিলে, সে কখনই ঐ কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলে তার আত্মবিশ্বাস-বোধ নষ্ট হয়ে যায় ; ক্রমশ সে নিজেকে ছোট করে ভাবতে শেখে। এতে তার ব্যক্তিত্ব সম্যকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সাধ্যের

অতিরিক্ত বোঝা বইতে বইতে বা অসম্ভবের পেছনে ছুটতে ছুটতে সে দেহে ও মনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

স্বাধীনতার চাহিদা: বিশেষ করে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে এই চাহিদা অত্যন্ত মূল্যবান হলেও, শিশুদের ক্ষেত্রেও এর মূল্য কিছু কম নয়। ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলাফেরার চাহিদা শিশুর মৌলিক চাহিদার অন্তর্গত। সাধারণত স্কুলে বা বাড়িতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার করা হয় না। স্কুলে শিক্ষার পরিবেশকে এবং বাড়িতে জীবন-যাপনের পরিবেশকে নানারকম নিয়ম-শৃঙ্খল ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, মাত্রাতিরিক্ত শাসন ও শৃঙ্খলা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়।

সক্রিয়তার চাহিদা: এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা শিশুর দেহের ও মনের ধর্ম নয়। সক্রিয়তা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। শিশুর আচরণের মধ্যে খেলা, উদ্দেশ্যহীন ছুটোছুটি একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। খেলা ও ছুটোছুটির মধ্য দিয়ে শিশু তার সক্রিয়তার চাহিদাটি তৃপ্ত করে। এ ছাড়া নানা সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়েও শিশু তার সক্রিয়তার চাহিদা মেটায়। সক্রিয়তা বলতে এখানে কেবল দৌড়-ঝাঁপ, ছুটোছুটি ইত্যাদি দৈহিক সক্রিয়তার কথাই বলা হচ্ছে না, মনের সক্রিয়তা বা চিন্তার সক্রিয়তার কথাও বলা হচ্ছে। এই সক্রিয়তার চাহিদা না মিটলে শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়।

স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা: প্রতিটি শিশুই চায় শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য। নিছক দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখাতেই সে সন্তুষ্ট নয়। কোনরকমে টিকে থাকলেই হল না, সে চায় তৃপ্তিকর জীবন যাপন করতে। শিশু বয়সে এই চাহিদার সম্যক পরিতৃপ্তি না ঘটলে, পরিণত বয়সে মানুষের মধ্যে আলস্য, কর্মবিমুখতা, দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি দোষের আবির্ভাব ঘটে। অপরপক্ষে, বাল্যকালে এই চাহিদার তৃপ্তি ঘটলে পরবর্তী জীবনে মানুষ দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকতে এবং শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তিকর সব কিছুই এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়।

যৌন-কৌতুহল নিবৃত্তির চাহিদা: যৌন বিষয় সম্পর্কে শিশুর মনে দুরন্ত কৌতুহল দেখা যায়। ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সব চেয়ে বড়। মাকেই সে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করে থাকে। একটু বড় হলে বাবার কাছেও সে তার নানা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। মা-বাবার কাছ থেকে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পেলে শিশু ভিন্ন জায়গা থেকে ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। শুধু তাই নয়, মা-বাবার কাছ থেকে ধমক খেয়ে তার মনে অপরাধ বোধের অংকুরও জন্মাতে পারে। এ সবই তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী।

নতুনত্বের চাহিদা: নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। কোন বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি শিশুর বিরাগ দেখা দেয় এবং

নতুন বস্তু পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এই নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা শিশুর মনে নানা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সে নতুন জামা-কাপড পডতে চায় বা নতুন জায়গায় বেড়াতে যেতে চায়। নতুন কিছু সংগ্রহ করা বা নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য সে উৎসুক হয়ে ওঠে। এই নতুনত্বের চাহিদার পরিতৃপ্তি না ঘটলে সে মানসিক অস্বস্তি অনুভব করে। পরবর্তী জীবনে, তার কৌতূহল-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিশুদের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা কিভাবে এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি বিধান করা যায় এবং এ সম্পর্কে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য কি তা আলোচনা করব।

পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য

ভালবাসার চাহিদা একটি মৌলিক চাহিদা। শিশুরা যাতে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের নিকট থেকে প্রকৃত ভালবাসা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভালবাসার অর্থ অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান নয়। অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে। বিপযস্ত পরিবারের শিশুরা বা যারা অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছে তারা যাতে স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। সাফল্যলাভের চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে ঠিকভাবে তৃপ্তিলাভ করে তার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশকে সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। যে সব কাজকে সহপাঠক্রমিক কাজ বলা হয় সেগুলির পর্যাপ্ত আয়োজন করতে হবে। আর একটি কথা। শিশুর গ্রহণ-ক্ষমতা ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে তার উপর অতিরিক্ত গৃহ-কাজের বোঝা চাপিয়ে দিলে চলবে না, এতে তার সাফল্য-লাভের চাহিদা অপরিতৃপ্ত থেকে যাবে। বিদ্যালয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর সক্রিয়তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। শিশুরা যাতে অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্য, নাচ, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার অবকাশ পায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশ পর্যটন ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিশুর নতুনত্বের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাজেই শিশুদের পর্যটন বা ভ্রমণের সুযোগ দিতে হবে। শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকাংশে নির্ভরশীল বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুরা বিদ্যালয়ে এসে সহজভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে যাতে তারা বিদ্যালয়-পরিবেশে আপন আপন সুনির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ হল তার মৌলিক চাহিদাগুলির অপরিতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দূর করতে হয় তবে নিছক আচরণের চিকিৎসা না করে তার মূল কারণ যে অতৃপ্ত চাহিদা তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

যৌবনাগম বা বয়ঃসন্ধিকালের প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদা

এর আগে আমরা শিশুর মানসিক চাহিদা নিয়ে আলোচনা করেছি ; এখন আমরা দেখব বয়ঃসন্ধিকালের প্রধান মানসিক চাহিদাগুলি কি এবং কিভাবেই বা ঐসব চাহিদার যথোপযুক্ত পরিতৃপ্তি সম্ভবপব।

শিশুর জীবনের জৈব-মানসিক ক্রমবিকাশের ধারায় যৌবনাগম (Adolescence) একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানারকম মানসিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদাগুলির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

স্বাধীনতার চাহিদা ঃ প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে শক্তিশালী চাহিদা হল এই স্বাধীনতার চাহিদা। শৈশব ও বাল্যকাল পর্যন্ত এরা লক্ষণীয়ভাবেই পরাধীন ছিল। যৌবনপ্রাপ্তিব সঙ্গে সঙ্গে এই পবনির্ভরতা থেকে তারা মুক্তি খোঁজে, অধিকতর দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আর পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে চায়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ কবতে চায়। বযস্ক ব্যক্তিরা প্রাপ্তযৌবনদের এই স্বাধীন মনোভাবকে ভাল চোখে দেখেন না। এব ফলে বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংঘর্ষ বাধে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের এই যে বিরোধ তা নানাপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা ঃ প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মুক্ত সক্রিযতার চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে যে নিয়ন্ত্রিত সক্রিয়তা তা এদের কাম্য নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী খেলা-ধুলা, পিকনিক, ভ্রমণ ইত্যাদিব মধ্য দিয়ে যে মুক্ত-সক্রিয়তার প্রকাশ ঘটে তাই এদের কাম্য।

সমাজ-জীবনের চাহিদা ঃ প্রাপ্তযৌবনদের আর একটি উল্লেখযোগ্য চাহিদা হল এই যে, তারা বৃহত্তর সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করতে চায়। নিজের ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার জন্য একটা ব্যাকুলতা এই সময়েই তারা অনুভব করে ; তাই নানাপ্রকার সামাজিক কাজ-কর্মের সঙ্গে নিজেদের তারা নানাভাবে যুক্ত করতে চায়। নানাপ্রকার সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের এই সামাজিক জীবনেব চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে।

আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা ঃ প্রাপ্তযৌবনরা খেলাধুলা, পড়াশুনা, নাচ-গান-অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সৃজনাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে সর্বদাই প্রকাশ করতে চায়। এই চাহিদার তৃপ্তি না ঘটলে প্রাপ্তযৌবনদের ব্যক্তিসত্তা কখনই সুষমভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তারা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে

এবং সব কাজেই নিজেকে ছোটো করে ভাবতে শেখে। এককথায়, সুপ্ত আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে এই চাহিদার পূরণের মধ্য দিয়ে।

আত্মনির্ভরতার চাহিদা: প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার চাহিদাও একটি উল্লেখযোগ্য চাহিদা। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা প্রবল বাসনা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে এবং কিভাবে সমাজ-জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে সে সম্পর্কে এরা জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করে। নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থকরী যোগ্যতা অর্জনের দিকে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে।

নতুন জ্ঞানের চাহিদা: যৌবনাগমে মনের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিগুলি দেখতে দেখতে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে। এর ফলে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবৃত্তি খুব তীব্রভাবে বেড়ে যায়। নতুন নতুন জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে তারা। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের অদম্য আগ্রহ দেখা যায়। যৌবনাগমে এই চাহিদার যথোপযুক্ত পরিতৃপ্তি না ঘটলে প্রাপ্তযৌবনদের হৃদয় ও মন একদিক দিয়ে উপবাসী থেকে যায়। এতে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়।

নীতিবোধের চাহিদা: শৈশবকালে এবং বাল্যকালে নীতিবোধ অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট থাকে। প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ প্রভৃতি বিচার-বোধ তীব্রভাবে দেখা দেয়। এর ফলে তারা নিজেদের এবং অপরের সমস্ত কাজ-কর্ম ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে বিচার করে দেখতে চায়। এই সময়ে তাদের মধ্যে যুক্তিধর্মী চিন্তার বিশেষ বিকাশ ঘটে। যে কোন কাজেই তারা অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে। নিজেরা কোন অন্যায় কাজ করলেও এই বয়সের ছেলেমেয়েরা তার জন্য তীব্র মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করে থাকে।

জীবনদর্শনের চাহিদা: যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও জগতের অন্তর্লীন রহস্য সম্পর্কে আগ্রহ জাগে। স্রষ্টা কে, সৃষ্টি কিসের জন্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক কি, মানব জীবনের সার্থকতা কিসে, জীবনের চরম লক্ষ্য কি, মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি ইত্যাদি প্রশ্ন প্রাপ্তযৌবনদের মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। নানান জায়গায় তারা এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায় এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা গড়ে তোলে। একটি সন্তোষজনক ও সুস্থ জীবনদর্শন গোড়া থেকেই গড়ে না উঠলে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয় না।

যৌন-কৌতূহল নিবৃত্তির চাহিদা: শিশুদের মধ্যেও যৌন-কৌতূহল দেখা যায়, তবে যৌবনাগমে এই কৌতূহলের তীব্রতা বহুগুন বেড়ে যায়। সুস্থ ও স্বাভাবিক উপায়ে এই কৌতূহলের নিবৃত্তি না ঘটলে তারা নানা অবাঞ্ছিত উৎস থেকে বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এতে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। বড়দের দ্বারা উপেক্ষিত বা তিরস্কৃত হলে তাদের মনে কালক্রমে অপরাধবোধ জেগে ওঠাও বিচিত্র নয়।

যৌন-তৃপ্তির চাহিদা ঃ যৌবনাগমে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিও তাদের স্বাভাবিক কাজ শুরু করে দেয়। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের যৌনচেতনা পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। বাল্যকালে যৌনবোধ বা যৌন-তৃপ্তির চাহিদা থাকে স্তিমিত। বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত হয়ে ওঠে, ফলে দেহ-মন যৌন আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই যৌনসচেতনতার প্রকাশ ঘটে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনার মধ্য দিয়ে। আমাদের রক্ষণশীল সমাজে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ নেই বলে প্রাপ্তযৌবনদের এই যৌনচাহিদা সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ পায় না। এর ফলে যৌন-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

শারীরিক সামর্থ্যবোধের চাহিদা ঃ যৌবনাগমে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পেশী ইত্যাদির সম্যক পরিপুষ্টি ঘটে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ শারীরিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠে। নিজের শারীরিক ক্ষমতাকে তারা নানাভাবে প্রকাশ করতে চায়। দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধুলা, কুস্তি, ব্যায়াম, শরীরচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নিজের শারীরিক সামর্থ্যকে প্রকাশ করবার সুযোগ না পেলে সমাজ-বিগর্হিত পথে তারা শারীরিক শক্তি-প্রকাশের চেষ্টা করতে পারে। এটা যে শুধু সমাজের পক্ষেই ক্ষতিকারক তাই নয়, প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এটা ক্ষতিকারক।

সৌন্দর্য-বোধের চাহিদা ঃ যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মনে বিশেষভাবে সৌন্দর্য-বোধের বিকাশ ঘটে। সৌন্দর্য উপলব্ধির চাহিদা প্রাপ্তযৌবনদের একটি অন্যতম মানসিক চাহিদা। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপলব্ধিই নয়; শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিত-কলা ইত্যাদির সৌন্দর্যও তারা উপলব্ধি করতে চায়। এই চাহিদার (Need for Aesthetic experience) যথাযথ পরিতৃপ্তি না ঘটলে ছেলেমেয়েদের হৃদয়বৃত্তি তথা সুকুমার মনোভাবের সম্যক বিকাশ ঘটে না, ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রাপ্তযৌবনদের প্রধান প্রধান চাহিদা নিয়ে আলোচনা করা হল; এখন আমরা দেখব কিভাবে এই সব চাহিদার যথাযথ পরিতৃপ্তি সম্ভব। কারণ, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সব বিশেষ বিশেষ চাহিদা রয়েছে সেগুলি যদি শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তাহলে ছেলেমেয়েদের বিপথে চালিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের এ সম্পর্কে কি করণীয় তা বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখা দরকার।

পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে স্বাধীনতার ও মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা রয়েছে তার পরিতৃপ্তির জন্য তারা যাতে বিদ্যালয়ের মধ্যেই স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। শৃঙ্খলাকে জোর করে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে,

তারা যাতে নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিধি-নিয়ম মেনে চলে সেটাই দেখতে হবে। বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ পায় তা দেখতে হবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রুচি ও প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধুলা, অভিনয়, বনভোজন, দেশভ্রমণ ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রাপ্তযৌবনদের সমাজ-জীবনের চাহিদা যাতে যথাযথভাবে তৃপ্তিলাভ করে তার জন্য বিদ্যালয়কে সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। বিদ্যালয় ও সমাজ—এ দুয়ের মধ্যে যাতে কোন কৃত্রিম ব্যবধান না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা যাতে বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে নিজেদের ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রাপ্তযৌবনদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল, আত্ম-অভিব্যক্তি ও আত্মনির্ভরতার চাহিদা। খেলাধুলা, সঙ্গীত, সাহিত্যচর্চা, শিল্পকলা, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই চাহিদার পূরণ হওয়া দরকার। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে এই দুটি চাহিদা পূরণের দিক দিয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্ভাব্য স্থলে বিদ্যালয়ে রেডক্রশ, এন. সি. সি., গার্ল গাইড ইত্যাদির আয়োজন করা দরকার। বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক উপদেশ ও নির্দেশনা দানের ব্যবস্থাপনা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে রয়েছে নতুন জ্ঞানের চাহিদা। দেশভ্রমণ, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, পদযাত্রা, ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিমূলক স্থান বা বস্তু পরিদর্শন, পাঠাগারের সম্যক ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এই চাহিদার তৃপ্তি ঘটে। পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার।

প্রাপ্তযৌবনদের নীতিবোধ ও জীবন-দর্শনের চাহিদার যাতে তৃপ্তি ঘটে সেদিকে পিতা-মাতা বা শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ছেলেমেয়েদের ভাল বই পড়তে দিতে হবে, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং তারা যাতে প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলেমেয়েদের মনে যাতে কোন প্রকার কুসংস্কার দানা বেঁধে উঠবার সুযোগ না পায় সেদিকেও সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। কোন 'রেডি মেড' জীবন-দর্শন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেরাই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং নিজ নিজ অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পায় সেদিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক বা শিক্ষকরা বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে রয়েছে যৌন-কৌতূহল নিবৃত্তি ও যৌন-তৃপ্তির চাহিদা। ছেলেমেয়েদের যৌনজীবন যাতে সুস্থভাবে গড়ে ওঠে সেজন্য বিদ্যালয়ে যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ছেলেমেয়েরা নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে সেদিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি রাখা দরকার।

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই ক্ষমতাকে তারা প্রকাশ করতে চায়। কাজেই দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধুলা, কুস্তি, ব্যায়াম, শরীরচর্চা, নৃত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাতে তারা শারীরিক সামর্থ্যকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সৌন্দর্যবোধের চাহিদা প্রাপ্তযৌবনের একটি অন্যতম চাহিদা। দেশভ্রমণ, প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বস্তু নিরীক্ষণ, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলা প্রভৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের সৌন্দর্যবোধ বা রসবোধের চাহিদা তৃপ্তিলাভ করে। কাজেই এগুলির ব্যবস্থাপনার দিকে কি অভিভাবক, কি শিক্ষক সকলকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। সম্ভাব্য স্থলে শিল্প-প্রদর্শনী, সাহিত্যমেলা, সঙ্গীত সম্মেলন ইত্যাদিতে যাতে ছেলেমেয়েরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

শৈশব ও বাল্যজীবনে আবেগ বা প্রক্ষোভ

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি কাজে কর্মে মানুষ প্রধানত যুক্তি-বুদ্ধির পথ ধরেই এগিয়ে চলে, এটা ঠিক; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, আবেগ বা প্রক্ষোভও তার জীবনের অনেকাংশ অধিকার করে থাকে। মানুষের জীবন সর্বদাই বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা পরিচালিত নয়। ঠিকভাবে দেখতে গেলে সাধারণ মানুষ তার জীবনের সহস্র কাজে যুক্তি অপেক্ষা আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয় বেশি। মানুষের জীবন—ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি নানা আবেগে পূর্ণ। এই সব আবেগ বা প্রক্ষোভ না থাকলে মানুষের জীবন কঠোর, রুক্ষ ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত। এই জন্যই মানুষের মন আলোচনাকালে মনোবিদগণ আবেগ বা প্রক্ষোভের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবেগের স্বরূপ বা প্রকৃতি কি, আবেগের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বলতে কি বোঝায়, শিশুর জীবনে আবেগের বিকাশ কিভাবে ঘটে, আবেগের শিক্ষাগত তাৎপর্য কতখানি, কেমন করে আবেগ বা প্রক্ষোভকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে ইত্যাদি বিশেষভাবে জানা দরকার।

আবেগের স্বরূপ

আবেগ বা প্রক্ষোভ হচ্ছে এক ধরনের যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি। একে আমরা সংবেদনজ অনুভূতি না বলে ভাবজ অনুভূতিও বলতে পারি। সংবেদনজ অনুভূতি কোন না কোন সংবেদন (সেনসেশন) থেকে জাত। সুমিষ্ট আম খাবার সময় আমাদের যে সুখানুভূতি হয় তা সংবেদনজ অনুভূতি, কেননা, এক্ষেত্রে সুখানুভূতি স্বাদ-সংবেদনের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে। অপরপক্ষে আবেগ সৃষ্ট হয় কোন মানসিক ভাব বা ধারণার দ্বারা। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করবার ফলে আবেগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সেখানেও উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে কোন ভাব বা ধারণা মনের মধ্যে জেগে ওঠে এবং এই ধারণাই আবেগকে উদ্দীপিত করে।

আবেগের স্বরূপ বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা আবেগের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখতে পাই -

১. আবেগ সৃষ্ট হয় প্রধানত কোন ভাব বা ধারণার দ্বারা।

২. কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলেও আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আসলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে কোন ভাব বা ধারণাই মনে জাগরিত হয় এবং ঐ ধারণাটিই আবেগের সৃষ্টি করে।

৩ আবেগ হল সুখ অথবা দুঃখব্যঞ্জক মানসিক উত্তেজনার এক জটিল অনুভূতি।

৪ আবেগ জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। আবেগের সময় দেহের আন্তরযন্ত্র এবং অনালী গ্রন্থিসমূহ উদ্দীপিত হয় এবং বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

৫. আবেগের জাগরণে দেহে সর্বাঙ্গীন যান্ত্রিক ক্রিয়া ঘটে থাকে, যেমন—নাড়ীর শক্তি ও গতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতা-অগভীরতা, গ্রন্থির রসক্ষরণ প্রভৃতি। এই সর্বাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলা হয় যান্ত্রিক ঝঙ্কার।

৬ আবেগ জাগলে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি দৈহিক বাহ্য প্রকাশ ঘটে। যেমন, ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করা, মুষ্টি বদ্ধ করা, দাঁত কড়মড় করা, ভ্রূকুটি করা ইত্যাদি।

৭. আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে। যেমন, ভয় পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করি অথবা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

৮ আবেগ আমাদের অনেক কাজের উদ্দেশ্য (মোটিভ) রূপেও কাজ করে অর্থাৎ আবেগ বা প্রক্ষোভ আমাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালিত করে এবং অপর কতকগুলি ব্যক্তি বা বস্তু থেকে আমাদের দূরে রাখে।

আবেগ বা প্রক্ষোভের সংজ্ঞা ঃ আবেগের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে উপরে যা বলা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আবেগ বা প্রক্ষোভের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা গঠন করতে পারি। **আবেগ হচ্ছে কোন ধারণা বা বস্তুর দ্বারা উদ্দীপিত সুখ অথবা দুঃখব্যঞ্জক মানসিক উত্তেজনার এক জটিল অনুভূতি, যে অনুভূতির সঙ্গে দেহের আন্তরযন্ত্রীয় পরিবর্তনজনিত দৈহিক বাহ্য প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকট থাকে এবং যা আমাদের কোন কাজে প্রবৃত্ত করে বা কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।**

আবেগের এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে এর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে আটটি লক্ষণের কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার সব কটিই আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই।

আবেগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ আবেগকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যথা—

১. আবেগ সর্বদাই বস্তুমুখী (ডাইরেক্টেড আপন্ অ্যান অবজেক্ট)। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কোন আবেগ দেখা যায় না। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে কিংবা কোন কিছুর কথা চিন্তা করে তবেই আবেগের সৃষ্টি হয়।

২. আবেগের একটি কালিক ধর্ম বা স্থায়িত্বকাল (Duration) আছে। আবেগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে, আবার একেবারে অন্তর্হিত হতেও কিছু সময় লাগে। আবেগের সময় দেহে আন্তর্যন্ত্রীয় পরিবর্তন সাধিত হয় এবং অনালী গ্রন্থিগুলি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। এই সব পরিবর্তন-জনিত আলোড়ন প্রশমিত হতে কিছুটা সময় লাগে বলেই প্রত্যেক আবেগের কমবেশি স্থায়িত্বকাল থাকে।

৩. আবেগ অনুভূতির (Feeling) মত কোন নির্দিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, এর উদ্দীপক একটি সমগ্র পরিস্থিতি।

৪. আবেগ যে শুধু অনুভূতিমূলক (Affective) মানসবৃত্তি তাই নয়। এতে অবগতিমূলক বা জ্ঞানমূলক (Cognitive) উপাদান এবং প্রচেষ্টামূলক বা ইচ্ছামূলক (Conative) উপাদানও রয়েছে। অবশ্য অনুভূতিমূলক উপাদানই আবেগে প্রধান স্থান গ্রহণ করে।

৫. আবেগের মধ্যে একটা আকস্মিকতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগকে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। যেমন—কোন ব্যক্তি পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধীর স্থির ছিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই হঠাৎ চটে উঠল। আসল কথা এই যে, এসব ক্ষেত্রে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবার পূর্বেই ভিতরে ভিতরে তা দানা বাঁধতে থাকে এবং একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছবার পর তার বাহ্য প্রকাশ প্রকট হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হঠাৎ আবির্ভূত হলেও আবেগ হঠাৎ তিরোহিত হয় না, ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়।

৬. আবেগ কোন না কোন সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে। সহজাত প্রবৃত্তি তার অনুষঙ্গী আবেগটিকে উদ্দীপিত করে ঐ আবেগের মধ্য দিয়ে নিজের পরিতৃপ্তি সাধন করে। এ জন্যই স্টাউট আবেগকে পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরগাছা যেরূপ কোন বৃক্ষকে অবলম্বন করে অবস্থান করে, আবেগও সেরূপ কোন সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকে। যখন আমরা কুকুরের মুখের খাবার কেড়ে নিই তখন কুকুরটি ক্রুদ্ধ হয়। ক্ষুধার তাড়নারূপ সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই এক্ষেত্রে ক্রোধের উদ্ভব ঘটে। এখানে কুকুরটির ক্রোধ ক্ষুধার তাড়না বা খাদ্যান্বেষণরূপ সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে।

৭. একই আবেগ বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হতে পারে। যেমন ধরা যাক—ক্রোধ। বিভিন্ন কারণের দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপিত হতে পারে। একটি কুকুরের মুখের খাবার কেড়ে নিলে কুকুরটি ক্রুদ্ধ হয়, আবার তার শাবকদের বিরক্ত করলেও ক্রোধ হয়, কিংবা কুকুরটির লেজ ধরে টানলেও কুকুরটি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন কারণের জন্য একই আবেগ সৃষ্ট হলেও, উক্ত আবেগের দৈহিক বাহ্য প্রকাশ সর্বত্রই এক প্রকার থাকে।

৮. আবেগ বা প্রক্ষোভে বিচারশক্তি ব্যাহত হয়। প্রক্ষুব্ধ অবস্থায় আমরা আবেগের দাস হয়ে পড়ি। তখন এমন কথা বলি বা এমন কাজ করি যা শান্ত অবস্থায় মূর্খতা বা বোকামি বলে মনে হয়। অনেক সময় তীব্র আবেগবশত মানুষ আত্মহত্যা করতেও উদ্যত হয়।

৯. তীব্র আবেগের আবির্ভাবে দৈহিক সংবেদন (Organic sensation) দেখা দেয়। যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে (যেমন অতিরিক্ত ভয়, অতিরিক্ত ক্রোধ ইত্যাদি) তখনই আমাদের শরীরে দৈহিক সংবেদন উপস্থিত হয়। তীব্র আবেগের ফলে দেহে যে আন্তর্যন্ত্রীয় বা বহির্যন্ত্রীয় পরিবর্তন সাধিত হয় তার ফলেই এই দৈহিক সংবেদন দেখা দেয়।

১০. আবেগের বাহ্য প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকাশমান হয় এবং সেজন্যই তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্রোধের কথাই ধরা যাক। ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির গলার স্বর রুক্ষ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, দেহ কাঁপতে থাকে এবং তার আচরণে একটি হিংস্র আক্রমণাত্মক ভাব ফুটে ওঠে।

১১. আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটলে তার তীব্রতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যায়।

১২. আবেগের দৈহিক প্রকাশ রোধ করলে আবেগের মৃত্যু হয় না। আবেগের দৈহিক প্রকাশ রোধের ফলে একটা মেজাজের সৃষ্টি হয় এবং এই মেজাজ অতি তুচ্ছ কারণেই আবেগরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৩ অনেক সময় নিরুদ্ধ আবেগ নানা প্রকার মানসিক বৈকল্যেরও সৃষ্টি করে থাকে।

আবেগের মুখ্য বিভাজন: আবেগ বা প্রক্ষোভকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—সাধারণ প্রক্ষোভ এবং বিশেষ প্রক্ষোভ। হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি সকল ব্যক্তিই অনুভব করে। এগুলিকে তাই বলা হয় সাধারণ প্রক্ষোভ বা সাধারণ আবেগ। ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাই এগুলিকে বলা হয় বিশেষ প্রক্ষোভ।

বিশেষ প্রক্ষোভ আবার দুই প্রকার—ব্যক্তিগত বা মূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক বা অমূর্ত। নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভে ব্যক্তির স্থান নেই। নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভকে রস বা সেন্টিমেন্ট বলা হয়। সৌন্দর্য-বোধের অনুভূতি একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভ। অপরদিকে ব্যক্তিগত বা মূর্ত প্রক্ষোভে ব্যক্তির স্থান রয়েছে। এই ব্যক্তিগত প্রক্ষোভকে পুনরায় দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা—স্বার্থকেন্দ্রিক এবং পরার্থপর। ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, অহংকার প্রভৃতি হচ্ছে স্বার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। অপরপক্ষে সহানুভূতি, দয়া, মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, দেশপ্রেম, ভালবাসা—এগুলি হচ্ছে পরার্থপর প্রক্ষোভ। এই পরার্থপর প্রক্ষোভগুলিকে আমরা সামাজিক প্রক্ষোভও বলতে পারি।

আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন

আবেগের আবির্ভাবে দেহযন্ত্রে কিছু না কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এই দেহযান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি দুই রকমের, আন্তর ও বাহ্য। কতকগুলি পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-সমূহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। যেমন,—হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, পাকস্থলী, রক্তসঞ্চালনযন্ত্র, অনালী গ্রন্থিসমূহ ইত্যাদির কাজ। বিশেষ বিশেষ আবেগের আবির্ভাবে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ দ্রুত চলতে থাকে, রক্তের গতিবেগ বাড়ে, কোন কোন অনালী গ্রন্থির রসক্ষরণ ঘটে। এইগুলি দেহযন্ত্রের আন্তর পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তন

বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। এসব পরিবর্তন ছাড়াও আবেগের আবির্ভাবে দেহযন্ত্রে আর এক রকমের পরিবর্তন ঘটে। নাসা স্ফীত হওয়া, চক্ষুতারকা বিস্ফারিত হওয়া, মুখ পাংশুবর্ণ হওয়া, শরীরে রোমাঞ্চ হওয়া, কপোল আরক্ত হওয়া ইত্যাদি। এই সব পরিবর্তনকে আমরা সহজেই বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। তাই এগুলিকে বলা হয় দেহযন্ত্রের বাহ্য পরিবর্তন। আবেগের দৈহিক প্রকাশ এই সব দেহযান্ত্রিক পরিবর্তনেরই ফল। দেহযন্ত্রের বাহ্য পরিবর্তন থেকেই আমরা আবেগের অস্তিত্ব অনুমান করি। আবেগের এই যে আন্তর ও বাহ্য পরিবর্তনের কথা বলা হল—স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সক্রিয়তার জন্যই তা ঘটে থাকে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি ভাগ আছে—সমবেদী (Sympathetic) ও পরাসমবেদী (Para-sympathetic)। আবেগ তীব্র হলে সমবেদী অংশ সক্রিয় হয়। এর ফলে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্তচাপের আধিক্য ঘটে এবং পেশীসমূহ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন্ নির্গত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই গ্রন্থিরস শরীরে বাড়তি শক্তির যোগান দিয়ে ব্যক্তিকে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার যোগ্য করে তোলে। অপর পক্ষে আবেগ মৃদু হলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের পরাসমবেদী অংশ সক্রিয় হয়। এর ফলে হৃৎস্পন্দনের গতি কমে যায়, রক্তচাপ হ্রাস পায়, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে, হজমের জন্য পাকস্থলীতে প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ ঘটে এবং দৈহিক উত্তাপ কমে যায়।

প্রাক্ষোভিক বিকাশ

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে কেবল তার দৈহিক বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের পর্বগুলিকেই জানলে চলবে না, তার প্রাক্ষোভিক বিকাশের পর্বটিকেও ঠিক ঠিক বুঝে নিতে হবে। প্রক্ষোভ মানুষের মনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রক্ষোভ বা আবেগ যে মানুষের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। শিশুর বিচারশক্তি বা চিন্তনশক্তির পূর্ণবিকাশের বহু আগেই তার মানসিক জীবন আবেগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা জানি আবেগের সময় সুখ-দুঃখমূলক অভিজ্ঞতার আস্বাদন ঘটে। দ্বিতীয়ত, কোন উদ্দীপকের উপস্থিতি ছাড়া আবেগের জাগরণ ঘটে না। তৃতীয়ত, নানা রকম বাহ্য আচরণের মধ্য দিয়ে আবেগ বা প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কাজেই প্রাক্ষোভিক বিকাশ বলতে আমরা নিম্নলিখিত তিন ধরনের বিকাশকেই বুঝব,—

[ক] প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিকাশ,

[খ] প্রক্ষোভমূলক উদ্দীপক বা প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ এবং

[গ] প্রক্ষোভমূলক আচরণ বা প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ।

জন্মসময়ে বা জন্মের অব্যবহিত পরে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা থাকে খুবই সরল ও সাধারণধর্মী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথকীকরণ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতাগুলির পরিবর্তন ঘটে। ম্যাকডুগাল, মান, শারমান, ওয়াটসন, গুডেনাফ, ক্যাথারিন ব্রিজেস প্রমুখ মনোবিদরা মানুষের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিকাশকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যবহারবাদী ওয়াটসন মনে করেন,—

মানুষের প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ তিনটি—ভয়, ক্রোধ ও ভালবাসা। জন্মসময়ে শিশুর মধ্যে এই তিনটি আবেগ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এই তিনটি আবেগ বহুধা বিশ্লিষ্ট হয়ে নানারূপ জটিল আবেগের জন্ম দেয়।

আমেরিকার শিশু মনোবৈজ্ঞানিক ক্যাথারিন ব্রিজেস বলেন, নবজাত শিশুর মনে তীব্র উদ্দীপক এক ধরনের সাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই সাধারণ উত্তেজনাই হচ্ছে শিশুর মনের প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ। এই উত্তেজনা ধীরে ধীরে দুটি পৃথক আবেগে প্রকাশিত হয়। [ক] অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ এবং [খ] স্বাচ্ছন্দ্য বা হর্ষ। শিশুর মনের এই অস্বাচ্ছন্দ্য চার মাস বয়সে বিশেষায়িত হয় রাগে, পাঁচ মাস বয়সে বিরক্তিতে এবং সাত মাস বয়সে ভয়ে। অপরদিকে হর্ষ বা স্বাচ্ছন্দ্য ছয় মাস বয়সে বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাসের (Elation) রূপ লাভ করে। মোটামুটি এক বছর বয়সে এই উচ্ছ্বাস বড়দের প্রতি ভালবাসার (Affection) রূপ নেয়। পনের মাস বয়স থেকে এই ভালবাসা শিশুর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি প্রসারিত হতে থাকে। শৈশবোত্তর স্তরে আবেগের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এই সময় আবেগের গভীরতা, স্থায়িত্ব ও জটিলতাও বেড়ে যায় লক্ষণীয়ভাবে। বয়োপ্রাপ্তির ফলে আবেগগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৌদ্ধিক, সামাজিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবেগগুলি নিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট এবং সুসংযত হয়ে ওঠে।

শিশুর জীবনে প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিকাশ কিভাবে ঘটে তা আমরা আলোচনা করেছি। এবার প্রক্ষোভমূলক উদ্দীপক বা উদ্দীপনার বিকাশ কিভাবে ঘটে তা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। মনোবৈজ্ঞানিক জার্শিল্ড বলেন, শিশুর পরিপক্বতা (Maturation) যত আসতে থাকে, যতই তার কর্মের ও অনুরাগের ক্ষেত্র বাড়তে থাকে, যতই তার পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান বাড়তে থাকে, ততই দেখা যায় তার প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার ক্ষেত্রও বেড়ে যাচ্ছে। জন্মের সময় বা জন্মের অব্যবহিত পরে শিশুর জীবনে প্রক্ষোভ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকের সংখ্যা থাকে খুবই কম। বয়োবৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সাথে সাথে এই উদ্দীপকের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দুই-ই বেড়ে যায়। শৈশবাবস্থায় যে ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতি শিশুর মনে কোনই প্রক্ষোভ জাগাতে পারত না, দেখা যায়—বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সেই ব্যক্তি, বস্তু বা পরিস্থিতি-ই তার মনে বিপুল প্রক্ষোভের আলোড়ন তুলছে। শিশু ভয় পায়। প্রথম দিকে অবলম্বনের অভাব বা উচ্চ শব্দই এই ভয়ের কারণ। অতঃপর অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির ফলে শিশুর জীবনে প্রাক্ষোভিক উদ্দীপনার বিস্তৃতি ঘটে। দেখা যায়, সে কুকুর, বিড়াল, অন্ধকার ইত্যাদিকেও ভয় পাচ্ছে। ক্রমে শিশুর মধ্যে স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। দেখা যায়, কোন বিশেষ অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি অথবা কাল্পনিক কোন বস্তুও তার মনে ভয় জাগাচ্ছে। এর পর তার মনে ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ চিন্তার বিকাশ ঘটে। তখন বাবা-মা বিপদে পড়লেও তাকে ভয় পেতে দেখা যায়।

বয়োবৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর জীবনে প্রাক্ষোভিক উদ্দীপকের ক্ষেত্র কিভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে তা আমরা দেখলাম। এবার আমরা প্রক্ষোভমূলক

আচরণের বিকাশ কিভাবে ঘটে তা পর্যালোচনা করব। শৈশবে শিশুরা সামগ্রিকভাবে তাদের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার সময় তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ সামগ্রিকভাবে কাজ করে। রাগ প্রকাশ করবার সময় শিশুরা কাঁদে, হাত-পা ছোঁড়ে, মাটিতে মাথা ঠোকে, কামড়ায়, আঁচড়ায় ইত্যাদি। শৈশবে প্রক্ষোভমূলক আচরণ থাকে অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত, সরল ও সাধারণ-ধর্মী। বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাক্ষোভিক আচরণগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বৌদ্ধিক তথা সামাজিক বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে এবং সামাজিক বিধি-বিধান ও অনুশাসনের চাপে শিশুরা তাদের প্রাক্ষোভিক আচরণগুলিকে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত, সংযত ও সমাজ-সম্মতভাবে প্রকাশ করতে শেখে। শুধু তাই নয়, শৈশবোত্তর স্তরে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষেত্রবিশেষে তারা প্রক্ষোভমূলক আচরণের অবদমনেও অভ্যস্ত হয়।

প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ

ম্যাকডুগাল মনে করেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতের এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গেই একটি করে আবেগ সংশ্লিষ্ট আছে কাজেই তাঁর মতে মৌলিক আবেগের সংখ্যাও সতের। ভয়, ক্রোধ, স্নেহ, দুঃখ, বিরক্তি ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর মতে এক একটি মৌলিক আবেগ। এই মৌলিক আবেগগুলিই পরবর্তী কালে নিজেদের মিশ্রণে নতুন নতুন মিশ্র আবেগের সৃষ্টি করে থাকে। অপর দিকে মৌলিক আবেগের সংখ্যা মাত্র তিনটি বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে ভয়, রাগ ও আনন্দ—এই তিনটি হল মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগ। মনোবৈজ্ঞানিক ওয়াটসনের মতে মৌলিক আবেগের সংখ্যা হচ্ছে তিনটি—ভয়, ক্রোধ ও ভালবাসা। একদল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু সব আবেগের মূলে একই প্রকার উত্তেজনামূলক অবস্থা বর্তমান থাকে, অতএব আবেগ মূলত একটিই, একাধিক নয়। আমেরিকার শিশু-মনোবৈজ্ঞানিক ক্যাথারিন ব্রিজেসের মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ একটিই, এবং তা হল—সাধারণ উত্তেজনা।

আবেগের সাপেক্ষীকরণ

মানুষের জীবনে আবেগ বা প্রক্ষোভের যে জটিলতা, বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে সাপেক্ষীকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শৈশব অবস্থায় প্রক্ষোভ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকের ক্ষেত্র থাকে সংকীর্ণ। কেবল দৈহিক, বৌদ্ধিক বা সামাজিক বিকাশের ফলেই নয়, পরন্তু সাপেক্ষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও এই উদ্দীপকের ক্ষেত্রটি পরবর্তী কালে বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ওয়াটসনের মতে ভয় হচ্ছে একটি মৌলিক আবেগ। যে দুটি উদ্দীপক নবজাতকের মনে ভয় জাগাতে পারে তা হচ্ছে—উচ্চ শব্দ ও আকস্মিক পতন। কিন্তু শিশু যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে, তার ভয় কেবলমাত্র ঐ দুটি উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। অন্যান্য উদ্দীপকও তার মনে ভয় জাগাচ্ছে। সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভ বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়।

ওয়াটসনের পরীক্ষা

প্রক্ষোভের জটিলতা, বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির মূলে সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ওয়াটসন তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন। এলবার্ট নামে নয় মাসের একটি শিশুর উপর এই পরীক্ষা কার্য চালান হয়। ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি দেখে এলবার্ট ভয় পেত না; সে ভয় পেত জোরালো শব্দ শুনলে। একটি সাদা ইঁদুরকে এলবার্টের সামনে আনা হল। ইঁদুর দেখে এলবার্ট ভয় পেল না, সে ইঁদুরের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু যখনই সে ইঁদুরটিকে স্পর্শ করতে যাবে তখনই বিরাট এক শব্দ করা হল। শব্দ শোনা মাত্রই সে ভয় পেল এবং কেঁপে উঠল। এই রকম বার বার করার পর দেখা গেল—ইঁদুর দেখলেই এলবার্ট ভীত হচ্ছে এবং এই ভীতি-সাপেক্ষীকরণের দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের পরিণত বয়সের অনেক ভীতিই এই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফল।

ওয়াটসনের মতে মানবজীবনে আবেগের বিকাশ সাপেক্ষীকরণের নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ তাঁর মতে, শৈশবের গুটিকয়েক মৌলিক আবেগই সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী জীবনে প্রাক্ষোভিক জটিলতা ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে থাকে।

আবেগের শিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রণে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য

আমরা আগেই দেখেছি, মানুষের জীবন সর্বদাই বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা চালিত হয় না। ঠিকভাবে দেখতে গেলে সাধারণ মানুষ তার জীবনের সহস্র কাজে যুক্তি অপেক্ষা আবেগ দ্বারাই পরিচালিত হয় বেশি। মানুষের জীবন ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণা, হর্ষ, বিষাদ, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি নানা আবেগে পূর্ণ। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগমূলক অভিজ্ঞতা, উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার বিকাশ হতে থাকে। এই বিকাশ যতটা সম্ভব সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, শিশুর আবেগজীবন সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত না হলে তার ব্যক্তি-সত্তার সম্যক প্রকাশ ঘটে না। এ ছাড়া শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশের সঙ্গে তার বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ কোন কারণে ব্যাহত হলে তার বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশও ব্যাহত হয়ে পড়ে। কাজেই শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবন যাতে গোড়া থেকেই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর এই প্রাক্ষোভিক জীবন গঠনে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের কর্তব্য কি তাই নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও সৌষম্য নির্ভর করে প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর—

১. মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি, ২. উন্নত গৃহ-পরিবেশ, ৩. উন্নত বিদ্যালয়-পরিবেশ, ৪. পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সুষম আচরণ, ৫. গৃহ ও বিদ্যালয়ে সুপরিমিত

শৃঙ্খলা, ৬. পরিবর্তনশীল আদর্শ ও মানের স্বীকৃতি, ৭. বয়স্কদের আদর্শ আচরণ, এবং ৮. গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়।

১. মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি : শিশু বা কিশোরদের মৌলিক চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্ত হয় সেদিকে পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা, মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা, আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা ইত্যাদি হচ্ছে শিশু বা কিশোরদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক চাহিদা। এগুলি যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত না হলে শিশু বা কিশোর বয়স্কদের মনে নানা প্রকার প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং এর ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ বা বিকাশ ব্যাহত হয়।

২. উন্নত গৃহ-পরিবেশ : উন্নত গৃহ-পরিবেশ যে শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য—এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুর পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে তার প্রাক্ষোভিক জীবন যেভাবে গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। কাজেই সূচনা-পর্ব থেকেই পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতা-মাতার কলহ-মতান্তর যাতে শিশুকে স্পর্শ না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুর চোখের সামনে চেঁচামেচি বা মারধোর না করাই ভাল। শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবন-গঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ ও সহজ সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে সংসার বিপর্যস্ত বা যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্বাভাবিক নয় সেই পরিবারের শিশুরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাক্ষোভিক বিপর্যয়ে ভুগে থাকে। যে সব পিতা-মাতা স্বার্থপর, সংকীর্ণচেতা, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলে-মেয়েদের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কালক্রমে নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ দেখা দেয়। পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কখনই উচিত নয়—শিশুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করা। পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার শিশুদের মনে তীব্র প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে। গৃহ-পরিবেশে পিতা-মাতার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রতি পিতা-মাতার ব্যবহার তার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সেইজন্য শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে পিতা-মাতার দায়িত্বই সব চাইতে বেশি।

৩. উন্নত বিদ্যালয়-পরিবেশ : গৃহ-পরিবেশের পরই আসে উন্নত বিদ্যালয়-পরিবেশের কথা। শিশু প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে। শিশু যেন মনে করে বিদ্যালয় একটি ক্ষুদ্র সমাজ এবং সে ঐ সমাজের একজন বাঞ্ছিত ও সম্মানিত সদস্য। বিদ্যালয়ে অনুসৃত পাঠক্রম ও শিক্ষণ-পদ্ধতি যাতে মনোবিজ্ঞান সম্মত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তীব্র রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া থেকে বিদ্যালয়কে মুক্ত রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকবে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহৃদ্যের পরিবেশ। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক বিভিন্ন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যাতে শিশুর

প্রয়োজনীয় মানসিক চাহিদাগুলির তৃপ্তি ঘটে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে পরিবেশে শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত ভয় সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশ থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। শিশুকে দৈহিক শাস্তিদান থেকে বিরত থাকাই ভাল। মনে রাখতে হবে, স্নেহের শাসনই সব চাইতে বড় কথা। শিশুকে শাস্তি দানের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঐ শাস্তির পদ্ধতি তার মনে কোনরূপ দীর্ঘস্থায়ী ভয়ের বা আতঙ্কের সৃষ্টি না করে। শিক্ষা যাতে আবেগধর্মী হয় প্রকৃত শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন অর্থাৎ শিক্ষা প্রদানকালে শিশুর মনে যাতে শিক্ষার অনুকূল আবেগের সঞ্চার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষাদাতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষণীয় বিষয়—এই তিনের প্রতি শিশুর মনে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থাকা বাঞ্ছনীয়। রাগ, ভয়, দ্বেষ, দুশ্চিন্তা, হীনমন্যতা প্রভৃতি আবেগ শিক্ষার অনুকূল বা সহায়ক নয়। এ সব আবেগ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, এগুলি শিক্ষার কাজকে নানা দিক দিয়ে ব্যাহত করে। কৌতূহল, আনন্দ, ভালবাসা, সহানুভূতি ইত্যাদি আবেগ শিক্ষার সহায়ক। কাজেই এগুলি যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর একটি কথা। শিক্ষার পক্ষে সহায়ক আবেগগুলিও যদি খুব তীব্র হয় বা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে তা শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে। কাজেই আবেগের যথাযথ বিকাশ বা প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশুর অবাঞ্ছিত আবেগ দূর করবার একটি কার্যকরী পদ্ধতি হল—পুনরাবর্তন-প্রক্রিয়া (Re-conditioning)। এই পদ্ধতিতে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত আবেগের উদ্ভব ঘটে সেই পরিস্থিতিকে তার নিকট প্রীতিপ্রদ করে তোলা হয়। প্রয়োজনস্থলে শিক্ষক এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুর অবাঞ্ছিত আবেগ দূর করবার চেষ্টা করবেন। সর্বোপরি, প্রতি শিশুর আবেগকেই শিক্ষকের ব্যক্তিগতভাবে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্যের নীতি এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শিক্ষায় আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার সময় শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই নিয়ন্ত্রণ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। শাসন করে বা ভয় দেখিয়ে শিশুর আবেগকে রুদ্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। এতে শিশুর মনে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

৪. **পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সুষম আচরণ:** শিশুর প্রতি পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষদের আচরণ যাতে সুষম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুকে শাসন করা বা তাকে আদর করার সময় পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিরা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যাতে তাঁদের আচরণের একটি নির্দিষ্টমান বজায় রেখে চলতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত শাসন কিংবা অতিরিক্ত আদর দুই-ই বর্জন করতে হবে। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিদের ব্যবহারে যাতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক কথায়, শিশুর প্রতি পিতা-মাতা, অভিভাবক বা শিক্ষকদের ব্যবহার কখনই অসঙ্গতিপূর্ণ বা খামখেয়ালী ধরনের হওয়া উচিত নয়। এই মুহূর্তে অতিরিক্ত শাসন এবং পরমুহূর্তেই সীমাহীন আদর এরূপ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

৫. **গৃহ ও বিদ্যালয়ে সুপরিমিত শৃঙ্খলা:** গৃহ বা বিদ্যালয়ের সুপরিমিত শৃঙ্খলা শিশুর প্রাক্ষোভিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের দিক থেকে অত্যাবশ্যক। অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা যেমন বর্জনীয়, তেমনি বর্জনীয় হল শৃঙ্খলার চরম অভাব।

৬. **পরিবর্তনশীল আদর্শ ও মানের স্বীকৃতি:** প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। বহু ক্ষেত্রে এ থেকে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কাজেই সময়ের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে এবং আধুনিক ভাবধারা ও আদর্শ মেনে নিতে হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক—এঁদের সকলের মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা থাকা বাঞ্ছনীয়। গোঁড়া রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী বা একরোখা মনোভাব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. **বয়স্কদের আদর্শ আচরণ:** সামাজিক বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন কঠোর হোক বা শিথিল হোক তাতে শিশু বা কিশোরদের কিছুই আসে যায় না। যে জিনিসটি তাদের মনকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করে, তা হচ্ছে ঐ বিধিনিষেধ ও নিয়ম-কানুনের প্রতি বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্রা। যে সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিরা সামাজিক আদর্শ বা নিয়ম-কানুনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে সেই সমাজে শিশু বা কিশোরদের মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় কম দেখা যায়।

৮ **গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়:** পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিশুর প্রাক্ষোভিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ বা অটুট রাখতে হলে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয় থাকা একান্ত দরকার। শিক্ষকের উচিত যে গৃহ বা যে সমাজ-পরিবেশ থেকে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে সেই গৃহ বা সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা। অপরদিকে, পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও উচিত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা। বলা বাহুল্য, শিক্ষক, অভিভাবক, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী—এঁদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রক্ষোভ-জীবন সহজভাবে গড়ে ওঠবার পর্যাপ্ত অবকাশ পায়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভ

পূর্বে উল্লেখ করেছি, শৈশবকালে শিশুদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের আবেগের প্রকাশ দেখা যায়। এইগুলি রাগ, ভয় ও ভালবাসা। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী এদের বলেন প্রাথমিক প্রক্ষোভ। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

ক্রোধ বা রাগ (Anger or Rage)

সকল শিশুদের মধ্যে রাগ কম-বেশী দেখা যায়। রাগ একটি উত্তেজিত মানসিক অবস্থা, তবে ক্ষেত্র ও অবস্থা অনুযায়ী এর মাত্রা কম-বেশী হতে পারে। কখন কখন

তা সাংঘাতিক মাত্রায় প্রকাশ পায়, তখন শিশু চুল টানতে থাকে, হাত পা ছোঁড়ে এবং যার বিরুদ্ধে রাগ তাকে নানাভাবে আঘাত করতে থাকে। শিশুর রাগের সাথে অনেক সময়ে ঈর্ষা মিশ্রিত থাকে। কোন প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হলে রাগ সৃষ্টি হয়। শৈশবকালে শিশুর রাগ জন্মে যদি তার স্বাধীনভাবে চলাফেরাতে বাধা সৃষ্টি করা হয় অথবা শিশু যখন খাওয়ার আগ্রহ দেখায় তখন তার কাছ থেকে খাবার সরিয়ে নিলে অথবা খাবার দিতে দেরী করলে। শিশুর স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা পেলেও রাগ সৃষ্টি হতে পারে। অন্যেরা কোন কিছু নিতে বাধা দিলেও শিশুর রাগ জন্মাতে পারে। শিশুর আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও শিশুর রাগ জন্মাতে পারে।

ক্রোধ সৃষ্টির উপযোগী কয়েকটি অবস্থা: যদি কোন শিশুর শারীরিক সামর্থ অন্যদের অপেক্ষা কম থাকে, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি অনুভব করে, কোন কারণে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, কিংবা ক্ষুধিত থাকে, তখন তার মধ্যে সহজেই ক্রোধ জন্মাতে পারে। সব সময়ে যে কোন একটিমাত্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেই শিশুর রাগ হয় তা নয়, শিশুর অনেকদিনের সঞ্চিত বিরক্তি কোন একটি মাত্র কারণেই প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে পারে। কিন্তু রাগের প্রকাশের মধ্যে ব্যক্তি পার্থক্য দেখা যায়। যেরূপ অবস্থায় একটি শিশু ক্রোধ প্রকাশ করে, অনুরূপ অবস্থায় অন্য শিশু শান্তভাবে থাকতে পারে; কোনরূপ রাগ প্রকাশ করে না। গৃহে যে শিশু মনে করে যে, ছোট ভাইকে বাবা-মা বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন, সে বাবা-মায়ের অল্প বকুনিতে রাগ করতে পারে। যে সকল পিতা নিজের কাজকর্ম সবসময়েই সঠিক মনে করেন, ছেলেমেয়েদের সামান্য আপত্তিতে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করেন। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় অনেক বাবা-মা আছেন যারা কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন না।

কিভাবে শিশুরা ক্রোধ প্রকাশ করে: শিশুরা নানাভাবে নিজেদের ক্রোধ প্রকাশ করে। অবাধ্যতা, কাজে বাঁধাদান প্রভৃতি আচরণের ভিতর দিয়ে শিশু রাগ প্রকাশ করে। যখন শিশু কথা বলতে শেখে তখন তার রাগ প্রকাশ হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। গুডেনাফ্ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। একটি শিশু কোন কারণে মায়ের উপর রাগ প্রকাশ করল এই বলে যে, সে এখন থেকে অন্য মাকে মা বলবে। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শিশু আচরণের মধ্যে একটা হিংস্র ভাব এনে রাগ প্রকাশ করতে পারে। সে চুল টানতে পারে, কাপড়জামা ছিঁড়তে পারে, প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারে। আবার জোরে কেঁদে উঠে রাগ প্রকাশ করতে পারে।

ক্রোধের মূল্য: মহাপুরুষেরা সর্বদা এই উপদেশ দেন যে, প্রত্যেকের উচিত ক্রোধ পরিহার করা। ক্রোধকে একটি প্রধান রিপু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ক্রোধের কিছু কিছু প্রয়োজনও আমাদের জীবনে দেখা যায়। হঠাৎ কোন কারণে ক্রোধ সৃষ্টি হলে শিশুর আচরণের জড়তা কেটে যায় এবং লক্ষ্যসাধনে সচেষ্ট হয়। রাগের ফলে আমাদের আচরণে যে অসঙ্গতি দেখা যায়, পরবর্তী সময়ে যখন রাগ কমে যায়, তখন শিশু নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নিজের আবেগকে সংযত

করবার প্রয়োজন বুঝতে পারে। তবে রাগের ফলে ব্যক্তির ক্ষতি হয় এবং শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অবসাদ বোধ করে। তবে কোন শিশু কি কি কারণে রাগ করে তা লক্ষ্য করে পিতা-মাতা ও শিক্ষক তার প্রতি আচরণে সতর্ক হবেন।

শিশু রাগ করলে কিভাবে তার সঙ্গে আচরণ করতে হয়ঃ বয়স্কেরা অনেক সময়ে বুঝতে পারে না যে, শিশুরা রাগ করলে কিভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বড়দের উচিত শিশুদের রাগের কারণ অনুসন্ধান করা। অনেক স্থলে শিশুদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হয়। অথবা অন্যায় করে শিশুদের বকা হয়। এই সকল কারণে শিশুদের রাগ জন্মাতে পারে। শিশুদের ক্রোধ তাদের মনের অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ। ক্রোধের কারণগুলি জেনে নিয়ে শিশুদের স্বাভাবিক আচরণে উৎসাহিত করা উচিত।

ভয় (Fear)

ভয় রাগের ন্যায় একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ। রাগের ন্যায় ভয় নানাবিধ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। রাগের ন্যায় ভয়েরও মাত্রা (Degree) আছে। ভয়ের প্রচণ্ডতা এরূপ হতে পারে যে, ভয়ে শিশুর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা শিশু সামান্য মাত্রায় ভয় পেতে পারে। যে সকল ঘটনা বা বিষয়ে শিশুর ভয় জন্মে, তা থেকে শিশুর নানা ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিশু চীৎকার করে কেঁদে উঠতে পারে, শিশু পালিয়ে যেতে চায়।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর ভয় সৃষ্টির উপযোগী কয়েক ধরনের বিশেষ উদ্দীপকের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—উচ্চশব্দ, অন্ধকার, পড়ে যাওয়ার ভয় (Loss of support) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি সকল অবস্থায় সকল শিশুর মধ্যে ভয় সৃষ্টি করবে এরূপ নয়। কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সকলের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করতে পারে না। শিশুর ঐ সময়ের মানসিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অতীত অভিজ্ঞতা, কোন ঘটনা বিপজ্জনক কি না বিশ্লেষণের ক্ষমতা, ব্যক্তির জীবনে কোন ঘটনা দ্বারা যদি আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় তাহলে ঐ সকল অবস্থায় ভয় জন্মাতে পারে। কিন্তু কোন ঘটনায় নিজেকে যতই অসহায় মনে করবে—ততই সে ভয় পেতে থাকবে।

পরবর্তীকালে যখন শিশু কল্পনা করতে শেখে, ততই তার ভয়ের কারণগুলি বাড়তে থাকে। শিশু কল্পনায় ভয়ের অনেক কারণ সৃষ্টি করে নেয়। শিশু কল্পনায় কালো মেঘের মধ্যে রাক্ষসের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেয় এবং কালো মেঘ দেখলে ভয় পেতে পারে। অন্ধকারে কোন দূরের বস্তুকে ভূত মনে করে ভয় পেতে পারে। কৈশোরকালে যৌবনাগমে শিশুর মনে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি যেমন আকর্ষণ বোধ হয়, তেমনি ভয়েরও সৃষ্টি হতে পারে।

শিশুর বিভিন্ন বয়সে ভয়ের বিবর্তনঃ বয়স ভেদে শিশুর মধ্যে ভয়ের বিবর্তন ঘটে থাকে। প্রথম জীবনে শিশু যে সকল বিষয়ে ভয় পায়, পরবর্তীকালে সেই সকল বিষয়ে ভয় নাও পেতে পারে। ছোটবেলায় যে ছেলে মেঘের ডাক শুনে ভয় পায়, পরবর্তীকালে বড় হলে সে আর মেঘের ডাক শুনে ভয় পায় না। অনেক

ছেলেমেয়ে কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু দেখে ভয় পায়। কারও কারও পক্ষে দেখা যায়, এই ভয় বড় হলেও যায় না। আরশোলা, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী অনেক বয়স্কদের ভয়ের উদ্রেক করে।

শিশুর ভয় সৃষ্টির কারণ: শিশুর বয়সের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বস্তু শিশুর কাছে ভয়ের কারণ হতে পারে। পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করলে শিশু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে ষাঁড় দেখলেই সে ভয় পায়। প্রাথমিক ঘটনা শিশুর পরবর্তী জীবনে ভয়ের স্থায়ী কারণ হতে পারে। স্কুলে অনেক সময়ে অঙ্কের শিক্ষক কঠোর ব্যবহার করেন এবং শিশু অঙ্কের শিক্ষককে ভয় করে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, শিশুর অঙ্কের শিক্ষকের প্রতি ভয় বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ অঙ্কে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অনুষঙ্গ (Association) প্রক্রিয়া থেকেও ভয় সৃষ্টি হতে পারে। দিয়াশলাই নিয়ে খেলতে খেলতে শিশু আগুন ধরিয়ে দিল। এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হল, বড়দের বকুনি খেল এবং নিজের অসদাচরণের জন্য যে ক্ষতি হল, তাতে তার মনে অনুশোচনা সৃষ্টি হল। কিন্তু এই ঘটনা তার মনে এমন একটি স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করল যে, সে এর ফলে অন্ধকারে ভয় পেত, আগুন দেখলে ভয় পেত এবং একা থাকতে ভয় পেত।

শিশুর ভয় বৃদ্ধি পায় যদি প্রথম জীবনে তাকে কাল্পনিক ভয়ের বস্তু বর্ণনা করে ভয় দেখানো হয়। অনেক মা-বাবা শিশুদের জুজুর ভয়, ভূতের ভয়, মরে যাওয়ার ভয়, ছেলেধরার ভয় দেখান শিশুকে তাদের বাধ্য করবার জন্য। পরবর্তীকালে বড় হলেও দেখা যায়, শিশু এই কাল্পনিক বিষয়গুলিতে ভয় করতে শেখে।

ভয়ের মূল্য: ভয় আছে বলেই শিশু ইচ্ছা মতো কাজ করতে বিরত হয়। শিশুরা স্কুলের কাজগুলি ঠিক করে করতে চেষ্টা করে, কারণ মাস্টারমশায় ঐ কাজ না করলে বিরক্ত হবেন। বাড়ীতে বাবা-মা বিরক্ত হবেন, এই ভয়ে শিশুরা নিজেদের দৈনন্দিন কাজ করতে সচেষ্ট হয়। এই ভয়ের ফলেই আমরা আমাদের আচরণকে সংযত করি। ভয় আমাদের বাধ্য করে চিন্তা করে, বিচার করে সব জিনিস করতে। এখন ঠিকমতো পড়াশুনা না করলে পরে দুঃখ পাবো, ভবিষ্যতের ভয় শিশুদের বাধ্য করে পড়াশুনা করতে। আমাদের জীবনে ভয়ের মূল্য আছে বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে অতিরিক্ত ভয় শিশুর আচরণে অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে। মনোবিজ্ঞানে কয়েক ধরনের ভয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন, অনেক শিশু বন্ধ ঘরে থাকতে ভয় পায়। অনেকে একা থাকতে ভয় পায়। যে সমস্ত শিশু বাড়ীতে কড়া শাসনে মানুষ হয়, তাদের আচরণে একটা ভীরুতা সৃষ্টি হয়। কারণ কর্তৃপক্ষকে তারা সব সময়ে ভয় পেতে অভ্যস্ত হয়। এইরূপ ভয়ের আবহাওয়ায় যে সকল শিশু বড়ো হয়, দেখা যায়, বড় হলে তাদের চরিত্রে অনেক অসঙ্গতি থাকে।

ভালবাসা (Love)

ভালবাসা শৈশবকালের একটি প্রাথমিক আবেগ। শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর থেকেই শিশুর জীবনে 'ভালবাসা' আবেগটির প্রকাশ দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে

শিশুর আচরণ প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় 'আনন্দ ও দুঃখ মতবাদ' (Pleasure-pain principle) দ্বারা। শিশু যে তার মাকে সবচেয়ে ভালবাসে তার কারণ হল, মা-ই তাকে নিয়মিত খাদ্য দেন এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে সাহায্য করেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর আত্মপ্রেম (Self love) তার চারপাশের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, মা-বাবা, খেলনা, পোশাক প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হয়। কারণ ঐ ব্যক্তি বা বস্তু তাকে নানাভাবে আনন্দ দেয়।

শিশুদের জীবনে ভালবাসার প্রভাব : শিশু পিতা-মাতা ও বড়োদের কাছ থেকে স্নেহ দাবি করে। বড়দের অকৃত্রিম স্নেহ শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশের জন্য প্রয়োজন। সমস্ত পরিবারই যে শিশুর জন্মকে আকাঙ্ক্ষা করেছে এবং শিশু যে পরিবারে কোন অবাঞ্ছিত কেউ নয়, এই বিষয়টি শিশু প্রথম থেকেই দাবি করে। শিশু যদি বুঝতে পারে তাকে সকলে চায়, আন্তরিকভাবেই চায় এবং শৈশব থেকেই শিশু যদি একটি স্নেহের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠবার সুযোগ পায়, তা হলে তার মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ সঠিকভাবে হতে পারে। সেই শিশুই দুঃখী, যাকে কেউ ভালবাসে না। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসার আবহাওয়া শিশুকে শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা দান করে।

কিন্তু কোনরূপ স্নেহের আতিশয্য শিশু পছন্দ করে না। অনেকে জোর করে শিশুকে 'হাম' খান বা কোলে জোরে চেপে ধরেন। এই ধরনের আচরণ শিশু তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মনে করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভালবাসার আবহাওয়া ছাড়া শিশুর বিকাশ সঠিক হয় না। কারন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। শারীরিক দিক দিয়ে শিশু খুব দুর্বল, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে শিশু অত্যন্ত শক্তিশালী। বাড়ীতে বয়স্কেরা সব সময়ে সতর্ক থাকেন শিশুকে সাহায্য করতে। বড়রা কিভাবে শিশুর প্রতি তাদের স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করেন! শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও বয়স্কদের ভালবাসা একটি রহস্যজনক বিষয় নয়। শিশুর প্রতি বড়দের ভালবাসা প্রকাশ হয় নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শিশুর নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য পিতা-মাতা সচেষ্ট। শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলনা ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস পিতা-মাতা সচেষ্ট থাকেন সাধ্যমতো যোগান দিতে। শিশুর হাটা, চলা, কথা শেখা, বড় হলে লেখা-পড়া শেখা, সর্বত্রই পিতা-মাতার স্নেহের দৃষ্টি রয়েছে। একটু বড়ো হলে, যখন শিশু নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে, সেখানেও উত্তর দানে পিতা-মাতার স্নেহের সুর থাকে। একটি মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে (Experiment) এইরূপ ফল দেখা যায় যে, যে সকল শিশু গৃহে পিতা-মাতার স্নেহ দৃষ্টির সম্মুখে বড়ো হয়, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় সুষম ; কিন্তু যারা বাস করে বাড়ী থেকে দূরে হোস্টেলে তাদের সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে বহুবিধ গুণের অভাব দেখা যায়। আর একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, পিতা-মাতার স্নেহের অভাব যে সকল শিশু বোধ করে বা পায় না তাদের আচরণে অপরাধপ্রবণতা (Delinquency) দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে গৃহের পরিবেশ, পিতা-মাতার ভালবাসা শিশুর মনে নিরাপত্তা বোধের

সৃষ্টি করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশের জন্য এই স্নেহ-ভালবাসার বিশেষ প্রয়োজন।

আগ্রহ (Interest)

আগ্রহ হল একটি বিশেষ ধরনের প্রবণতা যার সাহায্যে ব্যক্তি পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একটি ক্ষুধিত প্রাণী তার পরিবেশস্থিত অন্য বিষয় অপেক্ষা খাদ্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। অনুরূপভাবে কোন ছাত্র যার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে বিজ্ঞানের প্রতি, সে পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহকে ছুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(১) **সহজাত বা স্বাভাবিক আগ্রহ এবং (২) অর্জিত আগ্রহ।** সহজাত বা স্বাভাবিক আগ্রহের উৎস হল আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি। শিশুদের আচরণে সাধারণভাবে যে সকল আগ্রহ প্রকাশ পায়, সেগুলি প্রধানত সহজাত প্রবৃত্তিজাত। যেমন, ছোট শিশুদের মায়ের প্রতি আগ্রহ, খেলার আগ্রহ, গল্প শোনবার আগ্রহ সকল শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। বিভিন্ন বিষয় জানবার জন্য শিশুদের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা যায়, তাকেও আমরা স্বাভাবিক আগ্রহ বলতে পারি।

কিন্তু অর্জিত আগ্রহ পরিবেশ ও শিক্ষাজাত। বাড়ীর সকলে ভাল গান জানে ও গান ভালবাসে। শিশুরও গানে আগ্রহ দেখা গেল। এটি পরিবেশজাত বা অর্জিত আগ্রহ। বাবা ডাক্তার—বাবাকে দেখে অথবা বাবার প্রভাবে শিশুর চিকিৎসা শাস্ত্রে আগ্রহ দেখা গেল। এই ধরনের আগ্রহ হল পরিবেশ প্রভাবজাত আগ্রহ। স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রত্যক্ষ আগ্রহও বলে। খাদ্য সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ প্রত্যক্ষ আগ্রহের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমরা টাকাকড়ির জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করি। অর্থের জন্য আমাদের আগ্রহ অপ্রত্যক্ষ আগ্রহের অন্তর্গত। টাকা-পয়সা আমরা চাই বটে, তবে তা নোটের কাগজখানি বা মুদ্রার ধাতুর জন্য নয়। টাকা আমরা চাই, কারণ টাকা দিয়ে জিনিস কিনে আমরা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারি। ক্লাশে লেখা-পড়ায় সবচেয়ে ভাল মেয়েটির সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হল ; তুমিও লেখা-পড়ায় ভাল হবার চেষ্টা করলে। এর কারণ লেখা-পড়ার আগ্রহের জন্য নয়। মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অর্থাৎ তার সমান হবার জন্য।

আগ্রহের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Interest) : আগ্রহের মধ্যে একটি মানসিক ভাব (Feeling) ও প্রক্ষোভের যোগ আছে। আমাদের আগ্রহ একই দিকে পরিচালিত হয়। আগ্রহ হল সদর্থক (Positive)। যেমন আমরা কোন ব্যক্তি, কোন ছবি বা কোন বই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করি। কোন ব্যক্তি যে বিষয়ে আগ্রহী, সেই বিষয়ে তার বিরক্তি জন্মে একথা আমরা কখনই বলতে পারি না। ব্যক্তির আগ্রহ সর্বদাই সক্রিয়। কখনই নিষ্ক্রিয় নয়। আমরা সেই সকল কাজ করতে ভালবাসি যাতে আমাদের আগ্রহ আছে।

ব্যক্তির আগ্রহের সঙ্গে তার আনন্দদায়ক মনোভাবের যোগ আছে। আগ্রহ একটি সক্রিয় মনোভাব এবং এর সাহায্যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তু বা বিষয়কে লাভ করতে চায়। যেমন, যার সিনেমা দেখতে আগ্রহ আছে, সে সিনেমা দেখে আনন্দ উপভোগ করতে চায়।

শিশুদের আগ্রহ (Interest of Children)

শিশুদের নানা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ বাল্যকাল থেকেই দেখা যায়। তবে আমাদের আগ্রহের একটি বৃহত্তর অংশ অর্জিত। বাল্যকালে যে পরিবেশে শিশু বেড়ে ওঠে, সেখান থেকেই আগ্রহের উপাদান সংগ্রহ করে। অবশ্য বয়সের সঙ্গে আগ্রহেরও পরিবর্তন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সারা জীবন একটি বিশেষ আগ্রহ স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। শিশুদের আগ্রহ বাল্যকালে দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রথমটি হল **খেলা** এবং দ্বিতীয়টি হল **গল্প**। শিশুরা সবচেয়ে ভালবাসে খেলা করতে। খেলা শিশুর জীবন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। গল্প শুনতেও শিশু ভালবাসে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, গল্পের ভিতর দিয়ে শিশু তার মানসিক অভাববোধের তৃপ্তি সাধন করে কল্পনার মাধ্যমে। (উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা)

প্রত্যেক শিশুই কাজ করতে ভালবাসে। বিভিন্ন কাজে শিশুদের আগ্রহ দেখা যায়। শিশু আবার সেই সকল কাজ করতে ভালবাসে যার ভিতর দিয়ে শিশুর গঠনমূলক প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধিত হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে পড়ার সঙ্গে কাজের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

শিশুর বয়স ভেদে আগ্রহের পরিবর্তন হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

> "ভাবে শিশু বড় হলে শুধু যাবে কেনা
> বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলনা।
> বড়ো হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
> দুই হাত তুলে যায় ধন জন পানে।
> আরো বড় হবে নাকি যবে অবহেলে
> ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।"

আগ্রহ দল (Interest Groups) **:** স্ট্রং (Strong) প্রভৃতি কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী শিশুদের তাদের আগ্রহ অনুসারে কয়েকটি দলে ভাগের কথা বলছেন। যেমন, কোন শিশুর বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহ, কোন শিশুর আগ্রহ দেখা যায় মানব বিদ্যায়। বড়দের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তির আগ্রহ রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং কোন ব্যক্তির আগ্রহ দেখা যায় অফিসের চাকুরিতে। আগ্রহ অনুসারে শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়। এই আগ্রহ দলের বৈশিষ্ট্য কি? আগ্রহ দল হল, সদৃশ বা সমজাতীয় আগ্রহবিশিষ্ট একটি দল এবং একটি দলের আগ্রহ অন্য দলের আগ্রহ অপেক্ষা পৃথক। সদৃশ আগ্রহবিশিষ্ট গ্রুপকে আগ্রহ দল বলে।

আগ্রহ ও মনোযোগ (Interest and Attention)

আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের একটি গভীর সম্পর্ক দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতে 'আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ, আর মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা'। যখন কোন বিষয় বা বস্তুতে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করি, তখন ঐ বিষয়ে আমাদের মনোসংযোগের কোন অসুবিধা হয় না। যে সকল ছেলেরা স্কুলের পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না, দেখা যায় তারা অন্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। পাঠে সফলতা মনঃসংযোগের ক্ষমতার মানের সঙ্গে যুক্ত।

যেরূপভাবে পাঠদান করলে শিক্ষার্থী সহজেই পাঠটি আয়ত্ব করতে পারে, তাকে ফলপ্রসূ শিক্ষণ বলে। শিক্ষণকে ফলপ্রসূ করতে হলে পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে অথবা জীবনের সমস্যা বা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা আগ্রহান্বিত হই, তখন ঐ বিষয় সম্পর্কে আমরা সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে চাই। আবার কোন পাঠ সঠিকভাবে আয়ত্তের জন্য গভীর চিন্তা প্রয়োজন। যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকে, আমরা ঐ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি, ঐ সম্পর্কে পড়াশোনা করি, ঐ বিষয়টি নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করি। যে বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ থাকে না, ঐ বিষয় নিয়ে আমরা কোন রূপ চিন্তা করি না। এই কারণে যে সকল বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, সেই সকল বিষয় সঠিকভাবে আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ ঐ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক অর্থাৎ শিশুর আগ্রহ-কেন্দ্রিক। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন, শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রম স্থির করা উচিত। বয়স ভেদে শিশুদের আগ্রহ পরিবর্তনশীল। তবে সাধারণত দেখা যায়, প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণীতে শিশু নানা বিষয়ে আগ্রহ দেখায় এবং বড়দের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে। কেন পাখী ওড়ে? মেঘ থেকে কেন বৃষ্টি হয়? ফুল কিভাবে ফোটে?—ইত্যাদি প্রশ্ন শিশুরা বড়দের নিকট প্রতিনিয়ত করে। একজন শিক্ষাবিদ এই ধরনের শিশুদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এরা হল যেন একটি চলন্ত প্রশ্নবোধক চিহ্ন' (Question mark)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বয়সে শিশুরা ভর্তি হয়, সেই বয়সে যে সকল বিষয়ে তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, তা হল গল্প শোনা, খেলাধূলা প্রভৃতি। কৈশোর বয়সে ছেলে-মেয়েদের আগ্রহ দেখা যায় অ্যাডভেনচারের গল্পে ও প্রতিযোগিতামূলক বাইরের খেলাধূলায় (Outdoor games)।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে ও কাজকর্মে শিশুদের আগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং আগ্রহকে কেন্দ্র করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা।

পাঠে শিশুদের আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?

পাঠে শিশুদের আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়? এই প্রশ্নটি অভিভাবকেরা ও শিক্ষকেরা একই ভাবে করে থাকেন। অনেক সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের কাছে

এই প্রশ্ন করে, 'কেন আমি পাঠে আগ্রহ পাই না? আগ্রহ না থাকলে পাঠে মনসংযোগ করাও কঠিন। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা শিক্ষার্থীর পরিবেশের প্রভাবের কথা যেমন বলবো, তেমনি ব্যক্তি হিসাবে শিশুর বিভিন্ন গুণাগুণেরও উল্লেখ করবো।

মনোবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, শিশুদের পাঠের আগ্রহ তার পরিবেশগত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এইগুলি হল—(১) শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, (২) শিশুর বুদ্ধি ও মনোভাব, (৩) বিদ্যালয় পরিবেশ, (৪) পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃতি ইত্যাদি।

শিশুর পারিবারিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যে গৃহে নিয়মিত লেখা-পড়ার চর্চা হয়, সেখানে শিশুরা সহজেই লেখা-পড়া করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। লেখা-পড়ার আগ্রহ শিশুর অভ্যাস গঠনের সঙ্গে যুক্ত। যে গৃহে সকালে ও সন্ধ্যাবেলায় নির্দিষ্ট সময়ে পড়বার ব্যবস্থা আছে, সেখানে শিশুরা আপনা থেকেই লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখায়।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে লেখা-পড়ায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কারণ এই শ্রেণীর অধিকাংশই চাকুরিজীবী এবং যেহেতু যারা লেখা-পড়ায় উত্তম ফল করে, তাদের চাকুরি পেতে সহজ হয়। এই কারণে এই সকল পরিবারের শিশুদের প্রথম থেকেই লেখা-পড়ায় আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু যে সকল পরিবারে তেমন লেখা-পড়ার চর্চা নেই, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের লেখা-পড়ায় তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

শিশুর বুদ্ধি ও মনোভাবের সঙ্গে আগ্রহের যোগ আছে। বুদ্ধিমান শিশুরা বিমূর্ত চিন্তামূলক বিষয় ও সৃষ্টিমূলক কাজে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে।

বিদ্যালয় পরিবেশ শিশুর লেখা-পড়ায় আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। উন্নতমানের বিদ্যালয় ও দক্ষ শিক্ষকগণ শিশুর শিক্ষালাভে আগ্রহ সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিশুর শিক্ষালাভে আগ্রহ সৃষ্টিতে পিতা-মাতার উৎসাহ (Parental encouragement) এবং উত্তম বিদ্যালয় পরিবেশ (Good schooling) সবিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষকের শিক্ষাদানের কৌশল, স্নেহময় ও দরদী ব্যবহার শিশুদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি নির্ভর করে না। বিদ্যালাভ একটা তপস্যা, কঠোর সাধনার সঙ্গে যুক্ত।' প্রথম থেকেই শিশুদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সেইভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক কিছু কৌশল অবলম্বন করে সাময়িকভাবে পাঠে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন। এই কৌশলগুলি হল—(১) সহজ থেকে কঠিনে এবং জানা থেকে অজানায় বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করা। (২) উদাহরণ ও উপকরণের সাহায্যে বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক করতে চেষ্টা করা। (৩) বিষয়বস্তুটি সরাসরি বক্তৃতার মাধ্যমে

ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত না করে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করা। (৪) যে সকল প্রশ্নের উত্তর ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টায় দিতে পারে, তা কখনই শিক্ষক বলে দেবেন না। (৫) আলোচ্য বিষয়টিকে কয়েকটি ধারাবাহিক অংশে ভাগ করে ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হবে। (৬) মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে শিক্ষক জানবেন ছাত্ররা কতখানি বিষয় আয়ত্ত করতে পেরেছে। (৭) শিক্ষার্থীদের সর্বদাই আবিষ্কারকের ভূমিকায় রাখতে হবে।

মনোভাব (Attitudes)

সুষ্ঠু শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল শিশুর উচ্চ আদর্শ, সুস্থ মনোভাব ও উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। শিক্ষাবিদেরা মনে করেন, এই গুণগুলির উন্মেষ যে কোন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সংজ্ঞা: মনোভাবের প্রতিশব্দ হিসাবে অনেকে 'প্রতিন্যাস' শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে মনোভাব বা প্রতিন্যাস একটি মানসিক অবস্থা। কোন ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির যে প্রতিক্রিয়া, তা ব্যক্তির মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত। মনোবিজ্ঞানীরা মনোভাবকে বলেন কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বা ঝোঁক।

আগ্রহ ও মনোভাব

কোন বিষয়, বস্তু বা ভাব (Idea) সম্পর্কে আমাদের একটি বিশেষ ধারণা থাকতে পারে। এই ধারণা বিষয়বস্তুর অনুকূল বা প্রতিকূল—এর যে কোন একরকমের হতে পারে। আগ্রহের পরিসর ক্ষুদ্র, কিন্তু মনোভাবের পরিসর খুব ব্যাপক। মনোভাব নিষ্ক্রিয়, কিন্তু আগ্রহ সক্রিয়। কোন বিষয় সম্পর্কে আমরা একটা বিশেষ মনোভাব পোষণ করতে পারি, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি। আবার ঐ বিষয় সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি।
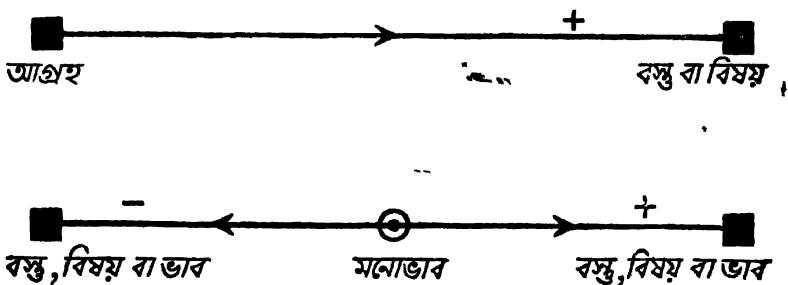
উপরের চিত্রে আগ্রহ ও মনোভাবের পার্থক্য দেখানো হল। আগ্রহের গতি একই দিকে। কিন্তু মনোভাবের গতি উভয় দিকে।

সংস্কার ও মনোভাব

আমাদের সংস্কারের সঙ্গে মনোভাবের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সংস্কারের ফলে আমাদের অনেক মনোভাব গঠিত হয়। পিতা-মাতারা তাদের সন্তান সম্পর্কে একটি সংস্কারমূলক মনোভাব পোষণ করেন। সাধারণত পিতা-মাতারা মনে করেন তাদের ছেলেমেয়েরা কোন অন্যায় করতে পারে না। প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরাই দুষ্ট। 'বঙ্গে প্রতিবেশীরাই দুরাত্মা।' অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক মনোভাব আমরা আমাদের দেশ ও জাতি সম্পর্কে পোষণ করি। যেমন আমরা মনে করি, আধুনিক বিমানের আবিষ্কারগুলি আমাদের বেদে উল্লেখ আছে। আমরা মনে করি, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ সকল দেশের সেরা। ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলকে অন্য সব স্কুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের বশে আমরা আমাদের জাতিভেদ প্রথা সমর্থন কবতে ভুল বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যবহার করি। সংস্কার আমাদের যুক্তিমূলক মনোভাবকে আচ্ছন্ন করে।

বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ হয়। সংস্কার-মূলক মনোভাব শিশুরা লাভ করে গৃহ-পরিবেশে বাবা-মা'র কাছ থেকে। খাদ্য সম্পর্কে মনোভাবও বাল্যকাল থেকে গঠিত হয়। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সংস্কার প্রভৃতি আমরা লাভ করি বাল্যকাল থেকেই।

মনোভাব সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান
Factors Influencing the Development of Attitudes

১. **পরিণমন (Maturation) ঃ** মনোভাব সংগঠন যদিও প্রধানত পরিবেশ জাত এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত, শিশুর মনোভাব সংগঠনে শিশুর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই পরিণমন বলতে শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ বোঝায় না, এই বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ পূর্ণতা। শারীরিক পূর্ণতার অভাব হলে শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব স্বভাবী (Normal) শিশুদের মনোভাব অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। যে সকল শিশুর শারীরিক গঠনে ত্রুটি থাকে তাদের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে। একটি সুস্থ সবল কিশোর বালক তার চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কে একটি সুস্থ মনোভাব পোষণ করে। ব্যক্তির উচ্চতা, গায়ের রং, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সামাজিক উপযোজনের প্রধান উপাদান। আমাদের দেশে গায়ের রঙের একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা আছে। কুশ্রী চেহারার ব্যক্তিরা অনেক সময়ে হীনমন্যতা দোষে ভোগে। ব্যক্তির বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদও বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ যেমন ব্যক্তির পরিণমনের একটি প্রধান বিষয়, তেমনি তা ব্যক্তির মনোভাব গঠনেও সাহায্য করে। ব্যক্তির যৌনগ্রন্থির ক্ষরণ ব্যক্তির পরিণমনের একটি প্রধান উপাদান।

ব্যক্তির মনোভাব গঠনের সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশের যোগ আছে। মনোভাব গঠন

নির্ভর করে প্রত্যক্ষজ বা উপলব্ধিগত অভিজ্ঞতার উপর এবং মনোভাবের বিকাশ নির্ভর করে স্মৃতি, বোধশক্তি ও যুক্তিশক্তির উপর। একটি ছোট শিশুর পক্ষে তার চারিপাশের বস্তু, ব্যক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সীমাবদ্ধ। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন শিশুর পক্ষে ১২ বৎসরের পূর্বে পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করা সম্ভব হয় না। ১২ বৎসরের পরে শিশুরা সাধারণভাবে বিমূর্ত শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। যেমন, এই বয়সে তারা সততা ও দয়া এই শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে। এই বয়সে তাদের বুদ্ধি শক্তির বিকাশ ঘটে এবং নানা বিষয়ে নিজস্ব মনোভাব গঠনের শক্তি অর্জন করে।

কৈশোরকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাজকর্মে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই বয়সে তারা অন্যের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেবামূলক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। তবে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় মনোভাবের তারতম্য।

কৈশোরকালে মনোভাবের বিকাশ সম্পর্কে অলপোর্ট ও ভার্নন একটি পরীক্ষা করেন। তাঁদের পরীক্ষার বিষয় ছিল কৈশোরকালের মূল্যমান (Values) সম্পর্কে পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দেখা গেল, ছাত্ররা বেশী নম্বর পেয়েছে তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এবং ছাত্রীরা বেশী নম্বর পেয়েছে সৌন্দর্য সম্পর্কিত, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে। এই কারণে অলপোর্ট ও ভার্ননের সিদ্ধান্ত এই যে, ছেলেমেয়ে-ভেদে কিশোরকালে মেয়েদের মধ্যে নানা বিষয়ে মনোভাবের পার্থক্য দেখা যায় এবং এই পার্থক্য হেতু তাদের পাঠ্যক্রমের বিষয় নির্বাচনেও পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

২. **শারীরিক কারণ (Physical Factors):** মনোবিজ্ঞানীদের মত এই যে, শিক্ষার্থীর মনোভাব সংগঠনে শারীরিক সুস্থতা ও প্রাণবন্ততা অন্যতম প্রধান উপাদান। এইগুলি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে পরিবেশের সঙ্গে সঠিক উপযোজনে। শারীরিক অসুস্থতা, পুষ্টিহীনতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়। আমাদের বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। লেখা-পড়ার ব্যাপারে এই ধরনের রুগ্ন শিশুরা আশানুরূপ ফল দেখাতে পারে না। ফলে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায় এই ধরনের শারীরিক ত্রুটিযুক্ত শিশুরা নানা ধরনের অসামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং বিদ্যালয়-পরিবেশ তাদের আচরণকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে না।

৩. **গৃহের প্রভাব (Home Influence):** শিশুর মনোভাব গঠনে গৃহের প্রভাব খুব বেশী থাকে। পিতা-মাতা বিভিন্ন বিষয়ে যে মনোভাব পোষণ করেন, সাধারণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেইরূপ মনোভাব দেখা দেয়। ধর্ম সম্পর্কে পিতা-মাতার মনোভাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েরা অনুসরণ করে। কিন্তু সুস্থ বা রাজনৈতিক মতবাদ বা অন্য আধুনিক বিষয় সম্পর্কে পিতা-মাতার মনোভাব ছেলে-মেয়েরা গ্রহণ করতে চায় না। তবে এই সম্পর্কে দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা

গৃহের পরিবেশ দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। আমাদের সমাজে গৃহের বাইরে মেয়েদের মেলামেশার সুযোগ কম, কিন্তু ছেলেরা নানা দল ও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয় ও বহু ধরনের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকে এবং অন্যদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলে তারা পরিবার থেকে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করে। গৃহের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিশুর মনোভাবকে গঠন করে থাকে। গৃহের সকল সভ্যদের আচরণ যদি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অধীন হয় এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা যদি উচ্চমানের হয় তাহলে শিশুর ব্যক্তিগত আচরণও উচ্চ শৃঙ্খলাযুক্ত হতে পারে।

৪ **সামাজিক পরিবেশ:** গৃহ-পরিবেশ শিশুর প্রাথমিক মনোভাব গঠনে অন্যতম প্রধান উপাদান এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিশু যতোই বড় হয়, ততই তার সামাজিক পরিবেশও বড় হয়। সে নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব, খেলার সাথী ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়। ফলে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে থাকে। কৈশোর ও যৌবনকালে শিক্ষার্থী নানা ক্লাব, প্রতি·ান, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে এবং এর ফলে সে নতুন নতুন মতবাদ, সংস্কার ও সামাজিক নিয়মনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়। এই সকল প্রভাবে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং নতুন মনোভাব গঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশও এই সময়ে শিশুদের মনোভাব গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিশেষ করে যে সকল শিশু নতুন বিদ্যালয়ে আসে তাদের মনোভাবে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব আদর্শ আছে। একে আমরা ট্রাডিশন বলতে পারি। এই ট্রাডিশনের প্রভাব নতুন শিক্ষার্থীর মনোভাবকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

৫ **পাঠ্য বিষয়ের প্রভাব:** বিদ্যালয়ে শিশু যে সকল পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে, শিশুর মনোভাব গঠনে তারও যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়ে যে সকল রচনা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়, তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনোভাব প্রভাবিত হয়। পুস্তকের ঘটনা বিন্যাস কিভাবে একটি জাতির মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি আনন্দমঠ, নীলদর্পণ, টমকাকার কুটির প্রভৃতি পুস্তক।

৬. **বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসন (School Government):** বিদ্যালয় পরিচালনা যদি সকলের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে তবে তার প্রভাব ছাত্রদের আচরণ ও মনোভাবকেও প্রভাবিত করতে পারে। এইভাবে তারা গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে যদি বিদ্যালয় কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নির্দেশে অর্থাৎ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তার প্রভাবে ছাত্ররা অগণতান্ত্রিক মনোভাব গঠন করতে পারে। বিদ্যালয় পরিচালনায় যদি ছাত্রদের অংশ থাকে তবে তার প্রভাবও গণতান্ত্রিক মনোভাব গঠনে সহায়ক। এই কারণে আধুনিক বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রচলন করা হয়।

৭. **চলচ্চিত্রের প্রভাব :** ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব সংগঠনে চলচ্চিত্রের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই সম্পর্কে যে সমীক্ষা চালান হয় তা থেকে দেখা যায়, যে সকল ছেলেমেয়ে নিয়মিত সিনেমা দেখে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যমান ও আদর্শ সম্পর্কে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়ে থাকে। অপরাধমূলক ও যৌন অপরাধ সম্পর্কিত সিনেমার ঘটনা ছাত্রদের মানসিক শৃঙ্খলাকে নষ্ট করতে পারে।

৮. **শিক্ষকের প্রভাব :** শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ঐ সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের চারিত্রিক প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব ও আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। শিক্ষক যদি ছাত্রদরদী হন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষককে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তা হলে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব গঠনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন। তবে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের মতে প্রভাব সৃষ্টি করবার জন্য দরকার ছোট ক্লাশের। কারণ বড় ক্লাশের শিক্ষকদের পক্ষে সকল ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না।

৯. **পাঠ্যক্রমের প্রভাব :** থর্নডাইক কয়েকজন শিক্ষকের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব গঠনে কতখানি সাহায্য করে, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। ঐ বিষয়গুলি আমাদের দেশের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরিবর্তিত রূপে এখানে উল্লেখ করা যায়। যথা—১. খেলাধুলা, ২. শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ৩. হাতের কাজ, ৪. মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ৫ ইতিহাস, ৬. মাতৃভাষায় রচনা লেখা, ৭. বিজ্ঞান ও গণিত, ৮. সংস্কৃত। শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠনে, বিশেষ করে সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠনে খেলাধুলা, হাতের কাজ ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের প্রভাব খুব বেশী। মাতৃভাষা ও সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতি (National culture) বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রভাবও যথেষ্ট দেখা যায়। আমাদের দেশে বিজ্ঞান পাঠের একটি বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ডিগ্রী কোর্সে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিষয় পাঠ করে তারা নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে একটি বিশেষ মনোভাব পোষণ করে। একজন শিক্ষাবিদের মতে বিজ্ঞানের ছাত্ররা শিক্ষার ক্ষেত্রে কুলীন শ্রেণীভুক্ত। বিদ্যালয়ে অন্য ছাত্রদের চেয়ে এরা একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব গঠনে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে।

১০. **শিক্ষা-পদ্ধতি :** মনোবিজ্ঞানীরা ও শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞানীরা ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে কিভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে সহজে শিখতে পারে এবং পাঠের বিষয়বস্তু কিভাবে তাদের মনোভাবকে পরিবর্তন ও গঠন করতে পারে সেই সম্পর্কে নানা গবেষণা করেছেন। বই থেকে সরাসরি কোন পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করলে ঐ সম্পর্কে তাদের মনোভাব বিরক্তিকর হতে পারে। দৈনন্দিন পাঠে মনোযোগের

অভাব দেখলে অনেক সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল হওয়ার ভয় দেখান কিংবা শাস্তি দেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষকদের ঐরূপ আচরণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পর্কে উপযুক্ত মনোভাব গঠনের পরিপন্থী এবং তা তাদের নৈতিক মানের অবনতি ঘটাতে পারে। যে শিক্ষক কোন পাঠকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে ছবি, মডেল ও ডায়াগ্রামের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পাঠদান কালে শিক্ষার্থীদের মানসিক তৃপ্তির দিকে নজর রাখেন, তিনি সফল শিক্ষক হিসাবে গণ্য হন। শিক্ষার্থীর মনোভাব গঠনে এই ধরনের শিক্ষকদের প্রভাব খুব বেশী। শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গঠন একদিনে সহজে সম্ভব হয় না; এর জন্য শিক্ষক, অভিভাবকদের প্রথম থেকেই নজর দিতে হয়।

মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষা (Attitude Scale) : আজকাল মনোভাব পরিমাপের জন্য নানা ধরনের স্কেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। উপযুক্ত স্কেল পেলে শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের চেষ্টা করা। চারিত্রিক সততা, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে মনোভাব উপযুক্ত স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

৩
শিশুর শিখন : শিখনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন কৌশল
CHILD LEARNING : ITS NATURE AND VARIOUS MECHANISMS

শিখন

সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা নতুন জ্ঞান অর্জন করি বা নতুন কৌশল আয়ত্ত করি বা কোন নতুন কাজ সম্পাদনে সক্ষম হই, তাকে শিখন বলে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর আদিম আচরণের পরিবর্তন ঘটে থাকে। ব্যক্তি তখনই শিক্ষা লাভ করে যখন সে শিক্ষালাভের প্রয়োজন অনুভব করে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে।

শিখনের একটি জটিল ধরন হল—কোন সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। শিখন তখনই ঘটে যখন পুরাতন অভিজ্ঞতা ও কাজের প্রণালী শিশুকে তার সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে না বা নতুন পরিবেশে উপযোজনে সাহায্য করে না। এইরূপ ক্ষেত্রে শিখন হল একটি উপযোজন প্রক্রিয়া।

উপরের সংজ্ঞাটিতে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তা যে একমাত্র বাইরের আচরণেই ঘটে থাকে তা নয়। তা অভ্যন্তরীণ আচরণের অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির ও কল্পনা শক্তিরও পরিবর্তন ঘটায়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, শিখন হল অনুশীলন বা চর্চার ফলস্বরূপ। তবে এই অনুশীলন যান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হলেই শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখনের ক্ষেত্রে অনুশীলন হল ব্যক্তির পুনঃপুনঃ সংগঠিত প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সার্থকভাবে উপযোজনে সক্ষম হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। মনে করা যাক, একটি ছেলে 'হাতের লেখা' শিখতে চেষ্টা করছে। প্রথমে যখন সে লিখতে আরম্ভ করল, তখন সে কিভাবে পেন্সিল ধরতে হবে, কিভাবে কাগজের উপর অক্ষর বা শব্দটি লিখতে হবে, কিছুই জানতো না। যখন সে প্রথমে লিখতে চেষ্টা করল, তখন হাতের বা আঙুলের পেশীগুলোকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকভাবে লেখা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। পরে ধীরে ধীরে পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে তার পক্ষে হাতের পেশীগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল এবং সে লিখতে শিখল। পরে যতই তার লিখবার চর্চা বেড়ে গেল, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে সে লিখবার ক্ষমতা আয়ত্ত করল, তখন তার লেখবার ক্ষমতাটি অভ্যাসে পরিণত হল। পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার প্রাথমিক

ভুল ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলি বাদ দিতে শিখল এবং প্রথম দিককার অসংযত প্রতিক্রিয়ার স্থান অধিকার করল সংযত ও সহজ প্রতিক্রিয়া। উপরোক্ত প্রকাশের ধারাটিকে ভিত্তি করে শিখনকে বলা যায় এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দক্ষতার উন্নতি ঘটে থাকে।

কোন একটি বিষয় প্রথমে একবার পাঠ করে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অর্থনীতিতে 'জিনিসের উৎপাদনের সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধির সম্পর্ক সম্পর্কে যে আলোচনা আছে' অনেকের পক্ষে একবার পড়ে হয়তো বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। কিন্তু কয়েকবার পাঠের পর ছাত্রের পক্ষে যেমন জাতীয় সমৃদ্ধির সঙ্গে কলকারখানা ও কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের হারের জটিল সম্পর্কটি বোঝা সম্ভব হয়, তেমনি অর্থনীতির অনেক বিষয় সম্পর্কে তার পূর্বের ধারণা পরিবর্তিত হতে পারে।

উপরের আলোচিত বিষয়গুলি ছাড়া শিখনের অন্যান্য রূপ হল—১. সার্থক-ভাবে পর্যবেক্ষণ, ২ মুখস্থ করা, ৩. কোন বিষয় উপলব্ধি করা এবং দুইটি বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জন, ৪. সমস্যার সমাধান, ৫. সঠিকভাবে প্রাক্ষোভিক প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন, ৬. কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, মনোভাব ও আদর্শের বিকাশ সাধন।

ব্যক্তি যেভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে, তার উপর নির্ভর করে শিখন প্রতিক্রিয়াটি। অনেক ক্ষেত্রে শিখনের সমস্যা ও তৎসম্পর্কিত প্রকৃত উত্তরটি সহজেই শিক্ষার্থীর পক্ষে ধরা সম্ভব হয়। যেমন, যদি কাউকে অর্থহীন বাক্য সমষ্টির একটি তালিকা অর্থাৎ Nonsense syllables মুখস্থ করতে বলা হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজন থাকে না। এই ধরনের বিষয় শেখাকে বলে যান্ত্রিক শিখন অর্থাৎ না বুঝে মুখস্থ করা (Rote learning)। যদি শিক্ষার্থীকে একটি ছবির মাধ্যমে কোন একটি বস্তুকে নির্দেশ করতে বলা হয়, সেখানেও এই ধরনের শিখনের মধ্যে, প্রকৃত উত্তরটি নির্দেশের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ প্রচেষ্টার পরিচয় থাকে না। কিন্তু যদি বিষয়টি এরূপ হয় যে, একটি ভগ্নাংশের লবকে বৃদ্ধি করে গেলে ভগ্নাংশটির উপর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত উত্তরের জন্য যেমন আবিষ্কারকের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, তেমনি বিষয়টিকে বিশ্লেষণের ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। শিক্ষার্থীর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। এখানে শিক্ষার্থীকে জানতে হবে প্রদত্ত সমস্যাটির প্রকৃত অর্থ। সমস্যাটিতে কি দেওয়া আছে? কি বের করতে হবে? এবং কিভাবে প্রদত্ত উপাত্ত (Date)-এর সাহায্যে প্রকৃত উত্তরটি জানা যেতে পারে। তখনই তার পক্ষে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হবে।

শিখনের কয়েকটি শর্ত (Some Conditions of Learning)

সাধারণত শিখনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রধান।

১ **শিখন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল** (Learning Depends on

Environment.) : যদি শিক্ষার্থী ও পরিবেশের মধ্যে কোনরূপ সংযোগ স্থাপিত না হয়, তাহলে শিখন সম্ভব হয় না। যেমন জন্ম থেকেই মূক-বধির শিশুরা পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পায় না। পরিবেশের প্রকৃতির উপর শিখন নির্ভর করে। যেমন সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার উপর নির্দিষ্ট পরিবেশের শিশুদের ভাষা, স্থানীয় উচ্চারণ ভঙ্গি, সামাজিক আচরণ, মনোভাব প্রভৃতি নির্ভরশীল।

শিশুর সামাজিক পরিবেশ যত উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে, ততই তার পক্ষে শিক্ষায় সুযোগও বেশী হবে। আবার অন্য পক্ষে শিশুর পরিবেশ যদি ভিন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ অনুন্নত এবং দরিদ্র হয়, তখন শিশুর পক্ষে শিখনের সুযোগও কম থাকে। দরিদ্র ও অনুন্নত পরিবেশে শিশুর ভাষার উন্নতি ও শব্দ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয় এবং তা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

ডাঃ এ. এফ্. ওয়াট্‌স (Dr. A. F. Watts) শিশুদের ভাষার শব্দ সম্পদ (Vocabulary) সম্পর্কে গবেষণা করেন। এই পরীক্ষণে তিনি শিশুদের দুইটি ভাগে ভাগ করেন। এক দলে রইল উন্নত অঞ্চলের শিশুরা এবং অন্য দলে থাকল অনুন্নত অঞ্চলের শিশুরা। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, উন্নত অঞ্চলের শিশুরা অনুন্নত অঞ্চলের শিশুদের অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ মার্ক বেশী পেয়েছে।

আর একটি পরীক্ষায় সিরিল বার্ট (C. Burt) দেখিয়েছেন যে, শিশুদের বিদ্যালয়ের উপস্থিতির হার পরিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই পরিবেশের মান অবশ্য বিচার করা হয়েছে শিশুর পিতার বাৎসরিক আয়ের ভিত্তিতে। একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে ফ্রেজার (E. Fraser) দেখিয়েছেন যে, একই প্রকার বুদ্ধির মানবিশিষ্ট ছেলে মেয়েদের মধ্যে যারা উন্নত গৃহ-পরিবেশ থেকে এসেছে, তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অধিকতর উন্নত।

আর একটি পরীক্ষণে দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধির সাফল্যাঙ্ক পরিবারের আকারের দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের শিক্ষা বিষয়ক একটি সার্ভের মাধ্যমে দেখা গেল ছোট ও সীমিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বৃহৎ পরিবারের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা অধিক উচ্চমানের বুদ্ধিযুক্ত।

এই সকল পরীক্ষণ থেকে মনোবৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরিবেশের গুণ বা বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান শিশুর শিক্ষাগত উৎকর্ষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবেশে শিশুরা পরিবেশগত উদ্দীপনার অভাব বোধ করে, পরিবেশ থেকে জ্ঞান আহরণের কোন সুযোগ পায় না এবং সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও তাদের সুযোগ খুব সীমিত। পারিবারিক কোন উৎসাহও সাধারণ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে তারা নিজেদের তেমন ভাবে প্রকাশের সুযোগ পায় না, তাদের উৎসাহ থাকে অবদমিত এবং যেটুকু মানসিক দক্ষতা নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করে, পরিবেশগত কারণে তা ব্যবহারের সুযোগও তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হল এই যে, শিশুর শিক্ষায়

বিদ্যালয়ও একটি প্রধান পরিবেশ। বিদ্যালয়ের মান উন্নত ও উৎসাহদায়ক না হলে শিশুর শিক্ষাগত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২. শিখন পরিণমনের বা দেহমনের পরিপক্কতার উপর নির্ভরশীল (Learning Depends on Maturation): উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়াও শিশুর শিক্ষায় রয়েছে জৈবিক বিকাশ অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিপক্কতার প্রভাব। এই পরিপক্কতা বলতে আমরা বুঝি অভ্যন্তরীণ বিকাশের স্তর।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দেহমনের উপযুক্ত পরিপক্কতা না জন্মালে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না। যেমন, একটি ছয় মাস বয়সের শিশুকে শত চেষ্টা করেও আমরা হাঁটা বা কথা বলা শেখাতে পারি না। উপযুক্ত বয়স হলে শিশুর দেহমনে যে পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়, শিখন তার উপর সবিশেষ নির্ভরশীল। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অল্প বয়সে শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে কিছু কিছু বিষয় শেখানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে কেবলমাত্র সময় ও পরিশ্রমের অযথা ব্যয় হয়ে থাকে।

গেসেল ও থম্‌সন (Gesell and Thomson) সমজাতীয় যমজ দুটি মেয়েকে নিয়ে এক পরীক্ষা করেন। যখন তাদের বয়স ৪৬ সপ্তাহ তখন একটি মেয়েকে নিয়ে থমসন সপ্তাহে ৬ দিন ধরে মোট ৬ সপ্তাহ ট্রেনিং দিলেন একটি সিড়ি বেয়ে উঠতে। ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং-এর পর মেয়েটি ২৬ সেকেণ্ডে সিড়িটি বেয়ে উঠতে শিখল। অন্য মেয়েটিকে কোন ট্রেনিং দেওয়া হল না। যখন তাদের বয়স ৫৩ সপ্তাহ হল তখন অন্য মেয়েটিকে সিড়ি বেয়ে উঠতে দেওয়া হল। মেয়েটির পূর্বে সিড়ি বেয়ে উঠবার কোন অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল সে প্রথম প্রচেষ্টায় ৪৫ সেকেণ্ডে সিড়ি বেয়ে উঠতে শিখল। কিন্তু যখন তাদের বয়স হল ৫৫ সপ্তাহ, তখন ২ সপ্তাহের ট্রেনিং-এর পর মেয়েটি ১০ সেকেণ্ডে সিড়ি বেয়ে উঠতে শিখল। দেখা গেল ৫৫ সপ্তাহ বয়সের সময় দ্বিতীয় মেয়েটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর তাড়াতাড়ি সিড়ি বেয়ে উঠতে শিখল, যদিও প্রথম মেয়েটিকে পূর্বে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষকদের মন্তব্য এই যে, বয়সের পরিপক্কতাহেতু দ্বিতীয় মেয়েটির পক্ষে সহজেই প্রথম মেয়েটিকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, পরিণমন ও শিখন উভয়ই শিশুর বিকাশে সাহায্য করে। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ শারীরিক বৃদ্ধি ও মনোবিকাশ একই অর্থে ব্যবহার করেন। যদি আমরা কোন দক্ষতার উন্নতি হিসাবে বিচার করি তখন শিখন-এর সঙ্গে বৃদ্ধি বা উন্নতির সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিণমন বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির বৃদ্ধি যে বৃদ্ধি কোনরূপ বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ যে কোন পরিবেশেই ব্যক্তিকে রাখা হোক না কেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। শারীরিক বৃদ্ধির জন্য শিশুকে কোন ট্রেনিং নিতে হয় না বা কোন বিষয় অভ্যাস করবার প্রয়োজন হয় না। পরিবেশের ব্যাপক পার্থক্য সত্ত্বেও শিশুদের বিকাশ ধারা মোটামুটি একই ভাবে ঘটতে থাকে। অর্থাৎ শিশুরা মোটামুটিভাবে একই বয়সে কথা বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে। শিশুদের এই শিখন তাদের শারীরিক পরিপক্কতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু জ্ঞানমূলক শিখনের জন্য শিশুদের

পরিবেশ ও সুযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে পরিবেশ শিশুর শেখার উপযোগী উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। শিশুর শিখন দুটি বিষয় অর্থাৎ পরিবেশ ও শিশুর পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

৩. **শেখবার জন্য প্রস্তুতি (Readiness to Learn) :** উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শিখন কেবল মাত্র ট্রেনিং ও পুনঃপুনঃ অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ ট্রেনিং না দেওয়া সত্ত্বেও শিখন ক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। সঠিকভাবে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর একটি বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা প্রয়োজন। শিশুর এইরূপ পরিপক্বতার সময়েই শিখন কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হতে পারে। মনের দিক থেকে এই পরিপক্বতাকেই 'মানসিক প্রস্তুতি' বলে। শিশুর এই মানসিক প্রস্তুতির কালেই শিশুকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, লেখা ও পড়া শেখাবার সঠিক বয়ঃক্রম হল অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর। তখন শিশুব শরীর ও মন লেখা ও পড়া শেখবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সকলের পক্ষেই যে এই বয়সে এই শিক্ষার প্রস্তুতি আসে এরূপ নয়। এই প্রস্তুতি বহুলাংশে শিশুর গৃহ-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার শিশুর একটি নির্দিষ্ট জন্ম বয়সকেই লেখবার ও পড়বার সঠিক কাল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এই প্রস্তুতি অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মনোবয়স বা বুদ্ধির উপরও নির্ভর করে।

শিশুর গৃহ-পরিবেশ যদি শিশুর নিকট আনন্দদায়ক হয়, বাবা মা ও বড়দের উৎসাহ শিশু প্রতিনিয়ত লাভ করে এবং গৃহের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এমন যে, শিশু প্রতিনিয়ত শেখবার একটি তাগিদ অনুভব করে, তাহলেই তার মধ্যে বিষয়টি শেখবার জন্য একটি প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল
Various Mechanisms of Learning

শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশল আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি। এগুলি হল, **১. পর্যবেক্ষণ, ২. অনুকরণ, ৩. পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতি, ৪ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ও ৫. অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান।**

আমরা বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি।

১. পর্যবেক্ষণ (Observation)

পর্যবেক্ষন হল শিখনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি, নানা বিষয় সম্পর্কে ধারণা করি। যে পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ধারণা করি তাকে **পর্যবেক্ষণ** বলে। কিন্তু কেবল মাত্র চোখে দেখে এবং কানে শুনেই কোন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মে না। কোন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য, অর্থাৎ ঐ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পর্যবেক্ষণ করা

উচিত। যে ধরনের পর্যবেক্ষণ কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পাদন করা হয় তাকে শিক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ বলে।

পর্যবেক্ষণের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Observation) : মানুষের সকল কাজের পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকে। পর্যবেক্ষণের পিছনেও মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। ছোট শিশু প্রথমে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে। সে চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে। আবার কখনও কখনও মুখে দিয়ে স্বাদ অনুভব করে। শিশুর বিশ্বজগতের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম অবস্থাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন 'বিস্ময়ের পর্যায়' (Wonder stage)। ক্রমে তার জ্ঞানেন্দ্রিয় যতোই সবল হতে থাকে, ততই তার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ধারণার প্রক্রিয়ায় কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এইগুলি হল এই যে, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিশু নিজেই হয় নিজের শিক্ষক ; এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পায়। এর ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। শিশু যখন কোন কিছু শেখে নিজের চেষ্টায় তখন তার প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। তার মধ্যে প্রক্ষোভের স্থিরতা জন্মে (Emotional stability)। সঠিক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ লাভ করে।

পর্যবেক্ষণের কয়েকটি শর্ত (Some Conditions of Observations) : পর্যবেক্ষণ কয়েকটি বিশেষ শর্তের অধীন। প্রথমত পর্যবেক্ষণের থাকবে একটি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যহীন পর্যবেক্ষণ দ্বারা কোনরূপ শিক্ষালাভ হয় না। দ্বিতীয়ত, পর্যবেক্ষণ করবার পূর্বে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ কিভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এই সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণের একটি ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। চতুর্থত, পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য বা উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকার। পর্যবেক্ষণ কার্যে শিক্ষার্থী যেন আনন্দ পায় এবং পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য হবে কিছু আবিষ্কার করা বা নতুন বিবরণ সংগ্রহ করা।

অনুসন্ধান (Exploration) : পর্যবেক্ষণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত আর একটি পদ্ধতি হল অনুসন্ধান। অনুসন্ধান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে নিতে হবে একজন আবিষ্কারকের ভূমিকা। নিউটন ফলের বাগানে বসে আপেল ফলটি পড়া দেখলেন। তাঁর আগে বহু ব্যক্তি আপেল ফল পড়া দেখেছে। কিন্তু যেহেতু নিউটন ছিলেন একজন আবিষ্কারক এবং একজন বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এই কারণে 'ফল পড়া' ব্যাপারটি তাঁর কাছে মামুলী ঘটনা বলে মনে হল না। তিনি এর পিছনে যে অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করলেন সেটি হল 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'।

পর্যবেক্ষণ শক্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের একটি বিশেষ ভূমিকার কথা শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করেছেন। শিক্ষকের উচিত পর্যবেক্ষণ প্রণালীর বৈজ্ঞানিক সূত্রটি ছাত্রদের ধরিয়ে দেওয়া। কোন বস্তু বা স্থান সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের

জন্য ছাত্রদের কি কি বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে? কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে? শিক্ষককেই এই বিষয়ে নির্দেশ দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণের সময়ে শিক্ষার্থীদের একটি প্রশ্নতালিকা পূর্ণ করতে হবে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই পদ্ধতিটির সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছেন, একটু পরিবর্তিত রূপে। তিনি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন 'স্থানিক তথ্য সন্ধান' (Regional study)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রেরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় অর্থনীতি, ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করবে।

কিভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি কাজে লাগানো যায়ঃ অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে যায়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, ঐতিহাসিক স্মৃতিসমৃদ্ধ অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদ দর্শন করে। কিন্তু এই মামুলি দেখায় তাদের শিক্ষাগত লাভ তেমন হয় না। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতির জন্য পর্যবেক্ষণের পিছনে শিক্ষকের সহযোগিতামূলক নির্দেশনা (Guidance) প্রয়োজন। সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষকের উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পর্যবেক্ষণের বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থাপিত করা। একটি কাগজে প্রশ্নগুলি লিপিবদ্ধ করে ছাত্রদের দিলে ছাত্ররা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে প্রয়োজনীয় উত্তর সংগ্রহ করে পরে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করলে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। প্রকৃতি পাঠ, ইতিহাস, ভূগোলের অনেক বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায়। শিল্পচর্চায় এবং শিল্পসম্মত মনোভাব সৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রকৃতিতে যে 'ঋতু উৎসব' চলছে তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে হবে; এইজন্য শরতের ধানক্ষেত ও পদ্মবন, বসন্তের পলাশ শিমুলের মেলা তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নন্দলালবাবু বলেছেন, 'প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালবাসতে শিখলে, তাদের সৌন্দর্যের উৎস আর কখনও শুকোবে না, কারণ প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্প সৃষ্টির উপাদান যুগিয়ে এসেছে।'

২. অনুকরণ (Imitation)

অনুকরণ হচ্ছে অন্যকে নকল করবার প্রবৃত্তি। আমরা নানাভাবে অন্যদের অনুকরণ করি। অনুকরণের মাধ্যমে প্রথম জীবনে শিশু ভাষা ও আচরণের অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন প্রাণীর জৈব প্রয়োজনের পক্ষে অপরিহার্য দুটি বিষয় হল প্রকৃতিজাত। একটি হল সহজ প্রবৃত্তি (Instinct) এবং অন্যটি হল অনুকরণ। পার্সি নান্ ব্যাক্তির এই অনুকরণ প্রবৃত্তিকে বলেছেন মাইমেসিস্ (Mimesis)। ক্ষুধা পেলে খাবার ইচ্ছা প্রাণীর একটি সহজ প্রবৃত্তি, কিন্তু দাদার বল খেলা দেখে ছোট ভাইয়ের বল খেলতে আরম্ভ করা হল অনুকরণ। ম্যাকডুগাল একজন ব্রিটিশ

মনোবিজ্ঞানী। ম্যাকডুগালের মতে সহজ প্রবৃত্তির ন্যায় অনুকরণ প্রবৃত্তিও প্রাণী ও মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে কোন আবেগ যুক্ত থাকে; তবে অনুকরণের সঙ্গে সাধারণত কোনরূপ আবেগ যুক্ত থাকে না। এই কারণে ম্যাকডুগাল অনুকরণ প্রবৃত্তিকে বলেছেন **নকল প্রবৃত্তি** (Pseudo-instinct)।

অনুকরণের মনস্তত্ত্ব (Psychoolgy of Imitation): ম্যাকডুগাল কেবলমাত্র অনুকরণকে নকল প্রবৃত্তি বলেননি, তিনি আরও দুটি প্রবৃত্তিকে নকল প্রবৃত্তি বলেছেন। এই দুটি নকল প্রবৃত্তি হল অভিভাবন (Suggestion) এবং সমবেদন (Sympathy)। এই তিনটি বিষয়ের কার্যপ্রণালীর মধ্যে কয়েকটি শর্ত দেখা যায়। প্রথমত, এগুলি ঘটে থাকে দুজন ব্যক্তির মধ্যে। দ্বিতীয়ত, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন প্রভাবিত হন এবং অন্যজন প্রভাবিত করেন। তৃতীয়ত, অনুকরণ ঘটে এমন দুইজনের মধ্যে যখন একজন অন্যজন অপেক্ষা উচ্চমানের, অর্থাৎ একজন অন্যকে নকল যোগ্য মনে করে।

শিক্ষা ও সামাজিক দিক দিয়ে নিম্নস্তরের একব্যক্তি কেন উচ্চস্তরের ব্যক্তিকে অনুকরণ করতে চায়? এর কারণ এই যে, মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে নিম্নতর সামাজিক স্তর থেকে উচ্চস্তরে উঠবার জন্য। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ উপযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে কল্পনা বিলাসের খেলা আরম্ভ হয়। শিশু দেখে নানা লোকে নানা কাজ করে। মা, বাবা, ভাই, বোন শিশুর দৃষ্টির মধ্যে নানা কাজে লিপ্ত রয়েছে। শিশু যখন এই সমস্ত দেখে তখন সে তার কৌতূহল ও অনুকরণের প্রবৃত্তি অনুযায়ী নিজের জীবনে ঐ কাজগুলি প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। নতুন কাজের উদাহরণ শিশুর মনের উপর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই শিশু ঐ সকল কাজ অনুসরণ কবতে চায়। অনুকরণের সাহায্যে শিশু যখন ঐ সকল কাজ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে তখন তার আচরণের সার্থক রূপটি প্রকাশ পায় এবং এর ফলে তার **সার্থক আত্মানুভূতি** (**Positive self-feeling**) জন্মে।

অবশ্য এই সার্থক আত্মানুভূতি প্রথম থেকেই জন্মে না। শিশু যখন অন্যকে কাজ করতে দেখে, তখন নিজে ঐ কাজ করবার সুযোগ না পেলে শিশুর মনে ব্যর্থ আত্মানুভূতির (Negative self-feeling) সৃষ্টি হয়। শিশু নিজের অনুকরণ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঐ খেলা আরম্ভ করে। অনুকরণের মাধ্যমে শিশু চেষ্টা করে ব্যর্থ আত্মানুভূতিকে সার্থকস্তরে চালিত করতে। শিশু যখন অনুকরণে সার্থক হয়, তখন তার প্রবৃত্তির তৃপ্তি জন্মে এবং তার আত্মানুভূতি সার্থক স্তরে উন্নীত হয়। স্যার পারসি নান্ এই ধরনের অনুকরণধর্মী মনগড়া খেলাকে বলেছেন "পরীক্ষামূলক আত্মগঠন কর্ম" (Experimental self-building)। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি তার আত্মগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রবৃত্তির প্রভাবের ফলেই শিশু ধীরে ধীরে শৈশব থেকে বাল্যে এবং বাল্য থেকে কৈশোরে উপনীত হয়।

অনুকরণের শর্ত (Conditions of Imitation): শিশুর কাজের সকল

অবস্থাতেই অনুকরণ ঘটে না। অনুকরণধর্মী কাজ ও খেলা অনেকগুলি শর্তের সঙ্গে যুক্ত। এই শর্তগুলি হল—

(১) ছোটরা বড়দের কাজকর্ম অনুকরণ করে।

(২) শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থ সম্পদে যারা উচ্চপর্যায়ের তাদের আচার-আচরণ নিম্ন পর্যায়ের লোকেরা অনুকরণ করতে চায়।

(৩) শাসিতেরা শাসকশ্রেণীর আচরণ অনুকরণ করে।

অনুকরণের শিক্ষাগত মূল্য (Values of Imitation in Education): শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে অনেক জিনিস শেখে। ছোটবেলায় ভাষা শেখবার কালে শিশুরা কথা বলবার ভঙ্গি, উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, আচরণের স্টাইল, সংস্কার, মনোভাব প্রভৃতি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে অনুকরণের মাধ্যমে শিখে থাকে। এক পরিবেশ থেকে অন্য সামাজিক পরিবেশে বাস করলে এই বিষয়টি বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে অন্যদের অনুকরণের প্রবৃত্তি বিদ্যালয় সমাজের শৃঙ্খলার মান বজায় রাখে।

শিখনের একটি পদ্ধতি হিসাবে অনুকরণকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়? চিরাচরিত পদ্ধতি হল, কোন বিষয়ের একটি মডেল বা আদর্শকে শিক্ষকের নির্দেশ মত কপি করতে বলা হয়। যেমন কোন অক্ষরের মডেল বা আদর্শকে নকল করে শেখা, অথবা ছবি-আঁকা দেখে ছবি আঁকা অথবা একটি রচনার আদর্শ অবলম্বন করে অনুরূপ রচনা লেখবার চেষ্টা করা।

শিখনের একটি পদ্ধতি হিসাবে অনুকরণ পদ্ধতিটি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রচলিত। মনে হয়, পদ্ধতি হিসাবে অনুকরণকে প্রাচীনকালে যেমনভাবে ব্যবহার করা হত, বর্তমানেও ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এই পদ্ধতির ব্যবহারে এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকেন, 'আমি যেমন বলি, তেমনি করে বল অথবা এইভাবে অঙ্কটি কর অথবা ব্লাকবোর্ড থেকে লেখাটি কপি করে নাও।' অনুকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করে কিছু করবার নেই। শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যে বিষয়টি নকল করা হয় তার উদ্দেশ্যও শিক্ষার্থীর নিকট তেমন স্পষ্ট নয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের আদেশ মান্য করে কাজটি করে বটে, কিন্তু তার নিজের দিক থেকে তার ইচ্ছা বা স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব থাকতে পারে। পদ্ধতি হিসাবে অনুকরণ তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন শিক্ষার্থী নিজেই কাজটি করে আনন্দ পায় এবং কাজটি করবার জন্য ভিতর থেকেই একটি তাগিদ অনুভব করে। অনুকরণ পদ্ধতি হিসাবে তখনই ফলপ্রসূ হয়।

৩. 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতি (Trial and Error Method)

যখন কোন ব্যক্তি একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে ঐ সমস্যাটি সমাধানের প্রয়োজন অনুভব করে, তখন ঐ সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রথমে তার পূর্ব-পরিচিত কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে। কিন্তু ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য যদি তার পূর্ব-পরিচিত অভিজ্ঞতাটি যথেষ্ট মনে না হয়, তখন সে সমস্যাটি সমাধানে নতুন কোন পদ্ধতি

আবিষ্কারের চেষ্টা করে। সে সমস্যাটির সমাধানে বহুপ্রকার সম্ভাব্য পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং যে পদ্ধতিগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হয় অর্থাৎ সমস্যার সমাধানে যে সকল পদ্ধতি সাহায্য করে না, সেগুলি সে পরিত্যাগ করে এবং নতুন কোন পদ্ধতি খোঁজ করে। এইভাবে পরীক্ষা ও ভ্রম সংশোধনের মাধ্যমে সে সমস্যাটি সমাধানের সঠিক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতি। শিখনেব মূলে থাকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা বা পরীক্ষা। প্রথম দিকে ভুলের সংখ্যা বেশী থাকে। পরে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে ভুলের সংখ্যা কমতে থাকে এবং সকলের শেষে সঠিক উত্তব খুঁজে পাওয়া যায়।

আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক শিক্ষার 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' তত্ত্বের প্রবক্তা। থর্নডাইক বলেন যে, শিক্ষা বলতে বোঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। এটি একটি অন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একবার ভুল করে আবার ভুল সংশোধন করে অগ্রসর হতে হয়। থর্নডাইকের এই মতবাদকে যোগসূত্র স্থাপনের মতবাদ (Connectionism or the Bond Theory of Learning)-ও বলা হয়। থর্নডাইক শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেন, তা হল প্রাণীদের নিয়ে। তিনি বিড়াল, কুকুর, পাইক মাছ প্রভৃতি নিয়ে এই পরীক্ষা চালান। থর্নডাইকের এই পরীক্ষাগুলি প্রচেষ্টা ও ভ্রম পদ্ধতির মারফত শিখন ও অভ্যাস গঠন সম্পর্কে মৌলিক পরীক্ষার পর্যায়ে পড়ে।

থর্নডাইকের পরীক্ষণ

শিখন সম্পর্কে থর্নডাইকের বিখ্যাত পরীক্ষণ হল বিড়াল নিয়ে। প্রাণীদের শিখনের ক্ষমতা পর্যবেক্ষণের পরীক্ষা হিসাবে এর মূল্য সমধিক। থর্নডাইকের পরিকল্পনা ছিল
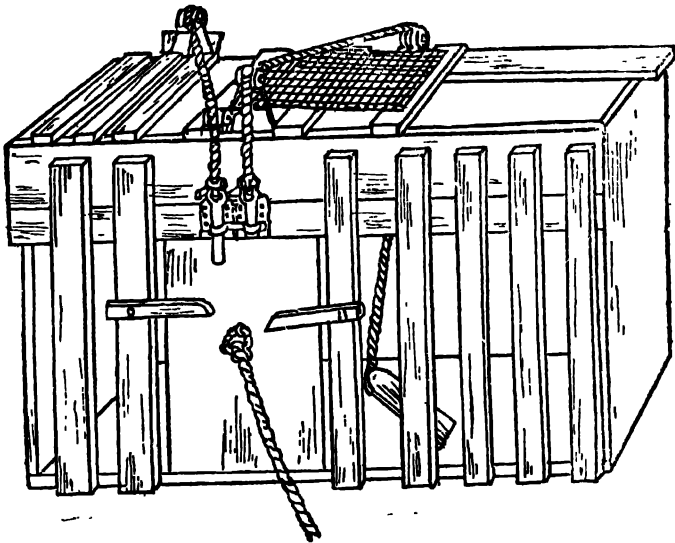
এইরূপ। তিনি অনেকগুলি কাঠের খাঁচা তৈরি করলেন। এদের নাম দেওয়া হল 'ধাঁধা খাঁচা' (Puzzle box)। প্রদত্ত চিত্রটি থেকে এই খাঁচার গঠন সম্পর্কে ধারণা

করা*যেতে পারে। খাঁচাগুলি এরূপভাবে তৈরি করা হল যে, একটি মাত্র কৌশল কাজে লাগিয়ে দরজাটি খোলা যেতে পারে। বিভিন্ন খাঁচার জন্য বিভিন্ন রকম খোলার ব্যবস্থা রাখা হল। যেমন কোন খাঁচার দরজা একটা বোতাম ঘোরালেই খুলে যায়। কোনটির একটি দড়ি টানলে, কোনটিতে একটি লিভার (Lever) নামিয়ে এবং কোনটিতে একটি তারের আংটা টানলেই দরজাটা খোলা যায়। অবশ্য জটিল খাঁচাগুলিতে একাধিক কৌশল রাখা হল বেরিয়ে আসবার জন্য।

থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখলেন এবং খাঁচার বাইরে রাখলেন এক খণ্ড মাছ অথবা মাংস। এই অবস্থায় বেড়ালটিকে খাঁচার মধ্যে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। সে নানা উপায় অবলম্বন করল। কখনও খাঁচার ফাঁক দিয়ে থাবাটা ঢুকিয়ে দিল, কখনও খাঁচার রড্‌গুলি কামড়াতে লাগল, আঁচড়াতে লাগল। বেড়ালটির প্রথম দিকের আচরণের মধ্যে দেখা গেল বেরিয়ে আসবার জন্য এলোমেলোভাবে প্রচেষ্টা। এইভাবে নানা রকমের চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ বেড়ালটি দরজার দড়ি ধরে টান দিল এবং দরজাটি খুলে গেল। বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছটি খেতে লাগল। কিছুটা খাবার পরেই বিড়ালটিকে আবার খাঁচার মধ্যে রাখা হল দ্বিতীয় বার পরীক্ষার জন্য। দ্বিতীয় বারও বেড়ালটি নানাভাবে চেষ্টা করল বেরিয়ে আসবার জন্য এবং পরিশেষে দরজা খোলবার দড়িটিকে টান দিয়ে বেরিয়ে আসতে শিখল। দ্বিতীয় বারে বিড়ালটি প্রথম বারের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারল। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় তার আচরণ প্রথম বারের মত এলোমেলো ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলিতে তার এলোমেলো আচরণগুলি অনেক সংযত হল এবং ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে আসবার পদ্ধতিটি শিখে ফেলল। পরবর্তী পরীক্ষায় বেড়ালটিকে খাঁচার মধ্যে রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার কাছে গেল এবং দড়িটি টান দিয়ে বেরিয়ে আসল। বেড়ালটি কুড়বার বা তার বেশীবার চেষ্টা করে এবং সময়ের দিক থেকেও এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগালো বেরিয়ে আসবার কৌশলটি শিখতে। এই পরীক্ষণ থেকে থর্নডাইক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করলেন :

১. বেড়ালটির বেরিয়ে আসবার পেছনে দুটি বিষয়ের প্রভাব ছিল—প্রথমত, সে ছিল ক্ষুধার্ত এবং দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করে বেরিয়ে আসবার পরেই সে তৃপ্তিদায়ক খাদ্য পেয়েছিল।

২. বার বার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বেড়ালটি এলোমেলো আচরণ পরিত্যাগ করতে শিখল এবং সঠিক আচরণটি আবিষ্কার করল।

৩. বিড়ালটি খাঁচা থেকে বের হবার পদ্ধতিটি বারে বার ভুল করে তবে শিখতে পারল।

থর্নডাইকের ১২নং বেড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য যে সময় (সেকেণ্ড) লাগিয়েছিল তা নিচে দেওয়া হল :

১৬০, ৩০, ৯০, ৬০, ১৫, ২৮, ২০, ৩০ ২২, ৩০,
১৫, ২০, ১২, ১০, ১৪, ১০, ৮, ৮, ৫, ১০,
৮ ৬ ৬ ৭

পূর্বপৃষ্ঠার উপাত্তগুলি বা সাফল্যের সময় লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়।
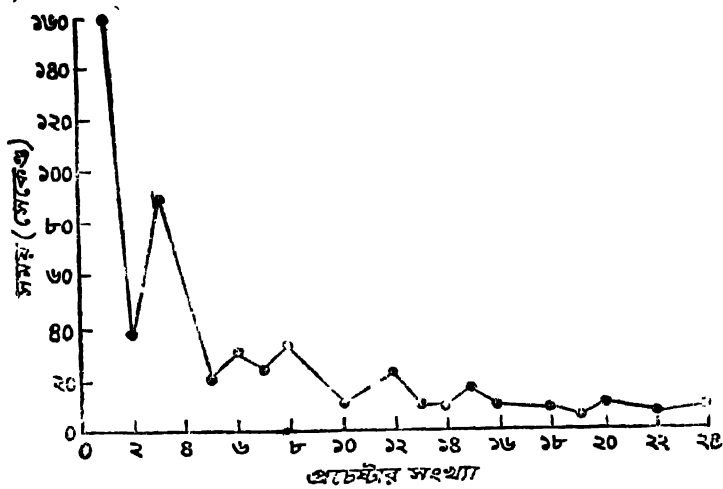
শিখন লেখ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিড়ালটি প্রথম প্রচেষ্টার পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সময় নিল ৩০ সেঃ, তারপরের প্রচেষ্টায় আবার অধিক সময় (৯০ সেঃ) লাগল। শিখন লেখটি পরীক্ষা ও ভ্রান্তি শিখনের একটি সুন্দর চিত্র।

থর্নডাইক বেড়ালের শিখনের যে লেখচিত্রটি দিয়েছেন তা নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। লেখচিত্রটি থেকে শিখনের লেখচিত্রটি সাধারণভাবে কিরূপ হবে, সেই সম্পর্কে ধারণা করা যায়। লেখটির গতিপথ থেকে বোঝা যায় শিখন কিভাবে ঘটে থাকে। প্রথম বারে বেড়ালের ১৬০ সেঃ লাগল খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু দ্বিতীয় বারে ঐ সময় লাগল মাত্র ৩০ সেঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় বারেই বেড়ালটি বেরিয়ে আসবার কৌশলটি অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করতে পারল। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, বিড়ালটি তার প্রথম বারের অভিজ্ঞতাটি সহজেই কাজে লাগিয়ে খাঁচা থেকে বের হতে পারল। কিন্তু পরের প্রচেষ্টাগুলিতে ঐ ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। কখনও কম সময় এবং কখনও বেশী সময় লাগিয়ে বেড়ালটি খাঁচা থেকে বের হবার চেষ্টা করেছে। থর্নডাইক এই ধরনের অনিয়মিত প্রচেষ্টাকেই বলেছেন 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতি। তবে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিড়ালটি বেরিয়ে আসবার নিয়মটি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে পারল এবং এর ফলে শেষ প্রচেষ্টাগুলিতে তার সময় লাগল খুব কম। থর্নডাইক বলেছেন যে, লেখটির উন্নতি ও অবনতির ধারা লক্ষ্য করলেই সহজেই বোঝা যায় কি করে শিখন প্রক্রিয়ায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

থর্নডাইকের শিখন-সূত্র

Thorndike's Laws of Learning

বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে থর্নডাইক শিখনের কয়েকটি নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে অনুষঙ্গ নীতির (Laws of Association) উপর ভিত্তি করে এই সূত্রগুলি গঠন করা হয়েছে। এই সূত্রগুলির ব্যবহার দেখা যায় আমাদের দৈনন্দিন শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই সূত্রগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ড (Prof. Sandiford)-এর মন্তব্য এই যে, এই সূত্রগুলি শিখনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করেছে এবং শিক্ষকদের নিকট এই সূত্রগুলি খুব মূল্যবান। নিচে আমরা সূত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করছি।

[ক] ফললাভের সূত্র (The Law of Effect)

কেউ কেউ এই সূত্রটিকে বলেন সন্তোষ ও বিরক্তির সূত্র (Law of satisfaction and annoyance)। থর্নডাইক সূত্রটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন।

যখন কোন উদ্দীপক বা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি পরিবর্তনযোগ্য সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এই সংযোগের ফল স্বরূপ যদি অব্যবহিত পরে একটি সন্তোষজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ দৃঢ়তর হয়; অন্য পক্ষে যদি সংযোগের অব্যবহিত পরে বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ দুর্বল হয়।

থর্নডাইকের এই সূত্রটিকে পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত নিয়ম (Law of Reward and Punishment) ও বলা যায়। যদি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের পরেই পুরস্কার দেওয়া যায়, তাহলে সংযোগটি দৃঢ়তর হয়; যদি শাস্তি দেওয়া যায়, তাহলে সংযোগটি শিথিল বা দুর্বল হয়।

উক্ত সূত্রটির সমর্থনে থর্নডাইকের পরীক্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। বেড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবার পাওয়ার আনন্দ পেল, ফলে তার শিখনটি দৃঢ়তর হল এবং তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে আসবার নিয়মটি শিখে নিল। যদি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটিকে শাস্তি দেওয়া হত বা জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আন্দাজ করা যায় বেড়ালের পক্ষে শিখনটি আদৌ ঘটত না।

ফললাভের সূত্রটি থর্নডাইকের একটি প্রধান সূত্র। শিক্ষকদের উচিত সঠিকভাবে সূত্রটির তাৎপর্য অনুধাবন করা। ছাত্রদের শেখবার আগ্রহ তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন তাদের নিকট শিখনের ফলটি তৃপ্তিদায়ক হবে এবং তত্ত্বের নেতিবাচক দিকটি অর্থাৎ যখন শিখনের ফলটি দুঃখজনক হয়, তখন শেখবার আগ্রহ হ্রাস পায়।

ফললাভের সূত্রটিকে পুরস্কার ও শাস্তির নিয়ম বলা হয়েছে। এখন এই পুরস্কারের প্রকৃতি নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। সামাজিক প্রশংসা বা সমর্থনকেও অনেকে পুরস্কারের সমতুল্য মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ভালো ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া ঠিক নয়। তারা যে ভালো, সাধারণের এই প্রশংসামূলক মনোভাবেই তারা নিজেদের পুরস্কৃত ভাববে। সমাজে প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি আর্থিক সঙ্গতি লাভ করতে না পারলেও প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভকেই যোগ্য পুরস্কার বলে মনে

করবে। অন্যেরা যা পারেনি, আমি তা পেরেছি—এই মনোভাবই হল যোগ্যতার পুরস্কার। প্রকৃত জ্ঞানলাভ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে ভালো হওয়াই ভালো ছেলের একমাত্র পুরস্কার হওয়া উচিত।

[খ] অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise or Frequency)

থর্নডাইকের শিখনের দ্বিতীয় সূত্রটি হল অনুশীলনের সূত্র। এই সূত্রকে অভ্যাস গঠনের সূত্র (Law of habit formation)-ও বলা যায়। এই সূত্রটির দুই অংশ—একটি অংশ হল ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে, অন্যটি হল অব্যবহার বা পুনরাবৃত্তির অভাব সম্পর্কে।

ব্যবহারের সূত্র (Law of use): যখন কোন উদ্দীপক বা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি পরিবর্তন যোগ্য সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহলে অন্য সকল অবস্থা সমান থাকলে (অভ্যাসের ফলে) সেই সংযোগ দৃঢ়তর হয়।

অব্যবহারের সূত্র (Law of dis-use): একটি উদ্দীপক বা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে কোন পরিবর্তন যোগ্য সংযোগ স্থাপিত না হলে উভয়ের সংযোগ শিথিল হয়।

উপরের সূত্রটিতে 'অন্য সকল অবস্থা সমান থাকলে' এই কথাটির তাৎপর্য হল অবস্থার সন্তোষজনক অথবা অসন্তোষজনক অবস্থা। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে শিখনটি দৃঢ় হয়, কিন্তু তা তখনই হতে পারে যদি পরবর্তী অবস্থাটি সন্তোষজক হয়। দুঃখজনক বা কষ্টদায়ক অবস্থা যদি সংযোগ স্থাপনের পর সৃষ্টি হয়, তাহলে কোন ক্রমেই পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা শিখন কার্যটি নিখুঁত হয় না।

অনুশীলনের সূত্রটির সঙ্গে আরও যে দুটি নিয়ম জড়িত বা কাছাকাছি, সেগুলি হল **তীব্রতা** (Intensity) ও **সাম্প্রতিকতা** (Recency)। উজ্জ্বল আলোক, উচ্চশব্দ শিশুদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে। কোন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ শিখনটি সহজতর করে। এই সকল বিষয়ের সহিত প্রতিক্রিয়ার সংযোগ কয়েকবার অনুশীলনের পর-ই দৃঢ় হয়। আবার যে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে তা পূর্বের স্থাপিত সম্পর্ক অপেক্ষা দৃঢ়তর হয়।

অনুশীলনের সূত্র ও ফললাভের সূত্র দুইটির কাজ একসঙ্গে ঘটে থাকে। সাধারণত যে কাজ সন্তোষজনক তা আমরা সহজেই শিখতে পারি, যে কাজ দুঃখজনক তা তাড়াতাড়ি ভুলে যাই।

ব্যবহার: আমাদের জীবনে অনুশীলনের সূত্রটির বহুল প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। টাইপ শেখা, মটর ড্রাইভিং, সাইকেল চালানো শেখা প্রভৃতিতে আমরা প্রাথমিক নিয়মগুলি প্রথমে শিখে নিয়ে যতোই অনুশীলন করি ততই আমাদের শেখার উন্নতি ঘটে থাকে। বিদ্যালয়ে নানা বিষয় শিক্ষালাভেও অনুশীলন সূত্রের প্রয়োগ দেখা দেয়। আমরা যখন একটি কবিতা মুখস্থ করি বা নামতা মুখস্থ করি পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মারফতেই আমরা শিখে থাকি।

সমালোচনা : থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির বিরুদ্ধে অনেক মনোবিজ্ঞানী সমালোচনা করেছেন। প্রাথমিক স্মৃতি (Incidental memory), সম্পর্কে যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায়, আমরা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করছি, কিন্তু আমাদের সচেষ্ট মনোসংযোগের অভাব রয়েছে—এরূপ বিষয়গুলি আমরা সঠিকভাবে শিখি না। যেমন কোন ব্যক্তি হয়তো বারে বারে ঘড়ি দেখে কিন্তু বলতে পারে না তার ঘড়ির ডায়ালের সংখ্যাগুলি রোমান সংখ্যা না সাধারণ সংখ্যা। আমাদের স্কুলেও এরূপ অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই সকল সময়ে শিখনকে দৃঢ় করে না। নিম্নলিখিত গল্পটি অনেক মনোবিজ্ঞানের বইতে উল্লেখ করা হয়, অনুশীলন সূত্রটির ব্যর্থতার উদাহরণ হিসাবে। একটি বালকের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, সে **I have gone** না লিখে লিখত **I have good**। তার এই ভুলটি সংশোধনের জন্য শিক্ষক তাকে **'I have gone'** বাক্যটি ১০০ বার লিখতে বললেন। এই জন্য বালকটিকে স্কুলের ছুটির পর এইটি লিখে বাড়ী যেতে বলা হল। বালকটি **I have gone** বাক্যটি ১০০ বার লিখে যখন দেখল যে, শিক্ষক মহাশয় চলে গিয়েছেন, তখন তাকে এইভাবে একখানি চিঠি লিখে বাড়ী চলে গেল। বালকটি লিখল—**Sir, I have written 'I have gone' 100 times and since you are not here, I have goed home."** অর্থাৎ স্যার, আমি **'I have gone'** ১০০ বার লিখেছি, যেহেতু আপনি এখানে নেই, **I have goed home**। এরকম ভুলের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুশীলনের সূত্র সব ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়।

[গ] প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

যখন কোন সঞ্চারক বা আচরণ যোগ্য সত্তা বা পরিবহণ একক (Conduction unit) ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ হয়, তখন ক্রিয়াটি সম্পাদিত হলে সন্তোষ জন্মে ; আবার কোন সঞ্চারক যদি কোন ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ না হয়, তাহলে ক্রিয়াটি সম্পাদনে বিরক্তি জন্মে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, কাজের জন্য প্রস্তুতি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। থর্নডাইক প্রস্তুতির সূত্রটিকে প্রধানত নার্ভ বা স্নায়ুক্রিয়ার প্রস্তুতি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। স্নায়ুতন্ত্রের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ায় যে নিউরোনগুলি সক্রিয় হয়ে স্নায়ুপ্রবাহের আকারে ঐ উত্তেজনাকে স্নায়ুকেন্দ্রে নিয়ে যান, তখন ঐ নিউরোনগুলিকে পরিবহণ একক বা সঞ্চারক (Conduction unit) বলে। সকল সঞ্চারক—উত্তেজনা গ্রহণ করে স্নায়ুকেন্দ্রে পরিবহণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে না। যখন তাহা প্রস্তুত থাকে তখন পরিবহণটি হয় সুখকর এবং যখন প্রস্তুতির অভাব থাকে, তখন সেটি হয় দুঃখকর।

থর্নডাইক সূত্রটিকে অন্যভাবেও আলোচনা করেছেন। যখন কোন যোগসূত্র (Bond) ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ হয়, তখন কাজটি সম্পাদন করলে আনন্দ জন্মে এবং না

করলে বিরক্তি জন্মে। আবার যখন কোন যোগসূত্র কোন ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ না হয়, তখন কাজটি সম্পাদিত হলে বিরক্তি জন্মে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, কাজের জন্য প্রস্তুতি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোনের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। সময়ে সময়ে ঐগুলি ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ হয়, আবার মাঝে মাঝে ঐগুলিব উন্মুখতা থাকে না। যখন ঐগুলি সক্রিয়তার জন্য প্রস্তুত থাকে, তখন ক্রিয়াসম্পাদনটি আনন্দদায়ক হয় এবং কাজটি না করাটা হয় দুঃখজনক। উপরোক্ত অবস্থার বিপরীত প্রক্রিযাটি অর্থাৎ নিউরোনকে যদি জোর করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, যখন তাদের কাজের জন্য প্রস্তুতি থাকে না, তখন বিরক্তি বা অসন্তোষ জন্মে থাকে। যখন আমরা ক্লান্ত বোধ করি, তখন কোন কিছু করতে বলা বিরক্তিকর। তবে উপযুক্ত বিশ্রামেব পর কঠোর পবিশ্রম আনন্দদায়ক।

বিদ্যালয়ে এই সূত্রটির প্রভূত প্রয়োগ দেখতে পাওয়া পায়। শ্রেণীকক্ষে যে ছেলে উত্তর দিতে উন্মুখ হয় তাকে বলতে দিলে তাব পক্ষে বিষয়টি সন্তোষজনক হয় ও না বলতে দিলে বিরক্তিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

থর্নডাইকেব পরীক্ষা থেকেও সূত্রটির সমথন পাওয়া যায়। থর্নডাইকের বেড়ালটি ছিল ক্ষুধার্ত এবং বাইরে ছিল খাদ্য। সুতবাং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সবদিক থেকে বেড়ালের প্রস্তাত ছিল। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদেরও কাজ হওয়া উচিত পাঠ আলোচনার পূবে ছাত্রদের প্রস্তুত কবে নেওয়া। সঠিকভাবে প্রস্তুতি না জন্মালে ছাত্রদের পক্ষে শেখবার কাজটি আনন্দদায়ক হয় না।

৪. সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ (Theory of Conditioning)

শিখনের অন্য একটি তত্ত্ব হল সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ। সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ কোন নতুন বিষয় নয়। প্রাচীন কাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, দুটি বিষয়ের সংযুক্তি (Associations) পরস্পবের সঙ্গে কিভাবে ঘটে থাকে। একটি ছোট শিশু মাকে দেখে মা কথাটি উচ্চারণ কবে। মাকে 'মা' বলতে তাকে কে শেখালো? অবশ্য এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এইভাবে যে, শিশু মাকে যতবার দেখেছে ততবার 'মা' কথাটি শুনেছে ও বলেছে। এখানে মাকে দেখাটি হল S এবং প্রতিক্রিয়া শব্দটি 'মা' হল R। সুতরাং S→R-এর সঙ্গে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট হয় না প্রথমে কিভাবে এই অনুষঙ্গ ক্রিয়াটি গঠিত হয়েছিল।

এই বিষয়ের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ প্যাভলো (Pavlov) তার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্পর্কে পরীক্ষণ থেকে। প্যাভলোর এই পরীক্ষণটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আমরা যদি তেঁতুল বা আমের আচাব খাই আমাদের মুখে লালা নিঃসরণ হয। একটি কুকুরকেও যখন কিছু মাংস খেতে দেওয়া হয় তখন কুকুরের মুখ দিয়েও লালা ঝবে। এই যে খাদ্য মুখে দিলে মুখ দিয়ে লালা ঝরে এটি আমাদের শারীরিক অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। এটি কাউকে আলাদা করে শেখাতে হয় নি। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন উদ্দীপক (মাংস বা তেঁতুল) স্বভাবত যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, তাকে বলা হয় সরল বা নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত (Simple or unconditioned reflex)। এখন যদি কুকুরকে মাংস দেওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে কয়েকবার ঘণ্টা বাজানো হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাহলে দেখা যায় মাংস না দিয়েও ঘণ্টা বাজালে কুকুরের মুখ দিয়ে লালা ঝরে। এই যে কুকুরের ঘণ্টার শব্দ শুনে লালা নিঃসরণ, একে বলা যায় **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Conditioned response)

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্পর্কে প্যাভলোর পরীক্ষণ
Pavlov's Experiments on Conditioned Response

ইভান পেট্রোভিচ্ প্যাভলো (১৮৪৯-১৯৩৬) একজন বিখ্যাত রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ। মানুষের শরীরের রক্ত বহন প্রণালী, হজম প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্পর্কে তার মৌলিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। ১৯০৪ সালে তিনি ভেষজ বিদ্যা সম্পর্কে (Medicine) মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পান। ১৯০২ সাল থেকেই তিনি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (Conditioned response) সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু তার ঐ সম্পর্কে গবেষণা পত্রগুলি রাশিয়ান ভাষায় লেখা ছিল বলে পাশ্চাত্য দেশে ঐ ফলাফল জানতে দেরি হয়।
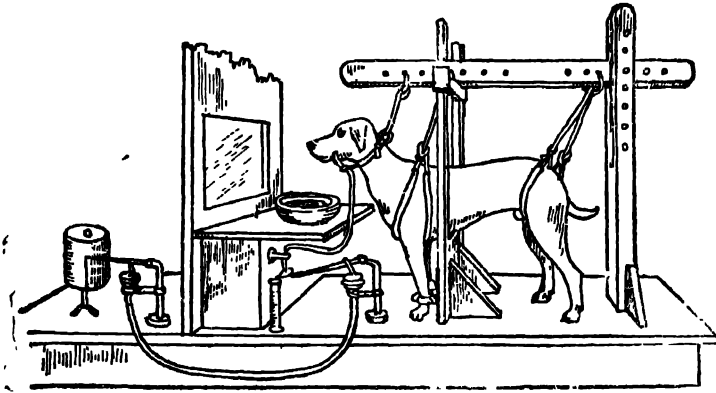
পরবর্তীকালে ঐ গবেষণার ফল যখন অন্য দেশে প্রচারিত হল, তখন বিভিন্ন দেশে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঐ বিষয়ের চর্চা আরম্ভ হল। বিশেষ করে আমেরিকার আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের নিকট প্যাভলোর গবেষণা এক নতুন পথ খুলে দিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্যাভলোর আবিষ্কার ব্যবহারিক শিখন-মনোবিজ্ঞানকে (The Experimental Psychology of Learning) বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

প্যাভলোর পরীক্ষণের ব্যবস্থাটি ছিল এইরূপ—পরীক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কুকুরকে পরীক্ষাগারে এনে (চিত্র দ্রষ্টব্য) এমনভাবে দাঁড় করানো হলো যে, যান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা বাইরে থেকে কুকুরকে খাবার দেওয়া যায়। প্যাভলোর ল্যাবরেটরীটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হল যে, বাইরের কোন শব্দ যেন কুকুরটির বিরক্তি ঘটাতে না পারে। কুকুরটির মুখে একটি ছিদ্র করে এমনভাবে একটি টিউব আটকে দেওয়া হল যে, কুকুরটির সামান্য মাত্র লালা নিঃসরণ ঘটলেও ঐ টিউবের সাহায্যে তা একটি শিশিতে সংগ্রহ করা

যেতে পারে। কুকুরটিকে দাঁড় করিয়ে যখন খাদ্য দেওয়া হল তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টাও বাজানো হল। এইভাবে পরীক্ষাটি কয়েক দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করা হল। প্রত্যেকদিন খাদ্য ও খাদ্যের সঙ্গে ঘণ্টা বাজানো হল ৮।১০ বার করে। প্রথমে দেখা গেল খাদ্য ও ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে (একযোগে) কুকুরের মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। এইভাবে সাধারণত ২০ থেকে ৪০ বার পরীক্ষণটি পুনরাবৃত্তি করবার পর দেখা গেল খাদ্য না দেওয়া সত্ত্বেও ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মুখ দিয়ে লালা ক্ষরণ হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাংস যেমন লালা নিঃসরণ প্রতিক্রিয়াব একটি উদ্দীপক, ঘণ্টার শব্দটিও তেমনি লালা নিঃসরণের উপযোগী একটি সমর্থ উদ্দীপক (Adequate stimulus)। ঘণ্টা বাজানোব সঙ্গে সঙ্গে লালা নিঃসরণ এটি স্বভাবগত প্রক্রিয়া নয়, এটি হল একটি শিক্ষালব্ধ বা আয়ত্তীকৃত প্রতিক্রিয়া (Learned reactions)। কিভাবে এই বিষয়টি ঘটে থাকে তা নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে আলোচনা করা যায়।

শব্দ উত্তেজকেব সাহায্যে কিভাবে লালা নিঃসবণ সাপেক্ষিত (Conditioned) হয় তা নিচেয় দেখান হযেছে।

একটি শিখন প্রক্রিয়া হিসাবে উত্তেজক প্রতিক্রিয়া বা Stimulus-Response (S-R) সূত্র অনুযায়ী বিষয়টিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়।

S_1 (মাংস) ————→ R_1 (লালা নিঃসরণ,
একটি স্বভাবগত প্রক্রিয়া)

S_2 (ঘণ্টার শব্দ) ————→ R_2 (শব্দ শোনা—একটি
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া)

S_1+S_2 (খাদ্য দেওয়া
হল এবং সঙ্গে সঙ্গে
ঘণ্টা বাজানো হল) → R_1 (লালা নিঃসরণ
কয়েকবার পুনরাবৃত্তি প্রতিক্রিয়া)
করা হল।

S_2 (ঘণ্টার শব্দ) ———→ R_1 (লালা নিঃসরণ)

মন্তব্য : ঘণ্টার শব্দ একটি কৃত্রিম উত্তেজক লালা নিঃসরণ করালো।

সিদ্ধান্ত : কুকুবের লালা নিঃসরণ প্রতিবর্ত (Reflex)-টি সাপেক্ষিত (Conditioned) হল।

প্যাভলো তার পরীক্ষায় কেবলমাত্র ঘণ্টার শব্দকেই উত্তেজক হিসাবে ব্যবহার করেন নি। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় নির্ভর উত্তেজকও ব্যবহার করেছেন। যেমন ঘ্রাণশক্তির উত্তেজক হিসাবে কর্পূর, দৃষ্টিশক্তির উত্তেজক হিসাবে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ও অক্ষর, এবং স্পর্শশক্তির উত্তেজক হিসাবে ত্বক ঘর্ষণ ইত্যাদি।

শিখনের একটি তত্ত্ব হিসাবে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
The Conditioned Reflex as a Principle of Learning

প্যাভলো, বিচ্‌টিরিও প্রভৃতি রুশ বিজ্ঞানীরা এবং ল্যাসলী ও ওয়াটসন্‌ প্রভৃতি ব্যবহারবাদীরা শিখনকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সম্পর্কে বেশীর ভাগ পরীক্ষা হয়েছে প্রাণীদের নিয়ে। তবে মানব শিশুদের পক্ষেও যে এই পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য এ বিষয়টিও কোন কোন মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করেছেন। আমরা সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের সূত্র অনুসারে কিভাবে শিখন ঘটে থাকে সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করছি।

১নং সমস্যা : পূর্বে আগুনে ছেঁকা লেগেছে এরূপ একটি শিশু কিভাবে আগুনকে ভয় করতে শিখে থাকে। (**The burnt child has learned to dread the fire**)

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সূত্রটির প্রয়োগ

S_1 (উত্তপ্ত বস্তু স্পর্শ করা) ——→ R_1 (জ্বালা অনুভব করা, হাত সরিয়ে নেওয়া)

S_2 (স্টোভ দেখা) ------——→ R_2 (হাত দিয়ে ধরতে যাওয়া, সাধারণ প্রতিক্রিয়া)

$S_1 + S_2$ ----- -------——→ R_1 (হাত সরিয়ে নেওয়া)

এই ধরনের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একবারের অভিজ্ঞতাযই ঘটে থাকে।

S_2 (স্টোভ দেখা) ------ ——→ R_1 (হাত সরিয়ে নেওয়া, স্টোভের নিকট না যাওয়া)

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত স্থাপিত হল।

পূর্বে আগুনের ছেঁকা লেগেছে, এরূপ শিশু আগুনকে ভয় করতে শিখলো।

উপরের পরীক্ষায় যে শিশুর হাতে ছেঁকা লেগেছে, তা এরূপ বেদনাদায়ক যে, শিশু সহজেই একবারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিখে নিল।

২নং সমস্যা : শিশুরা বিভিন্ন দ্রব্যের নাম কিভাবে শিখে থাকে ? যেমন 'বল' শব্দটি।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সূত্র অনুসারে।

S_1 (মা বললেন 'বল') ——→ R_1 (শিশু বলল 'বল', অনুকরণের মাধ্যমে)

S_2 (বল দেখে) —— ——→ R_2 (ধরতে যাওয়া)

$S_1 + S_2$ - - ----- ----——→ R_1 (শিশু বল শব্দটি বলল এবং পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করল)

S_2 (বল দেখে) ------——→ R_1 (বল কথাটি বলল)

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হল।

মন্তব্য : শিশু 'বল' কথাটি শিখল।

উপরের দুটি উদাহরণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অনেক বিষয় আমরা শিখে থাকি সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের মাধ্যমে। থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলিও সমর্থিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের দ্বারা। যেমন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্নের জন্য আমাদের একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হয় এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই নতুন বিষয়টি শিখতে হয়। এই বিষয়টির সঙ্গে থর্নডাইকের শিখনের অনুশীলন সূত্রটির অন্তর্গত ব্যবহারের সূত্রটির (Law of use) মিল দেখতে পাওয়া যায়। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রক্রিয়াটি যদি অনেকদিন ধরে কোনরূপ পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাহলে প্রতিবর্তটির ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে থাকে। এটি হল থর্নডাইকের অব্যবহারের সূত্র (Law of disuse)

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আসল মূল্যটি রয়েছে শিখনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মধ্যে। এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষকের পক্ষে শিশুর শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। শিশুর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উদ্দীপক বা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার (S-R) বিশ্লেষণ করা যায়, যেগুলি শিখনের ব্যাপারে অনুষঙ্গ স্থাপনে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, জন্মের পূর্ব থেকেই শিশুর সরল বা নিরপেক্ষ সূত্র (Bonds) সাপেক্ষিত হয় বহুবিধ উপায়ে এবং এইগুলিই শিশুর পরবর্তী জীবনে অভ্যাসে এবং শিক্ষায় পরিণত হয়।

৫. অন্তর্দৃষ্টি (Insight)

শিখনের অন্যতম পদ্ধতি হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা। আর্কিমিডিস যখন স্নানের ঘরে চৌবাচ্চার জল উপচে পড়তে দেখে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চীৎকার করে রাজার কাছে ছুটলেন,' তার অর্থ তিনি বস্তুর ভরের (Mass) সঙ্গে উপচে পড়া জলের সম্পর্ক ধরতে পারলেন। এটি তিনি বুঝতে পারলেন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। কোন বিষয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ ও আবিষ্কার অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের সঙ্গে যুক্ত। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

প্রশ্ন : (ক) কয়লা : কালো : : তুলা : ?

(খ) কচ্ছপ : আস্তে চলে : : খরগোস : ?

এই ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কার করতে হবে কয়লার সঙ্গে কালো রঙের যে সম্পর্ক, অনুরূপভাবে তুলার সঙ্গে কোন্ রঙের সেই সম্পর্ক ? অথবা কচ্ছপের চলার গতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে খরগোসের চলা কিরূপ ?

বৈশিষ্ট্য : মনোবিজ্ঞানীগণ অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

১. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অংশের সঙ্গে সমগ্র বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয়ের সঙ্গে যুক্ত। যথা, প্রদত্ত সিরিজটি সম্পূর্ণ কর :—

২, ৪, ৬, ৮, —, —

এই সিরিজটি সম্পূর্ণকরণের জন্য শিক্ষার্থীকে ২-এর সঙ্গে ৪, ৪-এর সঙ্গে ৬, এবং ৬-এর সঙ্গে ৮-এর সম্পর্কটি প্রথম আবিষ্কার করতে হবে, এবং উক্ত সম্পর্ক অনুসারে পরবর্তী

সংখ্যা দুটি বের করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র সিরিজের গঠন প্রণালী উপলব্ধি করে সিরিজের পরবর্তী সংখ্যা দুটি বের করতে হবে।

২. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা শিখনের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বের কোন শিখনে শিক্ষার্থী যদি সামান্যীকরণের কৌশল বা ক্ষমতা শিখে থাকে, তাহলে সেটি নতুন ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৩. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ (Observation) ও আবিষ্কার ক্ষমতার (Exploration) প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

৪. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধির সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ সামান্যীকরণের ক্ষমতা শিশুর বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। উন্নত বুদ্ধিযুক্ত শিশুরা সহজেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করতে পারে। গণিতের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, যদি বলা হয় ১৯ + ১৯ = কত? বুদ্ধিমান শিশুর পক্ষে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই বলা সম্ভব হবে : ১৯ + ১৯ = ২০ + ২০ − ২ = ৪০ − ২ = ৩৮। দীর্ঘ ভাগের ক্ষেত্রে দ্রুত ভাগফল নির্ণয়ের জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

৫. মনোবিজ্ঞানীরা বলেন অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মত সমস্যাটির সমাধান শিক্ষার্থীর মনে উদয় হয়।

৬. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন তখনই ঘটে যখন সমগ্রের সঙ্গে অংশের সঠিক সম্পর্কটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন সম্পর্কে পরীক্ষা

Experiment on Learning by Insight

অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন সম্পর্কে কয়েকটি চমৎকার পরীক্ষা করেন গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা। এখানে কোয়েলার (Koehler)-এর পরীক্ষার কয়েকটি বর্ণনা দেওয়া হল।

কোয়েলারের শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে পরীক্ষা, শিম্পাঞ্জীদের শিখন প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের একটি চমৎকার উদাহরণ। আফ্রিকার উপকূলবর্তী কেনারী দ্বীপপুঞ্জের (Canary Islands) অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ হল টেনেরিফ (Tanerife)। সেখানে গত মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯১৩-১৯১৭) এই পরীক্ষা চালানো হয়। এই দ্বীপে শিম্পাঞ্জীদের একটি কলোনি গড়া হল একটি প্রশস্ত জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘিরে। দ্বীপটির আবহাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের আবহাওয়ার মত হওয়ায় শিম্পাঞ্জীদের পক্ষে সহজভাবে এখানে বাস করা সম্ভবপর হল।

কলোনিতে শিম্পাঞ্জীদের সংখ্যা ছিল ১২ এবং তারা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হল। শিম্পাঞ্জীদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য তাদের নিকট রাখা হল লম্বা রড, লাঠি, ছড়ি, বাক্স ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল, এগুলি যেন

তারা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। কোয়েলার শিম্পাঞ্জীদের নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা করেন। আমরা কয়েকটি পরীক্ষার বর্ণনা নিচেয় দিচ্ছি।

১নং পরীক্ষা ঃ কোয়েলার তার কলোনির একটি শিম্পাঞ্জীকে কিছু খেতে না দিয়ে তার খাবারের জন্য এক কাঁদি কলা উপরে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলেন যে, শিম্পাঞ্জী সহজে যেন তার নাগাল না পায়। খাঁচাটির মেঝেতে একটি বাক্স একটু দূরে সরিয়ে রাখা হল। শিম্পাঞ্জী যদি বাক্সটিকে ঠিক কলাগুলির নিচে আনে এবং বাক্সটির উপর দাঁড়ায়, তা হলেই তার পক্ষে কলা-কাঁদি নেওয়া সম্ভব হতে পারে। শিম্পাঞ্জীটি পূর্বের কোন পরীক্ষায় এইরূপ বাক্স ব্যবহার করেনি। প্রথম দিকে সে বাক্সটির কোনরূপ প্রয়োজন বুঝতে পারলো না এবং বাক্সটি সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ দেখালো না। শিম্পাঞ্জীটি কলার নাগাল পাবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করলো। কখনও লাফ দিল, কখনও খাঁচার দেওয়াল বেয়ে উঠে কলার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, শিম্পাঞ্জীটি কিছুতেই যখন কলার নাগাল পেল না, তখন গবেষক শিম্পাঞ্জীকে নিজেই কৌশলটি দেখিয়ে দিলেন, অর্থাৎ তিনি বাক্সটি কলাগুলির নিচেয় এনে বাক্সটির উপর উঠে কলার কাঁদিতে হাত দিলেন এবং নিচে নেমে পড়ে দূরে বাক্সটি সরিয়ে দিলেন। শিম্পাঞ্জী ব্যাপারটি লক্ষ্য করল। গবেষক নিচে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটিকে টেনে কলার কাঁদির নিচে নিয়ে এল এবং বাক্সের উপর উঠে কলাগুলি আত্মসাৎ করল।

উপরের পরীক্ষা থেকে কোয়েলারের সিদ্ধান্ত এই যে, বাক্সটির সঙ্গে কলা পাবার কি সম্পর্ক এটি শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে বুঝতে পারেনি। বাক্সটি ছিল তার প্রত্যক্ষের পশ্চাৎভূমিতে, পরে যখন তা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তার কেন্দ্রে মূর্ত হয়ে উঠল, তখনই শিখনটি ঘটল। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে বস্তুগুলির নতুন বিন্যাস ঘটল এবং যেটি পূর্বে সামান্য অপ্রয়োজনীয় বাক্স মনে হয়েছিল তা সমাধানের একটি বিশিষ্ট উপকরণ হিসাবে প্রতিভাত হল।

২নং পরীক্ষা ঃ উপরে বর্ণিত পরীক্ষাটি একটু সামান্য পরিবর্তন করে কোয়েলার অন্য একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এই শিম্পাঞ্জীটি ছিল একটু বোকা ধরনের। এর পূর্বে তাকে নিয়ে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয়নি। তবে এই শিম্পাঞ্জীটি পূর্বে অন্য শিম্পাঞ্জীদের বাক্স নিয়ে নানারূপ কাজ করতে দেখেছে। নিজে কিছু করেনি।

কোয়েলার-এর পরীক্ষা হল—শিম্পাঞ্জীটিকে এমন একটি পরীক্ষার মধ্যে ফেলা, যেখানে কলা খেতে হলে বাক্সটি ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ বাক্সটির উপর দাঁড়িয়ে তবেই সে কলাগুলি নাগাল পেতে পারে। তবে বাক্সটিকে পূর্বের পরীক্ষার মতো কলাগুলির নিচে আনা দরকার। এককাঁদি কলা খাঁচাটির উপরের দিকে ছাদের সঙ্গে টাঙিয়ে দেওয়া হল এবং বাক্সটিকে একটু দূরে সরিয়ে রাখা হল। শিম্পাঞ্জীটির আচরণ এই অবস্থায় কি হতে পারে তা কোয়েলার পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমেই ছুটে গেল বাক্সটির কাছে, কিন্তু বাক্সটিকে কলার নিচে না এনে, বাক্সটির উপর বেয়ে উঠে কলার দিকে লাফ দিল। এইরূপ সে কয়েকবার করল কিন্তু কলার নাগাল

সে পেল না। কোয়েলার দেখলেন শিম্পাঞ্জীটি অন্য শিম্পাঞ্জীদের নিকট থেকে বিশেষ কিছুই শেখেনি।

মন্তব্য: বাক্সটির সঙ্গে সমগ্র সমস্যাটির কি সম্পর্ক এই জ্ঞান শিম্পাঞ্জীটির জন্মায় নি। বাক্সটিকে সে একটি উপকরণ হিসাবে বুঝতে পেরেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারটি সে শেখেনি।

৩নং পরীক্ষা: কোয়েলার-এর শিম্পাঞ্জী কলোনিতে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান শিম্পাঞ্জীর নাম ছিল সুলতান। কোয়েলার সুলতানকে নিয়ে একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করলেন। তিনি দুটি বাঁশের লাঠি সংগ্রহ করলেন। একটি লাঠি ছিল অন্যটির চেয়ে সরু এবং সরুটি সহজেই বড়টির মধ্যে ঢুকিয়ে একখানি বড় লাঠি বানানো যায়। কোয়েলার-এর শিম্পাঞ্জীরা অনেকেই একখানি লাঠি ব্যবহার করে খাঁচার বাইরে রাখা কলা আনা পূর্বেই শিখেছে। তাদের কেউ দুটি লাঠি একসঙ্গে জোড়া দিয়ে একখানি লম্বা লাঠি বানিয়ে কখনও কলা আনেনি।

পরীক্ষার ব্যবস্থাটি এরূপ করা হল। শিম্পাঞ্জীকে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল এবং খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটি লাঠি। কোন একটি মাত্র লাঠি ব্যবহার করে কলাগুলি টেনে আনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কেউ যদি একটি লাঠির মধ্যে আর একটি লাঠি ঢুকিয়ে দুটি লাঠিকে একটি লাঠি বানাতে পারে, তাহলে সেই লম্বা লাঠি দিয়ে সে কলাগুলি অনায়াসে নাগালের মধ্যে আনতে পারে।

পরীক্ষাটিতে প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি একখানি লাঠি ব্যবহার করে কলাগুলি নাগালের মধ্যে আনতে চেষ্টা করল। সেটি যখন পারল না, তখন সে অন্য লাঠি দিয়ে চেষ্টা করল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তার পক্ষে পাবা সম্ভব হল না। তার পরবর্তী প্রচেষ্টা হল, একখানি লাঠিকে কলার দিকে প্রসারিত করে অন্য লাঠি দিয়ে ঠেলে কলার দিকে এগিয়ে দেওয়া।

এ ক্ষেত্রে সে দেখল লাঠি দিয়ে কলার নাগাল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কলাকে টেনে আনা গেল না। এরূপ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, যখন সে পারল না, তখন সে কলার আশা

ত্যাগ করে খাঁচার মধ্যে লাঠি দুটি নিয়ে খেলা করতে লাগল। লাঠি দুটি নিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ সে ছোট লাঠিখানি বড় লাঠিখানির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। প্রথমবার তেমন শক্তভাবে আটকানো গেল না, দ্বিতীয়বারে সে লাঠিদুটিকে খুব শক্ত করে আটকাতে পারলো। এইবার সে লাঠিটিকে ব্যবহার করে কলাগুলি টেনে আনলো।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাটি থেকে কোয়েলার-এর সিদ্ধান্ত এই—

১. শিখন তখনই ঘটে যখন সমগ্র ক্ষেত্রটিতে অবস্থিত বিভিন্ন উপকরণগুলির সঙ্গে সমগ্র ক্ষেত্রটির সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়। যে পর্যন্ত না সুলতান দুটি লাঠিকে একত্র সংযুক্ত করে একটি লাঠি হিসাবে দেখতে পেল, এবং উপকরণ হিসাবে লাঠিদুটির সঙ্গে ক্ষেত্রটির সামগ্রিক রূপটি তার নিকট স্পষ্ট হল, অর্থাৎ তার গেস্টাল্ট বা সামগ্রিক ছকটি সম্পূর্ণ হল, ততক্ষণ তার শিখন ঘটল না অর্থাৎ সে খাদ্য পেল না। যখন সে লাঠিদুটিকে একত্র করতে পারলো এবং সমস্যাটি সমাধানের কৌশলটি উপলব্ধি করল তখনই তার পক্ষে সামগ্রিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব হল।

২. গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মূল তত্ত্বটি হল যে, শিখনের ব্যবহারিক উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হবার জন্য বাক্স বা লাঠি শিম্পাঞ্জীর (শিক্ষার্থী) সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের অংশ হিসাবে গণ্য হবে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন একগোছা উত্তেজক প্রতিক্রিয়া সূত্র (S-R Bonds) নয়। যখন প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা জানা যায়, তখনই শিখন দ্রুত ঘটে থাকে।

৩ গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন অন্তর্দৃষ্টিমূলক। অন্তর্দৃষ্টি তখনই জন্মে যখন সমগ্র পরিস্থিতি ও উপকরণগুলি একযোগে শিক্ষার্থীর নিকট সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে।

৪ অন্তর্দৃষ্টি দ্রুত ও এককালীন শিক্ষা। বিদ্যুৎ চমকের মত এর প্রকাশ ঘটে থাকে। এটি ধীরে ঘটে না, হঠাৎ ঘটে থাকে। অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন নতুন আবিষ্কারের মত।

৫. অন্তর্দৃষ্টির ফলে সমগ্র প্রত্যক্ষক্ষেত্রে যে উপকরণগুলি রয়েছে, তার বিন্যাস নতুনভাবে ঘটে। এর ফলে যে উপকরণগুলি প্রত্যক্ষক্ষেত্রের পশ্চাৎভূমিতে ছিল, তা কেন্দ্রে মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন সুলতান নামক শিম্পাঞ্জীটি কলার নাগাল পাবার জন্য যে লাঠিদুটি ব্যবহার করল ঐগুলি পূর্বে ছিল পশ্চাৎভূমিতে, কিন্তু যখন এরা একযোগে একখানি লাঠিতে পরিণত হল, তখন তা উপস্থিত হল প্রত্যক্ষক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। এর ব্যবহার তখন শিম্পাঞ্জীর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠে, সমস্যাটির সমাধানে আলোকপাত করে।

অন্তর্দৃষ্টি ও 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' শিখনের তুলনা

প্রাণীদের শিখন লেখ (Learning curve) পরীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, শিখন ঘটে ধারাবাহিকভাবে। ধীরে ধীরে ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি দূর হয় এবং সঠিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে একীভূত হয়। এইভাবে ধীরে সঠিক প্রতিক্রিয়াটির উন্নতি ঘটে। এই ধরনের শিখনকে বলে 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' শিখন। অধ্যাপক স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন, এরূপ শিখনকে 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' শিখন বলা ঠিক নয়। এই ধরনের শিখনকে বলা উচিত 'সফল প্রতিক্রিয়াগুলি নির্বাচন' সংক্রান্ত শিখন। কারণ এই ধরনের

প্রতিক্রিয়ার শিখন ঘটে থাকে সঠিক প্রতিক্রিয়াটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি বাদ দিয়ে নয়। ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি আপনিই বাদ পড়ে যায়, কারণ সঠিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঐগুলি একসঙ্গে থাকতে পারে না। এই ধরনের শিখন একমাত্র ইতর প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় না। ঐগুলি মানব শিখনেরও বৈশিষ্ট্য। সাইকেল চালানো শেখা, গাড়ী চালানো শেখা, টাইপ রাইটিং শেখা, সাঁতার শেখা, প্রভৃতি বিভিন্ন রকম শিখন পরীক্ষা ও ভ্রান্তিমূলক শিখন।

কেবলমাত্র সক্রিয় কাজের বা শারীরিক নৈপুণ্যের (Motor skills) মধ্যেই পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতি নিবদ্ধ থাকে না। আমরা যখন কোন জ্যামিতিক উপপাদ্য বা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি, আমরা তা করে থাকি, 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতির সাহায্যে। আমরা যখন কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি, তাও সাধারণভাবে একপ্রকার 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতি।

কোয়েলার যে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের কথা বলেছেন তার অস্তিত্ব দেখা যায় দ্রুত শিখনের ক্ষেত্রে এবং সরল সমস্যা (Simpler problems) সমাধানের ক্ষেত্রে। শিখন লেখে যেখানে কোনরূপ উন্নতি দেখা যায় না সেখানে কোনরূপ শিখন ঘটে না, নিশ্চয়ই এরূপ কথা বলা চলে না। এর একটি ব্যাখ্যা হল যে, উন্নতির হার এত অল্প যে লেখচিত্রটিতে তা স্পষ্টভাবে দেখানো যায় নি। মনে করা যাক, একটি বালক একটি জটিল ধরনের অঙ্ক করছে। দেখা গেল, প্রথম আধঘণ্টায় তার কোনরূপ উন্নতি দেখা গেল না, অর্থাৎ সে অঙ্কটি কিভাবে করতে হবে তা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ সে সমাধানের প্রক্রিয়াটি ধরতে পারলো, সে অঙ্কটি পেরে গেল। প্রথম আধঘণ্টায় সে কিছুই করেনি, এ কথা বলা চলে না, তবে কোন উন্নতি বোঝা যায় নি। যে শিক্ষার্থীটি প্রথমদিকে কিছুই পারেনি, কিন্তু পরে হঠাৎ পেরে গেল, তার মানে এই নয় যে, সে প্রথমে কিছুই করেনি। প্রথম দিকে তার শিখন প্রক্রিয়াটি শিখন লেখে দেখানো না গেলেও এ কথা ঠিক, সে নানাভাবে চেষ্টা করেছে সমস্যাটি সমাধানের জন্য। একটি সমস্যা সমাধানের জন্য যে ব্যক্তিটি চেষ্টা করছে সে হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমি পেরেছি।' এখানে অন্তর্দৃষ্টির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, প্রচেষ্টার শেষফল হিসাবে এবং এর পূর্বে তাকে বহুরকমভাবে 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতি অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করতে হয়েছে। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি হল এমন এক ধরনের শিখন পদ্ধতি যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে 'পরীক্ষা ও ভ্রান্তি' পদ্ধতির যথেষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়, তবে তা খানিকটা গুপ্তভাবে।

আমরা উপরে যে পরীক্ষাগুলির উল্লেখ করেছি, তা কেবলমাত্র প্রাণীদের নিয়েই করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের শিখন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কি? মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের শিখন ও প্রাণীদের শিখনের মধ্যে তফাত এই যে, মানুষ তার শিখনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ইতর প্রাণীদের সেই সুযোগ নেই। তবে যেখানে ভাষা ব্যবহার সীমিত এবং নানা কারণে সম্ভব নয় যেমন জড়বুদ্ধি ও অল্প বুদ্ধিদের ক্ষেত্রে সেখানে প্রাণীদের শিখনের সঙ্গে ঊনমানস শিশুর শিখনের কোনরূপ পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখন ক্রিয়া ঘটে থাকে।

● দ্বিতীয় পত্র ●

দ্বিতীয় খণ্ড

।

৪

কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী

SOME MODERN EDUCATIONAL PRACTICES

আধুনিক শিক্ষা প্রণালী

যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের নতুন জ্ঞান দান করেন বা নতুন কোন কৌশল শিক্ষা দেন তাকে **শিক্ষাপদ্ধতি** বলে। শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকারের, যথা—(১) প্রাচীন পদ্ধতি (Traditional method) এবং (২) প্রগতিশীল পদ্ধতি (Progressive method)।

প্রাচীন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন পদ্ধতিতে মুখস্থ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছাত্রদিগকে নতুন জ্ঞান বা বিষয় আয়ত্ত করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করে। এই পদ্ধতিতে বলা হয়, কোন বিষয় মুখস্থ করলেই ভালভাবে শেখা যায় এবং ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যায়। প্রাচীন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এরূপ :

১. এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করাই মূল উদ্দেশ্য,—শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতার বিচার করা হয় না।

২. সকল শিক্ষার্থী একইভাবে শেখবার চেষ্টা করে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-বৈষম্যকে এই পদ্ধতিতে মান্য করা হয় না।

৩. শিক্ষকের প্রদত্ত জ্ঞান শিক্ষার্থী যান্ত্রিক প্রণালীর সাহায্যে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে।

৪. প্রাচীন পদ্ধতির অন্তর্গত কয়েকটি পদ্ধতি হল, মুখস্থ করা পদ্ধতি, বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method) এবং অনুকরণ পদ্ধতি।

৫. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাচ্ছিল্য করা হয়।

৬. বিভিন্ন শিশু যে বিভিন্ন প্রণালীতে শেখে, এই তত্ত্ব এই প্রাচীন পদ্ধতি স্বীকার করে না।

৭. যেহেতু মুখস্থ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিষয়টি আয়ত্ত করা হয়, এই কারণে এই পদ্ধতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞান নতুন বিষয় শিক্ষার সময়ে কাজে লাগানো কঠিন হয় অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞান কেবলমাত্র পুস্তকের বিষয় হয়ে থাকে।

৮. প্রাচীম পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করে না।

প্রগতিশীল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত শিক্ষা প্রণালীকে বলে প্রগতিশীল বা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি। এই নতুন বা প্রগতিশীল পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. প্রগতিশীল পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Inter action) মাধ্যমে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করে।

২. এটি শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র নতুন জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে এরূপ নয়, এটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

৩. এটি শিক্ষার্থীর কাজের মান, বিচার শক্তি, তার বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য, মনোভাব ও মূল্যবোধকে নতুন স্তরে উন্নীত করে। কিন্তু একটি অধম পদ্ধতি এর বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

৪. প্রগতিশীল পদ্ধতির লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক উন্নতির মধ্যেই (Intellectual training) সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে উন্নত করবে।

৫. প্রগতিশীল পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত হয় কর্মপ্রিয়তা (Love of work)। এই কাজের ইচ্ছাটি এরূপ হবে যে, শিক্ষার্থী যেন যোগ্যতার সঙ্গে কাজটি সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। যদি শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কাজের ইচ্ছা জাগ্রত করতে না পারে, তাহলে বিদ্যালয়ে যত রকম বিষয় শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, তা কখনই শিক্ষার্থীর চরিত্র উন্নত করতে পারে না এবং মনকে শিক্ষা দিতে পারে না। আমাদের দেশের সামাজিক এবং পারিবারিক নানাবিধ কারণে কাজের প্রতি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের তথাকথিত পাঠ্যবিষয়সমূহ শিক্ষার জন্য তারা পাঠ্যপুস্তক গভীরভাবে অধ্যয়নের চেয়ে নোটবই, সাজেস্‌সন্‌ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ অধিকতর সঙ্গত মনে করে।

৬. প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু বক্তৃতা বা আলোচনার সাহায্যে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এরূপ জ্ঞানকে শিক্ষার্থী পুস্তকের বিষয়বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ সত্য হিসাবে নয়।

৭. প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি (Clear thinking) জাগ্রত করে। স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির অধিকারী হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানে সঠিক চিন্তা করবার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিসরকে (Range of pupils' interest) বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করে। একজন প্রকৃত শিক্ষিত এবং সংস্কৃতবান ব্যক্তি বহুতর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে এবং এই বহু বিষয়ে আগ্রহের ফল স্বরূপ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুসম বিকাশ ঘটে থাকে।

৮. একটি প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীর বিকাশকে সঠিকভাবে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। এটি কর্মকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতি করতে পারে।

৯. প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা

করে। এটি শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তম মেজাজ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সৃষ্টি করে। এটি স্বাধীনভাবে কাজ করবার শক্তি প্রদান করে।

১০. প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি পাঠ্যবিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। এটি বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোন বিষয় শিক্ষাদানের কথা বিবেচনা করে না। প্রগতিশীল পদ্ধতিতে গণিত শেখাতে যে প্রণালী বা কৌশল গ্রহণ করা হয়, ইতিহাস বা সাহিত্য পাঠে তা থেকে ভিন্নতর কৌশল গ্রহণ কবা হয়ে থাকে।

১১. প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি মনস্তত্ত্ব প্রভাবিত (Psychological), প্রাচীন পদ্ধতির ন্যায় এটি যুক্তিধর্মী (Logical) নয়।

উন্নতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে যে পদ্ধতিগুলি শিক্ষাবিদ্‌গণ বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—

১. কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা (Learning by doing); ২. প্রোজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি (Project method); ৩. কর্মশালা পদ্ধতি (Workshop method); ৪. পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী পদ্ধতি (Laboratory method)।

১. কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা

যে জ্ঞান আমরা শিক্ষকের মুখ থেকে বা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে লাভ করি, তাকে কখনই প্রকৃত জ্ঞান বলা চলে না। শিক্ষাবিদগণ এইরূপ জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান (Second-hand knowledge) বলেছেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কাজের ভিতর দিয়ে, আত্ম-প্রচেষ্টায় আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, তাই হল আমাদের প্রকৃত জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানকে বলা হয় বুনিয়াদী জ্ঞান (Key knowledge) বা মূল জ্ঞান।

শিক্ষাতত্ত্বের একটি মূল বিষয় হল **সক্রিয়তা** (Activity)। রুশো, ফ্রোয়েবল, মন্তেসরী, ডিউই, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ সকলেই সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার কথা বলেছেন। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে একটি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি। গান্ধীজী পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শিল্পকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিশুর ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা শিক্ষায় খেলার রূপ নিয়ে থাকে। অবশ্য বয়স্কদের নিকট এই সক্রিয়তাই কাজরূপে দেখা দেয়। এই খেলার সাহায্যে রচিত শিক্ষাপদ্ধতিকে বলা হয় 'খেলাচ্ছলে শিক্ষা' (Play way in education)।

খেলা ও কাজের প্রকৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের সত্তার একটি দিক হচ্ছে প্রাণধারণ করে টিকে থাকা। সেইজন্য আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরও একটু বড় হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটমেয়ে যে মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের

ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র ; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায়, প্রতিযোগিতার খেলায় এই বৃত্তিকে শান দিতে থাকে।'

শিশুদের পক্ষে তাদের খেলাই কাজ ও কাজই খেলা। কবির ভাষায়—'মোদের যেমন খেলা, তেমনি যে কাজ, জানিস নে কি, ভাই।' ছুটোছুটি করা শিশুদের ধর্ম। আমরা দেখি ছেলেরা বিনাকারণে ছুটোছুটি করে। তারা যে চেঁচামেচি করে তার কোন অর্থ নেই এবং তাদের খেলা দেখলে বিজ্ঞব্যক্তিদের হাসি আসে। সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী খেলা শিশুর ধর্ম। এর দ্বারা যেমন প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনি এর সাহায্যে শিশু নিজেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে প্রস্তুত করে।

শিক্ষাবিদেরা শিশুর এই সক্রিয়তাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। ফ্রোয়েবল তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে, মন্তেসরী তাঁর পদ্ধতিতে, ডিউই তাঁর শিক্ষা প্রণালীতে, গান্ধীজী তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে এই সক্রিয়তাকে বিভিন্নরূপে ব্যবহার করেছেন।

শিক্ষার জন্য কাজ বা সক্রিয়তাকে দুইভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, এটি হবে আত্মসক্রিয়তা (Self act.vity)। অনুকরণের সাহায্যে শিশু এটি করবে না। দ্বিতীয়ত, সক্রিয়তা উদ্দেশ্যমূলক (Purposeful) হতে-পারে। ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরী তাদের পদ্ধতিতে যেমন একদিকে আত্মসক্রিয়তার নীতিকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি বিশেষ কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য নানাবিধ যন্ত্রের (Apparatus) সাহায্যে এই সক্রিয়তাকে উদ্দেশ্যমূলক করেছেন। ডিউই সক্রিয়তাকে গ্রহণ করেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে। ডিউই-এর প্রোজেক্ট পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা ছাড়া কিছুই নয়।

কাজ দুইপ্রকারের ঃ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আমরা যে কাজের কথা বলি—তাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) সৃষ্টিমূলক কাজ (Creative work) ও (২) গঠনমূলক বা সৃজনাত্মক কাজ (Constructive work)। সৃষ্টি অন্তরের, গঠন বাইরের। সৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টিকর্তা আপনার প্রকাশ ঘটায় ; গঠনমূলক কাজের সাহায্যে ব্যক্তির সঙ্গতি বৃদ্ধি ঘটে। একটির যোগ প্রাণের সঙ্গে, আর একটির যোগ সমাজের সহিত। গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষায় অর্থাৎ সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে গঠন-মূলক কাজের প্রাধান্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে সৃষ্টিমূলক কাজের কথা বলেছেন।

কাজের কেন্দ্রে শিশু ঃ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে শিশুর কথা বলতে হয়। শিশুই সকল শিক্ষার কেন্দ্রে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যদি শিশুকে বেঞ্চিতে বসিয়ে শিক্ষক শুধু বই পড়াতে থাকেন তাতে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না।

শিশু শ্রোতা নয়, কর্মী ঃ শিক্ষায় শিশুর ভূমিকা শ্রোতার নয়, শিশু কর্মী। শিশু কাজ করতে ভালবাসে। শিশুর শিক্ষা হবে কাজের মাধ্যমে। কাজের সুযোগ পেলে শিশুর আনন্দ জন্মে। কাজ করতে করতে যখন শিশু কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তার আগ্রহ জন্মে সমস্যাটি সমাধানের জন্য। ডিউই বলেছেন, এইভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমেই শিশু শিক্ষালাভ করে। শিক্ষকেরও উচিত উপযুক্ত সুযোগের

অপেক্ষা করা, যাতে সমস্যাটির সমাধানে শিশু আগ্রহান্বিত হয়। কোন বিষয়ে শিশুর আগ্রহ জন্মালে তাকে বিষয়টি শেখানোও সহজ হয়।

শিশুরা জ্ঞানলাভ করে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, শুধু দুটি কান দিয়ে শুনে নয়। আমরা অনেক সময় মনে করি, শিশু শ্রেণীকক্ষে যা শোনে, তাই শিখে থাকে। কিন্তু এটি খুব ভুল তথ্য। শিশুরা কানে শুনে শেখে না, শেখে নিজের অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে। শিশু তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে কাজের মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা লাভই তার শিক্ষা। সুতরাং কাজেব ভিতর দিয়ে শিশু যাতে সব শিখতে পারে বিদ্যালয়ে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সব শিশুই কাজ করতে ভালবাসে : সব শিশুই কাজ কবতে ভালবাসে, ভালবাসে জিনিস গডতে, ভাঙতে। ভালবাসে ছুটোছুটি করতে, খেলতে, বেড়াতে, নতুন বিষয় জানতে। একটি বিশেষ বয়সে প্রত্যেক শিশুই একজন ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক। আশে-পাশেব সকল বিষয় সম্পর্কে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা।

শিশুর অভিজ্ঞতার স্বরূপ : নানা কাজেব মাধ্যমে শিশু শিক্ষালাভ করে। নানাকাজের মাধ্যমে শিশু যে অভিজ্ঞতালাভ করে—তাই হল শিক্ষা। শিশুর অভিজ্ঞতাকে কযেকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১. সামাজিক অভিজ্ঞতা; ২. বস্তু ও প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা; ও ৩. শিক্ষক ও পুস্তক থেকে লব্ধ পরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

শিশু সামাজিক অভিজ্ঞতালাভ করে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করে, খেলাধূলার মাধ্যমে, দলবেধে কাজ করে, বাড়ীতে মা, বাবা, ভাইবোনদের সঙ্গে একত্রে বাস করে।

বস্তু ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিশু অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে, নানা জিনিসের মডেল প্রভৃতি তৈরি করে।

শিক্ষক ও পুস্তক থেকেও শিশু জ্ঞান লাভ করে। এইরূপ লব্ধ জ্ঞান শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, পরোক্ষ জ্ঞান। কাজ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে শিশু পবোক্ষ জ্ঞানকে যাচাই করতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর কবে শিশু পরোক্ষ জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষা করতে পারে। যে সকল জ্ঞান আমাদের পক্ষে সরাসরি লাভ করা সম্ভব হয় না, সেখানে আমরা পুস্তকের উপব নির্ভর করি।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা

কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে শিশুই কাজ করে এবং শিক্ষক থাকেন পশ্চাতে, অলক্ষ্যে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর ভূমিকাই প্রধান। শিক্ষক শিশুকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে মাত্র সাহায্য করতে পারেন। শিশু কাজ করবে নিজের উৎসাহে। এই পদ্ধতিতে শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রমকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—**১. হাতের কাজ, ২. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসবের কাজ, ৩. পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।**

হাতের কাজের মধ্যে থাকবে মাটির কাজ, কাগজের কাজ, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কাপড় বোনা, বেতের কাজ, বাগান তৈরি ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে আমরা নানা উৎসব করি। এই উপলক্ষে উৎসব মণ্ডপ সাজানো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারাই করাতে হবে।

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় কাজের মাধ্যমে বা সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১. হাতের কাজ

শিশুর শিক্ষায় হাতের কাজের একটি বিশেষ-মূল্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, দৈহিক সামর্থ্য প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুর হাতের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু যখন কোন কাজ করে, তখন কেবলমাত্র তার হাতের নিপুণতা জন্মে না, কাজের মাধ্যমে শিশুর মন ও মস্তিষ্কের বিকাশও ঘটে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো হয়, তাহলে হাতের কাজের মাধ্যমে তা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। বিদ্যালয়ে সাধারণত নিম্নলিখিত শিল্পগুলিকে হাতের কাজ হিসাবে শেখানো হয়। এগুলি হল মাটির কাজ,কাগজের কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশের ও বেতের কাজ প্রভৃতি।

শিশুর শিক্ষার প্রথম স্তরে হাতের কাজগুলি হবে খুব সহজ ধরনের। শিশু প্রথমে কাজের উপাদানগুলি নিয়ে নাড়াচাডা করবে। সে হয়তো কিছু তৈরি করতে চাইবে। কিন্তু তার হাতের পেশীসমূহের নমনিয়তা ও আঙ্গুলের নিপুণতা সঠিকভাবে বিকাশের জন্য কিছু সময় দরকার। উপাদান নিয়ে নাড়াচাডা করতে করতে সে হয়তো কিছু তৈরি করে ফেলবে। জিনিসটি বাস্তবের সঙ্গে না মিলতে পারে এবং শিশু তার নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার একটি নামও দিতে পারে।

উপাদান নিয়ে এমনিভাবে নাডাচাড়া করার সার্থকতা এই যে, এইভাবে শিশু তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিস্তারের সুযোগ পায়। হাতের মাংসপেশী, হাত ও আঙ্গুল ক্রমে শক্তি অর্জনের সুযোগ পায়, চোখ ও হাতের সংযোগ স্থাপিত হয়। উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও সে প্রত্যক্ষ জ্ঞ.ন সঞ্চয় করে। এই বয়সের কাজকে খেলার পর্যায়ে ভিন্ন অন্য কোন পর্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে শিক্ষকের উচিত ধীরে ধীরে কাজগুলিকে উন্নত করবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ছেলে-মেয়েরা মাটির জিনিস তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নিতে চায়। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে ঐগুলি ফেটে যায়। শিক্ষক যদি মাটি তৈরি করে নেবার প্রণালী দেখিয়ে দেন এবং খেলনা প্রস্তুতের পর ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়ার জন্য উপদেশ দেন, তাহলে ছেলে-মেয়েরা ঐভাবে কাজ করতে শিখবে।

সকল প্রকার হাতের কাজেই কিছু না কিছু নিয়মকানুন আছে এবং কাজের যন্ত্রপাতিও আছে। প্রথম থেকেই ছেলে-মেয়েদের ঐগুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারে।

হাতের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন গুণের বিকাশ

[ক] নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য ঃ হাতের কাজের ভিতর দিয়ে

শিক্ষার্থীর চরিত্রের অনেক সৎগুণ বিকশিত হয়। যেমন, শিশু কাজ করতে করতে বুঝতে পারে যে, যে ঘরে বসে সে কাজ করছে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে কাজ ভালভাবে করা যায় না। ব্যবহারের যন্ত্রপাতিও ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখতে হয়। কোন কাজ সঠিক-ভাবে করবার জন্য দরকার ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

[খ] যৌথ দায়িত্ব বোধ : কাজের ভিতর দিয়ে শিশুর যৌথ দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। শিক্ষকদের উপদেশে তেমন হয় না। বাগানের কাজে বা অন্য কোন কাজে যেখানে পারস্পরিক সাহায্য প্রয়োজন, সেখানে যৌথ দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।

২. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসবের কাজ

আধুনিক শিক্ষায় উৎসবানুষ্ঠানকে শিক্ষাদানের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উৎসব যেমন একদিকে শিশুকে আনন্দ দান করে, তাকে কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি শিশুর মনে নানা জিজ্ঞাসাবোধ জাগ্রত করে। আনন্দোৎসবের ভিতর দিয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবক ও জনসাধারণের সংযোগ স্থাপিত হয়। উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বেশী দায়িত্ব দেওয়া উচিত, শিক্ষকেরা অবশ্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। উৎসব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি খুব সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনটিকে আমরা ফুল-পাতার দ্বারা সাজাই, দীপ-মালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সঙ্গীতের দ্বারা মধুর করে তুলি।' প্রকৃতপক্ষে উৎসব শিশুদের যেমন কাজ করবার সুযোগ এনে দেয়, তেমনি শিশুদের মনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে। শিক্ষার এটি একটি মহৎ উদ্দেশ্য। অন্যদিনের চেয়ে উৎসবের দিনের একটি পার্থক্য আছে। 'এই দিনটিকে মিলনের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণি করে তুলি'। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, 'যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দ রূপমমৃতং যদ বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধির দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে।'

উৎসবে অংশ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর সৌন্দর্যবোধ যেমন জাগ্রত হয়, তেমনি সহ-যোগিতামূলক মনোভাবের ট্রেনিং হয়। কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেমন মিলেমিশে কাজ করতে হয়, তেমনি ব্যক্তিগত কর্ম নিপুণতার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৩ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক বিষয়, বিশেষ করে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার সপক্ষে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত বিষয়গুলি কিভাবে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হয় আমরা এখানে আলোচনা করছি।

ভূগোল : স্যার পারসি নান বলেছেন যে, শিশুদের ভূগোল শিক্ষা দিতে হলে কাজের মাধ্যমে, স্কুল থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে শেখাতে হবে। ভূগোল শিক্ষার প্রথম পদ্ধতি শিশুদের বাস্তব ভৌগোলিক বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই নীতি

অনুসারে ভূগোলকে পুস্তকের বিষয় না করে, করা উচিত পর্যবেক্ষণের বিষয়। প্রাথমিক স্তরে ভূগোলের জ্ঞান দেওয়া উচিত গৃহ ভূগোল (Home geography)-এর মাধ্যমে। নিজেদের আঞ্চলিক ভূগোল (Local geography) জেনে শিশুরা সহজেই প্রথমে নিজেদের মাতৃভূমির ভূগোল পরে বিশ্বের ভূগোল জানতে পারবে।

ভূগোল শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি কাজের নমুনা :

১. শিশুরা কাঁদামাটি দিয়ে পাহাড়-পর্বত, নদী, উপত্যকা প্রভৃতি তৈরি করবে।

২. শ্রেণীকক্ষের ম্যাপ, বিদ্যালয়ে আসবার রাস্তার ম্যাপ প্রভৃতি আঁকবে।

৩. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা, ফুলফল ও শস্যাদির বিবরণ সংগ্রহ করবে।

৪. বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে রোজকার বৃষ্টিপাত পরিমাপ করবে।

৫. শিক্ষকের সহযোগিতায় বৎসরের সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট দিনের তারিখ দুটি এবং বৎসরের যে দিন দুটিতে দিন রাত্রি সমান হয়, তা ভূগোলের খাতায় লিখে রাখবে।

৬ বিদ্যালয়ের রোজকার আবহাওয়া রিপোর্টে আবহাওয়ার খবর লিখে রাখবে।··· ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক পাঠ ঃ সাধারণত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। যথা—

১. শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশে সাহায্য করা,

২ তার ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা,

৩. কোন জিনিস আবিষ্কার করার মনোভাব তৈরি করা,

৪. নিজে জেনে নেবার, পরীক্ষা করবার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে জাগ্রত করা,

৫. প্রাথমিক বিজ্ঞানের পাঠগ্রহণের সুযোগ পাওয়া।

প্রাথমিক বিজ্ঞানপাঠ আরম্ভ হবে প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিশুদের আটকে রেখে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় না। প্রাকৃতিক রাজ্যে কত রহস্য আছে সেই দিকে ছেলে-মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। প্রাকৃতিক রাজ্যে বিচরণ করতে গিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে সাধারণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, শিশুর পরিবেশের মধ্যে যেটুকু বিজ্ঞান স্বাভাবিকভাবে আসবে, প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই শিশুর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান গড়ে উঠবে। অল্পবয়সে জটিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। শিশু তার চারপাশে কত রংয়ের পাখী দেখে, তাদের গানে মুগ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে পাখীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নেয়। আকাশে কালো মেঘ দল বেধে কোথায় যায়? কেমন করে বৃষ্টি হয়?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন শিশুর মনে উদয় হয়। বিভিন্ন ঋতুতে কোন কোন ফুল ফোটে, কোন কোন ফল পাওয়া যায়, কোন কোন ফুল সাদা, কোন কোন ফুল রঙ্গীন— শিশু জেনে নেয় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি নির্ধারিত হবে বিভিন্ন ঋতু ও পরিবেশের দ্বারা। শীতকালে মরশুমী ফুলের আলোচনা করলে শিশুদের পক্ষে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। আকাশ যেদিন নির্মল, মেঘমুক্ত সেদিন মেঘের আলোচনা নিষ্ফল।

প্রত্যেক শিশুরই থাকবে প্রকৃতি পাঠের একটি খাতা। ঐ খাতায় শিশু নানা জিনিসের নমুনা সংগ্রহ করে রাখবে। শিক্ষক মহাশয় শিখিয়ে দেবেন—কিভাবে পাতা, ফুল প্রভৃতিব নমুনা সংগ্রহ করে রাখতে হয়। বিদ্যালযেব মিউজিয়ামে শিশুদের সংগ্রহ সাজিয়ে বাখতে পাবলে ভাল হয।

ইতিহাস পাঠ ঃ ভূগোল ও প্রকৃতি পাঠের মত ইতিহাস শিক্ষাদানও প্রাথমিক স্তরে কাজের ভিতর দিয়ে দিতে হবে। পুবাতন প্রণালীতে ইতিহাস শেখানো হয় বই পড়ে। বই-এব বিষয মুখস্থ করে শিশু ইতিহাস শেখে। নতুন পদ্ধতিতে শিশুকে কাজের ভিতর দিয়ে ইতিহাস শিখতে হয। নতুন প্রণালীতে শিশু পর্যক্ষেণ করে, অনুসন্ধান কবে, নিজে নানাবকম মডেল তৈবি করে, অভিনয় কবে এবং এই সকল কাজে অংশ গ্রহণ করে ইতিহাস শেখে। ইতিহাস, শেখবাব কয়েকটি উপযোগী কাজের তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল। যথা—

১. বিদ্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত তাব মানচিত্র প্রস্তুত করা ও পরীক্ষা করা।

২. নানা রকমেব ঐতিহাসিক মডেল তৈরি করা, যেমন—তাজমহলের মডেল।

৩. কোন অঞ্চল সার্ভে কবে তথ্য সংগ্রহ্ কবা এবং তথ্যগুলি যথাযথভাবে সাজানো।

৪. মিউজিযাম পরিদর্শন।

৫. ইতিহাসের ছবি সংগ্রহ কবা এবং ইতিহাসের খাতায় কালক্রম অনুযায়ী আটকে রাখা।

৬. মহাপুরুষ এবং বিভিন্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ছবি সংগ্রহ করে খাতায় আটকে রাখা।

৭. স্থানীয় পুরাতন অট্টালিকা, দুর্গ, মন্দিব প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সংগ্রহ।

৮. অভিনয় ও নাটক রচনা ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি কবা।

'কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা' পদ্ধতিটি প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে জ্ঞানলাভের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন আছে। তবে প্রয়োজন ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজ করে শিখলে পাঠ্যবিষয়গুলি আনন্দদায়ক হতে পারে।

বুনিয়াদি শিক্ষা ও হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এটি একটি-কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। তবে সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি থেকে এর পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে কাজটি নির্বাচন করা হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কিন্তু বুনিয়াদী

শিক্ষাপদ্ধতিতে শিল্পটি নির্বাচন করা হয় শিশুর সামাজিক প্রয়োজন থেকে এবং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা মনে রেখে। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পটিকে এরূপভাবে শেখাতে হবে যে, ছাত্রদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে বিদ্যালয়ের খরচের আংশিক পূরণ হতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পদ্ধতিতে একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত শিল্পগুলি মূল শিল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—১. সুতাকাটা ও কাপড় বোনা, ২. কাষ্ঠশিল্প, ৩ কৃষি শিল্প, ৪. উদ্যান নির্মাণ (ফলের বাগান ও সবজির বাগান।) ৫. চর্মশিল্প, অথবা ৬. অন্য কোন শিল্প যা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করা হবে।

এই 'মূল শিল্প'কে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে কেউ ঐ শিল্পকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

মূল শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন যে, বর্তমানে যেভাবে যান্ত্রিক উপায়ে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিল্পকে আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অর্থ এই যে, এর সাহায্যে শিক্ষার্থী যে কেবলমাত্র শিল্পের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবে তাই নয়, তাদের শিল্পের ইতিহাস ও জাতীয়জীবনে শিল্পের প্রভাব সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। গান্ধীজী মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ একমাত্র শিল্পশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। গান্ধীজী মনে করেন হাতের কাজের সাহায্যেই মস্তিষ্কের অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ সাধন সম্ভব। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় এই প্রণালীর মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পাবে সেই সম্পর্কে গান্ধীজী কিছু কিছু আলোচনা করেছেন।[১] আমরা সংক্ষেপে তা এখানে আলোচনা করছি।

বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন যে, তা পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হবে। তবে যখন শিক্ষার্থী শরীর ও মনে কিছু পূর্ণতা অর্জন করেছে, তখনই তা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

গণিত শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন, শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে এটি শিক্ষা দিতে হবে। সংখ্যা ও গণনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুতার দৈর্ঘ্য প্রভৃতি হিসাবের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। এমন কি গান্ধীজী মনে করেন, জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয় তকলীর বিভিন্ন অংশের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। তকলীর চাকতির সাহায্যে বৃত্তের জ্ঞান দেওয়া যায়। গান্ধীজী লিখেছেন, 'আমি এইভাবে ইউক্লিডের নাম উল্লেখ মাত্র না করে বৃত্তের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতে পারি।'

ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, সুতা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলি নানা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কারণ তুলার সাহায্যে সুতা প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়নের ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পুথির সাহায্যে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার চেয়ে এই শিল্পকেন্দ্রিক পদ্ধতির

মাধ্যমে ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ভালভাবে দেওয়া যেতে পারে।

২. প্রোজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি

প্রোজেক্টের সংজ্ঞা ঃ প্রোজেক্ট পদ্ধতি বা প্রকল্প পদ্ধতি একটি কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা নীতি এই পদ্ধতিতে প্রযোজ্য। প্রোজেক্ট কথাটি প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। শিক্ষকদের উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবজীবনের সমস্যার পটভূমিতে শিক্ষালাভ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা। ডা. জন ডিউই-এর নাম যদিও প্রোজেক্ট পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত, প্রকৃতপক্ষে ডিউই'র শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁর শিষ্য ডা. কিলপ্যাট্রিক প্রোজেক্টকে একটি পদ্ধতি হিসাবে আলোচনা করেছেন।

প্রোজেক্ট সম্পর্কে কিলপ্যাট্রিকের সংজ্ঞাটি এইরূপ—"**প্রোজেক্ট হল এমন উদ্দেশ্যমূলক একটি কাজ যা সামাজিক পরিবেশে আন্তরিকভাবে সম্পাদন করা হয়।**" (A project is a whole-hearted purposeful activity executed in a social environment.)

ডাঃ স্টিভেনসন প্রোজেক্টের অন্য সংজ্ঞা দিয়েছেন।—**কোন সমস্যামূলক কাজ যদি তার স্বাভাবিক পটভূমিতে সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় তবে তাকে প্রোজেক্ট বা প্রকল্প বলে।** (A project is a problematic act carried to completion in its natural setting)

প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

মনরো প্রজেক্ট পদ্ধতি সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করেছেন।—'যথোচিত শিক্ষণকার্যে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে উদ্দীপিত করবার জন্য প্রোজেক্ট পদ্ধতি একটি ভিন্ন ধরনের কার্যপ্রণালী। কোনরূপ পৃথক কাজের দায়িত্ব এই পদ্ধতিতে দেওয়া হয় না। অন্যপক্ষে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করতে ভালবাসে তাদের তাই করবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং করবার জন্য উৎসাহিত করা হয়।' মনরো প্রোজেক্ট পদ্ধতিকে একটি শিক্ষা পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রজেক্ট হল সমস্যার সমাধানে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রোজেক্ট সম্পর্কে এন. এল্. বসিং (N. L. Bossing) নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এতে প্রোজেক্টের একটি সামগ্রিক অর্থ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বসিং-এর সংজ্ঞাটি এইরূপ :

সমস্যাযুক্ত প্রকৃতির ব্যবহারিক কার্যক্রমের একটি বিশিষ্ট একক (Unit) হল প্রোজেক্ট। এই কার্যক্রমটি পরিকল্পিত ও স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা। এই কার্যে তারা অভিজ্ঞতার বিশেষ এককটিকে (Unit of experience) সম্পূর্ণ করবার জন্য বাস্তব উপকরণ (Physical materials) ব্যবহার করতে পারে।

বসিং প্রোজেক্টধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমের একাধিক নামকরণ করেছেন। যথা,—একক (Units), আগ্রহের কেন্দ্র (Centres of interest), উদ্দেশ্যমূলক কাজ (Tasks), প্রচেষ্টা (Enterprises), সংযুক্ত যৌথ কার্যক্রম (Unified group activity)।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূল বিষয়টি হল যে, শিশুদের কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ নির্বাচনে শিক্ষকেরা প্রয়োজন ক্ষেত্রে যদি সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে ঐ কাজটি সম্পাদনে শিশুদের উৎসাহিত করেন, তাহলে তার মাধ্যমে শিশুরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করে থাকে।

প্রোজেক্টের তত্ত্বটি থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ শিক্ষার সূত্রের দ্বারা (Laws of learning) সমর্থিত। কাজটি এরূপ হবে যে, শিশু আন্তরিকভাবে সম্পাদনে আগ্রহ প্রকাশ করবে। (তুলনীয়, প্রস্তুতির সূত্র : Law of readiness)। কাজটি পরিকল্পনায় শিশুর ভূমিকা থাকবে অর্থাৎ কাজটি যে তারাই স্থির করেছে এবং কর্তৃপক্ষ জোর করে চাপিয়ে দেননি—এই বোধটি কাজটি সম্পাদনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাজটি সম্পাদনে যে পরিকল্পনা করা হবে, তাতেও শিশুর অংশ থাকবে। কাজটি সম্পাদনে শিশুকে সক্রিয় অংশ নিতে হবে। (তুলনীয়, পুনরাবৃত্তির সূত্র : Law of exercise)। কাজটি সম্পাদনে শিশুর আগ্রহ থাকবে, কারণ তাহলে শিশু মানসিক তৃপ্তি লাভ করবে (তুলনীয়, ফললাভের সূত্র : Law of effect)।

প্রোজেক্টের মধ্যে থাকে একটা খেলার ভাব। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সামনে বসে ছাত্ররা যখন পড়াশোনা করে তখন তারা সাধারণত একটি অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে আটকে থাকে। এই অবস্থায় তাদের স্বতঃস্ফূর্ততার ভাবটি নষ্ট হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিশুদের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে এবং তারা খেলাচ্ছলে কাজটি সম্পাদনের মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং অনেক বিষয় শিখে নেয়।

প্রোজেক্টের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ প্রোজেক্টকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রোজেক্ট নিয়ে আলাচনা করা হল।

১. **একক প্রোজেক্ট** (Unit Project) : ছাত্র-ছাত্রীরা এককভাবে যখন কোন কাজ সম্পাদন করে তাকে বলা হয় একক প্রোজেক্ট। যেমন, মাথার টুপি তৈরি, একটি ম্যাপ অঙ্কন, একটি মডেল প্রস্তুত করা।

২. **শিক্ষামূলক বা সমস্যামূলক প্রোজেক্ট** (Intellectual or Problem type) : বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন, একটি ডাকঘর স্থাপন, অথবা, একটি সমবায় দোকান করা, ইত্যাদি।

৩. **সাধারণ প্রোজেক্ট বা যান্ত্রিক প্রোজেক্ট** (Routine type) : বিদ্যালয়কে সুন্দর করা (School beautification), বাগান তৈরি (Gardening)।

৪. **উপলব্ধিমূলক প্রোজেক্ট** (Appreciation type) : বাংলা সাহিত্য পাঠ, নাট্যাভিনয়, বিতর্ক সভা।

প্রোজেক্ট সংগঠনের কার্যক্রম

প্রোজেক্ট সংগঠনের কাজকর্মকে নিম্নলিখিত ৪টি স্তরে ভাগ করা যায়। ঐ চারটি স্তর হল: ১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Purposing), ২. পরিকল্পনা (Planning), ৩. সম্পাদন (Executing), ও ৪. মূল্যায়ন (Judging)।

১. **উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** সর্বপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতি হল শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা। আমরা যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন আমাদের মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং আমরা অশান্তি অনুভব করি। এই অশান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা ঐ সমস্যার সমাধান খুঁজি। অনুরূপভাবে একটি প্রোজেক্ট আমাদের সম্মুখে একটি সমস্যা তুলে ধরে এবং ঐ সমস্যাটি সমাধানের জন্য ছাত্রদের মধ্যে যৌথভাবে একটি আন্তরিক সহযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হয়। অবশ্য প্রোজেক্টটি পরিকল্পিত হওয়া চাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিক থেকে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রোজেক্টটি পরিকল্পিত হলে এবং উক্ত পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকলে, শিক্ষার্থীরা মনে করবে কাজটি তাদের এবং তাদের মনে একটি 'আমরা ভাব' (We-feeling) জাগ্রত হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা তাদের ভিতর থেকে একটি তাগিদ অনুভব করবে সমস্যাটি অর্থাৎ প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করবার জন্য।

শিক্ষক মহাশয়ের উচিত ছাত্রদের মনোভাব ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। কোন্ বিষয়টি নিয়ে তারা বর্তমানে চিন্তা করছে এবং ঐ সকল বিষয় চিন্তা করে তিনি তাদের একটি উপযুক্ত প্রোজেক্ট নির্বাচন করতে বলবেন। তবে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত প্রোজেক্টটি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে, তার শিক্ষামূলক মূল্য না থাকতে পারে। তবে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা উপযুক্ত প্রোজেক্ট বাছাই করতে অক্ষম হয়, সেখানে শিক্ষক-মশায়ের উচিত উপযুক্ত প্রোজেক্ট বাছাই করে দেওয়া। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রোজেক্টের মূল্য নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভের উপর।

২. **পরিকল্পনা:** প্রোজেক্টটি যখন ছাত্ররা একমত হয়ে নির্বাচন করল—তখন আরম্ভ হবে দ্বিতীয় স্তরের কাজ। এই স্তরে প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করবার জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে। এই সময়ে অনেকগুলি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে। প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করবার জন্য ছেলেরা অধৈর্য হয়ে উঠতে পারে। প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করবার জন্য যে পূর্বে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন এই বোধটি তাদের না থাকতে পারে। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এই বিষয়টি পরিষ্কার করবেন যে, প্রোজেক্টটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি নিখুঁত পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রোজেক্টের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরিকল্পনা একটি প্রধান স্তর। প্রোজেক্টের সাফল্য নির্ভর করে নিখুঁত পরিকল্পনার উপর। উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের উপর। পরিকল্পনাটি প্রণয়নে তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে, পরস্পরের মতামতকে সমালোচনা করবে এবং আলোচনার ভিত্তিতে একটি সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। ছাত্রদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে

এবং প্রাথমিক ভুলের ভিতর দিয়েই ছাত্রদের চেষ্টা করতে হবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। তবে পরিকল্পনাটিতে যাতে মারাত্মক ভুল না থাকে সেইজন্য ছাত্ররা যেমন শিক্ষকদের পরামর্শ নেবে, তেমনি শিক্ষকেরাও প্রোজেক্টটির পরিকল্পনাটি বিচার করে ছাত্রদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন। তবে শিক্ষকদের সবসময়েই দেখতে হবে যে, ছাত্ররা যেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। এই কারণে শিক্ষক যেন ছাত্রদের স্বাভাবিক আলোচনায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করেন। যদি পরিকল্পনায় মারাত্মক কোন ভুল না থাকে, তাহলে তিনি ছাত্রদের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। ছাত্ররা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজে-দের ভুল সংশোধন নিজেরাই করতে শিখবে।

কিভাবে প্রোজেক্টটি পরিকল্পনা করা হবে—সেই পরিকল্পনার ধারাবাহিক বিবরণ ছাত্ররা নিজেরাই লিপিবদ্ধ করে রাখবে। লিখিত বিবরণটি এরূপ হবে যাতে ঐ বিবরণ পাঠ করে সম্পাদনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। প্রোজেক্ট-টির বিভিন্ন ধাপের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ছাত্ররা চিন্তা করবে এবং কোন বিষয়ে যদি অস্পষ্টতা থাকে সেটি দূর করতে চেষ্টা করবে। প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্টভাবে লেখা থাকলে ছাত্ররা প্রত্যেকটি ধাপ সম্পর্কে কি সুবিধা এবং কি অসুবিধা তা বিচার করতে পারবে। এইরূপ নানাভাবে আলোচনার পর কোন প্রোজেক্ট যদি কোন শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহলে তখন শিক্ষকের ভূমিকা হবে উপদেষ্টার। প্রোজেক্টটি সম্পাদনে তখন তিনি ছাত্রদের একমাত্র প্রয়োজনক্ষেত্রে সাহায্য করবেন।

৩. **সম্পাদন ঃ** প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে তৃতীয় ধাপটি অর্থাৎ সম্পাদন ধাপটি সর্বা-পেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ছাত্রদের আগ্রহশীল মনের নিকট প্রোজেক্ট কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই স্তরটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ছাত্রদের সক্রিয়তা ও কর্মদক্ষতা এই স্তরেই সর্বাপেক্ষা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। কাজ করতে করতে অনেক সময়ে ছাত্ররা প্রোজেক্টটির উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অপ্রধান বিষয়ের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখে। পরিকল্পনা স্তরটির সঙ্গে সম্পাদন স্তরটির সম্পর্ক খুব গভীর। পরিকল্পনায় কোন গণ্ডগোল থাকলে সম্পাদনা স্তরেও গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে।

সম্ভব ক্ষেত্রে শিক্ষককে দেখতে হবে যে, প্রোজেক্টটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেন ছাত্ররা সহজেই পেতে পারে। প্রোজেক্টটি সম্পাদনের জন্য ছাত্রদের সময় ও শক্তি যেন অযথা বাজে ব্যাপারে ব্যয় না হয় এবং তাদের সর্বদা যেন লক্ষ্য থাকে—প্রোজেক্টটির মাধ্যমে তারা কতখানি বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। 'যদি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়, তাহলে ছাত্রদের মনোযোগ মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে প্রোজেক্ট সম্পাদনেও ছাত্রদের পরিশ্রম ও সময় অযথা ব্যয় হবে। অনেক সময় শিক্ষকেরা ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য দেখান। কিন্তু এই মনোভাব সংযত করতে হবে। কারণ শিক্ষকদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন সমস্যা থেকে ছাত্রদের নিজের চেষ্টায় উত্তীর্ণ হতে হবে

এবং ছাত্রদের ট্রেনিং একমাত্র এইভাবেই হতে পারে। ছাত্ররা যখন তাদের কাজ প্রথম আরম্ভ করে, তখন তাদের কাজের মধ্যে সুষ্ঠুভাব ও নিপুণতার অভাব থাকতে পারে। অনেক সময় তারা এলেমেলোভাবে কাজটি করতে চায়। কাজের এলোমেলো ভাব কাটিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে করবার ক্ষমতা অর্জনই হল আসল শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার এই হল রাজপথ। ছাত্রদেব সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য ছাত্রদের শিক্ষার পথটিকে কোন ক্রমেই সংক্ষিপ্ত করা যায় না। সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করলে ছাত্রদেরই ক্ষতি বেশী হয়। তবে কোন দল যদি অত্যন্ত ধীর গতিতে কাজ করে, তবে তাদের এই ত্রুটির জন্য সমগ্র শ্রেণীব কাজের উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। এই অবস্থায় শিক্ষককে কোন উপায় বেব করতে হবে, যাতে কাজের উন্নতির গতি ব্যাহত না হয়। তবে শিক্ষকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রোজেক্টটি তখনই সফল বলে গণ্য করা যায়, যদি প্রোজেক্টটি সম্পাদনে সমস্ত ছাত্রের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা লাভ করা যায়।

যখন প্রোজেক্টটি ধীবে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে যাবে তখন থেকেই শিক্ষককে প্রোজেক্টটির উন্নতির ধারা নিকট থেকে লক্ষ্য করতে হবে। শিক্ষক লক্ষ্য করবেন কাজটি পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে কিনা। শিক্ষক যেন সর্বদা একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রোজেক্টটির কাজেব ধারা বিচার করেন। ছাত্রদের মধ্যেও যেন নিজেদের কাজের সমালোচনা করবার মনোভাব জাগ্রত করবার চেষ্টা করা হয়। আত্মসমালোচনা বুদ্ধির একটি উপাদান। সুতরাং ছাত্রদের আত্মসমালোচনার ভাবটি চর্চা করা সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ তাহলেই তারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভবান হতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো 'অভিভাবন (Suggestion) বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে। এটির প্রযোজন সাধারণত ছাত্ররা বোধ করে গঠনমূলক প্রোজেক্টেব ক্ষেত্রে, যেখানে সম্পাদনে কিছু কিছু যান্ত্রিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই ধাপে শিক্ষকদের ভূমিকা বন্ধুত্বপূর্ণ উৎসাহদাতার (Friendly stimulator)। প্রোজেক্টটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় যেন ফেলে রাখা না হয়। ছাত্রদের অবশ্যই জানতে হবে যে কোন প্রোজেক্ট সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হলেই, তবে তার শিক্ষামূলক মূল্য সার্থক হয়। সম্পাদিত প্রোজেক্টে ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশী।

৪. **মূল্যায়ন :** প্রোজেক্টটি সম্পাদনের পরবর্তী ধাপ হল সম্পাদিত কাজটির মূল্যায়ন করা। কাজটি সুসম্পাদিত হলে ছাত্রদের সময় ও শ্রম ব্যয় করা সার্থক হযেছে এরূপ মনে করা যেতে পারে। 'প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করে আমাদের কি লাভ হল'?—ছাত্রদের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগতে পারে। কারও কাছে মনে হতে পারে প্রোজেক্টটি সম্পাদন করে আমরা কি কি বিষয় শিখেছি তা জানা দরকার। চতুর্থ অর্থাৎ মূল্যায়ন ধাপে শিক্ষকদের কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের এরূপ ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা সহজে কাজের মান সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। নিজেদের বন্ধুবান্ধবের প্রশংসা ছাত্রদের নিকট সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারা যেন নিজেদের কাজের সমালোচনা নিজেরা করতে শেখে। নিজেদের কাজের প্রশংসা বন্ধুবান্ধবদের নিকট থেকে পেলে, ছাত্ররা তাতে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে।

মূল্যায়নের জন্য বিষয় অনুযায়ী ছাত্ররা হিসাব করতে পারে। যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা কি কি বিষয় শিখেছে, গণিতের ক্ষেত্রে তারা কি কি নতুন জিনিস আয়ত্ত করেছে, সমাজ বিদ্যা বা ইতিহাস-ভূগোলের ক্ষেত্রে কি কি নতুন বিষয় তারা জানতে পেরেছে, ছাত্রদের কাজের নিপুণতার মান এই কাজের ফলে কতখানি উন্নত হয়েছে ইত্যাদি।

কয়েকটি প্রোজেক্টের উদাহরণ

১. স্কুল-ব্যাঙ্ক প্রোজেক্ট

সমস্যা: ছাত্ররা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখবার জন্য একটি স্কুল-ব্যাঙ্ক খুলতে চায়।

সমস্যার ধরন: শিক্ষামূলক।

শ্রেণী: অষ্টম শ্রেণী। ছাত্রসংখ্যা ৪৪ জন। (গড বয়স: ১৫+)

সময়: দুই মাস।

উদ্দেশ্য নির্ধারণ: স্কুলের নিকট একটি নতুন ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে ; ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একটি শাখা। ব্যাঙ্কটি খোলার প্রথম দিন থেকেই ছাত্ররা ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ছাত্রবা একটি 'স্কুল সমবায় ব্যাঙ্ক' খোলার প্রয়োজন অনুভব করল। এই বিষয়টি নিয়ে শ্রেণী-শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করল। তিনি অর্থনীতির শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করলেন ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক খোলার সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে। শিক্ষক ছাত্রদের উৎসাহ দেখে প্রোজেক্টটি অনুমোদন করলেন।

পরিকল্পনা: ছাত্ররা নিজেদের চারটি দলে ভাগ করে নিল এবং প্রত্যেক দলের উপর এক এক ধরনের কাজের ভার দেওয়া হল। এই চারটি দল নিম্নলিখিত কাজগুলি ভাগ করে নিল।

প্রথম দল/ছাত্র সংখ্যা ১১: ব্যাঙ্কের অফিস ঠিকমতো সাজানো। আসবাব-পত্র জোগাড় করা। টেবিল, আলমারী, লোহার আলমারী, সেফ প্রভৃতি দিয়ে ব্যাঙ্কের মত করে ঘরটি সাজানো।

দ্বিতীয় দল/ছাত্র সংখ্যা ১১: ব্যাঙ্ক আইনের খুঁটিনাটি ও নিয়ম-কানুন নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করবে।

তৃতীয় দল/ছাত্র সংখ্যা ১১: এই দল ব্যাঙ্ক পরিচালনায় অফিসারদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করবে এবং ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলী হিসাবে কাজ করবে।

চতুর্থ দল/ছাত্র সংখ্যা ১১: এই দল ব্যাঙ্কের মক্কেল হিসাবে কাজ করবে। কেউ টাকা জমা রাখবে, কেউ টাকা ধার করবে।

সম্পাদনা: উপরে উল্লিখিত চারটি দল নিজেদের কাজগুলি সঠিকভাবে করতে সচেষ্ট হবে। প্রথম দল নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক অফিসে গিয়ে আসবাবপত্রগুলির মাপ নেবে এবং তদনুযায়ী ব্যাঙ্কের আসবাবপত্র জোগাড় করবে। অন্যদল ব্যাঙ্ক পরিচালকদের সঙ্গে 'ব্যাঙ্ক খোলা' সম্পর্কে আলোচনা করবে। সরকারী ব্যাঙ্ক-আইন সম্পর্কে জানবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে। ব্যাঙ্ক খোলার জন্য তারা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি পত্রের জন্য দরখাস্ত করবে। চিঠিগুলি ছাত্ররা নিজেরাই লিখবে এবং শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংশোধন করে দেবেন। তৃতীয় দল ব্যাঙ্ক খোলা সম্পর্কে স্কুল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দেবে এবং ব্যাঙ্কের অফিসার ও কর্মচারীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবে এবং ট্রেজারারকে বণ্ড দিতে বলবে। ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ স্থির করবে, শেয়ার বিক্রি করবে, ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র রাখবার নিয়ম-কানুন স্থির করবে। এই দল মক্কেলদের অর্থ ঋণ দেবে এবং ঋণের জন্য উপযুক্ত সিকিউরিটি দাবি করবে এবং ডিভিডেণ্ট ঘোষণা করবে। চতুর্থ দল মক্কেল হিসাবে কাজ করবে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাজকর্মের সমালোচনা করবে। তারা অ্যাকাউণ্ট খুলবে, টাকা জমা রাখবে এবং টাকা তুলবে।

মূল্যায়ন: আলোচ্য প্রোজেক্টটিকে একটি বৌদ্ধিক বা শিক্ষামূলক প্রোজেক্ট বলা যায়। প্রোজেক্টটিতে একধারে যেমন নানা ধরনের হাতের কাজের সুযোগ আছে, তেমনি আছে বিমূর্ত চিন্তার সুযোগ। প্রোজেক্টটিতে সাংগঠনিক চিন্তার (Constructive thinking) সুযোগ রয়েছে উচ্চমানের। এটি একটি উদ্দেশ্য-মূলক কর্মপ্রচেষ্টা। আলোচ্য প্রোজেক্টটি থেকে অর্থনীতি, বাণিজ্য, গণিত, ব্যবসায়িক চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। অধিকন্তু জাতীয় অর্থ-নীতিতে ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের সুযোগ ছাত্ররা পেতে পারে।

২. সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্যমূলক বিশেষ পাঠ

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীরা একটি হাতে লেখা শ্রেণী পত্রিকা প্রকাশ করেছে। ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনা লেখায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে। কিন্তু যাদের রচনা প্রকাশিত হয়নি তারা খুব ক্ষুন্ন হয়েছে। শ্রেণী-শিক্ষিকা ছাত্রীদের নিকট এই প্রস্তাব দিলেন যে, সাহিত্য বিষয়ক একটি বিশেষ প্রোজেক্ট নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তবে কেমন হয়? ছাত্রীরা একযোগে প্রস্তাবটি সমর্থন করল।

প্রোজেক্টটির ধরন: উপলব্ধিমূলক (Appreciation type)

শ্রেণী: সপ্তম শ্রেণী

ছাত্রী সংখ্যা: ৪৮ জন; (গড় বয়স ১৪ বৎসর+)

সময়: ৪০ দিন।

সাহিত্য পাঠকে অনুবন্ধনীতির মাধ্যমে ছাত্রীদের নিকট উপস্থাপিত করবার জন্য এই প্রোজেক্টটি নেওয়া হল। সাহিত্যের মৌখিক আলোচনা ও লিখিত রচনা এই প্রোজেক্টটির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ব্যাকরণ পাঠ, সাহিত্যের উপলব্ধিমূলক পাঠও এই প্রোজেক্টটির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।

কর্মবিবরণী: ১. এক একটি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছাত্রীরা কবিতা সংগ্রহের পুস্তক সম্পাদন করবে। পুস্তকে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ

পর্যন্ত প্রধান, প্রধান কবিদের উচ্চমানের কবিতা একটি দুটি করে সংকলন করা হবে।

২. ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন উচ্চভাব বিশিষ্ট উদ্ধৃতি সংগ্রহ করবে। ভাব অনুসারে উদ্ধৃতিগুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হবে।

৩. ছাত্রীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছেলে ভুলানো ছড়া, লোক গাঁথা ও প্রবাদ বাক্য প্রভৃতির সংগ্রহ পুস্তিকা সম্পাদন করবে।

৪. দৈনিক দেয়াল **সংবাদ পত্র** নিয়মিত সম্পাদনা ও প্রকাশ করা হবে।

৫. শ্রেণীর জন্য একখানি হস্তলিখিত **মাসিক পত্র** সম্পাদনা ও প্রকাশ করা হবে। ছাত্রীরা বিভিন্ন রচনাগুলিকে ছবির দ্বারা অলংকৃত করবে।

৬. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন **উৎসবের ও অনুষ্ঠানের** বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হবে।

৭. ছাত্রীদের **আত্মজীবনী** রচনা ও গ্রামের **ইতিহাস** রচনার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

৮. ব্যাকরণের কিছু পাঠ এই প্রোজেক্টের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ছাত্রীদের দিয়ে ব্যাকরণের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করা হবে। উদাহরণ : একটি দলকে সমাস, অন্য দলকে সন্ধি, অন্য একটি দলকে কারক সম্পর্কে পুস্তক সম্পাদন করতে বলা হবে। ছাত্রীরা নিজেরা নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে পুস্তক রচনা করবে এবং ঐ সম্পর্কে উদাহরণ সংগ্রহ করবে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কাটিং থেকে। প্রয়োজন-মত কার্টুন (মজার ছবি) সংগ্রহ করে পুস্তকখানিতে আটকে দেবে। মনে করা যাক, একটি মেয়ে বিশেষ্য পদ নিয়ে ব্যাকরণের একটি বই রচনা করল। প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হল বিশেষ্যের সংজ্ঞা ও প্রকার। যথা, কোন ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা বিষয়ের নাম বোঝাবার জন্য বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়। এই সংজ্ঞাটি লেখার পর, সংবাদ পত্র থেকে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ্যপদের উদাহরণ সংগ্রহ করে আটকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে বিশেষ্যপদ কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকে ব্যবহৃত হয়। কারক সম্পর্কেও উদাহরণ নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে পুস্তকখানিতে আটকে দেওয়া হবে।

৯. দলবদ্ধ হয়ে কোন বিষয় নিয়ে রচনা লেখা ছেলেমেয়েদের নিকট একটি উৎসাহদায়ক কাজ। এরূপ কাজের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন শব্দ যোজনা দ্বারা মনের ভাব উত্তমরূপে প্রকাশের ট্রেনিং শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। এক একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে ছেলেমেয়েদের রচনা লিখতে দিতে হবে। খুব ভাল হয় যদি তারা নিজেরাই বিষয়টি নির্বাচন করে নিতে পারে।

মনে করা যাক, পিকনিক বা চড়ুইভাতি সম্পর্কে একটি রচনা লেখবার দায়িত্ব দেওয়া হল। বিষয়টিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে এক একটি অংশ রচনার ভার এক একটি দলের উপর দেওয়া হল। 'চড়ুইভাতি' বিষয়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, ১. প্রস্তুতি পর্ব, ২. যাত্রা পর্ব, ৩. রান্না ও ভোজন পর্ব, ৪. প্রত্যা-বর্তন পর্ব। সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের বিষয় অনুযায়ী চারটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট দলের প্রত্যেকটি ছাত্রকে গ্রুপের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হবে এবং অনুচ্ছেদটি রচনার জন্য সময় সীমা রাখা হবে ২০ মিঃ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল ছেলেমেয়েরা অনুচ্ছেদ রচনা সম্পন্ন করতে পারবে, সেগুলি সংগ্রহ করে গ্রুপের সামনে অনুচ্ছেদটি পড়তে বলা হবে। গ্রুপের একটি ছাত্র হবে সভাপতি। দলের অধিকাংশ সভ্যের মতামতের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনাটি নির্বাচিত করা হবে। এই নির্বাচনে রচনার ভঙ্গি বা স্টাইল এবং বিষয়ের যাথার্থ্যের উপর জোর দেওয়া হবে। শ্রেণীকক্ষের এক এক কোণে দলগুলি নিজেদের দলের উত্তম রচনাটি বাছাই করবে। তবে এরূপভাবে সভার কাজ পরিচালনা করতে হবে যে যাতে অন্যদলের কোনরূপ বিরক্তি না জন্মে। অনুচ্ছেদটি সকলের সামনে পড়বার ফলে সকলের পক্ষে অনুচ্ছেদটির দোষত্রুটি বের করা সম্ভব হবে। এইভাবে চারটি অনুচ্ছেদ বাছাই করে পরপর সংগতি রেখে সমগ্র শ্রেণীর সামনে পড়া হবে। তখন ছাত্ররা নিজেরাই জানতে পারবে উত্তম রচনার বৈশিষ্ট্য কি। তারা রচনাটির বর্ণনা ভঙ্গি, শব্দ যোজনা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। সমগ্র রচনাটি যখন একসঙ্গে বিচার করা হবে তখন তারা বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন অসংগতি বা পুনরাবৃত্তি থাকলে তা সহজেই বুঝতে পারবে। একজন মাত্র ছাত্রদ্বারা রচিত হলে এইভাবে বিচার করা সম্ভব হতো না।

যে সমস্ত শিক্ষকের পক্ষে কোন বিষয় নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করা সম্ভব, তারা উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তাকে (অর্থাৎ প্রোজেক্টটিকে) বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে কবিতা, নাটক ও গল্পরচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সৃষ্টিমূলক (Creative) আত্মপ্রকাশের সুযোগকে উৎসাহিত করতে পারেন। স্বরচিত কোন নাটক যদি সাধারণভাবে না পড়িয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত করা যায়, তাহলে নাটকটি শিক্ষার্থীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে এবং নাটকটির ভাব ও বিষয়বস্তু অধিকতর সুষ্ঠুভাবে তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

৩. কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের উপযোগী একটি প্রোজেক্ট : খেলনা এরোপ্লেন তৈরী

প্রোজেক্টের নির্বাচন : স্কুলের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে এরোপ্লেন উড়ে যায়। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আকাশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দেখে। কিছুক্ষণ পরে এরোপ্লেনটি আর দেখা যায় না। স্কুলে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এরোপ্লেন নিয়ে। শিক্ষিকা লক্ষ্য করলেন ছেলেমেয়েদের এরোপ্লেন নিয়ে আগ্রহ। শিক্ষিকা স্থির করলেন, ছেলেমেয়েদের দিয়ে এরোপ্লেন তৈরির একটি প্রোজেক্ট সম্পাদন করবেন।

কার্যক্রম : ১. ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে এরোপ্লেন নিয়ে আলোচনা করল এবং নানাধরনের এরোপ্লেনের মডেল ও ছবি নিয়ে পরীক্ষা করল।

২. কাগজ ও পিসবোর্ড দিয়ে নানাধরনের এরোপ্লেনের মডেল তৈরি করল,

এরোপ্লেনের ছবি আঁকল এবং এরোপ্লেন নিয়ে নানাধরনের খেলা আবিষ্কার করে খেলতে লাগল।

৩. বাড়ী থেকে তারা এরোপ্লেনের ছবি এনে বুলেটিন বোর্ডে আটকে দিল এবং এরোপ্লেনের কিছু ছোট ছবি তারা একটি খাতায় আটকে অন্য ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য লাইব্রেরী ঘরের টেবিলের উপর রেখে দিল। ঐ খাতায় শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে এরোপ্লেনের নাম লিখে দিলেন। এই ব্যাপারে দেখা গেল ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নাম পড়বার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. আলোচ্য প্রোজেক্টটি ছেলেমেয়েদের মনের মত এবং সহজে তাদের মন আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রোজেক্টটিকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। এরোপ্লেনগুলির নাম লেখবার সময় দেখা গেল তাদের লেখবার ও পড়বার আগ্রহ খুব বেড়ে গেছে।

৫. এরোপ্লেনের ডানা ও মূল অংশ সঠিকভাবে প্রস্তুত করবার জন্য মাপবার প্রয়োজন দেখা গেল। ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল দুটো ডানা করতে হবে একই মাপের এবং মূল কাঠামোর গড়নও তদনুরূপ হবে।

৬. ছেলেমেয়েরা নিজেরা এরোপ্লেন নিয়ে কবিতা, ছড়া তৈরি করবে। শিক্ষিকা কয়েকটি ভাল ছড়া বোর্ডে লিখে দেবেন এবং পাশে ছবি আঁকবেন।

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের এরোপ্লেন সম্পর্কে উৎসাহ লক্ষ্য করে শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিকটবর্তী কোন বিমান বন্দর পরিদর্শনে যাবেন, এরূপ স্থির করলেন। ছেলে-মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি সমর্থন করল। বিমান বন্দরের ম্যানেজারকে চিঠি লেখা হল, ছেলেমেয়েদের বিমান বন্দর পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ার জন্য। বিমান বন্দরে যাওয়ার আগে শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করলেন তারা কি কি জিনিস দেখতে চায়, কি কি বিষয় জানতে চায় এবং বিমান বন্দরের ম্যানেজারকে তারা কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায়। কিভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বিমান বন্দরে যাবে সেই রাস্তার একখানি মানচিত্র তারা পূর্বেই শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তৈরি করে নিল।

বিমান বন্দরের ম্যানেজার ছেলেমেয়েদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিমান বন্দরের চারিদিকে ঘুরে ছেলেমেয়েদের দেখালেন। তিনি তাদের হ্যাঙ্গারের (Hangers) কাছে নিয়ে গেলেন, কিভাবে এরোপ্লেনগুলি হ্যাঙ্গারে রাখা হয় দেখাবার জন্য। ছেলে-মেয়েরা তাকে অনেক প্রশ্ন করলো এবং তিনিও তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

স্কুলে ফিরে এসে ছেলেমেয়েরা খুব উৎসাহের সঙ্গে কাঠ ও কাগজ দিয়ে এরোপ্লেন তৈরি করতে লেগে গেল। কাঠ দিয়ে তারা সকলে মিলে একটি মনোপ্লেন ও একটি বাইপ্লেন তৈরি করল। প্লেন রাখবার জন্য হ্যাঙ্গারও তৈরি করা হল। প্লেনের মধ্যে পুতুল বসিয়ে পাইলট ও যাত্রী করা হল। নানা রকমের রং দিয়ে প্লেনগুলি রং করা হল।

প্রোজেক্টটি সম্পূর্ণ করে, তারা স্থির করল যে, যারা তাদের প্লেন তৈরি করতে সাহায্য

করেছে, তাদের ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে হবে। প্রথমে ঠিক করা হল বিমান বন্দরের ম্যানেজারকে একখানি চিঠি লেখা উচিত। ছেলেমেয়েরা আলোচনা করে ঠিক করলো কি লেখা হবে এবং শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের হয়ে চিঠিটা লিখে দিলেন। আরও কয়েকখানি চিঠি লেখা হল তাদের, যারা প্রোজেক্টটি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করেছে।

প্রোজেক্টের মূল্যায়ন

প্রোজেক্ট পদ্ধতি একটি অভিনব পদ্ধতি। প্রোজেক্টকে প্রকৃতপক্ষে একটি পদ্ধতি বলা চলে না। পদ্ধতির কথা আলোচনা করলে আমাদের মনে যে ছবি ভাসে, তা হল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ছাত্রদের যে কৌশলে শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করে এবং শিক্ষক প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ অন্য কোথাও হয় বলে মনে হয় না। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

তবে কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন প্রোজেক্ট পদ্ধতি একটি নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষা শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়। শিক্ষক শিশুদের পরামর্শ দিতে পারেন, তবে প্রোজেক্ট নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শিশুদের। লেখা, পড়া ও গণিতের জ্ঞান শিশুরা পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষা করে না, শিক্ষা করে একটি বিশেষ কাজের মাধ্যমে এবং যখন তারা ঐ সম্পর্কে প্রয়োজন বোধ করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রধান উদ্দেশ্য কর্মটি সার্থকভাবে সম্পাদন করা এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান কর্ম সম্পাদনের মারফতই তারা আয়ত্ত করে থাকে।

শিক্ষকেরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে, এইভাবে ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সকল বিষয়ের জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট মানে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা। এই পদ্ধতির একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, এই পদ্ধতির সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাতে কোন একটি বিষয়ের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন শিক্ষাবিদ এই মত পোষণ করেন যে, প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া নয়, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কোন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, পদ্ধতিটি ছেলে-মেয়েদের সুষম বিকাশে কতখানি সাহায্য করতে পারে। উত্তম পদ্ধতি যেমন ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে, তেমনি শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করবে। তারা একা একা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ সম্পাদনে আগ্রহী কিনা? কাজে অংশগ্রহণ করে কোনরূপ মানসিক তৃপ্তি ও সুখ বোধ করছে কিনা? যে পদ্ধতির সাহায্যে উপরোক্ত গুণগুলি শিক্ষার্থীর চরিত্রে বিকশিত হয়, সেখানে বিষয়ের দক্ষতা না জন্মে পারে না। তবে সাধারণ শিক্ষকেরা পদ্ধতি হিসাবে প্রোজেক্ট পদ্ধতির কার্যকারিতা স্বীকার করেন না। কারণ তারা মনে করেন যে, এই পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্ররা অসম্পূর্ণভাবে যে জ্ঞান অর্জন করে তা পরীক্ষায় পাসে তাদের কোনরূপ সাহায্য

করে না এবং পরীক্ষা পাসকেই প্রধান বিষয় মনে করে শিক্ষার সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ পারসী নানের মন্তব্যটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নানের মতে উদ্দেশ্যমূলক কর্মপদ্ধতি স্কুলের সর্বস্তরে সমানভাবে ব্যবহার করা যায় না। সকল বয়সের শিশুদের পক্ষেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল যে, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যে সীমারেখা আছে এই পদ্ধতি তাকে তেমন মান্ত করে না।

তবে প্রোজেক্ট পদ্ধতি পদ্ধতি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সার্থকভাবে ব্যবহার করা চলে। উচ্চশ্রেণীতে, বিশেষ করে ১৪, ১৫ ও ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য এই পদ্ধতি আদৌ কার্যকরী নয়। নান মনে করেন, উচ্চশ্রেণীতে প্রাচীন যৌক্তিক পদ্ধতিই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে। কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী প্রতি স্তরে বিচার বিশ্লেষণের মারফত নতুন জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করে। নান মনে করেন একমাত্র এইভাবেই ছাত্ররা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

বুনিয়াদী বা সেবাগ্রাম পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির তুলনা

বুনিয়াদী বা সেবাগ্রাম পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির অনেক ক্ষেত্রে যেমন মিল আছে, তেমনি আছে পার্থক্য। উভয় পদ্ধতিতেই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান পৃথক পৃথকভাবে না দিয়ে একটি বিশিষ্ট কর্মকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ নীতির ভিত্তিতে এই পদ্ধতি দুটিতে দিতে বলা হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই শিশুকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান তখনই শিশু অর্জন করবে, যখন জ্ঞান অর্জনে তার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। উভয় পদ্ধতিতেই সামাজিক ও পরিবেশগত প্রয়োজন অনুসারে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কর্ম নির্বাচন করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু উভয় পদ্ধতির মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে যে শিল্প নির্বাচন কবা হয় তা শিশুর পবিবেশগত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচিত করা হয়। শিল্পটির যেন অর্থনৈতিক মূল্য থাকে এবং বাজাবে যেন তার একটি বিশেষ চাহিদা থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষায় নিম্নলিখিত শিল্পগুলি মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হযেছে। যথা, সুতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, কৃষি কাজ, ফল, ফুল ও সব্জি বাগান তৈবি, চামডার কাজ ইত্যাদি। কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এমন কাজ নির্বাচন করা হয় যে, কাজে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখা যায়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে নির্বাচিত কাজগুলি আমাদেব অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষে প্রয়োজন হলে ছাত্রছাত্রীবা শিল্পটিকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে নির্বাচিত সমস্যাটি আদৌ জীবিকা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত নয়। কাজেব ভিতর দিয়ে শিক্ষা বা একটি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা, এই নীতির ভিত্তিতে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে যে কাজটি বাছাই করা হয়, তার মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র কাজের সুযোগ থাকে। কিন্তু

কোন ক্রমেই এটিকে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা চলে না। গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি পদ্ধতিতে যে শিল্পটি নির্বাচন করা হবে, একদিকে যেমন তার থাকবে শিক্ষাগত মূল্য, তেমনি অন্যদিকে থাকবে অর্থনৈতিক প্রয়োজন। আবার আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্গত।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করলে মনে হয় বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। কারণ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যে জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং এই যোগ্যতা বৃদ্ধিতে বুনিয়াদী শিক্ষার চেয়ে উত্তম পদ্ধতির কথা বিশেষ কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আমেরিকা একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। সেখানে বেকার সমস্যা তেমন প্রকট নয়। এই অবস্থায় যে কোন একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে কাজের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৩. কর্মশালা পদ্ধতি

সূচনা: বর্তমান যুগ শিল্পকেন্দ্রিক যুগ। বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, পরমাণুশক্তি আবিষ্কারেব পব মানুষ শিল্পসমৃদ্ধ এক নতুন যুগের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছে। বৃহৎ শিল্প পবিচালনার জন্য নিখুঁত নিয়মাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অবস্থায় শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বৃহৎ শিল্প কারখানা পরিচালনা পদ্ধতির প্রভাব যে কিছু পডবে, এইরূপ আশা কবাই সঙ্গত। এক সময ছিল যখন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার মনোবিজ্ঞানকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। তখন মনোবিজ্ঞানের নাম দেওয়া হয়েছিল মানসিক রসায়ন (Mental chemistry)। এইরূপ আরও উদাহবণ দেওয়া যেতে পাবে। যেমন, শিক্ষা বিষয়ক অভীক্ষাগুলিকে বলা হত, 'শিক্ষা-চাপমান যন্ত্র' (Education barometer)। শিল্প পরিচালনা ও বিভিন্ন দ্রব্য তৈরির আধুনিক পদ্ধতির নিয়মাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থকভাবে বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পদ্ধতি বা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বলে **কর্মশালা পদ্ধতি** (Workshop method)। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, যথা—এপিডিযাস্কোপ, ফিল্ম প্রোজেক্টর, বেডিয়ো, টেলিভিসন্, টেপ-বেকর্ডার ইত্যাদি। এইগুলি ব্যবহারেব বিদ্যাকে বলা হচ্ছে শিক্ষাবিষয়ক যান্ত্রিক বিদ্যা (Educational technology)।

সংজ্ঞা: কর্মশালা পদ্ধতি কাকে বলে? কর্মশালা পদ্ধতি হল এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার একটি বিশেষ বিষয়কে বৃহৎ শিল্পালয়ের শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী অবলম্বন করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে বৃহৎশিল্প শ্রমিকদের কর্মবিভাজন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বৃহৎ শিল্প কারখানায় কোন বস্তু তৈরি করবার জন্য বস্তুটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পৃথকভাবে তৈরি করা হয় এবং পরে অংশগুলি একত্র করে পূর্ণ বস্তুটি প্রস্তুত করা হয়। যেমন, একটি মোটর গাডীর কারখানায় বা একটি

বৃহৎ জুতা কোম্পানীতে এইভাবে বিভিন্ন অংশগুলি পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হয় একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুসারে এবং পরে অংশগুলি একত্রে সংযুক্ত করে মূল বস্তুটি প্রস্তুত করা হয়। কর্মশালা পদ্ধতিতেও একটি বিষয়কে কয়েকটি অংশে ভাগ করে। এক একটি অংশ সম্পাদনের ভার দেওয়া হয় এক একটি ক্ষুদ্র দলের উপর।

কর্মশালা পরিচালনা : কর্মশালা পদ্ধতিতে প্রোজেক্ট পদ্ধতির মত একটা বিশেষ সমস্যা বা বিষয় নির্বাচন করা হয় এবং এক একটি অংশ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এক একটি দলের উপর। যে কয়টি অংশে বিষয়টিকে ভাগ করা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদেরও তদনুরূপ কয়েকটি দলে ভাগ করা হবে। ফ্যাক্টরীতে বা কর্মশালায় যেভাবে কাজ হয়, কর্মশালা পদ্ধতিতেও সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পাদন করা হয়।

শিক্ষকদের কাজ : কর্মশালা পদ্ধতিতে শিক্ষকদের ভূমিকা কি ? এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের বলা হয় বিশেষজ্ঞ (Experts) বা পরামর্শদাতা (Consultants) বা আকর ব্যক্তি (Resource persons)। তারা কাজটি সম্পাদনে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উপদেষ্টা, উৎসাহদাতা হিসাবে কাজ করেন এবং কাজের ত্রুটি নির্দেশ করে সংশোধন সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

শ্রেণীকক্ষ : শ্রেণীকক্ষগুলি রূপান্তরিত হবে এক একটি কর্মশালায়। ঐগুলিকে সুসজ্জিত করা হবে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে। প্রত্যেক কক্ষেই থাকবে নানা বই, পত্রিকা, ছবি, চার্ট, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

কার্যক্রম : একটি সমস্যাকে নির্বাচন করে শিক্ষক একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিষয়টিকে কিভাবে সম্পাদন করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন এবং তিনিই ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দেবেন। ছাত্রেরা নিজেদের উৎসাহ ও আগ্রহ অনুসারে উক্তদলের এক একটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করবে। ছাত্রদের এক একটি দলকে বলা হয় কার্যনির্বাহক দল (Working groups)। ছাত্রদের এই কার্যনির্বাহক দলে থাকবে একজন ছাত্র-সভাপতি এবং একজন ছাত্র-রিপোর্টার বা প্রতিবেদন লেখক। প্রয়োজন অনুসারে তারা স্ব স্ব দলের সভা আহ্বান করে কাজের উন্নতি বা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং প্রযোজন ক্ষেত্রে আকর ব্যক্তির পরামর্শ নেবে। কাজটি ঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য ছাত্ররা বই ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেবে এবং প্রযোজন ক্ষেত্রে যন্ত্রাদির ব্যবহারও করতে পারে।

রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা : প্রত্যেক দল তাদের কাজের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করবে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করবার সময়ে ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে যেমন আলোচনা করবে, তেমনি প্রয়োজন মত শিক্ষকদের সাহায্য নেবে। প্রত্যেক দলের প্রতিবেদন পৃথকভাবে রচিত হবার পরে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদনগুলি সমগ্র শ্রেণীতে আলোচিত হবে এবং উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মতামত গঠন, ও সম্মিলিত আলোচনা বা সেমিনার এই কর্মশালা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই জন্য এই পদ্ধতিকে সেমিনার পদ্ধতিও বলা হয়।

কর্মশালা পদ্ধতির মূল্যায়ন

কর্মশালা পদ্ধতিতে পরস্পর মত ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করে। আকর ব্যক্তির সাহায্যে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে গ্রহণ করে থাকে। এই পদ্ধতিটির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির অনেকাংশে মিল আছে। তবে এই পদ্ধতিটি একমাত্র বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ ছাত্র-ছাত্রীরা এই পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রয়োগে উপযুক্ত নয়। পদ্ধতিটি ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। জ্ঞানের সকল অংশই এই পদ্ধতির মধ্যে আনা সম্ভব নয়। এই কারণে কর্মশালা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায় না। তবে এই পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করবার জন্য শিক্ষককে একজন আকর ব্যক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে এবং এইজন্য চাই ধৈর্য, নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কারের ক্ষমতা এবং ছাত্রদের সহযোগিতা।

একটি কর্মশালার উদাহরণ

কর্মশালার বিষয়বস্তু: স্থানীয় ভূগোল পাঠ (Study of home geography)।

শ্রেণী ও ছাত্রসংখ্যা: সপ্তম শ্রেণী, ছাত্রসংখ্যা ৪৪ জন।

কর্মশালার স্থায়িত্বকাল: ৯০ দিন।

বিদ্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ জানবার আগ্রহ রয়েছে সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের। তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করে ভূগোলের শিক্ষক স্থির করলেন যে, বিষয়টি কর্মশালা পদ্ধতির মারফত শিক্ষা দেওয়া হবে। তিনি ছাত্রদের সমস্যাটি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন এবং কিভাবে বিষয়টি কর্মশালা পদ্ধতির মারফত শেখানো হবে সেই সম্পর্কেও আলোচনা করলেন।

কার্যনির্বাহক দল গঠন: ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থানীয় অঞ্চলটিকে কয়েকটি ভৌগোলিক বিষয়ে ভাগ করা হল। ভৌগোলিক বিষয়গুলি হল—১. বন্ধুরতা (Relief) ও শিলাসংস্থান, ২. বারিমণ্ডল (Hydrography), ৩ জলবায়ু (Climate), ৪. উদ্ভিজ্জসংস্থান (Vegetation), ৫. জীবজন্তু, ৬. স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা সম্পর্কিত বিবরণ (Occupational survey), ৭. অঞ্চলটির ঐতিহাসিক বিবরণ (Historical survey)।

ছাত্রদের চারটি দলে বিভক্ত করে উপরোক্ত ভৌগোলিক বিষয়গুলির এক বা একাধিক বিষয় এক একটি দলের উপর ন্যস্ত করা হল। প্রত্যেক দল থেকে একজন সভাপতি ও একজন প্রতিবেদন লেখক নির্বাচন করা হল। আকর ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন এবং কিভাবে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে তা ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। স্থানীয় ভূগোল সম্পর্কে জানবার জন্য যে যে পুস্তক, পুস্তিকা ও রেফারেন্স বই-এর বিবরণ পাওয়া যাবে তা তিনি ছাত্রদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ এ পরিদর্শনের জন্য ছাত্ররা কিভাবে অগ্রসর হবে, কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে এবং কিভাবে ম্যাপে

আঞ্চলিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করবে এবং বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করবে, সেই সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করলেন।

আলোচনার পর ছাত্ররা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে স্ব স্ব দলের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করল। প্রথম দল বন্ধুরতা ও শিলা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবরণ সংগ্রহ করল। , তারা স্থানীয় অঞ্চল সম্পর্কে যে সকল পুস্তকে আলোচনা আছে, সেগুলি পড়ে নিল এবং স্থানীয় সার্ভে মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ করল। তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের একখানি রেখা মানচিত্র অঙ্কন করে নিল। মানচিত্রে বন্ধুরতার (Relief) চিহ্নগুলি অঙ্কন করে স্থানের উচ্চনীচ অংশগুলি চিহ্নিত করল। প্রয়োজন ক্ষেত্রে রং ও লাইনের সাহায্যে মানচিত্রে বন্ধুরতা দেখিয়ে দিল। স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে যদি কোন পাহাড় পর্বত থাকে তাও মানচিত্রে দেখানো হল এবং সার্ভে ম্যাপ থেকে ঐগুলির উচ্চতা লিপিবদ্ধ করা হল। আলোচ্য অঞ্চলটিতে যে ধরনের শীলা (Rocks) পাওয়া যায় সেগুলির নমুনা সংগ্রহ করা হল এবং বৈচিত্র্য অনুসারে ঐগুলি সাজিয়ে স্কুলের সংগ্রহশালায় রাখা হল। ঐগুলি কোন দল কোন তারিখে সংগ্রহ করেছে তাও লিখে রাখা হল। উপরের বিষয়গুলির বিবরণ সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন রচনা করা হবে।

দ্বিতীয় দল ভার নিল স্থানীয় অঞ্চলের বারিমণ্ডল ও আবহাওয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানের। অঞ্চলটিতে জল সরবরাহের উপায় কি, জনসাধারণ কিভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করে সেই সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করল। স্থানীয় অঞ্চলটিতে জল পাবার প্রধান উপায় কি ? অর্থাৎ নদী, পুকুর, কূপ বা ঝর্ণা, কোথা থেকে জনসাধারণ জল পেয়ে থাকে সেগুলি অনুসন্ধান করল।

স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কেও বিবরণ সংগ্রহ করা হবে, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে। বাযুব গতি, সূর্যতাপ. বায়ুতে আর্দ্রতা (Humidity) প্রভৃতি সম্পর্কেও সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিববণগুলি সংগ্রহ করে পরিস্কার করে একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে স্থানীয় জলবায়ু ও বারিমণ্ডল সম্পর্কে।

তৃতীয় দল উদ্ভিজ্জসংস্থান ও জীবজন্তু সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করবে। বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের প্রভাব স্থানীয় উদ্ভিদের উপর কিরূপ এবং ঋতুভেদে উদ্ভিদের যে পরিবর্তন হয় সেই সম্পর্কে এই দল অনুসন্ধান করবে। এই দল উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করবে, যেমন স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও কৃষিজাত উদ্ভিদ। কৃষিজাতশস্যের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে এবং কোন শস্যের গড় উৎপাদন হার কত তাও এই দল সংগ্রহ করে লেখের (Graphs) সাহায্যে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবে। এই দল অনুসন্ধান করবে ভূপ্রকৃতির সঙ্গে উদ্ভিজ্জসংস্থানের সম্পর্ক কি ? বৃষ্টিপাতের প্রভাব স্থানীয় কৃষির উপর কিরূপ ?—ইত্যাদি। আলোচ্য অঞ্চলটিতে যদি এমন কোন বৃক্ষ দেখা যায় যা এই অঞ্চলের আবহাওয়ার উপযোগী নয়, তা হলে সেই সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। কোন্ স্থানে বৃক্ষটি জন্মেছে তাও মানচিত্রে চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় আঞ্চলিক মানচিত্রে কৃষিজমি ও অকৃষি জমির আয়তন চিহ্নিত করা হবে। ম্যাপে কৃষিজমিগুলি বিশেষভাবে দেখানো হবে এবং কি জাতীয় শস্যের উপযোগী তা লিপিবদ্ধ করা হবে।

স্থানীয় জীবজন্তু সম্পর্কেও নানা বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। জীবজন্তু দুই প্রকারের। বন্যজন্তু ও গৃহপালিত জন্তু। কি কি ধরনের বন্যজন্তু অঞ্চলটিতে দেখতে পাওয়া যায় তার বিবরণ ছাত্ররা লিপিবদ্ধ করবে। প্রয়োজন মত ঐসকল জীবজন্তুব ছবি সংগ্রহ করে রিপোর্টে আটকে দেবে। গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা কত এবং তাদের শ্রেণী সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৃতীয় দল রচনা করবে।

চতুর্থ দলেব কাজ হবে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা কতজন কৃষিকার্য কবে জীবিকা অর্জন কবে, কতজন কলকারখানায় কাজ করে, কতজন শিক্ষকতা করে, কতজন ছোট দোকানদার ইত্যাদি বিবরণ এই দল সংগ্রহ করবে। এই অনুসন্ধানে স্থানীয় অঞ্চলের শিক্ষিতের হার সম্পর্কেও বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কতজন প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে, কতজন পেয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা পেয়েছে কতজন, এই বিববণও সংগ্রহ করা হবে।

স্থানীয় অঞ্চলের পুরাতন মন্দির, মসজিদ, অট্টালিকা থাকলে তার বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। মন্দিরের শিল্পকার্যের নিদর্শন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয়েরও বিবরণ ছাত্ররা সংগ্রহ করবে। চতুর্থ দল উপরোক্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করে একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রতিবেদন তৈরি করবে।

স্থানীয় ভূগোল সম্পর্কে চারটি দলের চারটি প্রতিবেদন রচিত হবার পরে ঐ প্রতিবেদনগুলি একত্রযোগে শ্রেণীকক্ষে সকল ছাত্রদের সামনে পাঠ ও আলোচিত হবে। রিপোর্টের মাঝে কোন অসঙ্গতি থাকলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে। শ্রেণীকক্ষে পূর্ণ ছাত্র সভায় আকর ব্যক্তিদের সামনে তা গৃহীত হবে এবং প্রতিবেদনটির এক একটি কপি প্রত্যেক ছাত্রকে দিতে হবে তাদের ব্যবহারের জন্য।

৪. পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী পদ্ধতি

পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী পদ্ধতিব অপর নাম ডলটন্ প্লান। ১৯২০ সালে মিস পার্কহার্স্ট নামক একজন আমেরিকান মহিলা শিক্ষাবিদ পরীক্ষাগার পদ্ধতিটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যের ডলটন নগরীর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই কারণে পরীক্ষাগার পদ্ধতির অন্য নাম ডলটন প্লান বা পদ্ধতি।

মিস পার্কহার্স্ট ছিলেন একজন শিক্ষিকা। তিনি প্রথমে কাজ আরম্ভ করেন একটি গ্রামের স্কুলে। ঐ স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০। পার্কহার্স্ট ঐ স্থানে প্রচলিত শ্রেণী-শিক্ষা পদ্ধতি (Class teaching)-এর পরিবর্তে অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে কাজে নিযুক্ত রাখার কথা চিন্তা করেন।

শিক্ষা-পরীক্ষাগার

১৯১১ সালে মিস্ পার্কহার্স্ট ৮ থেকে ১২ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য একটি

নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এখানে প্রচলিত শ্রেণী-কক্ষগুলি পরিবর্তিত করা হল শিক্ষা-পরীক্ষাগারে (Educat'onal laboratory)। এই পরিকল্পনায় কোন-রূপ সময় পত্রিকা (Time table) রাখা হল না। ছাত্ররা যাতে এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয় সেরূপ ব্যবস্থা রাখা হল। এই সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের জন্য মিস পার্কহার্স্ট ইতালীতে গেলেন মন্তেসরী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য (১৯১৪)। ১৯২০ সালে তিনি আমেরিকায় ফিরে এসে ডলটন নগরীর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে তার পদ্ধতি প্রথমে সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বটি 'ডলটন পদ্ধতিতে শিক্ষা' (Education on the Dalton plan) নামক পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

পরীক্ষাগার পদ্ধতির মূল তত্ত্ব

মিস পার্কহার্স্ট তাঁর পুস্তকে ল্যাবরেটরী পদ্ধতি বা ডলটন প্লানের মূল তত্ত্বটি বর্ণনা কবেছেন। স্কুলে শিক্ষকদের প্রধান কাজ হল 'শেখানোর সঙ্গে শেখার জটিল' সম্পর্কটি সমাধানের চেষ্টা করা। শিক্ষক যতোই ভালভাবে শেখান না কেন, ছাত্রদের পক্ষে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের কথা একবার শুনে বিষয়টি শেখা সম্ভব নয়। এত-কাল স্কুলকে সংগঠিত কবা হয়েছে শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বর্তমানে স্কুলকে পুন-র্গঠন করা উচিত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিক থেকে। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র, তাদের শেখবার প্রণালীও বিভিন্ন। এই কারণে বিদ্যালয়ের শ্রেণী-সংগঠনকে পুনর্বিন্যাস করা উচিত। বিদ্যালয় এরূপ হবে যে, শিশুরা যেন নিজেদের সঠিকভাবে বিকশিত করতে পারে, নিজেদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে এবং নিজেদের উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারে।

অনেকে মনে করেন পার্কহার্স্টের ল্যাবরেটরী পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষার (Indi-vidual instruct on) দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোর দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে। ছোট ক্লাশেও শিশুরা বিকাশেব উপযুক্ত সুযোগ না পেতে পাবে। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে শিশুর সম্ভাবনা পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। ল্যাবরেটরী পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। তবে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবার জন্য আলোচ্য পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয়েছে শ্রেণী সংগঠনের উপর ও স্কুলের সামাজিক জীবন ধাবার উপর। কোন বিষয়কে নতুনভাবে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি এ নয়, একে শিক্ষার কোন বিশেষ কৌশলও বলা চলে না। পরীক্ষাগার পদ্ধতি হল শিশুর জীবন যাপনের একটি বিশেষ উপায় মাত্র. (Way of life for the child)।

ডলটন প্লান্ শিশুকে তার কাজের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। জীবনে প্রত্যেকের আছে কাজ এবং নির্দিষ্ট কাজটি সার্থকভাবে সম্পাদনেব জন্য প্রত্যেকের দরকার তার শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের

উচিত শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট কাজকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা। এগুলিকে বলা হয় পাঠ্যাংশ (Job)।

বিদ্যালয় পরিবেশ

বিদ্যালয়ের পরিবেশ এরূপ হবে যে, শিশু যেন গৃহ-পরিবেশের ভাবটি বিদ্যালয় পরিবেশে বোধ করতে পারে। স্কুলে এসে শিশু যেন মনে করে সে বাড়ীতেই আছে। বাড়ীতে শিশু এক ঘর থেকে আর এক ঘরে বিচরণ করে নিজের প্রয়োজন অনুসারে, কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সে বসবার ঘর থেকে লাইব্রেরী ঘরে যায়, রান্না-ঘর থেকে যায় শোবার ঘরে। এই জন্য সে কারও অনুমতি নেয় না এবং প্রয়োজনও বোধ করে না। কোন ঘরে সে কি প্রয়োজনে যাবে সেই সম্পর্কে শিশু সচেতন থাকে। ডলটন প্লান গৃহ-পরিবেশে জীবন যাপনের ধারা বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়। বিদ্যালয়ে শিশু একটি পরীক্ষাগার থেকে অন্য বিষয়ের পরীক্ষাগারে বিচরণ করে নিজের কার্য সম্পাদনের জন্য; সে একটি বিষয়ের ঘর থেকে অন্য বিষয়ের ঘরে নিজের ইচ্ছামতো যাতায়াত করে। আলোচ্য পরিকল্পনায় শ্রেণীকক্ষগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের কর্মশালায় রূপান্তরিত করা হয় এবং তদনুযায়ী সজ্জিত করা হয়।

ছাত্রদের সম্পাদনের জন্য যে কাজগুলি দেওয়া হয়, পার্কহার্স্ট তাকে বাজারের একটি ফর্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন ব্যক্তি বাজারে গিয়ে কিভাবে জিনিসপত্র কেনা-কাটা করেন। তিনি প্রথমে একটি ফর্দ তৈরি করেন এবং পরে যান ঐ ফর্দ অনুযায়ী জিনিস কিনতে। মনে করা যাক, তিনি গেলেন একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জিনিস কিনতে। প্রথমে তিনি গেলেন একটি জামা কিনতে জামা কেনবার কাউন্টারে। কিন্তু দেখলেন কাউন্টারে খুব ভীড়। তখন তিনি অন্য জিনিস কিনতে গেলেন অন্য কাউন্টারে। জিনিসটি কেনবার পর তিনি ফিরে এলেন জামা কেনবার কাউন্টারে।

ডলটন্ প্লানেও ছাত্র সারাদিনের কাজের একটি পরিকল্পনা করে অগ্রসর হয়। যদি দেখে ঐ প্লান অনুযায়ী কাজ করা যাচ্ছে না, তখন সে তার প্লান পরিবর্তন করে এবং পরে নতুন প্লান অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে।

ডলটন পরিকল্পনার তিনটি নীতি

ডলটন প্লানে যে তিনটি প্রধান নীতি অনুসরণ করা হয় তা হল,—

১. **স্বাধীনতা** (Freedom). ২. **যৌথ জীবনের প্রভাব** (Interaction of group life) ও ৩. **শিক্ষা-সময়ের মিতব্যয়িতা** (The budgeting of time)।

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে **স্বাধীনতা** কথাটি অতি পরিচিত; আমাদের সকলের নিকটই 'শিক্ষায় স্বাধীনতা' একটি বহুল পরিচিত শব্দ। ডলটন পরিকল্পনায় স্বাধীনতার অর্থ হল শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এমন বিষয়সমূহের অপসারণ।

যৌথ জীবনের আন্তঃপ্রতিক্রিয়ার (Interaction) অর্থ হল স্কুলের

বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রাখা। সাধারণ স্কুলে একই শ্রেণীতে বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে এই সুযোগের অভাব থাকে। ডলটন পরীক্ষায় সকল শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ থাকে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের যেমন নতুন বিষয় শেখাতে পারে, তেমনি নিম্ন শ্রেণীর ছাত্ররাও তাদের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কাজের ধারা লক্ষ্য করে।

সময়ের মিতব্যয়িতা সম্পর্কে বলা যায় যে, ছাত্ররা যে বিষয়ে উন্নত সেই বিষয়টি তাড়াতাড়ি শিখে নেয় এবং যে বিষয়গুলিতে তারা দুর্বল সেই বিষযে অধিক সময় দিতে পারে। একেই বলা হয় সময়ের মিতব্যায়িতা।

শ্রেণীকক্ষ নয়, পরীক্ষাগার

মিস পার্কহার্স্ট বলেন, ডলটন প্ল্যানে শ্রেণী-সংগঠনের কোনরূপ স্থান নেই। শ্রেণী-কক্ষগুলিকে পরিবর্তিত করতে হবে পরীক্ষাগাররূপে। পার্কহার্স্ট মনে করেন শ্রেণী-গুলির এই নতুন নামকরণের ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক ধরনেব সচেতনতা দেখা দেবে। স্কুলকে চিন্তা করতে হবে একটি সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষাগার হিসাবে। এখানে প্রত্যেক ছাত্রই এক একজন গবেষক। তারা এখন এমন একটি ব্যবস্থার অংশ নয়, যে ব্যবস্থা প্রণয়নে তাদের কোন দায়িত্ব থাকে না। শ্রেণীকে এমন একটি স্থান হিসাবে গণ্য করতে হবে, যেখানে থাকবে সামাজিক অবস্থা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, যেমন তারা দেখে বাস্তব ক্ষেত্রে।

প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষ থাকবে এবং শ্রেণীকক্ষকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ। যথা, ছবি, চার্ট, ম্যাপ ইত্যাদি যেন ছাত্ররা সহজেই কাজে লাগাতে পারে। বিষয় শিক্ষকদের একজন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ছোট বিদ্যালয়ে একটি কক্ষকে একাধিক বিষয়ের পরীক্ষাগার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুক্তিপত্র

প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে একটি লিখিত চুক্তিপত্র দেওয়া হবে। সে স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কাজ করবে। পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট একটি বিষয়কে বারটি অংশে ভাগ করে মাসিক চুক্তি বা অ্যাসাইনমেণ্ট (Assignment)-এ ভাগ করতে হবে। পরে মাসিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট অংশটিকে ২০ দ্বারা ভাগ দিয়ে একদিনের কাজ নির্দিষ্ট করা হবে। অবশ্য এর মধ্যে ছুটির দিনগুলি ও শনিবার, রবিবার বাদ দিতে হবে।

বছরেব জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ÷ ১২ = একমাসের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়।

একমাসের নির্দিষ্ট বিষয় ÷ ২০ = দিনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়।

ডলটন প্ল্যানে একমাসের কাজকে কাজের একক (Unit) হিসাবে গণ্য করা হয়। ইংরাজীতে বলা হয় জব্‌স্‌ (Jobs)। যত মাস স্কুল চলবে ততগুলি জব্‌ নির্দিষ্ট করতে

হবে। যদি কোন শিক্ষার্থী তার নির্দিষ্ট জবটি একমাসের কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারে, তখন সে পরবর্তী জবটি সম্পন্ন করবার অধিকার অর্জন করবে। এইরূপ ব্যবস্থায় ভাল ছেলেরা দ্রুত কাজ করবার সুযোগ পেয়ে থাকে।

গ্রাফ্ বা উন্নতি লেখ (Graphs)

প্রত্যেক ছাত্রের কাজের উন্নতি পরিমাপের জন্য লেখচিত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়। ডলটন প্লানে লেখচিত্র একটি প্রধান উপকরণ। লেখচিত্রটি থেকে কোন ছাত্র জানতে পারে, বিষয়টিতে তার উন্নতির হার কিরূপ। ব্যক্তিগত লেখচিত্র ছাড়া প্রত্যেক বিষয় কক্ষে থাকবে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর জন্য যৌথ লেখচিত্র। যৌথ লেখচিত্রটি থেকে একজন ছাত্রের পক্ষে জানতে সুবিধা হয়, অন্যদের সঙ্গে তুলনায় তার উন্নতির হার কিরূপ এবং অন্য ছাত্রদের মধ্যে কে কে কাজটি শেষ করতে পেরেছে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষক যখন অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখন কোন ছাত্র যারা কাজ শেষ করেছে তাদের কাছে গিয়ে সাহায্য নিতে পারে।

বুলেটিন বোর্ড : ডলটন প্লানে বুলেটিন বোর্ড ব্যবহৃত হয় ছেলেমেয়েদের রোজকার কাজের পরিকল্পনা জানানোর জন্য। নতুন কোন কাজের কথা ছেলে-মেয়েদের জানানোর জন্যও বুলেটিন বোর্ড ব্যবহার করা হয়। ডলটন স্কুলে ছেলেমেয়েদের প্রথম দায়িত্ব হল স্কুলে এসে বুলেটিন বোর্ড দেখে প্রত্যেক দিনের কাজের দায়িত্ব বুঝে নেওয়া।

ডলটন বিদ্যালয়ের একটি দিনের কার্যক্রম

ডলটন বিদ্যালয়ের একদিনের কার্যক্রম আলোচনা করলে ডলটন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

বিদ্যালয়ে প্রথমে এসে ছাত্ররা প্রথমে যে শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে, তাকে বলা হয় উপদেষ্টা (Adviser)। ডলটন বিদ্যালয়ে উপদেষ্টা একজন প্রধান ব্যক্তি। ডলটন বিদ্যালয়ে যতজন বিষয় বিশেষজ্ঞ (Subject specialist) থাকবে, ততজন থাকবে উপদেষ্টা। বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রদলকে কয়েকটি সমান দলে ভাগ করা হয় এবং এক একদলের ভার দেওয়া হয় এক একজন উপদেষ্টার উপর।

উপদেষ্টা সর্বদাই ছাত্রদিগকে সাহায্য করেন। যখন ছাত্ররা কোন বিষয়ে অসুবিধায় পড়ে, তিনি সাহায্য করেন তাদের অসুবিধা অতিক্রম করতে। ছাত্ররা তাদের কাজ সমাপ্তির ভিতর দিয়ে যে উন্নতি দেখায় উপদেষ্টা তার রেকর্ড রাখেন। শুধু একটি মাত্র বিষয়েই নয় পাঠ্যক্রমের সকল বিষয়ের উন্নতির রেকর্ড তিনি রেখে থাকেন।

অ্যাসেমব্লী বা ছাত্রসভায় এরপর ছাত্রেরা যোগ দেয় উপদেষ্টার সঙ্গে। অ্যাসেমব্লীতে স্কুলের সকল ছাত্রকেই যোগ দিতে বলা হয়। কারণ ডলটন্ পরিকল্পনায় সকল ছাত্রকে একসঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া একটি প্রধান কাজ। অ্যাসেমব্লীতে যোগদানের পর ছাত্ররা নিজ নিজ উপদেষ্টার নিকট ফিরে যায় এবং প্রত্যেক ছাত্র তার নিজস্ব কাজের প্রোগ্রাম্ ঠিক করে নেয়। কাজের পরিকল্পনা ঠিক করে নেবার পর প্রত্যেক ছাত্র নিজ

নিজ টাইম টেবিল অনুযায়ী দিনের কাজ আরম্ভ করে। ছাত্রদের এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা তাদের পছন্দমত বিষয় নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করতে পারে। তবে যদি তারা কোন কাজে বিরক্তিবোধ করে, বা কাজটি করতে তাদের ভাল না লাগে, একমাত্র তখনই তারা ঐ কাজটি পরিত্যাগ করতে পারে। এর ফলে পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরীর আবহাওয়া থাকে শান্ত ও কর্মচঞ্চল, কারণ কোন অবস্থাতেই কোন শিশুকে জোর করে কাজ করানো হয় না। কাজে স্বতঃস্ফূর্ততার জন্য কোন বিষয়ে নিযুক্ত ছাত্র অন্য বিষয়ে মন দেবার অবকাশ পায় না। এই কারণে কোনরূপ বিশৃঙ্খলাও ঘটে না। যদি জোর করে তাদের দিয়ে কোন কাজ করানো হতো, তা হলে কাজে তারা আনন্দ পেতো না। কাজটিতে কোন আকর্ষণ না থাকায় তারা অন্য ছাত্রদের বিরক্ত করতো এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। কোন কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা গণিতের ঘরে সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে এবং এইভাবে তারা তাদের গণিতের দুর্বলতা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে।

মিস পার্কহার্স্ট এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একটি মেয়েকে দেখা গেল ভূগোলের ঘরে খুব মন দিয়ে কাজ করছে। পরিদর্শক মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,— 'তুমি ভূগোলের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছো ; আমার মনে হয় ভূগোল তোমার খুব প্রিয় বিষয়। মেয়েটি উত্তর দিল, 'না, আমি ভূগোল মোটেই পছন্দ করি না।' পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে তুমি এতক্ষণ ধরে কাজ করছো কেন?' মেয়েটি উত্তর দিল, 'কোন কোন দিন আমার শরীর ও মন ভাল থাকে। সেদিনটিতে আমি শক্ত কাজগুলি করি। আজ আমার শরীর ও মন ভাল আছে, এই কারণে ভূগোলের মত শক্ত বিষয়টি আজ শিখে নিচ্ছি। যেদিন আমার শরীর ও মন ভাল থাকে না, সেদিন আমি সহজ বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করি।'

ডলটন প্লানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাগারে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। অনেকে মনে করেন ডলটন-প্লানে কোন শ্রেণী নেই এবং এই কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে কোন কাজ করবার সুযোগ পায় না। কিন্তু ডলটন্ প্লানে একযোগে কাজ করবার সুযোগ খুব বেশী, কারণ পরীক্ষাগারগুলিতে ছেলেমেয়েদের দল-বেঁধে কাজ করতে হয়। আবার পরীক্ষাগারগুলিতে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের একযোগে কাজ করবার সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের পক্ষে সুবিধা এই যে, তারা একই শ্রেণীর একটি দলকে একই সময়ে কাজের নির্দেশ দিতে পারেন ; কারণ একই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত একই মানের কাজ করে থাকে। ছাত্ররা কিভাবে কাজ করে তার একটি নির্দেশনামা (Guide line) পূর্বেই তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্ররা পরীক্ষাগারে প্রবেশ করে ঐ নির্দেশনামা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে।

কাজের শেষে একই শ্রেণীর ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হতে পাবে কোন বিষয় আলোচনার জন্য। সেখানে তারা নিজেদের কাজের ফল আলোচনা করে এবং নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে। শিক্ষকও এই আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন কাজের প্রোগ্রামের ত্রুটি কোথায় এবং কিভাবে ঐ ত্রুটি দূর করা যেতে পারে।

একটি চুক্তিপত্রের নমুনা

বিষয়ঃ জ্যামিতি

শ্রেণীঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণী।

সময়সীমাঃ ১ মাস।

চুক্তিঃ আমি এইমত :চুক্তি করছি যে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত বিষয়টি সম্পন্ন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর.........ছাত্রের স্বাক্ষর.........তারিখ.........

বিষয়সূচী

১. জ্যামিতির প্রয়োজন কেন ?

আমাদের জীবনে জ্যামিতির প্রয়োজন কেন এই বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক থেকে সংগ্রহ কর। প্রাচীন গ্রীক দেশের দার্শনিক মহামতি প্লেটো তাঁর অলিভ বনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে এই কথা লিখে রেখেছিলেন যে, যারা জ্যামিতি জানে না তাদের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

২. প্লেটো এরূপ কেন লিখেছিলেন ? যাদের যুক্তিশক্তি তেমন উন্নত নয় তারা জ্যামিতি শিখতে পারে না কেন ?

৩. জ্যামিতি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জ্যামিতির উপকরণ কি ? কয়েকটি জ্যামিতির উপকরণ এখানে উল্লেখ কর ?

৪. ত্রিভুজ, বৃত্ত, রেখা, বিন্দু প্রভৃতি জ্যামিতির উপকরণ। ত্রিভুজ নিয়ে প্রথম আলোচনা কর। কত প্রকারের ত্রিভুজ আঁকা যায়। কয়েক প্রকারের ত্রিভুজ অঙ্কন কর। ত্রিভুজের একটি সংজ্ঞা দাও। ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু কোন্‌টি ? ত্রিভুজের কয়টি বাহু আছে, কয়টি কোণ আছে ? নিম্নলিখিত শর্ত অনুসারে ত্রিভুজ অঙ্কন করে, ত্রিভুজ গুলির নামকরণ কর। যথা, ত্রিভুজের তিনটি বাহু সমান, ত্রিভুজের যে কোন দুটি বাহু সমান, ত্রিভুজের তিনটি বাহু অসমান।

৫. ত্রিভুজের পরিসীমা কি ? যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে ৫ সে. মি., ৬ সে. মি., ১০ সে. মি, পরিসীমা কত ?

৬. **বৃত্তঃ** বৃত্ত জ্যামিতির অন্যতম উপকরণ। বৃত্তের অংশগুলি নির্দেশ কর। বৃত্তের একটি সংজ্ঞা দাও।

৭. ব্যাসার্ধ কাকে বলে ? একটি বৃত্ত অঙ্কন কর এবং বৃত্তের কয়েকটি ব্যাসার্ধ অঙ্কন কর। মনে করা যাক, বৃত্তটির কেন্দ্র হল O এবং OA, OB, OC তিনটি ব্যাসার্ধ।

৮. দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান হলে ঐ দুটি বৃত্তের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

৯. ব্যাস কাকে বলে ? ব্যাস ও ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কি ? প্রমাণ কর BE = 2OA, (BE ব্যাস ও OA ব্যাসার্ধ)।

১০. প্রমাণ কর একটি বৃত্তের সকল ব্যাসই সমান।

১১. বৃত্তাংশ (Arc) কাকে বলে ? একটি বৃত্ত অঙ্কন করে বৃত্তাংশ দেখাও।

১২. বৃত্তার্ধ কাকে বলে। দেখাও যে বৃত্তার্ধ একটি বৃত্তাংশ ?

১৩. রেখা কাকে বলে ? একটি সরলরেখা ও বক্ররেখা অঙ্কন কর। উভয়ের সংজ্ঞা দাও।

১৪. জ্যামিতির চিত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত যন্ত্র। জ্যামিতির চিত্র অঙ্কনে যে দুটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা হল কম্পাস ও স্কেল। কম্পাস ব্যবহৃত হয় বৃত্ত অঙ্কনের জন্য এবং স্কেল ব্যবহার করা হয় সরলরেখা অঙ্কনের জন্য।

১৫. কম্পাসের সাহায্যে দুটি বৃত্ত অঙ্কন কর, প্রথমটির ব্যাসার্ধ ৪ সে. মি. এবং দ্বিতীয়টির ব্যাসার্ধ ৬ সে. মি.।

১৬. দুটি অসমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দুটি বৃত্ত অঙ্কন কর এবং দেখাও যে, যে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ বড় সেটি বৃহত্তর বৃত্ত।

১৭. বিভিন্ন ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত অঙ্কন কর এবং বৃত্ত অঙ্কনে কম্পাসের ব্যবহার অভ্যাস কর।

১৮. একটি সরলরেখা সমদ্বিখণ্ডিত করা।. সমদ্বিখণ্ডিত করার অর্থ হল—একটি সরলরেখাকে সমান দুটি অংশে ভাগ করা। যে বিন্দুর দ্বারা সরলরেখাটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে, তাকে বলে মধ্যবিন্দু।

১৯. AB একটি সরলরেখা। AB-কে সমদ্বিখণ্ডিত কর। মধ্যবিন্দুটি C বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত কর। প্রমাণ কর AC=BC।

২০. কিভাবে সরলরেখাটি সমদ্বিখণ্ডিত করবে ? একটি পদ্ধতি হল নির্দিষ্ট সরলরেখাটিকে পরিমাপ করে এবং মোট দৈর্ঘ্যটিকে ২ দ্বারা ভাগ করে। এখন এক প্রান্ত থেকে সরলরেখাটির অর্ধেক পরিমাপ কর।

২১. নিম্নলিখিত দৈর্ঘ্যের সরলরেখা অঙ্কিত করে ঐগুলি সমদ্বিখণ্ডিত কর। যথা, ৮ সে. মি., ২.৫০ সে. মি., ৩.৪০ সে. মি. এবং ৯ সে. মি.।

২২. এইভাবে পরিমাপ করে সরলরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করবার পদ্ধতি সঠিক পদ্ধতি নয়। এতে নানা ধরনের ভুল হতে পারে। পরিমাপের যন্ত্রটি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। ব্যক্তিগত কারণেও ভুল হতে পারে। এই কারণে সঠিক পদ্ধতি হল কম্পাসের সাহায্যে পরিমাপ করা।

২৩. যে কোন ধরনের সরলরেখা অঙ্কিত করে কম্পাসের সাহায্যে সমদ্বিখণ্ডিত কর। প্রক্রিয়াটি পুনঃপুনঃ অভ্যাস কর।

২৪. নিম্নলিখিত অনুশীলনীগুলি অভ্যাস কর।

(ক) একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হলে ভূমি সংলগ্ন বাহুটি সমদ্বিখণ্ডিত কর।

(খ) একটি সমবাহু ত্রিভুজের সমান বাহু দুটি সমদ্বিখণ্ডিত কর। মনে কর, সমান বাহু দুটি E ও F বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে। EF যোগ কর। EF-এর সঙ্গে ভূমি BC-এর সম্পর্ক কি ?

দ্বিতীয় চুক্তিপত্রের নমুনা

বিষয়—ভূগোল

শ্রেণী—দশম শ্রেণী

সময় সীমা—১ মাস

চুক্তি : এই মত চুক্তি করছি যে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রদত্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর.........ছাত্রের স্বাক্ষর.........তারিখ.........

বিষয়সূচী

১. ভারতবাসীর খাদ্য।

বিষয়টি সম্পর্কে জানবার জন্য ছাত্ররা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পুস্তক থেকে বিষয়টি সম্পর্কে জানবে এবং এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি আকর পুস্তকের সাহায্য নেবে।

ছাত্ররা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবে।

ক. ভারতের একখানি ম্যাপ অঙ্কন করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বসাও।

(১) ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও রাজধানী।

(২) মানচিত্রটি ভারতের ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে নানা বিভাগে ভাগ কর।

(৩) আর একখানি মানচিত্রে ভারতের বৃষ্টিপাতের গড় হার চিহ্নিত কর।

(৪) তৃতীয় মানচিত্রে ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য অঞ্চল চিহ্নিত কর।

(৫) বৃষ্টিপাতের হারের সঙ্গে প্রধান খাদ্যশস্যের সম্পর্ক নিয়ে তুলনা করে একটি ছোট রচনা লেখ।

(৬) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :

(ক) ভাত কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য এবং কেন ?

(খ) গম কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ও কেন ?

(গ) ধান্য উৎপাদনে গড় বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের মান কত হওয়া উচিত ?

(ঘ) গম উৎপাদনে ঐ হার কত হবে ?

(ঙ) একখানি লেখচিত্রে ভারতের পূর্ব অঞ্চলের যে কোন স্থানের মাসিক বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের উপাত্ত সংগ্রহ করে লেখ (Graph) অঙ্কন কর। ঐ লেখে দেখাও ধান উৎপাদনের সময় কখন এবং ঐ সময়ে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের হার কিরূপ ? গম উৎপাদনের সময় কখন এবং ঐ সময় বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের হার কিরূপ ?

(চ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গম উৎপাদনে ভারতের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এই মন্তব্যটির টীকা লিখ। এর কারণগুলি নির্দেশ কর।

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা কিভাবে পারে আমাদের খাদ্যাভাব পরিবর্তন করতে ? এই বিষয়ে একটি রচনা লেখ।

(জ) ধর্ম, অভ্যাস ও আর্থিক অবস্থার প্রভাব আমাদের খাদ্যাভাবকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ? খাদ্যাভ্যাসের উপর সরকারী আইন-কানুনের প্রভাব কি ?
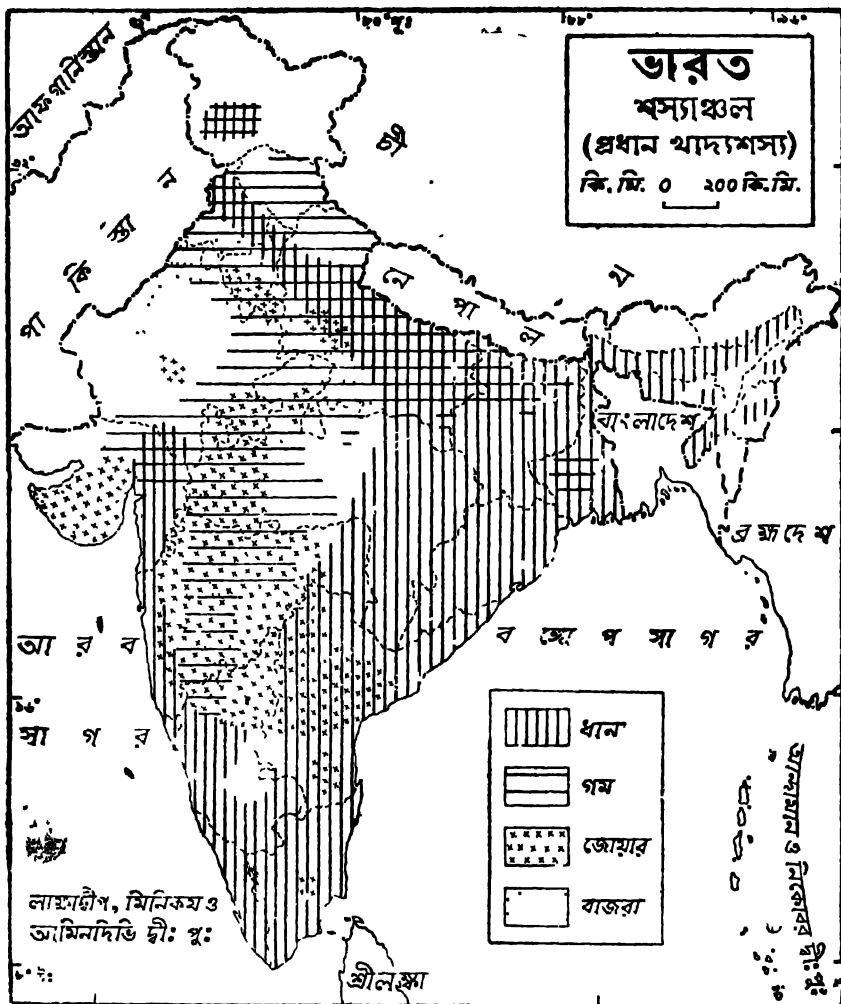
(ঝ) ভারতের পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত কর এবং তাদের খাদ্যমান বিচার কর। কোন অঞ্চলের খাদ্য শরীর রক্ষার পক্ষে বেশি উপযোগী মনে হয় ?

(ঞ) পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে যারা কাজ করে তাদের সংখ্যার হার প্রায় ৭০%। গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা সাধারণত কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। শহরাঞ্চলের লোকদের খাদ্যের সঙ্গে তুলনা কর।

(ট) চাউল থেকে ভাত ছাড়া আরও নানা প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে কোন কোন চাউলজাত খাদ্য বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার করা হয় তা আলোচনা কর।

(ঠ) পশ্চিমবঙ্গে চালের গুড়া থেকে নানা প্রকারের পিঠে তৈরী হয়। ঐগুলির নাম ও কিভাবে প্রস্তুত করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ড) সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা শ্রেণীর ধান জন্মে। কয়েকটি প্রধান শ্রেণীর নাম ও নমুনা সংগ্রহ কর এবং তাদের উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ঢ) মুড়ি, চিড়া, খই, নাড়ু, ইডলি ধোসে কিভাবে প্রস্তুত করা হয়?

(ণ) গম থেকে কি কি খাদ্য তৈরী হয়? সুজি, ময়দা, আটা থেকে কি কি খাদ্য তৈরী হয়?

(ত) ভাত ও রুটির খাদ্যমূল্য তুলনা কর।

ল্যাবরেটরী পরিকল্পনার মূল্যায়ন

মনস্তাত্বিক দিক থেকে ল্যাবরেটরী পরিকল্পনার যতোই মূল্য থাক না কেন, ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে মোটেই এই পদ্ধতি ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় এরূপ সিদ্ধান্ত অনেকে করেছেন। ভারতের বর্তমান শিক্ষার অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দান করা। ল্যাবরেটরী প্লানে বিদ্যালয়ের জন্য চাই বড বাডী, উপযুক্ত ল্যাবরেটরী, দক্ষ বিষয় শিক্ষক, বৃহৎ গ্রন্থাগার। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় তাই এই প্লানের কোনরূপ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

অবশ্য নতুন কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমাদের চাই অ্যাটিচ্যুডের পরিবর্তন। শ্রেণী-শিক্ষা সম্পর্কে আমরা এরূপ অভ্যস্ত যে, এর কোন পরিবর্তন হতে পারে এরূপ বিশ্বাস আমাদের মনে আসে না।

আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার পিছনে রয়েছে তদ্দেশীয় স্বাধীন চিন্তার সুযোগ। দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থায় আমরা দেশের শিক্ষকদের সুযোগ দিতে পারি নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করবার, যে কোন কারণেই হোক আমাদের দেশে সেই সুযোগের অভাব আছে। সুতরাং অন্যদেশের নকলে কোন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা করলে যে সে দেশের মাটিতে স্থায়ী আসন পেতে পারে না, এটি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করতে পারি।

আমরা মনে করি ভারতের পক্ষে যদি কোন কার্যকরী পদ্ধতি বাছাই করতে হয় সেটি হল মহাত্মাজীর বুনিয়াদী পদ্ধতি। আমাদের দেশে এখন বর্তমান প্রয়োজন শিক্ষাকে একটি উৎপাদনমূলক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু মাত্র পুঁথির পাতার মধ্যে শিক্ষাকে যুক্ত করে রাখলে আমাদের কোন মুক্তি নেই। দেশের দারিদ্র্য দূর করবার জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তীয় যোগ্যতা বৃদ্ধি করবার জন্য এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

৫

শিক্ষার উপজাত ফল, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উন্নতির ধারা অনুসরণ

END-PRODUCT OF LEARNING—EVALUATION PRACTICES AND FOLLOW UP FOR IMPROVEMENT

আমরা জানি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়—সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য। ব্যাপক উদ্দেশ্য বলতে সর্বজনীন উদ্দেশ্যকেই বোঝায়। শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং বৃদ্ধি সম্পর্কিত অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সবই এই বিভাগের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে, শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য-গুলি সর্বজনীন নয়। এগুলি বিষয় অনুসারে এবং শিক্ষার্থী যে শ্রেণীতে পাঠরত সেই শ্রেণীর মান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা বা ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। বাংলা শেখার বিশেষ উদ্দেশ্য ইতিহাস শেখার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে কখনই এক হতে পারে না। আবার চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা বা ইতিহাস শেখার উদ্দেশ্যের সঙ্গে দশম শ্রেণীতে বাংলা বা ইতিহাস শেখার উদ্দেশ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। সে যাই হোক না কেন, শিক্ষার এই ব্যাপক ও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণে নানারূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটে। আচরণগত এইসব পরিবর্তনকেই শিক্ষার উপজাত ফল বলে অভিহিত করা যেতে পাবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপজাত ফলের পার্থক্য এই যে প্রথমটি বিশেষভাবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি বর্তমানের ফলশ্রুতির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। আচরণগত পরিবর্তন যা ঘটা উচিত ছিল তা নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবে আচরণগত পরিবর্তন যা ঘটল—সেটাই হচ্ছে শিক্ষার উপজাত ফল।

শিক্ষার উপজাত ফল ও মূল্যায়ন

আমরা দেখেছি, শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানসিক সংগঠনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর এই আচরণ তিন রকমের হতে পারে, জ্ঞানমূলক আচরণ, আবেগ ও অনুভূতিমূলক আচরণ এবং প্রচেষ্টামূলক আচরণ। বলা বাহুল্য, শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে এই ত্রিবিধ আচবণের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়। শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য যথাযথভাবে চরিতার্থ হলে শিক্ষার্থীর দৈহিক. মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, চারিত্রিক, মেজাজগত ও নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে থাকে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামগ্রিক ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ,

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ, অভ্যাস, আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন-দর্শন ও সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হের-ফের ঘটে থাকে। এ সবই হচ্ছে শিক্ষার উপজাত ফল। প্রচলিত পরীক্ষা বা কোন একটিমাত্র অভীক্ষার সাহায্যে এগুলির যথাযথ পরিমাপ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমেই এগুলির গতি-প্রকৃতি, স্বরূপ ও পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষার ফলে শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তায় যে বহুমুখী ও বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে একমাত্র মূল্যায়নের আলোকেই তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। কোন বিশেষ বিষয়-বস্তুর অংশবিশেষের অধীত জ্ঞান বা কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা এবং ক্ষমতার পরিমাপ নির্ণয়ই নয়, শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে বা ব্যক্তিসত্তায় যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে মূল্যায়ন বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতি ও কলাকৌশলের (Techniques of evaluation) মাধ্যমে তারই সম্যক যাচাই ও পরিমাপ করে থাকে।

মূল্যায়নের আবশ্যকতা

বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী ও বিচিত্র আচরণের যে সব ভিন্ন ভিন্ন পবিমাপ পাওয়া যায় সেগুলির সুসংবদ্ধরূপের সাহায্যে মূল্যায়ন আমাদের নিকট শিশুর ব্যক্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করে। বলা বাহুল্য, শিক্ষাদাতার সম্মুখে শিক্ষা-গ্রহীতার ব্যক্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপস্থিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষাদাতার সম্মুখে শিক্ষা-গ্রহীতার ব্যক্তিত্বেব পূর্ণ চিত্র উপস্থিত না থাকলে, শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ, কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের আবশ্যকতা কতখানি। শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন আরও নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গঠনে সহায়তা : মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করে না। লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ মূল্যায়নের বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি মাত্র কাজ। মূল্যায়নের একটি প্রধান কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের যাচাই। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে মূল্যায়ন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে—সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য। একমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমেই এই সাধারণ ও বিশেষ তথা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যগুলির স্পষ্ট ধারণা গঠন সম্ভবপর।

প্রচলিত উদ্দেশ্যগুলির সংস্কার সাধনে সহায়তা : শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটানো। যে সব উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না সেগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন প্রচলিত উদ্দেশ্যগুলির সংস্কার সাধনে সহায়তা করে থাকে।

শিক্ষার নতুন নতুন উদ্দেশ্য গঠনে সহায়তা : আমরা চাই শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তি-সত্তায় বা আচরণে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটুক। এখানে প্রশ্ন এই যে, আমরা শিশুর জ্ঞানমূলক, প্রক্ষোভমূলক বা প্রচেষ্টামূলক আচরণে কি ধরনের পরিবর্তন প্রত্যাশা

করব? এইরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে, আমরা শিশুর মধ্যে যে ধরনের আচরণগত পরিবর্তন প্রত্যাশা করব শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলিকেও ঠিক সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমরা শিশুর মধ্যে কি ধরনের আচরণগত পরিবর্তন প্রত্যাশা করব তা মূল্যায়নের আলোকেই স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূল্যায়ন শিক্ষার নতুন নতুন উদ্দেশ্য গঠনে আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

শিক্ষা-পদ্ধতির সাফল্য ও অসাফল্য নির্ণয়ে সহায়তা: কোন বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটছে কিনা, বা যদি ঘটে থাকে তাহলে কি ধরনের বা কতটা পরিবর্তন ঘটছে তা মূল্যায়নের আলোকেই নিরূপণ করা সম্ভবপর। এর ফলে শিক্ষা-দান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটে। শিক্ষক-শিক্ষিকা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অকার্যকর পদ্ধতি পরিত্যাগ করে উন্নত ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে আগ্রহ বোধ করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূল্যায়ন শিক্ষা-পদ্ধতির সাফল্য-অসাফল্য নির্ণয় করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি নির্বাচনে সহায়তা করে।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কার সাধনে সহায়তা: একমাত্র মূল্যায়নের আলোকেই প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিগুলির দোষত্রুটি বিচার সম্ভবপর। যে সব পদ্ধতি শিশুর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম অথবা যেসব পদ্ধতির প্রয়োগে শিশুর আচরণে কোন প্রকার অবাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখা দেয় মূল্যায়নের মাধ্যমে সেগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন সম্ভবপর।

নতুন নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা: শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই সব পরিবর্তনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মূল্যায়নের আলোকে শিক্ষার নতুন নতুন পদ্ধতি গঠন করা সম্ভবপর।

রচনা-ধর্মী পরীক্ষার দোষ-ত্রুটি দূরীকরণে সহায়তা: গতানুগতিক রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিশুর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। কারণ, এই ধরনের পরীক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষার্থীর একই প্রশ্নের সমাধানে পার্থক্য তো থাকেই, এমন কি একই শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে কৃত সমাধানের মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য থাকে। একটু ভিন্নভাবে বলতে গেলে রচনাধর্মী পরীক্ষায় যথার্থতা নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, তুলনীয়তা ইত্যাদি প্রায় থাকে না বললেই চলে। ফলে, শিক্ষকের প্রশ্ন ও শিশুর উত্তরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষক যা জানতে চান শিশু হয়ত তার উত্তরই দিতে পারে না। আবার শিশু যা উত্তর দেয় শিক্ষক হয়ত তা জানতেই চান নি। কাজেই লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ বিচার হয় না। মূল্যায়ন এই পার্থক্য দূর করে রচনাধর্মী পরীক্ষাকে যথাসম্ভব দোষত্রুটি মুক্ত রাখতে চেষ্টা করে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সংগঠনে সহায়তা: পূর্বে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক, বর্তমানে আমরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা প্রায়ই বলে থাকি। বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গী, সৃজনক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ ইত্যাদির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মূল্যায়নের একটি বড় কাজ হল বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত পার্থক্য ও স্বতন্ত্র চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে শিক্ষার আয়োজন করা। বিভিন্ন

শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য বিদ্যমান একমাত্র মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমেই তা সুস্পষ্টভাবে পরিমাপ করা সম্ভবপর। এই ব্যক্তিগত পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে কি ধরনের শিক্ষা, কাজ বা পরিবেশ শিশুর পক্ষে উপযোগী হবে তা নির্ধারণ করা যায় না। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সংগঠনে মূল্যায়নের তাৎপর্য কতখানি।

শিক্ষামূলক পরিচালনায় সহায়তা: আজকাল শিক্ষামূলক পরিচালনার কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। মুদালিয়র কমিশন, কোঠারি কমিশন এই শিক্ষামূলক পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। মূল্যায়ন শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল পরিমাপই করে না, উপরন্তু উন্নত প্রণালীর শিক্ষামূলক পথনির্দেশও দান করে থাকে। আমরা শিশুর জন্য সুপরিকল্পিত ও সর্বোত্তম শিক্ষার কথাই ভেবে থাকি। শিশুর মৌলিক শক্তি, তার সামর্থ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখেই তার উপর শিক্ষার বোঝা চাপানো দরকার। তার ব্যক্তিগত রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। শিশুর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটা রয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিবেশের পটভূমিকায় তা কতদূর কার্যকরী হতে পারে তাও ভেবে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষার পথে এগিয়ে চলার সময় যাতে শিশুর শক্তি-সামর্থ্যের কোন অপচয় না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। এ সবই শিক্ষামূলক সুপরিচালনার অন্তর্ভুক্ত। যোগ্য পরিচালক উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক পরিমাপ করে এ কাজগুলি সুচারুপে সম্পন্ন কবতে পারেন। মূল্যায়নকে বাদ দিয়ে এর কোনটিই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়।

বৃত্তিমূলক পরিচালনায় সহায়তা: কৈশোরে ছেলেমেয়েদের মনে স্বভাবতঃই আত্মনির্ভরতার চাহিদা দেখা দেয়। একে বৃত্তির চাহিদাও বলা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাব্য আলেখ্য অঙ্কনের কাজটি এই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায়। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বৃত্তির অর্থকরী ও সামাজিক মূল্য সম্পর্কে এই সময় থেকেই ছেলেমেয়েরা আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে ও খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন রকমের বুদ্ধিবৃত্তি, আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য, দক্ষতা ও চারিত্রিক সংলক্ষণের আবশ্যকতা আছে। বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এগুলির যথাযথ পরিমাপ করে মূল্যায়ন কোন্ বৃত্তিটি ছেলেমেয়েদের পক্ষে সব চাইতে বেশী উপযোগী হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দান করে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সুস্থতা, সফলতা ও সার্থকতা এই বৃত্তিমূলক পরামর্শদানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অভিযোজনমূলক পরিচালনায় সহায়তা: মূল্যায়নের আর একটি বড় কাজ হল অভিযোজনমূলক পরামর্শ দান করা। গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ—এই তিনের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকলে অনেক সময়ই শিশুদের মধ্যে নানা রকম আচরণ-ঘটিত সমস্যা দেখা দেয়। পারিবেশিক প্রতিকূলতা তীব্র হয়ে উঠলে শিশুরা অনেক সময়ই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। এ ছাড়া শিক্ষায়

অনগ্রসর শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু বা অস্বভাবী শিশুদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় নানা কারণে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না। বিপর্যস্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে বা অবাঞ্ছিত শিশুদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। এদের সকলের মধ্যেই মানসিক বা প্রাক্ষোভিক ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়। অভিযোজনমূলক সুপরিচালনার লক্ষ্য হল ছেলেমেয়েদের এই মানসিক ও প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। মূল্যায়নের মাধ্যমেই এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ এবং দেশ, কাল ও পরিস্থিতির পটভূমিকায় ঐ পরিমাপের সম্যক পর্যালোচনা ও যাচাই অভিযোজনমূলক পরামর্শদানের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, একমাত্র মূল্যায়নের আলোকেই এই ধরনের পর্যালোচনা ও যাচাই সম্ভবপর। এখানেই মূল্যায়নের সার্থকতা।

প্রচলিত পাঠক্রমের দোষ-ত্রুটি নির্ণয়ে সহায়তা: প্রচলিত পাঠক্রমের দোষ-ত্রুটি নির্ণয়ের দিক দিয়ে আমরা মূল্যায়নের অবদানকে কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ বিষয় বা অভিজ্ঞতাগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল নয় তা মূল্যায়নের আলোকেই আমরা বুঝতে পারি। মূল্যায়নই বলে দেয়, পাঠ-ক্রমের অন্তর্গত কোন্ কোন বিষয়গুলি অতঃপর আর আমাদের আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না। শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী—সকলের পক্ষেই এটি জানা দরকার। কারণ, যে পাঠক্রম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক বা আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম নয়, সে পাঠক্রম কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রচলিত পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষাগত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য আদৌ রয়েছে কিনা বা থাকলে কতখানি রয়েছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি। শুধু কি তাই? বিভিন্ন পাঠক্রমের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কেও মূল্যায়ন আমাদের অবহিত করে। মূল্যায়নই জানিয়ে দেয়, কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের গুরুত্ব প্রচলিত বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের চাইতে অনেক বেশি। বিভিন্ন পাঠক্রমের তুলনামূলক অধ্যয়ন মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

প্রচলিত পাঠক্রমের উন্নতি ও সংস্কার সাধনে সহায়তা: মূল্যায়নের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ বিষয় বা অভিজ্ঞতাগুলি বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে অর্থাৎ আমাদের আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে পাঠক্রমের সংস্কার সাধন মূল্যায়নের একটি বড় কাজ। ক্ষেত্রবিশেষে পাঠক্রমের স্তরবিন্যাসেও পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। এখানেও মূল্যায়ন আমাদের বড় সহায়ক।

নতুন পাঠক্রম নির্মাণে সহায়তা: যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চাহিদার তারতম্য ঘটে। সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও জীবনচর্যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এই সব পরি-বর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পাঠক্রম রচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে

সমাজ-সংস্কার, সমাজ-পরিবর্তন বা সমাজ-বিপ্লবের সব চাইতে বড় হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা তথা সুপরিকল্পিত পাঠক্রম। বলা বাহুল্য, মূল্যায়নের মাধ্যমেই এই জাতীয় অভীষ্ট সাধক পাঠক্রম রচনা সম্ভবপর। স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম প্রচলিত ছিল তা কোন দিক দিয়েই বর্তমানে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ঐ পাঠক্রম যত তাৎপর্যপূর্ণই হয়ে থাকুক না কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় তা মূলতঃই অর্থহীন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জোট নিরপেক্ষতা, সমন্বয়মূলক জীবন-চর্যা এবং বিশ্বমৈত্রীই বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনাদর্শ। এই আদর্শের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে আমাদের পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। মূল্যায়নের মাধ্যমেই এ কাজ সম্ভবপর। শিক্ষার উপজাত ফল পূর্বে কি ছিল, বর্তমানে কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত তা মূল্যায়নের আলোকেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে।

শিশুর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূরীকরণে সহায়তা: শিশুর আচরণ-ঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে মূল্যায়ন নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন। শিশুর আচরণে কোন অবাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখা দিলে, ঐ অবাঞ্ছিত আচরণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে কিভাবে তা দূর করা যেতে পারে মূল্যায়ন সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়। কোন বিশেষ বিষয়ে অথবা কোন বিশেষ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ অংশে শিক্ষার্থীর কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে, মূল্যায়নের আলোকে ঐ দুর্বলতা দূরীকরণের কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের সঠিক পরিচালনার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।

মূল্যায়নের আবশ্যকতা, চাহিদা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এখন আমরা দেখব মূল্যায়নের প্রকৃতি ও স্বরূপ বলতে কি বোঝায় এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কী।

মূল্যায়নের প্রকৃতি ও স্বরূপ

শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়ন বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষা-প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। আমরা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা জানি। প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়িক—প্রতিটি স্তরেই মূল্যায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই আমরা এইসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হই। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা বা আবশ্যকতা সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি। ঐ আলোচনায়

/-মধ্য দিয়ে মূল্যায়নের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়। এখানে আমরা আরও দু'-চারটি কথা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করব।

মূল্যায়ন এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া

কোঠারি কমিশন মূল্যায়নকে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। শিশুর বিকাশ বা বৃদ্ধির যথাযথ পরিমাপই হচ্ছে মূল্যায়ন। এই বিকাশ বা বৃদ্ধি কখনই থেমে থেমে হয় না; এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূল্যায়নও অনিবার্যভাবেই একটি ধারাবাহিক বা অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

মূল্যায়ন সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

কোঠারি কমিশন মূল্যায়নকে কেবল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, এটিকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেও অভিহিত করেছেন। কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য, মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রক্রিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম, সহ পাঠক্রম, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা, পরীক্ষা ও পরিমাপ, শিক্ষা-পরিকল্পনা, শিক্ষা-প্রশাসন, শিক্ষা-পরিদর্শন, বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক নির্দেশনা ইত্যাদি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা (System of education) ও শিক্ষা-প্রক্রিয়ার (Process of education) বিভিন্ন রূপ-প্রকল্প। প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক এগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে মূল্যায়নের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মূল্যায়নকে বাদ দিয়ে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার কথা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

মূল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

কোঠারি কমিশন মূল্যায়নকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে অভিহিত করেছেন। আমরা পূর্বেই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছি। প্রাক্-প্রাথমিক স্তর, প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, কলেজীয় স্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়িক স্তর। প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির কতটা বাস্তবে রূপায়িত হল, কিভাবে হল, কতটুকুই বা রূপায়িত হতে পারল না, কেন পারল না, কি করলে উদ্দেশ্যের সবটুকুই বাস্তবে রূপায়িত করা যেত—একমাত্র মূল্যায়নের আলোকেই আমরা এ সব তথ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে পারি।

মূল্যায়ন শিশুর সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

এখানে 'সামগ্রিক বিকাশ' কথাটির অর্থ একটু বিশেষভাবে বুঝে নিতে হবে। সামগ্রিক বিকাশ বলতে শিশুর জীবন-বিকাশের সমস্ত স্তরগুলিকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক বিকাশ ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণে, ঠিক পথ ধরে হচ্ছে কি না তা মূল্যায়নের আলোকেই আমরা বুঝতে পারি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ ও সৃজন-ক্ষমতার সম্যক ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার হচ্ছে কিনা; —তার দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব ও জীবন-দর্শন যথাসময়ে যথাযথভাবে গড়ে উঠছে কি না,

এসব মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই জানতে পারা যায়। কেবলমাত্র শারীরিক বা কেবলমাত্র মানসিক বিকাশের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের খুঁটিনাটি যাচাই।

মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক পরিমাপ

আংশিক বা খণ্ডিত পরিমাপ নয়, মূল্যায়ন হচ্ছে শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক বিকাশের খণ্ড খণ্ড পরিমাপগুলির এক বৃহদায়তন ও ব্যঞ্জনাময় সমষ্টি (Total measurement of the whole child)। সত্যি কথা বলতে কি, শিশুর বহুমুখী জীবন-বিকাশের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাপগুলির কথা এইমাত্র বলা হল এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে তার কোনটিই তেমন তাৎপর্যপূর্ণ বা অর্থদ্যোতক নয়। কারণ, পৃথক পৃথকভাবে এগুলির কোন একটি বা দুটি কখনই শিশুর সামগ্রিক পরিচয় প্রদান করতে পারে না। শিশুর জীবন-বিকাশের লীলা-বৈচিত্র্যের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তার সামগ্রিক পরিমাপের মধ্য দিয়ে। মূল্যায়ন হচ্ছে এই সামগ্রিক পরিমাপ।

মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি পরিবর্তনশীল

মূল্যায়নের ক্রিয়া-কৌশল বা পদ্ধতিগুলি কোন স্থানু নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এগুলি পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মূল্যায়ন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। স্থানভেদে, কালভেদে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিভেদে এবং শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির হেব-ফের ঘটে। বৈদিক যুগে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল মধ্য যুগে তা ছিল না। আবাব মধ্য যুগে শিক্ষার যে আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচলিত ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা আমরা প্রায় দেখতে পাচ্ছি না। শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষাদর্শ গ্রীষ্মপ্রধান সমতল অঞ্চলের শিক্ষাদর্শ থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে ধনতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গৃহীত শিক্ষার লক্ষ্য সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যেব সঙ্গে কখনই এক হতে পারে না। স্তবভেদে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিও ভিন্ন ভিন্ন। স্থান, কাল, সামাজিক অবস্থা ও জীবন-বিকাশের স্তরভেদে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি পরিবর্তনশীল বলেই এগুলির মূল্যায়নের পদ্ধতিও অনিবার্যভাবেই পরিবর্তনশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে শিশুর আচরণগত বাঞ্ছিত পরিবর্তনকেই বোঝায়। সর্বযুগে সর্বাবস্থায় এগুলি কখনই এক থাকে না। এক এক যুগে এক এক সমাজ ব্যবস্থায় এক এক ধরনের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য প্রত্যাশা থাকে। মূল্যায়নের কাজ হচ্ছে উপযুক্ত পদ্ধতি বা ক্রিয়া-কৌশলের মাধ্যমে এই সব আচরণগত পরিবর্তনের বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই। কোন একটিমাত্র ধরাবাঁধা পদ্ধতির মাধ্যমে এ কাজ কখনই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। এর জন্য আবশ্যক বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন ও পরিবর্তনশীল মূল্যায়ন-পদ্ধতির।

মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি ব্যক্তিগত, যৌথ নয়

প্রায় সব ক্ষেত্রেই মূল্যায়নের পদ্ধতি বা ক্রিয়া কৌশলগুলি প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর উপর স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপ করা হয়। সন্দেহ নেই, এটি প্রচুর সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এতে মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত সযত্ন মনোযোগ ও প্রয়োগকুশলতার উপর চাপ পড়ে বেশি ঠিকই তবে নির্ভরশীলতা ও ফলাফলের মূল্যমানের দিক দিয়ে কাজটি হয় বহুলাংশে নিখুঁত। মূল্যায়নের জন্য নানারকম পদ্ধতি ও ক্রিয়া-কৌশল রয়েছে। এগুলি প্রয়োগের সময় শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতি-সাধন করছে তার উপরও মূল্যায়নের সাফল্য বেশ কিছুটা নির্ভর করে। যৌথ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিশুর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অবহেলা করা হয়। মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি ব্যক্তিগত। এগুলি প্রয়োগের সময় মূল্যায়নকারী শিশুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকেন বলে তাঁর পক্ষে তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলির সুবিচার করা সম্ভব হয়। প্রকৃত মূল্যায়নকারী শিশুর জীবন-বিকাশের সামগ্রিক পরিমাপের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, কাজেই তিনি শিশুর এই সব মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে কখনই তাৎপর্যহীন বলে মনে করতে পারেন না।

মূল্যায়ন একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া

শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ ফলাফলের পরিমাপ—এগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গেই মূল্যায়নের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মূল্যায়ন হচ্ছে একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। নীচে এই ত্রিমুখী প্রক্রিয়ার একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল—
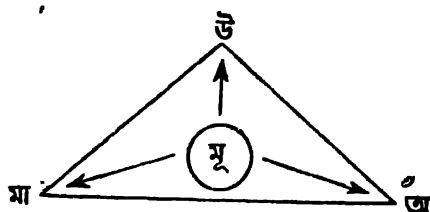
উ=শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই

অ=শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিচার বিশ্লেষণ ও যাচাই।

মা=শিক্ষালব্ধ ফলাফলগুলির পরিমাপের বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই।

মূ=মূল্যায়ন।

প্রথম প্রক্রিয়া: [শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই]: শিক্ষার ফলে শিশুর আচরণে যে সব পরিবর্তন ঘটা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলিই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে। যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অথবা সাধারণ ও বিশেষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় দর্শনের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে মূল্যায়নের কিছুই বলার নেই। মূল্যায়নের কাজ হচ্ছে স্থিরীকৃত উদ্দেশ্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ

উদ্দেশ্যগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা মূল্যায়নের একটি বড় কাজ। দর্শনের দ্বারা স্থিরীকৃত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মূল্যায়নই আমাদের বলে দেয়। মূল্যায়নের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কি ধরনের বা কতটা দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা রয়েছে এবং কেমন করেই বা তা দূর করা যায়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া [শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই]: শিক্ষার বিষয়-বস্তুকে কখনই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করা যায় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কার্যাবলীকেও অভিজ্ঞতা বলে না। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক নিশ্চেষ্ট বক্তৃতা শ্রবণও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা নয়। শিশু শিক্ষালাভ করে স্বতস্ফূর্ত চিন্তন, আত্ম-সক্রিয়তা, আত্মপ্রচেষ্টা ও আত্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে। পাঠক্রম বহির্ভূত বা পাঠক্রমভিত্তিক যে সব সক্রিয় চিন্তা, মননশীলতা ও কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবার সুযোগ পায় সেগুলিকেই বলা যায় শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। শিশুর মানস-সংগঠনের দিক দিয়ে এই অভিজ্ঞতা তিন প্রকারের হতে পারে—জ্ঞানমূলক (Cognitive), আবেগানুভূতিমূলক (Affective) ও প্রচেষ্টামূলক (Conative)। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি স্থিরীকৃত বা আয়োজিত হয় মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের দ্বারা। এক্ষেত্রে মূল্যায়নের কিছুই বলার নেই। মূল্যায়নের কাজ হচ্ছে স্থিরীকৃত বা আয়োজিত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার জ্ঞানমূলক, আবেগানুভূতিমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অভিজ্ঞতাগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা মূল্যায়নের একটি বড় কাজ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মূল্যায়নই আমাদের বলে দেয়। স্থিরীকৃত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর বয়সের উপযোগী কিনা, শিক্ষার গৃহীত উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার দিক দিয়ে ঐগুলি যথেষ্ট কিনা, যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে কিভাবে ঐগুলিকে গ্রহণযোগ্য করা যেতে পারে—এসব মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। এক কথায় বলতে গেলে, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলির বিজ্ঞান-সম্মত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পুনর্বিন্যাস একমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

তৃতীয় প্রক্রিয়া [শিক্ষালব্ধ ফলাফলগুলির মাপ-জোখের বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই]: আমরা জানি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করে। এই শিক্ষালাভের ফলে বাস্তবক্ষেত্রে তার আচরণে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলিকেই বলা হয় শিক্ষালব্ধ ফলাফল (Outcomes of instruction)। এই আচরণগত পরিবর্তন-গুলিকে শিক্ষার উপজাত ফল (End product of learning) বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ক্রিয়া-কৌশলের মাধ্যমে এই সব শিক্ষা-লব্ধ ফলাফলের মাপ-জোখ করে অতঃপর এগুলিকে পরিসংখ্যানের ভাষায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকাশ করা হয়। পরিমাপ-বিজ্ঞান ও রাশি-বিজ্ঞানের (Measurement and statis-

tics) সাহায্যেই এ কাজ সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে মূল্যায়নের কিছুই বলার নেই। মূল্যায়নের কাজ হল পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশিত এইসব শিক্ষালব্ধ ফলাফলগুলির মাপ-জোখের সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালব্ধ ফলাফল এবং ঐ ফলাফলের মাপ-জোক কতটা কার্যকর তা নির্ণয় করা মূল্যায়নের একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। পরিমাপ-বিজ্ঞান ও রাশি-বিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত শিক্ষালব্ধ ফলাফলগুলির মাপ-জোখ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য-পূর্ণ তা মূল্যায়নই আমাদের বলে দেয়। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের সামগ্রিক পরিমাপের দিক দিয়ে শিক্ষালব্ধ ফলাফলগুলির মাপ-জোখ ত্রুটিহীন কিনা, যদি ত্রুটিহীন না হয় তাহলে কিভাবে এগুলিকে ত্রুটিমুক্ত করা যেতে পাবে, লক্ষ্যের দিক দিয়ে এগুলি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থদ্যোতক এবং কতটাই বা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী তা মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি। মাপ-জোখের পুরাতন পদ্ধতিগুলিব সংস্কার এবং প্রয়োজনস্থলে নতুন নতুন পদ্ধতিব উদ্ভাবন একমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্ভবপর।

মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা দিক দিয়ে নানাভাবে উন্নততর করে তুলতে সাহায্য করে

মূল্যায়ন যে কেবল শিশুর আচবণকেই সম্যকভাবে নির্ণয় কবে, তা নয়। কুইলেন ও হান্নার মতে মূল্যায়ন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে নানা দিক দিযে নানাভাবে উন্নততব কবে গডে তুলতে সাহায্য কবে। শিক্ষাব সাধারণ ও বিশেষ লক্ষ্য, শিক্ষার আচরণমূলক উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রম, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা, বিদ্যালয-পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, পবীক্ষা ও পবিমাপ—এ সব কিছুকেই মূল্যাযন আপন নিরীক্ষাব আলোকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও পরিমার্জিত করে তুলতে সাহায্য করে।

মূল্যায়ন শিক্ষাকে তৃপ্তিদায়ক করে তোলে

মূল্যায়নের একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা শিক্ষাকে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক এই তিনের কাছেই তৃপ্তিদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করে। গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির আওতায় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ একটি নীরস, প্রাণহীন, যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। শিশু এব মধ্যে কোনই আনন্দেব সন্ধান পায় না, শিক্ষক এতে তৃপ্তি লাভ কবেন না এবং অভিভাবকবাও এর মধ্য থেকে ভবিষ্যতেব জন্য কোন বৃহৎ ব্যঞ্জনাব ইঙ্গিত লাভ কবতে সক্ষম হন না। পক্ষান্তবে, মূল্যাযন শিশুব চোখেব সামনে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বেব চিত্রটিকে তুলে ধবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখিয়ে দেয় চলার পথে সে কতদূব এগিযেছে এবং তাব অভীষ্ট লক্ষ্যই বা কতদূর। নিজের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে প্রত্যক্ষ কবে শিশু ঐগুলিকে দূব করবাব জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বাস্তব চিত্র অভিভাবকদেব নিজ নিজ শিশু সম্পর্কে অহেতুক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ থেকে বিবত বাখে। ফলে, শিশুর মনের উপর অযৌক্তিক চাপ পডে না অর্থাৎ সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা তাকে বইতে হয় না। অস্বাস্থ্যকর বহির্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর আত্ম-

প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবার অবকাশ পায়। এতে তার মনের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ দুই-ই হয়ে ওঠে পরম আনন্দদায়ক।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

শিশুর জীবন-বিকাশের সামগ্রিক পরিমাপ, পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে ঐ পরিমাপ লব্ধ ফলের নির্ভুল উপস্থাপন, প্রাপ্ত ফলাফলের সংব্যাখ্যান ও বিচার এবং তারই ভিত্তিতে শিশুকে কার্যকরী পথনির্দেশ দান—এক কথায় বলতে গেলে এই-ই হচ্ছে মূল্যায়নের আসল উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি এক? উত্তরে এ কথাই বলা যায়, শিক্ষা ও মূল্যায়ন উভয়ের উদ্দেশ্য ঠিক এক না হলেও এই দুয়ের মধ্যে মূলত কোনই বিরোধ নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন, আর ঐ বিকাশের গতিপ্রকৃতি জানাই হচ্ছে মূল্যায়নের কাজ। বস্তুত, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিগূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কিত। শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক চান শিশুর আচরণে বাঞ্ছিত ও ও সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে, পক্ষান্তরে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে মূল্যায়নকারী চান ঐ সব বাঞ্ছিত ও সমর্থনযোগ্য পরিবর্তনের গুণগত মান ও পরিমাণগত পরিমাপ নির্ণয় করতে।

মূল্যায়নের সংজ্ঞা

ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের যথাযথ পরিমাপ, ঐ পরিমাপ-লব্ধ ফলের সম্যক বিশ্লেষণ এবং তারই ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশ তাই হচ্ছে মূল্যায়ন। শিশুর ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তনের সামগ্রিক পরিমাপ ও তার বিচার-বিশ্লেষণকেই মূল্যায়ন বলে অভিহিত করা যায়। ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তন বলতে এখানে শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক, প্রাক্ষোভিক ও মেজাজগত আচরণমূলক পরিবর্তনকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে। অগ্রগতির সহায়ক বিভিন্ন পরিমাপপদ্ধতি ও অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা ও জীবন-বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াকেই মূল্যায়ন বলে।

আমরা মূল্যায়নের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য শিক্ষককে অনুসরণ করতে হবে, পাঠক্রমে প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি। প্রকৃত পক্ষে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর বিকাশ ধারা কোন্ দিকে অগ্রসর হবে সেটি স্থির করবার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা অব্জেকটিভ্ স্থির করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পাঠক্রম সংক্রান্ত উদ্দেশ্য স্থির করবার জন্য সাধারণত তিন প্রকারের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা—(ক) পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ পদ্ধতি, (খ) কনফারেন্স বা সম্মেলন পদ্ধতি ও (গ) প্রশ্ন-তালিকা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি।

উপরের তিনটি বিষয় নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

(ক) পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমের সাধারণ

উদ্দেশ্যকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। এই ক্ষুদ্র অংশগুলি এরূপ হবে যে, এগুলি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ধারণা হতে পারে এবং শিক্ষকদের পক্ষে ঐ উদ্দেশ্যে পৌছানো ও পরিমাপ উভয়ই সহজ হতে পাবে। স্মিথ (Dora V. Smith) ও রাইটস্টোন (T. Wayne Wright Stone) এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। স্মিথ (১৯৪৪) আধুনিক কালেব মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরীক্ষা কবে ৯টি প্রধান উদ্দেশ্য তালিকাভুক্ত করেছেন। ঐগুলি হল—প্রাথমিক দক্ষতা বা নিপুণতা (Basic skills) সম্পর্কে শিক্ষালাভ, সঠিকভাবে চিন্তা করবার শক্তির উন্নয়ন, কোন কাজ বা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহেব বিকাশ, কোন কাজ বা বিষয় সম্পর্কে নিজ নিজ কাজ করবার উদ্যম সৃষ্টি, সৃজন ক্ষমতার (Creative power) বিকাশ, উপলব্ধি করবার ক্ষমতার উন্নতি, সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি, লব্ধ জ্ঞানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানেব ক্ষেত্রে প্রযোগ, মনোভাবের সততা ও সম্ভাবনার বিকাশ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে বৃত্তীয় দক্ষতাব উন্নতি।

রাইট স্টোন (১৯৩৬) সামাজিক শিক্ষা (Social education) সম্পর্কে যে উদ্দেশ্য স্থির করেছেন, তা হল—ক্রিয়া বিষয়ক জ্ঞান লাভ (Functional information) বিষয় বা তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সামগ্রীকরণের ক্ষমতা (Generalization) গঠন ও উপলব্ধির ক্ষমতার বিকাশ, কোন তথ্য সঠিকভাবে সাজানোর ক্ষমতা, এবং সামাজিক মনোভাবের বিকাশ।

(খ) **কনফারেন্স বা সম্মেলন পদ্ধতি**ঃ এই পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা ও সম্মেলনের মারফত পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যগুলি তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হব। সাধারণত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক শিক্ষাবিদদের নিয়ে সম্মেলন ডাকা হয় এবং আলোচনার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়। রথ (Rath, Louis, E 1936), এইভাবে পাঠ্যক্রমেব ৮টি উদ্দেশ্য স্থির করেছেন। ঐগুলি হল ঃ

১ **চিন্তন** (Thinking) ঃ সামান্যীকরণের ক্ষমতা, কোন বিষয় বিশ্লেষণেব ক্ষমতা, বিজ্ঞান বা গণিতের কোন সূত্র নতুন বিষয়ে প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

২. **আগ্রহ, লক্ষ্য ও উপলব্ধি** (Interests, aims and appreciations) ঃ ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দ, কোন বিষয়েব মূল্য সঠিকভাবে উপলব্ধি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **মনোভাব** (Attitudes) ঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয় ও বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে মতামত ও বিশ্বাস।

৪ **পঠন ক্ষমতা ও কর্মের অভ্যাস** (Study skills and work habits) ঃ পড়বার নির্দিষ্ট সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তথ্যগুলি কাজে লাগানো।

৫ **সামাজিক উপযোজন** (Social adjustment) ঃ অন্যদের সঙ্গে মিলে-

মিলে কাজ করবার ক্ষমতা, অন্যদের সম্পর্কে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা, ঝগড়াঝাটির মনোভাব পরিহার ইত্যাদি।

৬. **সৃজনী দক্ষতা** (Creativeness): রচনা, অঙ্কন, শিল্পের মাধ্যমে মৌলিক সৃষ্টির সাহায্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ।

৭ **কাজে ব্যবহারের যোগ্য তথ্য সংগ্রহ** (Functional information): মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত নানা বিষয়ের (Concepts) জ্ঞান, নতুন বিষয় সঠিকভাবে উপলব্ধি, নতুন কৌশল আয়ত্ত করা।

৮. **সমাজ পরিবেশে বাসের উপযোগী গতিশীল সমাজদর্শন** (Functional social philosophy): ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত বুদ্ধিযুক্ত ও সহযোগিতামূলক সামাজিক মনোভাব এই পর্যায়ে পড়ে।

(গ) প্রশ্নতালিকা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ও কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রিত প্রশ্নতালিকা পাঠানো এবং লব্ধ উত্তর থেকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়। এইভাবে উদ্দেশ্য ঠিক করে মূল্যায়নের পদ্ধতি ঠিক করা হয়।

পূর্ব পৃষ্ঠায় আমরা মোটামুটিভাবে কিভাবে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়, সেই সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে এই উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবিত করে এবং আচরণে পরিবর্তন আনে।

আচরণ বলতে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী নতুন কি বিষয় শিখেছে, নতুন কি জ্ঞান লাভ করেছে, এবং তার চিন্তাধারায় কি পরিবর্তন এসেছে? শিক্ষার্থীর রুচি ও মেজাজের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে? এইগুলি অবশ্যই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং একটি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বা কৌশল শিক্ষার্থীর আচরণের, অভিজ্ঞতার, কর্মকুশলতার ও মনোভাবের যে পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে তার সঠিক পরিমাপের ব্যবস্থা করবে।

মূল্যায়নের উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাই করবার পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আর একটু আলোচনা করা দরকার।

আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞান দান নয়, শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশন (Guidance) দান করা। এই নির্দেশনের উদ্দেশ্য হবে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু শেখানো ছাড়া, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব, উপলব্ধি ক্ষমতা এবং প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক উপযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষকের কাজ হল সমগ্র শিশুকে নিয়ে, শিশুর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশই তার কাম্য। শিশুর আংশিক বিকাশ অর্থাৎ কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক বা জ্ঞান বিষয়ক বৃদ্ধি ঘটানো উদ্দেশ্য নয়।

আধুনিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের এটিই হল উৎকর্ষের নির্দেশক

মূল্যায়নের কাজ হল শিশুর সামগ্রিক বিকাশের একটি ছবি তৈরি করা। সুতরাং শিশুর সামগ্রিক আচরণ অর্থাৎ বৌদ্ধিক, শারীরিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক আচরণের

সম্পূর্ণ চিত্র মূল্যায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার কাজও হল শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। বিদ্যালয়ে শিশুকে যে বিষয়টিই শেখানো হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তারও উদ্দেশ্য ব্যক্তির সামগ্রিক পুষ্টি ঘটানো। আমরা এটা কখনই আশা করি না যে, খাদ্যের দ্বারা তার কোন অঙ্গের আংশিক পুষ্টি ঘটবে। বিদ্যালয়ে শিশু যখন গণিত অথবা বিজ্ঞান অথবা ইতিহাস শিক্ষা করে সে নির্দিষ্ট বিষয়টির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত মনোভাব গঠন, উপযুক্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক উপযোজনের ক্ষমতা লাভ করে থাকে। এই পরিবর্তন যে সব সময়ে সরাসরি হচ্ছে তা নয়, এটি ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে। যদি শিশুর পাঠ্যবিষয়টি শক্ত হয় অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু শিশুর বুঝবার শক্তির বাইরে হয় অথবা তাকে এমন বিষয় শেখানো হয় যা অত্যধিক সহজ এবং তার মনে কোন আনন্দ দেয় না। তা হলে পাঠ্য বিষয়টি তার মনে বিরক্তি বা এক-ঘেয়েমি সৃষ্টি করে বা তার মনে হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

সুতরাং শিক্ষকমহাশয় যখন কোন বিষয় শেখাবেন তাকে অবশ্যই এই কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি শুধু বিষয়বস্তুর জ্ঞানই দিচ্ছেন না, তার মধ্যে একটি সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছেন। সুতরাং তিনি যখন জ্যামিতির ত্রিভুজের সর্বসমতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন অথবা রসায়ন শাস্ত্রের কোন বিশেষ লবণের (Salt) রাসায়নিক প্রতীক (Chemical symbol) সম্পর্কে বলছেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি শিক্ষার্থীর আচরণে ও মনোভাবে নানা পরিবর্তন আনছেন। প্রত্যেকটি শিখন কার্যক্রম (Learning situations) একাধিক বিষয়ের শিক্ষা দিচ্ছে। শিশুকে যেমন বিষয়টি শেখাচ্ছে তেমনি তার ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। প্রত্যেক বিষয় বা কৌশল শিক্ষা-দানের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছেন। সুতরাং পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটানো, এটি যদি আমরা মেনে নি, তাহলে অবশ্য আমাদের মানতে হবে শিশুর আচরণের পরিবর্তনও শুধুমাত্র একটি কৌশলের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমাদের নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সাধারণ পরীক্ষা বা অভীক্ষা থেকে পৃথক। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল লব্ধ শিক্ষার মান পরিমাপ করা। কিন্তু মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল আরও ব্যাপক এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপের সঙ্গে যুক্ত। এই দিক থেকে বিচার করলে মূল্যায়নের সঙ্গে শিক্ষার সর্বস্তর অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষালাভ ও পরীক্ষা-গ্রহণ এই তিনটি স্তরের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। মূল্যায়ন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর লব্ধজ্ঞানের পরিমাপ করে না, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি করা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা। প্রকৃত পক্ষে মূল্যায়ন সেই সকল বিষয়ের বিচার করে যেগুলি শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি, বিকাশ, মনোভাব, অভ্যাস, গঠনমূলক ক্ষমতা ও উপলব্ধি ক্ষমতার

সঙ্গে যুক্ত। অবশ্য এর সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানলাভকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে আলোচনা করতে হলে উপরোক্ত তিনটি বিষয়েরও বিবেচনা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন

শিক্ষার উদ্দেশ্যের মূল বিষয় হল শিক্ষার্থীর আচরণে বা চিন্তায় আশানুরূপ পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। অর্থাৎ শেখানো যদি সঠিক হয়, তবে কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন লক্ষিত হবে। শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীর এমন সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়, যেগুলি সম্পর্কে পূর্বে তার কোনরূপ ধারণা ছিল না। সে এমন সব সমস্যার সমাধানে পারদর্শী হবে যেগুলি পূর্বে তার দ্বারা সমাধানের সম্ভাবনা ছিল না। ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্তন আনয়ন করা।

একটি উদাহরণ : বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করা যায়। শিক্ষক **সমাজবিদ্যার** (Social studies) একটি বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এরূপ উদ্দেশ্য স্থির করলেন যে, এটি শিক্ষার্থীর মনে **সামাজিক কর্তব্যবোধ** সৃষ্টি করবে। এখন এই সামাজিক কর্তব্যবোধ বিষয়টি কিভাবে স্থির করা হবে? আমাদের মনে হয় সামাজিক কর্তব্যবোধের সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। যথা—

১. সমাজ গঠনের স্বরূপ। ২. সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। ৩ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। ৪. সমাজের কিরূপ অবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক জীবন-যাপন সম্ভব। ৫. আইন মানার প্রয়োজন কেন? ৬. জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা। ৭ জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা। ৮. জাতীয় সম্পদ রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। এইভাবে মূল উদ্দেশ্যটিকে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর মারফত মূল বিষয়টি শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার একটি সম্পর্ক বিদ্যমান।

যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি সম্পর্ক রয়েছে, সেই হেতু শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যার সাহায্যে শিক্ষার্থী শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাটি লাভ করতে পারে। শিক্ষালাভ তখনই ঘটে যখন শিক্ষার্থী কোন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে।

পূর্বের আলোচিত 'সামাজিক কর্তব্যবোধ' বিষয়টি শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হবে? শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে তখনই যখন শিক্ষালাভের জন্য কোন বিষয় চিন্তা করে, অনুভব করে বা কোন কিছু সম্পাদন করে। শিক্ষালাভ কার্যটি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত। সমাজবিদ্যা

পাঠকালে শিক্ষার্থীকে এমন সুযোগ দিতে হবে যে, সে **সমাজজীবনের কার্যধারা** সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে পারে এবং ঐ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ উদাহবণ হিসাবে আরও একটি বিষয সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি। যেমন, ইতিহাস শিক্ষাদানে শিক্ষাব উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের ইতিহাসেব বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা এবং ঐতিহাসিক বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ঘটনার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানে ছাত্রদেব উৎসাহিত করা। এই উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে বেখে ঘটনাটি ঘটাবাব পিছনে কি কি কারণ কাজ করেছে, সেইগুলি বিশ্লেষণে ছাত্রদের সাহায্য করতে হবে। ঐ ঘটনাগুলি বিশ্লেষণেব মাধ্যমে কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত কবা যায়, তাও ছাত্রদেব শেখাতে হবে। সুতরাং ইতিহাসেব কোন বিবরণ পাঠে ছাত্রদেব বিষয়বস্তু যেমন জানতে হবে, তেমনি ঘটনাটি বিশ্লেষণ করবার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কবতে হবে।

মূল্যায়নের কাজ হল শিক্ষার্থীব নব-লব্ধ অভিজ্ঞতার মান নির্ণয় করা। শিক্ষা শিশুর মনে ও আচরণে যে পরিবর্তন এনেছে বা আনবার চেষ্টা কবেছে, মূল্যায়নের কাজ হল তাব পরিমাপ কবা। মূল্যাযন বিচার কবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষালাভের উপযোগী যে পবিবেশ সৃষ্টি কবেন তা শিক্ষার্থীর আচবণে কতটুকু পরিবর্তন এনেছে তা বিচার করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের মধ্যে সবিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা দবকার। কোন একটি বিষয় কোন শ্রেণীতে শিক্ষাদানের পরেই শিশুরা কতটুকু শিখেছে এবং ঐ শিক্ষালাভের পবে তাদের আচরণে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা কোন এক প্রকারের পরীক্ষাব সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কোনরূপ খাদ্য গ্রহণের ঠিক পরেই যেমন তার খাদ্যমূল্য বিচার করা সম্ভব হয় না, তেমনি কোন বিষয় শিক্ষাদানের পরেই তার প্রভাবে শিশুর চিন্তা ও আচরণে যেরূপ পরিবর্তন আশা করা যায় তা পবিমাপ সম্ভব হয না। খাদ্য যেমন ধীরে ধীরে শিশুর আচবণে পরিবর্তন আনে, তেমনি কোন বিষয শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিশুর আচরণে ধীরে ধীবে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন সামগ্রিক এবং কেবল একটি মাত্র নির্দিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে এটি পরিমাপ করা যায় না। আধুনিক মূল্যায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগেব সম্মিলিত ফলের উপর নির্ভবশীল।

মূল্যায়নের পদ্ধতি

উত্তম মূল্যায়ন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি ? যে পদ্ধতির মারফত শিক্ষার্থীদের আচরণের আশানুরূপ পরিবর্তনের সম্যক্ পবিচয় পাওয়া যায়, তাকে **উত্তম মূল্যায়ন** পদ্ধতি বলে। সাধারণ লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে এই পদ্ধতির পার্থক্য আছে। পাঠক্রমের

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন বিভিন্ন হতে বাধ্য।

এই কারণে প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য কেবল একটি মাত্র পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে একাধিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া উচিত। তবে শিক্ষার্থীর আচরণে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে ধরনের পরিবর্তন আশা করা যায়, তা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়নের পদ্ধতিও স্থির করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করেন। পদ্ধতিগুলিকে মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা যায়, যথা—১. **শিক্ষা ও বিকাশগত পদ্ধতি** এবং ২ **মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি**।

শিক্ষা ও বিকাশগত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার বা ইণ্টারভিউ, প্রশ্নমালা, কর্মশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষা, দৈনন্দিন ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণপত্র ও ছাত্রদের ডায়েরী পরীক্ষা।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে, বুদ্ধি অভীক্ষা, বিশেষ বুদ্ধি বা প্রবণতা অভীক্ষা, ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা, আগ্রহ অভীক্ষা, ইত্যাদি। আমরা নিচে বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. শিক্ষা ও বিকাশগত পদ্ধতি

লিখিত বা কাগজ-কলম অভীক্ষা (Written or Peper-pencil Tests) : বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সাধারণত লিখিত পরীক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই পরীক্ষা রচনাধর্মী (Essay type) বা বিষয়মুখী অথবা নৈর্ব্যক্তিক (Objective type) হতে পারে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মান নির্ধারণে, কোন সমস্যাকে বিশদভাবে বিশ্লেষণের বিচারে অথবা বহুবিধ ঘটনাকে বা বিষয়কে মনে রেখে যথাযথভাবে প্রকাশের ক্ষমতা পরীক্ষায় এরূপ লিখিত পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এই পরীক্ষা প্রমাণ নির্ধারিত (Standardized) হতে পারে অথবা শিক্ষকদের দ্বারা প্রস্তুত মামুলী ধরনের হতে পারে। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী পরীক্ষা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।* কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর এই দুটি পরীক্ষার প্রভাব খুব বেশী।

মৌখিক পরীক্ষা (Oral examinations) : লিখিত পরীক্ষার সহযোগী হিসাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক পরীক্ষা হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উচ্চারণ দক্ষতা, পঠন দক্ষতা, বোধশক্তি পরীক্ষার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষায় ব্যবহারিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষার জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ অনেক স্থানে চালু আছে। নিম্নশ্রেণীতে যখন শিশুরা লিখবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে না বা লিখিত প্রশ্ন পড়ে বুঝতে পারে না, তখন মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

---

* দ্রষ্টব্য : পরে আমরা এই দুটি পরীক্ষা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

মৌখিক পরীক্ষার অসুবিধা এই যে, এতে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হয়। যেহেতু প্রশ্নের মান বিভিন্ন ধরনের হয়, সেইহেতু কারও নিকট সহজ প্রশ্ন এবং কারও নিকট কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা করলে পরীক্ষকেরও ক্লান্তি জন্মাতে পারে। ফলে পরীক্ষকের বিচার সঠিক না হবার সম্ভবনা থাকে।

ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা: বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, কারিগরী-শিক্ষা প্রভৃতি পরীক্ষায় হাতে কলমে প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞান ও পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেণ্ট সংগঠনের দক্ষতার পরীক্ষা করা হয়।

পর্যবেক্ষণ (Observation): মূল্যায়নের অন্যতম পদ্ধতি হল 'পর্যবেক্ষণ'। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিশুর প্রক্ষোভগত ও বৌদ্ধিক পূর্ণতা এবং সামাজিক সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর নানাবিধ সু-অভ্যাস বিকাশের ধারা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য পর্যবেক্ষণের ফলে লব্ধ তথ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তা হলেই কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিশুর কোন বিষয়ের দক্ষতার পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে।

সাক্ষাৎকার বা ইণ্টারভিউ: সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষকদের পক্ষে শিশুদের আগ্রহ, মনোভাব বা অ্যাটিচ্যুডের পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জানবার চেষ্টা করবেন। সকল ছাত্রদের জন্য যাতে একই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়, এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকের উচিত প্রশ্নগুলি আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা। প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালে শিক্ষক ছাত্রের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করবেন।

প্রশ্নমালা: প্রশ্নমালার সাহায্যে ছাত্রদের অভিভাবক ও ছাত্রদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলি নানা উদ্দেশ্য জ্ঞাপক হবে। প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের আগ্রহ, মনোভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পাঠ্য বিষয়ের পছন্দ অপছন্দ, কোন বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা, হবি (Hobby), কোন ক্লাবের সভ্য, বন্ধুর সংখ্যা, প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির গুণাগুণ লক্ষ্য করা: ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির গুণাগুণ লক্ষ্য করে শিশুদের কর্ম-নিপুণতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। শিশুদের তৈরী জিনিস, বিশেষভাবে চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করলে শিশুদের অঙ্কন নৈপুণ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারা যায়। গান্ধীজী বিদ্যালয়ের মামুলী পরীক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করে ছাত্রদের পরীক্ষার মান বা গ্রেড্ নির্ণয়ের পক্ষপাতি ছিলেন।

ছাত্রদের দৈনন্দিন ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণপত্র (Cumulative record card) ও ডায়েরী পরীক্ষা: ছাত্রদের ডায়েরী, ছাত্রদের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা (Anecdotal reports) এবং ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণপত্র পরীক্ষা

ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হতে পারে। ছাত্রদের ডায়েরী, কোন বিশেষ ঘটনার প্রতিবেদন থেকে শিক্ষাগত ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের মনোভাব সহজেই জানতে পারা যায়।

২. মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি

বুদ্ধি অভীক্ষা (Intelligence Tests) : বুদ্ধি অভীক্ষা আলোচনার পূর্বে বুদ্ধি সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরকার। সাধারণ ব্যক্তিরা বুদ্ধিকে উজ্জ্বলতা বা তীক্ষ্ণতার পরিবর্তে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন রাম শ্যাম অপেক্ষা বুদ্ধিমান বা মানুষ ইতরপ্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধিমান। আমাদের যেমন জন্মবয়স আছে, তেমনি মনোবিজ্ঞানীরা মনোবয়স (Mental age)-এর কল্পনা করেছেন। আমাদের শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনি মনেরও বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি বাড়ে। তবে আমাদের বুদ্ধি একটি বিশেষ বয়সের পরে আর তেমন বাড়ে না। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির মান পরিমাপের জন্য মনো-বয়স ও জন্মবয়সের অনুপাত ব্যবহার করেন। এই অনুপাতকে ইংরাজীতে বলা হয় আই কিউ (I.Q) অর্থাৎ Intelligence Quotient।

[$I.Q. = \frac{MA}{CA}$] আই কিউ.-কে বাংলায় বলা হয় বুদ্ধাঙ্ক বা মনস্বিতাঙ্ক।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিনে একজন ফরাসী দেশীয় মনোবিজ্ঞানী। তিনি বুদ্ধিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, (১) বুদ্ধি হল নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, (২) আত্ম-বিচারের ক্ষমতা এবং (৩) নির্দেশ অনুযায়ী কোন কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা। থর্নডাইক একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। শিখনের সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা থর্নডাইকের বিষয় আলোচনা করেছি। থর্নডাইক বুদ্ধিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা—যান্ত্রিক (Mechanical), সামাজিক (Social) এবং বিমূর্ত (Abstract) বুদ্ধি। নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন্ বুদ্ধি কি পরিমাপ করে। যান্ত্রিক বুদ্ধি বলতে থর্নডাইক মনে করেন, যে বুদ্ধি দ্বারা আমরা যন্ত্র, বস্তু প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে নিপুণতা দেখাতে পারি। সামাজিক বুদ্ধি দ্বারা আমরা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি এবং বিমূর্ত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ ভাব (Idea) ও প্রতীক (Symbols)-এর উপলব্ধি ও ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা দেখাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধির এই তিনটি রূপ একটি বিষয়ের তিনটি দিক।

স্পিয়ারম্যান একজন বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী। তিনি বুদ্ধিকে দুটি অংশে ভাগ করেছেন অর্থাৎ **সাধারণ বুদ্ধি ও বিশেষ বুদ্ধি।** সাধারণ বুদ্ধিকে স্পিয়ারম্যান (g) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছেন এবং বিশেষ বুদ্ধিকে চিহ্নিত করেছেন (s) অক্ষর দ্বারা। স্পিয়ারম্যান মনে করেন, মানুষের সকল কাজই g ও s-এর সম্মিলিত ফল।

উপরে আমরা বুদ্ধি সম্পর্ক আলোচনা করলাম। ১৯০৫ সালে ফরাসী দেশের মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে তাঁর সহযোগী সাইমনের সঙ্গে একত্রযোগে বুদ্ধি পরিমাপের

জন্য অভীক্ষা (Test) প্রস্তুত করেন। তার পরে বিভিন্ন দেশে নানা প্রকারের অভীক্ষা প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন বুদ্ধিকে মোটামুটি সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারি। বুদ্ধি অভীক্ষা (Test) প্রয়োগ করে বুদ্ধির বণ্টন সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধরনের ছকটি পাওয়া যায়।

আই. কিউ. I Q.	শ্রেণীবিভাগ	শতকরা ভাগ
140—আরও বেশী	অত্যন্ত উচ্চবুদ্ধি (Gifted)	1·5
120—139	উচ্চবুদ্ধি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি	11 0
110—119	উজ্জ্বল (Bright) বা বুদ্ধিমান	18 0
90—109	স্বভাবী (Normal)	48 0
80—89	অনগ্রসর বা উনস্বভাবী	14 0
70—79	সীমারেখায় অবস্থিত দল	5·0
0—69	উনমানস বা মহামূর্খ (Feeble minded)	2·5

উপরের ছক থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের বুদ্ধির বিন্যাস এইরূপ যে, খুব বেশি বুদ্ধিযুক্তরা সংখ্যায় কম, তেমনি যারা উনমানস বা মহামূর্খ তারাও সংখ্যায় কম, মোটামুটিভাবে 2 5%। উনমানসেরা তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, জড়ধী (Idiots), ইমবেসাইলস্ বা ক্ষুদ্র বুদ্ধি (Imbeciles) এবং মোরন (Morons) বা মহামূর্খ। এর মধ্যে ইডিয়ট বা জড়ধীরা সর্বাপেক্ষা কম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিস্কেলের নিম্নতম স্থান দখল করে।

আমাদের বুদ্ধির শ্রেণীবিভাগের অন্যদিকে রয়েছে প্রতিভাবানেরা (Gifted children)। ট্যারমান একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। তিনি প্রতিভাবানদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিভাবানদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা অন্য শিশুদের অপেক্ষা সকল দিক থেকে উচ্চমানের যেমন, উচ্চতা, ওজন, চেহারা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ও প্রক্ষোভগত উন্নতি (Social and emotional maturity) এদের বেশি। লেখাপড়ায় এদের ফল হয় খুব উচ্চমানের।

আমরা মূল্যায়নে বুদ্ধিপরিমাপের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করছি। তার কারণ বুদ্ধি হল শিক্ষায় সাফল্য লাভের মূলসূত্র। শিশুদের শিক্ষালাভের যোগ্যতা বুদ্ধির মানের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে শিক্ষার্থীর উন্নতির পরিপূর্ণ চিত্র পেতে গেলে বুদ্ধির মান পরিমাপ করা প্রয়োজন। বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষালাভের যোগ্যতার সম্পর্ক খুব বেশি। মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষালাভের যোগ্যতার সঙ্গে বুদ্ধির নিম্নানুরূপ একটি হিসাব দিয়েছেন।

(ক) যদি I Q. ৭০-এর নিচে হয়। তখন এই রকম বুদ্ধির শিশুরা ১০/১১ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শ্রেণীতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ ১৪/১৫ বৎসর পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবস্থান করে। এই রকম বুদ্ধিযুক্ত শিশুরা কখনই পঞ্চম শ্রেণীর উপরে উঠতে পারে না।

(খ) যে সমস্ত শিশুদের I. Q. ৭০—৮৫, তারা তাদের বয়সের অনুপাতে এক বা দুই মান (Grade) নিচে পড়ে থাকে। এই সকল শিশুরা অষ্টম মানের উপরে উঠতে পারে না এবং অধিকাংশের পক্ষে পঞ্চম বা ষষ্ঠ মানের উপরে ওঠা সম্ভব হয় না।

(গ) যে সমস্ত শিশুদের I. Q. ৮৫—১১৫, তারা হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃহত্তর অংশ। এই দলের মধ্যে যাদের I. Q. ১০০, তাদের পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়া কঠিন। তবে যাদের I. Q. ১০০-এর বেশি, তারা অবশ্য উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার উপযুক্ত থাকে।

(ঘ) যে সমস্ত শিশুদের I Q ৯০ থেকে ১২০, তারা স্বভাবী শিশুদের দলে। এই দলের শিশুরা কলেজে উচ্চশিক্ষার উপযোগী। এদের মধ্যে যাদের ব্যক্তিত্ব খুব বেশি, তারা ব্যবসা বা অন্য বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক খুব নিবিড়। অল্প বুদ্ধিযুক্ত শিশুদের পক্ষে কোন ক্রমেই পরীক্ষায় ভাল ফল করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আবার দেখা যায় যে, উচ্চ বুদ্ধিযুক্ত শিশুরাও পরীক্ষার ফল খারাপ করে। তবে এর কারণ অবশ্যই থাকবে। শিশু পড়াশুনায় অমনোযোগী হতে পারে, কিম্বা দারিদ্রের জন্য পড়াশুনার সুযোগ কম পেতে পারে।

সুতরাং মূল্যায়নের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে।

প্রবণতা (Aptitude): বিশেষ বুদ্ধি ও প্রবণতা সমার্থক। যেমন, আমরা বলি মেয়েটির গানে প্রবণতা (Musical aptitude) আছে, এর অর্থ হল যে মেয়েটির গানের বিশেষ বুদ্ধি আছে।

ড্রেভার (James Drever) স্বাভাবিক প্রবণতার সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন: "অপেক্ষাকৃতভাবে সাধারণ ও বিশেষ ধরনের জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্মগত ক্ষমতাকে স্বাভাবিক প্রবণতা বলে।" মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে তার শিক্ষা ও বৃত্তির সম্পর্ক আছে।

স্বাভাবিক প্রবণতাকে সাধারণত দুইভাবে পরিমাপের চেষ্টা করা যায়। প্রথমত, যে বিষয়ে প্রবণতা পরীক্ষা করা হবে, সেই সম্পর্কে একটি কাজের নমুনা নির্বাচন করে ছাত্রদের ঐ কাজটি করতে বলা হয় এবং কাজ দেখে ছাত্রের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। যেমন, কারও যান্ত্রিক প্রবণতা (Mechanical aptitude) আছে কিনা পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেওয়া। ছোট ছোট দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, কাপড় আটকানোর কাঠের ক্লিপ, সাইকেলের ঘণ্টা, দরজার তালা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যে সব ছেলে-মেয়ে ঐগুলি পূর্বে ব্যবহার করেছে বা নাড়াচাড়া করেছে এবং ঐগুলির যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আছে, তাদের পক্ষে ঐ কাজগুলি তাড়াতাড়ি করা সম্ভব।

মূল্যায়নের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত প্রবণতা পরীক্ষা করা উচিত। যে সকল শিক্ষাগত প্রবণতা সাধারণত পরিমাপ করা হয় তার মধ্যে আছে গাণিতিক প্রবণতা, সংগীত প্রবণতা, বিজ্ঞান ও ইনজিনিয়ারিং প্রবণতা, সাহিত্য প্রবণতা, সৃজন ও যুক্তি-শক্তি

প্রবণতা ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবণতা পরীক্ষা করা হয় দুটি উদ্দেশ্যে, যথা—শিক্ষাগত নির্দেশন এবং বৃত্তিগত নির্দেশন দেওয়ার জন্য।

সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে প্রবণতার পার্থক্য আছে। সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করে প্রবণতা মাপা যায় না। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সাধারণ বুদ্ধি অনেকগুলি বিশেষ প্রবণতার সমষ্টি। ব্যক্তির প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত থাকে তার বিভিন্ন জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা। শিশুদের যদি দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে তা তাদের শিক্ষাগত উন্নতি, বৌদ্ধিক বিকাশ (ntellectual development) এবং সামাজিক উপযোজনে বাধা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা একটি সাধারণ নীতি।

সংবেদন তীক্ষ্ণতা (Sensory acuity) এবং সংবেদন দক্ষতা (Sensory capacities) না থাকলে শিশুদের নানাবিধ ত্রুটি দেখা যায়। যেমন, আচরণগত বিশৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ে পড়াশুনায় অবনতি, মানসিক বিষণ্ণতা ইত্যাদি। সুতরাং প্রবণতা পরীক্ষার সময়ে চোখ, কান প্রভৃতির তীক্ষ্ণতাও পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পরবর্তীকালে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তাদের থাকা উচিত সৃজনী ও যুক্তিশক্তি। সৃজনীশক্তি হল কোন নতুন বিষয় বা তত্ত্ব সংগঠনের ক্ষমতা এবং যুক্তিশক্তি হল বিচার করে কোন বিষয়ের গুণাগুণ পরীক্ষা করবার ক্ষমতা। থার্ডস্টোন মনে করেন, সৃজনী প্রতিভা শিক্ষাগত বুদ্ধি অপেক্ষা পৃথক ধরনের। তাড়াতাড়ি চিন্তা করবার ক্ষমতা, বিভিন্ন বিষয় থেকে মূল বিষয়টি বের করবার ক্ষমতা অর্থাৎ সামান্যীকরণের ক্ষমতা সৃজনী প্রতিভার মধ্যে পড়ে। থার্ডস্টোন মনে করেন, শিশুর মনের একটি বিশেষ ধাঁচ বা মেজাজের সঙ্গে 'সৃজনী প্রতিভার' সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হিসাবে প্রবণতা পরীক্ষা করবার প্রয়োজন আছে। যে ছেলেমেয়ের যান্ত্রিক প্রবণতা বা ইন্‌জিনিয়ারিং প্রবণতা আছে তাদের ঐ বিষয় পড়তে দিলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। যাদের ডাক্তারী বা আইনে প্রবণতা আছে তাদেরই শুধু ঐ বিষয়গুলি পড়তে দেওয়া উচিত। অনেক সময়ে অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের উপর চাপ দেন তাদের পছন্দসই বিষয় পড়াবার জন্য। যেমন ডাক্তার চান তার ছেলেকে ডাক্তার করতে, উকিল চান তার ছেলেকে উকিল করতে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ সকল বিষয়ে প্রবণতা পরীক্ষা করে তাদের ঐ সকল বিষয় পড়বার সুযোগ দেওয়া উচিত।

আগ্রহ (Interest) **:** ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন কার্যক্রমে আগ্রহ পরিমাপেরও প্রয়োজন আছে। মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহকেও এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা বলেছেন। আমাদের কোন বিষয়ে আগ্রহ আছে বলতে আমরা মনে করি দুই বা দুয়ের অধিক বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে আমাদের মনোনয়নকে সীমাবদ্ধ করা।

মনে করা যাক, আমরা বাজারে গেলাম শাড়ী কিনতে। নানা রংয়ের মধ্যে পছন্দসই রং-এর শাড়ী আমরা বাছাই করে কিনি। এই পছন্দই হল আগ্রহ। স্কুলে বা

কলেজে নানা পাঠ্য বিষয় পড়বার সুযোগ আছে। এর মধ্যে আমাদের যে সকল বিষয়ে আগ্রহ আছে সেইগুলি কেবলমাত্র বাছাই করি।

আগ্রহ পরিমাপের জন্য নানা প্রকার **প্রশ্নতালিকা** ব্যবহার করা যেতে পারে। এইগুলির মধ্যে প্রধান হল স্ট্রং-এর প্রশ্নতালিকা ও কুদারের আগ্রহতালিকা। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উচিত আগ্রহের একটি প্রশ্নতালিকা প্রস্তুত করে সাধারণভাবে আগ্রহ পরিমাপের চেষ্টা করা।

ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা (Personality Test): আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। সুতরাং মূল্যায়ন কার্যক্রমে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ব্যবস্থা রাখতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বের নানাবিধ সংজ্ঞা দিয়েছেন। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির এমন কতকগুলি গুণের সমষ্টি যা ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। কথা-বার্তায় চাল-চলনে, আচার-আচরণে এক ব্যক্তি যেভাবে অন্যের মনের উপর ছাপ রাখতে চেষ্টা করে, বা অন্যের নিকট নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টা করে, সেইটি হল ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক। অনেকে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে সমার্থক মনে করেন। তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট অংশ বা উপাদান মনে করা যেতে পারে। অলপোর্ট মনে করেন, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নৈতিকবোধ যুক্ত হলে তাকে **চরিত্র** বলা যায় এবং চরিত্র থেকে নৈতিক মূল্যবোধ বাদ দিলে আমরা পাই ব্যক্তিত্ব।[১] উডওয়ার্থের মতে ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক রূপটি হল তার **ব্যক্তিত্ব**।[২]

শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের কোন্ কোন্ গুণগুলি বিকশিত করেছে সেটি পরিমাপ করা মূল্যায়নের কাজ। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য দুই শ্রেণীর অভীক্ষা ব্যবহার করা যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলি পৃথক পৃথক ভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে একটি ব্যক্তিত্ব-জ্ঞাপক গুণের তালিকা প্রস্তুত করে, তার সাহায্যে। এই তালিকা ব্যবহার করে অবশ্য আমরা ব্যক্তিত্বের পুরো চিত্রটি পেতে পারি না। তার কারণ ব্যক্তিত্বের গুণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং ঐগুলি একসঙ্গে একটি জৈবিক ঐক্য (Organic unity) বজায় রেখে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এই পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলেও এর সাহায্যে আমরা ব্যক্তিত্বের একটি মোটামুটি রূপ বা চেহারা পেতে পারি। একটি গুণের তালিকা প্রস্তুত করে তার সাহায্যে আমরা অন্তর্মুখিতা (Introversion), সামাজিকতা, আত্মবিশ্বাস, আত্ম-সচেতনতা (Ascendency), নেতৃত্ব (Leadership), চারিত্রিক সততা, অধ্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান সহজেই নির্ণয় করতে পারি। সাধারণত ৫ পয়েন্ট স্কেলে এইগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে।

---

১. Character is personality evaluated and personality is character devaluated : Allport : Personality. Page 52.

২. Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's behaviour : Woodworth, Psychology.

কিন্তু যদি আমরা ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক ছবিটি অনুধাবন করতে চাই, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন গুণের সমষ্টি হিসাবে পরিমাপ না করে, বিভিন্ন গুণের ঘাত প্রতিঘাতে ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রিক রূপটি যেভাবে প্রকাশিত হয়, তার পরিমাপ করতে চাই, তবে কেবলমাত্র গুণের তালিকা পরীক্ষা করে আমাদের লক্ষ্যে পৌছান কঠিন। কারণ ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য গুণের তালিকা (Inventories) এবং রেটিং স্কেল ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উপাদান বা অংশের পরিমাপক মাত্র। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার পরিবেশের সহিত অভিযোজনের ফল। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির জৈবিক বিকাশের দ্বারা উদ্ভূত নয়; তা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের আন্তঃক্রিয়ার (Interrelationships) ফল স্বরূপ। ব্যক্তির কতিপয় জৈবিক ও মানসিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করে, ব্যক্তিত্ব এই প্রচেষ্টারই ফলস্বরূপ।

মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য দুই শ্রেণীর পদ্ধতির কথা বলেছেন, যথা, ১. সামগ্রিক পদ্ধতি ও ২. সংলক্ষণ বিচার বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

রর্শা মর্শা ছাপ অভীক্ষা নমুনা

[এই ছাপটি দেখে তোমাদের কি মনে হচ্ছে? একটি মেয়ে এই ছাপটি দেখে বলল, দুটি কুকুর ঝগড়া করছে। একটি ছেলে বলল, মানুষের হৃদপিণ্ডের ছবি। তোমাদের দেখে কি মনে হয়? তোমাদের উত্তর বিশ্লেষণ করে তোমাদের ব্যক্তিত্বের গঠন বা বৈশিষ্ট্য বের করা যায়।]

সংলক্ষণ বিচার বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। সমগ্র পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল অভিক্ষেপ বা প্রতিফলন পদ্ধতি (Projective technique)। অভিক্ষেপ পদ্ধতির মধ্যে **রর্সার মসী ছাপ অভীক্ষা** (Rorschach Ink Blot Test) ও **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা** (Thematic Apperception Test) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রর্সার মসী ছাপ অভীক্ষাকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের X-ray পদ্ধতি বলে। এর সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লুকানো অংশের সন্ধান পাওয়া যায়।

[ছবিটি দেখে তোমাদের একটি গল্প বানিয়ে লিখতে হবে। একটি মেয়ে একটি গল্প লিখেছে মা ও মেয়েকে নিয়ে। আর একটি মেয়ে লিখেছে শাশুড়ী বৌকে নিয়ে। আর একটি ছেলে লিখেছে একটি ডাইনী বুড়ি একটি মেয়েকে বন্দী করে রেখেছে। তোমরা এই ছবিটি দেখে একটি গল্প বানাতে চেষ্টা কর। মনোবিজ্ঞানীরা ঐ গল্প বিশ্লেষণ করে লেখকের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বের করতে চেষ্টা করেন।]

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষার ছবির

অবশ্য আমাদের বর্তমান বিদ্যালয় পরিবেশে উপরের আলোচিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা শক্ত এবং তেমন কোন ব্যবস্থাও নেই। এই কারণে ৫ পয়েন্ট স্কেলের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণগুলির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী যে সকল গুণ আমাদের পরিমাপের প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব, অধ্যবসায়, সামাজিক গুণ, দায়িত্বশীলতা, প্রাক্ষোভিক স্থিরতা, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সততা, স্বাবলম্বিতা ইত্যাদি।

মূল্যায়নের অন্যতম বিষয় হিসাবে ব্যক্তিত্ব অবশ্যই পরিমাপ করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নের ফল

রচনাধর্মী পরীক্ষা, বিষয়মুখী পরীক্ষা, ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্র প্রভৃতি পরীক্ষালব্ধ ফল এবং মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার ফল একত্র করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি মূল্যায়ন কার্ড (Evaluation card) বা পুস্তিকা (Evaluation booklet) প্রস্তুত করতে হবে। মূল্যায়ন কার্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মূল্যায়ন-কার্ডের নমুনা

১. ছাত্রের নাম, বয়স ও অন্যান্য বিবরণ।

২. বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড্—

ক. ত্রৈমাসিক পরীক্ষা

খ. ষাণ্মাসিক পরীক্ষা

গ. বাৎসরিক পরীক্ষা

৩. ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড্—

ক. ভৌত বিজ্ঞান

খ. জীব বিজ্ঞান

গ. আচরণ বিজ্ঞান

৪. ছাত্রদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির গ্রেড (কর্মশিক্ষার ফল)।

৫. দৈনন্দিন বিবরণ পত্র থেকে লব্ধ বিবরণ—

ক. শিক্ষা বিষয়ক…

খ. মনস্তাত্ত্বিক…

গ. শারীরিক…

ঘ ব্যক্তিত্ব জ্ঞাপক…

৬. মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রযোগ ফল—

ক. বুদ্ধি অভীক্ষা

খ প্রবণতা

গ আগ্রহ

ঘ. ব্যক্তিত্ব

৭ শারীরিক স্বাস্থ্যের মান—

ক সাধারণ স্বাস্থ্য

খ. উচ্চতা ও ওজন

গ চক্ষু পরীক্ষার ফল

ঘ কর্ণ দন্ত, ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ

মূল্যায়নের ভারপ্রাপ্ত শ্রেণী শিক্ষকের মন্তব্য—

ক. উন্নতি আশানুরূপ ও উচ্চমানের

খ. উন্নতি মাঝামাঝি

গ উন্নতি নিম্নমানের

আমরা মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে রচনাধর্মী পরীক্ষা, বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ঐ পদ্ধতিগুলির প্রভাব এত বেশি যে, ঐগুলি নিয়ে আমাদের পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান

শিক্ষাব্যবস্থা যে পরীক্ষাকেন্দ্রিক এতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা পরীক্ষায় পাস করাকেই শিক্ষা বলে মনে করি। যে পরীক্ষায় পাস করেছে তাকে আমরা শিক্ষিত বলি। যে পরীক্ষায় ফেল করেছে তাকে বলি অশিক্ষিত। সুতরাং উপরের আলোচিত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রচলিত পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য ও কাজ

ইংরাজী Examination কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Examen থেকে এবং Examen কথাটির অর্থ হল দাড়িপাল্লার কেন্দ্রদণ্ড। সাধারণভাবে 'পরীক্ষা' কথাটির অর্থ হল পরীক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কোন নির্দিষ্ট মানের সঙ্গে বিচার করা।

পরীক্ষার বিভিন্ন রূপ : লিখিত পরীক্ষাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১. **রচনাধর্মী পরীক্ষা** এবং ২. **বিষয়মুখী পরীক্ষা।**

বিষয়মুখী পরীক্ষারও দুটি বিভাগ উল্লেখযোগ্য, যেমন, প্রমাণ নির্ধারিত অভীক্ষা (Standardized test) এবং শিক্ষককৃত অভীক্ষা। প্রমাণ নির্ধারিত অভীক্ষাকে বলা হয় শিক্ষা-অভীক্ষা (Educational test)। একে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় সংক্রান্ত অভীক্ষা বা স্কোলাস্টিক্ টেস্টও বলা হয়।

পরীক্ষা যখন আন্তর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তাকে বলে আন্তর পরীক্ষা (Internal examinations) এবং পরীক্ষা যখন বাইরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাকে বলে বহিঃপরীক্ষা (External examination)। বহিঃপরীক্ষার প্রশ্নপত্র, উত্তর-পত্রের মূল্যায়ন প্রভৃতি পরিচালিত হয় বহিঃকর্তৃপক্ষের দ্বারা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বহিঃপরীক্ষার প্রভাব খুব বেশি। এইরূপ পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা নিরূপিত হয়। এই বহিঃপরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যই আন্তর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আবার বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনও এই বহিঃপরীক্ষার প্রয়োজন অনুসারে পরিচালিত হয়। এই কারণে বলা যায় **আধুনিক শিক্ষা পরীক্ষাভিত্তিক।**

পরীক্ষার কাজ

পরীক্ষার কাজ কি? পরীক্ষা কি পরিমাপ করবে? এই বিষয়গুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা গেল।

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা : পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করা যায়। শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করে, পরীক্ষার সাহায্যে আমরা তা পরিমাপ করতে পারি।

শিক্ষকদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা নিরূপণ : পরীক্ষার সাহায্যে পরোক্ষ-ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের যোগ্যতা যাচাই করা যায়। যদিও পূর্বের Payments by results অর্থাৎ পরীক্ষার ফল অনুযায়ী বেতন দানের নীতি এখন আর কোথাও চালু নেই, তবে পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিদ্যালয়ের যোগ্যতা যাচাই হয়ে থাকে। জনসাধারণও স্কুলের ফল বিবেচনা করে স্কুলকে ভাল, মন্দ বা মাঝারী গ্রেডে ভাগ করে থাকে। বিদ্যালয়ের মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড ও পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভরশীল।

ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জ্ঞাপন ঃ পরীক্ষার ফল পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতেই আমরা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করে থাকি। পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্ররা ফল ভাল করে, তাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা যায় যে, ভবিষ্যতে জীবন সংগ্রামে অধিকতর যোগ্যতা দেখাতে পারবে। আমাদের দেশের সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষার ভিত্তিতে অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা চালু আছে এবং যেহেতু এই পরীক্ষার মান অধিকতর উচ্চ, সেহেতু মনে করা হয় যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে। তবে কোন একটি পরীক্ষায় পরীক্ষার মান কোনক্রমেই অন্যক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার পরিচায়ক নয়—একথা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করেন, কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত সঞ্চারণ (Transfer) ঘটে না।

পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগান ঃ শিক্ষার্থীর কার্যে ও পাঠে পরীক্ষা উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। পরীক্ষা পাসের তাগিদের জন্য ছাত্ররা বহু নীরস বিষয় অধ্যয়ন করে, নিজের সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগ্রত থেকে পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করে। পরীক্ষার ভয় না থাকলে আমরা অনেক বিষয়ই জানবার প্রয়োজন অনুভব করতাম না। পরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর মনের উপর একটি সক্রিয় প্রভাব সৃষ্টি করে।

পাঠের বিষয়বস্তু বাছাই করা ঃ পরীক্ষায় পাসের প্রয়োজনের দিক থেকে পরীক্ষার্থীদের কর্মশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা পরীক্ষার অন্যতম কাজ। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী কোন্‌ বিষয়ে তার দুর্বলতা সেই সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে পাবে। শিক্ষকদের পক্ষেও পরীক্ষার সাহায্যে নিজেদের যোগ্যতা বিচার করা সম্ভব। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল বিচার করে শিক্ষক তার শিক্ষাদানের ত্রুটি ধরতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করতে পারেন। সুতরাং পরীক্ষা ত্রুটি নির্দেশক হিসাবে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই নির্দেশ দিতে পারে।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য নির্বাচন ঃ পরীক্ষার অন্যতম ব্যবহার হল উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাই করা। যতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেক বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, তাদের সকলকেই মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্বাচিত করা সম্ভব নয়। এদের মধ্যে অনেকে অর্থনৈতিক কারণে উচ্চশিক্ষা লাভে সক্ষম হয় না। আবার অনেকে উপযুক্ত যোগ্যতার অভাব হেতু এই শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না।

পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অধিকতর সেই সম্পর্কে জানতে পারা যায় এবং সেই অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিষয় নির্বাচনে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া যায়। একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার শেষে উচ্চতর শিক্ষার অধিকার একমাত্র তাদেরই থাকা উচিত যারা তার দ্বারা লাভবান হতে পারবে।

পদ্ধতি বা মেথড্‌ হিসাবে পরীক্ষার ব্যবহার ঃ শিক্ষাদানের একটি

পদ্ধতি বা মেথড্ হিসাবে পরীক্ষাব ব্যবহার বহুল পবিচিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজ হল প্রত্যেক শ্রেণীতে 'পড়া ধরা'। ছাত্রেরা বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর বা অভিভাবকদের সাহায্যে পড়া প্রস্তুত করে এবং পরের দিন ক্লাশে শিক্ষক ঐ পড়া জিজ্ঞাসা বা পরীক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালযেব কাজ হওয়া উচিত পড়া তৈরি করানো বা শেখানো। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি হল বাড়ীতে প্রস্তুত কবানো। প্রকৃত শিক্ষাব দিক্‌ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত অসঙ্গত—এতে কোন সন্দেহ নেই। আবার বিদ্যালযে আমবা যে সকল সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, বা ষাণ্মাসিক পবীক্ষা গ্রহণ কবি তাবও আসল উদ্দেশ্য পরীক্ষাব ভয় দেখিয়ে পড়া তৈাব কবতে ছাত্রদের বাধ্য করা।

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা

একটু গভীবভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদেব শিক্ষাব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত কবেছে। পবীক্ষায পাস কবাই হল বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য। পাঠক্রমকেও পবীক্ষা নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যা পবীক্ষায আসে না আমবা তা পড়ি না। শিক্ষাব প্রকৃত উদ্দেশ্য পবীক্ষা ব্যাহত কবছে। আমাদেব সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাও পবীক্ষার দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। আমাদেব বিদ্যালয়েব সামগ্রিক পবি-বেশও পরীক্ষা দ্বাবা প্রভাবিত। পবীক্ষাই শিক্ষার্থীব নিকট প্রেবণা ও উৎসাহদায়ক। শুধু শিক্ষার্থীব কথাই বা বলি কেন, শিক্ষকও তাব সামগ্রিক কর্মপ্রণালী পবীক্ষা পাসেব উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত কবেন। শিক্ষার্থীর কর্মপদ্ধতিও একমাত্র পরীক্ষা পাসের জন্যই কেন্দ্রীভূত। পাঠক্রমের যে সকল বিষয় পবীক্ষায় আসে না, শিক্ষার্থী তা পাঠে তেমন মনোযোগী হয় না।

পবীক্ষার অন্যতম ত্রুটি হল যে, পরীক্ষা শিক্ষার্থীব মধ্যে একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি কবে। না বুঝে বিষযবস্তু মনে বাখাব চেষ্টাকেই এরা শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে দেখে। অবশ্য একথা সকলে স্বীকাব কবেন যে, পরীক্ষায় পাসেব জন্যই অনেকে পড়া-শুনা কবে। এইভাবে চিন্তা কবলে মনে হয, পরীক্ষা শিক্ষা লাভেব জন্য উৎসাহদায়ক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য মেনে নিলে শিক্ষাব জন্য শিক্ষাব পবিবর্তে 'পরীক্ষা পাসেব জন্য শিক্ষা' এই নীতিব অনুকূলে পবিবেশ সৃষ্টি কবা হয। উৎসাহ প্রদানকারী হিসাবে পরীক্ষা প্রকৃত শিক্ষালাভেব পক্ষে তেমন কার্যকরী নয়, কারণ সারা বৎসর পড়াশুনা না কবে পরীক্ষার্থী পবীক্ষার কয়েক মাস আগে পড়াশুনা আবম্ভ কবে।

অনেক শিক্ষাবিদ প্রচলিত পবীক্ষার ফলাফলেব উপব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবেন, কাবণ তারা 'ফবম্যাল ডিসিপ্লিন' বা শক্তিবাদে বিশ্বাসী। কোন কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে পরীক্ষায় পাস কবে একমাত্র বেশী নম্বর পেলে যে জীবনেব বিভিন্ন বৃত্তিতে বা পেশায় তেমন যোগ্যতা জন্মে না, এ বিষয়টি অনেকে তেমন বিশ্বাস করতে চান না। মনোবিজ্ঞানেব বিভিন্ন পবীক্ষণেব সাহায্যে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শিক্ষায় কোন-রূপ সংক্রমণ ঘটে না। যে সকল ক্ষেত্রে কোনরূপ সংক্রমণ ঘটে, সেখানে তা ঘটে সীমাবদ্ধভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফল হয় বিপরীত।

পরীক্ষায় প্রস্তুতি পরীক্ষার্থীর মনের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে। বহু ক্ষেত্রে এর ফলে চারিত্রিক অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। এই ধরনের ছেলেমেয়েরাই অনেক ক্ষেত্রে 'মনস্তাত্ত্বিক ক্লিনিকে' চিকিৎসার জন্য আসে। আবার পরীক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীর শিক্ষাবিষয়ক জ্ঞানের পরিমাপ করে, চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষা পরিমাপ করে না। শিক্ষালাভের ফলে পরীক্ষার্থীর চরিত্রে যে পরিবর্তন জন্মে পরীক্ষা তা পরিমাপ করে না, করলেও করে পরোক্ষভাবে।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর সীমাবদ্ধ জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন করা। শিক্ষার ভিতর দিয়েই শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে থাকে, শিক্ষার ভিতর দিয়েই শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, সমাজ পরিবেশে ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য যদি ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো বোঝায়, তবে আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি এই পরিবর্তন পরিমাপ করতে পারে না। পরীক্ষার্থীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সামাজিকতা, সত্যনিষ্ঠা, প্রভৃতি পরীক্ষা পরিমাপ করতে পারে না। তবে উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির এই গুণ অবশ্যই থাকা উচিত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির কাজ আংশিক, সামগ্রিক নয়।

পরীক্ষার পরীক্ষা

পরীক্ষা প্রণালীকে কার্যকারীভাবে গ্রহণ করতে হলে কয়েকটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ পরীক্ষাকে একটি নিখুঁত মাপক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হলে এর বিশ্বাস্যতা (Reliability), সংগতি বা সত্যতা (Validity) এবং নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন।

এখন বিশ্বাস্যতা, সংগতি ও নৈর্ব্যক্তিকতা গুণগুলি কি? কিভাবে এদের মান নির্ধারণ করা যায়?

(ক) **বিশ্বাস্যতা :** কোন মাপক যন্ত্রের 'বিশ্বাস্যতার' অর্থ হচ্ছে পরিমাপক যন্ত্র হিসাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা। বিশ্বাস্যতা উত্তম পরীক্ষার একটি বিশেষ গুণ। বিশ্বাস্যতার ব্যবহারগত অর্থ হল এই যে, দুটি সম-প্রকৃতির পরীক্ষা একদল পরীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করে যদি একই প্রকারের সাফল্যাঙ্ক পাওয়া যায় তবে ঐ পরীক্ষাকে বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা বলা চলে।

(খ) **সংগতি :** সংগতির অর্থ হল, পরীক্ষা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে, অর্থাৎ ইতিহাসের পরীক্ষা ইতিহাসেরই জ্ঞান পরিমাপ করবে, গণিতের পরীক্ষা গণিতের জ্ঞান পরিমাপ করবে। যদি ইতিহাসের পরীক্ষা ইতিহাসের জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু পরিমাপ করে, তবে ঐ পরীক্ষা বা পরিমাপের মধ্যে সংগতির অভাব আছে মনে করতে হবে।

(গ) **নৈর্ব্যক্তিকতা ঃ** নৈর্ব্যক্তিকতার অর্থ হল যে, পরীক্ষার ফল পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত বা বিচার বুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ পরীক্ষার ফল দুইজন পরীক্ষকের ক্ষেত্রে যেন একই থাকে। আবার কোন একজন পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা কোনরূপ প্রভাবিত হবে না।

পার্থক্য জ্ঞাপক মূল্য (Discriminating Value)

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া উত্তম পরীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পার্থক্য জ্ঞাপক দক্ষতা। উত্তম পরীক্ষার অন্যতম গুণ হল ভালোর সঙ্গে মন্দের, মাঝারির সঙ্গে উত্তমের পার্থক্য নির্ণয় করবার যোগ্যতা। পরীক্ষায় যদি স্বল্প মেধাবীর সাফল্যাঙ্ক উন্নত বুদ্ধি বা মেধাবী পরীক্ষার্থীর ফলের চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে ঐ পরীক্ষাকে উত্তম পরীক্ষা বলা চলে না। পরীক্ষা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবে। অতএব উত্তম পরীক্ষার একটি বিশেষ গুণ এই যে, এটি ভালো ও মন্দের তফাত নির্ণয় করবে।

রচনাধর্মী পরীক্ষা

প্রচলিত যতগুলি পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে রচনাধর্মী পরীক্ষা তাদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। আমরা আমাদের অধিকাংশ পরীক্ষাই এই পদ্ধতি মারফত দিয়েছি। পরীক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেক প্রাচীন পদ্ধতি। আজকাল পরীক্ষার ত্রুটি ও পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়, সেগুলি সাধারণত রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে।

রচনাধর্মী পরীক্ষা কাকে বলে? রচনাধর্মী পরীক্ষায় একটি প্রশ্নবোধক বাক্য দেওয়া থাকে এবং ঐ প্রশ্নের বিষয়টি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা, মন্তব্য বা অন্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করতে বলা হয়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থী দিয়ে থাকে নিবন্ধাকারে। প্রশ্ন রচয়িতার নিকট এই ধরনের প্রশ্ন রচনা করা অধিকতর সহজ। তবে পরীক্ষার্থীর পক্ষে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তেমন সহজ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা মুখস্থ শক্তির উপর নির্ভর করে উত্তর দিয়ে থাকে। আজকাল প্রত্যেক বিষয়ের প্রচুর নোট বই ও রেডিমেড উত্তর যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং মুখস্থ শক্তির উপর নির্ভর করে অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব হয়।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি

রচনাধর্মী পরীক্ষার যথেষ্ট ত্রুটি আছে। এই পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষায় ও নম্বর দেওয়ার সময় কোনরূপ নিখুঁত পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। উত্তরপত্র পরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা শিক্ষাবিদগণ করেছেন তার মধ্যে একটি প্রধান ত্রুটি হল পরীক্ষক নির্ভর নম্বরদান ব্যবস্থা। এর অর্থ হল যে, একই উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক পরীক্ষা করলে প্রদত্ত মার্কের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

আবার একজন পরীক্ষক দিনের বিভিন্ন সময়ে যদি উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন তা হলেও তার প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। রচনাধর্মী পরীক্ষার এই ত্রুটিকে বলা হয় **নৈর্ব্যক্তিকতার অভাবজনিত ত্রুটি**।

রচনাধর্মী পরীক্ষার অপর ত্রুটি হল, **সীমিত নমুনাজনিত ত্রুটি**। রচনাধর্মী পরীক্ষার কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্রে কেবলমাত্র ৭/৮টি প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং তার মধ্যে মাত্র পাঁচটির উত্তর লিখতে বলা হয়। ঐ পাঁচটি উত্তরের মান বা স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী নম্বর দেওয়া হয়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। মনে করা যাক, ইতিহাসের এক পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী ৮০ নম্বর পেল। এই ফল থেকে আমরা সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঐ পরীক্ষার্থীর ইতিহাসের জ্ঞান যথেষ্ট উচ্চ-মানের। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিটি তেমন নির্ভরযোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করেন। কারণ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে। রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি এই যে, আমরা বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারছি না। আমরা বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বহু প্রশ্নের মধ্যে মাত্র ৫টি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা করতে পেরেছি এবং তার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করেছি। যদি পরীক্ষার্থীকে অন্য প্রশ্ন দেওয়া হত বা ৫টির পরিবর্তে আরও অধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর চাইতাম, তাহলে ফল অবশ্যই ভিন্ন হতে পারতো। সুতরাং রচনাধর্মী পরীক্ষায় 'সীমিত নমুনা যুক্ত প্রশ্নপত্র' একটি বিশেষ ত্রুটি, এতে কোন সন্দেহ নেই।

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্যতম ত্রুটি এই যে, এটি কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর বিশুদ্ধ-জ্ঞানের পরিমাপ করে না। বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া তা পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা, রচনা দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা এবং বিষয়বস্তুকে ঠিকভাবে প্রকাশের দক্ষতার দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ রচনাধর্মী পরীক্ষায় আমরা কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষা করে যে নম্বর পাই, প্রকৃত পক্ষে তা কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিমাপক নয়। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়েরও প্রভাব রয়েছে।

রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর শুধুমাত্র বিষয়ের জ্ঞান নির্দেশ করে না, তা পরীক্ষার্থীর রচনা বৈশিষ্ট্য, সাধারণ জ্ঞান, হস্তলিপি, বানানের নির্ভুলতা প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। এই কারণে রচনাধর্মী পরীক্ষার নম্বরকে মিশ্র নম্বর বলা হয়, তা পরীক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞানের বিশুদ্ধ নম্বর নয়।

পরীক্ষকেরা যখন কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তখন তারা কেবলমাত্র বিশুদ্ধজ্ঞানের পরীক্ষা করেন না। নম্বর দেবার সময়ে তারা পরীক্ষার্থীর উত্তম হস্তাক্ষর, বানান, রচনাশৈলী প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন।

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্যতম ত্রুটি হল যে, পরীক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশের মধ্যে দীর্ঘসময় দরকার হয়। এই মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবে এই দীর্ঘসময় পরীক্ষার্থীদের নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা ও স্নায়ুরোগে ভুগতে হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরাই নয়, তাদের বাপ-মা, অভিভাবকেরাও দুশ্চিন্তায় ভোগেন। প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষা পাসের উপর সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল, এরূপ একটা মিথ্যা মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে। ফলে 'যেন তেন প্রকারেণ' পরীক্ষায় পাসের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা।

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্যতম ত্রুটি হল, এতে পরীক্ষার্থী দক্ষ কোচিং-এর ফলে ভাল নম্বর পেতে পারে। সুতরাং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনেক সময়ে তাঁর প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপক নয়। অনেক সময়ে বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থী কোন বিষয় না জেনে আন্দাজে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এর ফলেও তার প্রকৃতজ্ঞান পরিমাপ করা যায় না। অনেক পরীক্ষার্থীর থাকে পরীক্ষাতঙ্ক। পরীক্ষার সময়ে তারা স্নায়ুদৌর্বল্যে ভোগে, ঠিক মতো খাদ্য গ্রহণ করতে পাবে না, নানারূপ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। তারা পরীক্ষায় বসে মানসিক উত্তেজনা নিয়ে এবং পরীক্ষার ফল তাদের প্রকৃত জ্ঞানের পরিমাপক হয় না।

যে সব পরীক্ষার্থী সাধারণভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন নির্বাচনে দক্ষতার পরিচয় দিতে পাবে এবং পরীক্ষার ব্যাপারে ধীর ও স্থিরভাবে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করতে পারে, পরীক্ষায় তাদের ফল অধিকতর আশানুরূপ হয়ে থাকে।

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণাগুণ বিচারের জন্য অন্যভাবে আমাদের বিবেচনা করা দরকার। একটি উত্তম পরীক্ষার প্রধান গুণ এই যে, একে একটি সুসঙ্গত মাপক যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে হবে। এর মধ্যে বিশ্বাস্যতা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে নৈর্ব্যক্তিকতা। এই মাপক যন্ত্রে থাকবে সংগতি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষার সংগতি ও বিশ্বাস্যতা নিভরশীল। প্রশ্নকারক বা পেপার সেটার, পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী এই তিনজনের উপরেই সংগতি ও বিশ্বাস্যতা নির্ভরশীল।

এই তিন ব্যক্তির সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়—
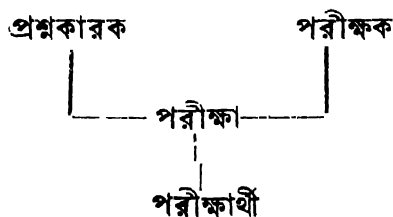
প্রশ্নকর্তা সাধারণত তার মান অনুযায়ী 'প্রশ্নপত্র' রচনা করেন। তিনি সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ সমস্যা বা বিষয়টির উপর জোর দিতে পারেন এবং ঐ অংশের উপর প্রশ্নরচনা সীমাবদ্ধ রাখতে পাবেন। তিনি সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের মধ্য থেকে 'নমুনা চয়ন' করে প্রশ্ন রচনা করতে পারেন। তিনি প্রশ্নের গঠন এরূপভাবে নির্দিষ্ট রাখতে পারেন যাতে পরীক্ষার্থী সহজেই পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে উত্তর দিতে পারে। আবার প্রশ্ন এরূপ হতে পারে যে, তা পুস্তকলব্ধ জ্ঞান ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে প্রশ্নকারকের উচিত প্রশ্নপত্র রচনার সময় তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। প্রশ্নকর্তা কি পরীক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তির পরীক্ষা করতে চান? তিনি কি পরীক্ষার্থীর যুক্তি ও বিচার-

শক্তির পরিমাপ করতে চান? এরকম কোন একটি ধারণা নিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করলে পরীক্ষার্থীর উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষালয়ে এখন যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়, তা আদৌ মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। অধিকাংশ প্রশ্নকর্তাব প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না। আবার অনেক সময়ে প্রশ্নের ধবন থেকে পবীক্ষার্থীরা বুঝতে পাবে না উত্তরেব প্রকৃতি ও আকার কিরূপ হবে?

অনেক প্রশ্নকর্তা তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য নানাভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে থাকেন। একজন এরূপ প্রশ্নকর্তার কথা জানা আছে যিনি প্রশ্নপত্রে নৈতিকতা ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে ভালবাসেন। প্রশ্নকর্তার যদি স্বলিখিত কোন পাঠ্য-পুস্তক থাকে, তবে তিনি প্রশ্নপত্র বচনায় নিজ পুস্তকের বিষয়বস্তু দ্বাবা প্রভাবিত হন। এম. এ. পরীক্ষার্থীগণ এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকেন এবং পূর্বেই প্রশ্নকর্তাব নাম জানতে সচেষ্ট হন। আমাব জানা একজন প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপত্র বচনায় নিজপুস্তকে উল্লিখিত কোটেশান বা উদ্ধৃতি ব্যবহাব কবতে ভালবাসেন। ঐ কাবণে পরীক্ষার্থীবা ঐ পত্র তৈরি করবার জন্য ঐ শিক্ষকের রচিত পাঠ্যপুস্তকেব উপব বিশেষভাবে নির্ভর কবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রশ্নকর্তার যোগ্যতাব উপর পবীক্ষাব নৈর্ব্যক্তিকতা ও বিশ্বাস্যতা সবিশেষ নির্ভরশীল।

এইবার পবীক্ষার্থীব দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা কবা দরকাব। পবীক্ষার্থী যন্ত্র নন, পরীক্ষায পবীক্ষার্থীব যোগ্যতা নির্ভব কবে, পবীক্ষার্থীর মানসিক ও শাবীরিক সুস্থতার উপর। শাবীবিক ও মানসিক সুস্থতাব অভাবের জন্য পরীক্ষার্থীর সাফল্যাঙ্কেব যে পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয 'বিচলন উৎপাদক'। উপযুক্ত পবিবেশেব উপবেই পরীক্ষাব সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু পবীক্ষার সময়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাযথভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। অনেক পবীক্ষার্থী পরীক্ষাব হলে সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক জানা বিষয় তাবা ভুলে যায়। পবীক্ষাব উত্তেজনা অনেক পবীক্ষার্থীব মনের উপব ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার কবে। পরীক্ষাব সময়ে অনেকের ক্ষুধা হ্রাস পায, ঘুম কমে যায় এবং দুশ্চিন্তায সময় অতিবাহিত হয়। এই ধরনের পবীক্ষার্থীদের যোগ্যতার পরিমাপক হিসাবে পবীক্ষা একটি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্র।

শারীরিক অসুস্থতাব জন্যও পবীক্ষার্থীব মানসিক শক্তি হ্রাস পায। সর্দি, প্রভৃতি অসুখে চিন্তার ক্ষমতায জড়তা আসে। এই সকল কাবণেও পরীক্ষা প্রকৃত যোগ্যতা পরিমাপ করতে পারে না। পবীক্ষাব পূর্বে পবীক্ষার্থীরা সাজেশান্ সংগ্রহেব চেষ্টা কবেন; আবার অনেকে দক্ষ শিক্ষকেব তত্ত্বাবধানে কোচিং লাভের সুযোগ পেযে থাকে। সুতরাং সাজেশান্ ও কোচিং পরীক্ষার বিশ্বাস্যতা ও সংগতি হ্রাস কবতে পারে।

বর্তমানে পবীক্ষাসমূহে যেরূপ ব্যাপক হারে টোকাটুকি ও নকল করা হচ্ছে, তাতে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বে পবীক্ষাব হলে নকল করা যে হতো না এমন নয়, তবে যাবা এই কাজ করতো তারা সংখ্যায় ছিল

মুষ্টিমেয় এবং তাদের এই কাজকে কেউ প্রশংসার চোখে দেখতো না। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর কেউ এই নিয়ে কোন পরীক্ষার্থীকে নিন্দা করে না, বরং অনেক অভিভাবক এর জন্য পরীক্ষার্থীর বুদ্ধির তারিফ করে থাকেন। পরীক্ষা পাসের উপর আমাদের সমাজে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরীক্ষায় পাস করা। সমাজেও প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে পরীক্ষা পাসের মূল্য বেশী। এই কারণে পরীক্ষার্থীদের একমাত্র চেষ্টা হল যে কোন উপায়ে পরীক্ষা পাসের ব্যবস্থা করা।

পরীক্ষা পাসের জন্য নকল করার মতো অন্য কোন ব্যবস্থা তেমন ফলপ্রসূ নয়। পরীক্ষার হলে যদি কোন শিক্ষক নকল ধরার জন্য তেমন সচেষ্ট হন, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। এই কারণে অধিকাংশ পরীক্ষার হলে বর্তমানে নকল ধরার জন্য কেউই তেমন সচেষ্ট নন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক সুবিধাবাদী ব্যক্তি পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে মোটা টাকা দাবি করেন—নকল করবার সুযোগ দেবার জন্য। কি ধরনের নকল করবার পদ্ধতি সাধারণত পরীক্ষার হলে দেখা যায়? বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের বিষয়।

পরীক্ষার হলে নকল করবার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়ে থাকে। (১) বই, বই-এর কোন অংশ বা লেখা নোট থেকে নকল করা। (২) শরীরের কোন অংশে ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে কোন বিষয় লিখে এনে নকল করা। হাতের পাতায় বা উরুতে লিখে আনার কথাও শোনা যাচ্ছে। (৩) পরীক্ষার্থীর বন্ধু-বান্ধব ছোট কাগজে উত্তর লিখে চর মারফত চালান দেয়। (৪) কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে মাইকযোগে উত্তর ঘোষণা করা হয়। (৫) ভাল ছাত্রদের উত্তরপত্র থেকে জোর করে নকল করা হয়। (৬) বাইরে খাতা পাঠিয়ে অন্যদের দিয়ে লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীর নামে জমা দেওয়া হয়।*

---

* পরীক্ষায় নকল সম্পর্কে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন—তা নিম্নে উল্লিখিত হল।

পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ ও ভিতরের হালচাল কি রকম দেখা যাক। একদল পরীক্ষার্থীর অসদুপায় গ্রহণের ও টোকাটুকি করিবার প্রকৃতি ও প্রবণতা এত বেশী, তাহারা এত দুঃসাহসী ও বেপরোয়া যে তাহারা তদারককারীদের (ইনভিজিলেটর) ও কর্তৃপক্ষদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। পাঠ্যপুস্তকের ছেঁড়া পাতা, কাগজের টুকরায় লিখিত উত্তর, কিংবা ডেস্কের নীচে রাখা বই প্রভৃতি দেখে তাহারা উত্তর লিখতে সংকোচ বোধ করে না। ইহা ছাড়া বাহির হইতে বন্ধুবান্ধবদের দল সাদা কাগজে উত্তর লিখে ভিতরে চর মারফত চালান দেয়। কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে আবার মাইকযোগে উত্তর ঘোষণা করা হয়। পরীক্ষাহলের কর্তৃপক্ষ এইরূপ ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করেন।...পরীক্ষান্তে দেখা যায়, পায়খানা প্রস্রাবের জায়গায় বইয়ের স্তূপাকার ছেঁড়া পাতা, হাতে লেখা কাগজ প্রভৃতি। কর্তৃপক্ষ দুষ্কৃতিকারীদের পরীক্ষা হল হতে বিতাড়িত করতে সাহস করেন না। ইহার ফলে পরীক্ষা হল একটা বিশৃংখলার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর ফলে ভাল ছেলেদের ফল ভাল হয় না—উপরন্তু যারা অসাধু উপায় গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেকের ভাল হয়। যাহা হউক, এইরূপ গোজামিল দিয়ে পাব্লিক এগজামিনেশনের একটা ঠাট বাজায় রাখা হইয়াছে। —মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত : পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অনাচার, পৃঃ ২।

এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষাকে মাপক যন্ত্র হিসাবে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে আদৌ নির্ভরযোগ্য হয় না।

এইবার **পরীক্ষকের** দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক।

পরীক্ষকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা উত্তর পত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের মান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে একই উত্তরপত্র দিনের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করে একজন পরীক্ষক বিভিন্ন নম্বর দিয়েছেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে ও পরে পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করলে নম্বরের পার্থক্য হতে পারে। উত্তরপত্র পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত উত্তরপত্রের মার্ক প্রদানের মানকে প্রভাবিত করতে পারে। একজন পরীক্ষক হয়তো উত্তরপত্রের বিষয়বস্তুর গভীরতার দিকে জোর দিতে চান, অন্যজন দিতে চান রচনার বৈশিষ্ট্যের দিকে, আর একজন হয়তো জোর দিলেন বিষয়বস্তুর বিশদ প্রকাশের উপর। অন্যজন জোর দিলেন বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার উপর। অনেক পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মতামত তার অনুরূপ না হলে অসন্তুষ্ট হন। পরীক্ষক যতই নিজেকে নিরপেক্ষ মনে করেন না কেন, বিরুদ্ধ মতের উত্তরগুলি অনেক সময়ে তার কাছে উপযুক্ত বিচার পায় না। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি প্রবণতাই যে উত্তরপত্র পরীক্ষায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পরীক্ষার্থীর পক্ষে তার লব্ধ জ্ঞানের সবটুকুই পরীক্ষার খাতায় ঠিক মতো দেওয়া সম্ভব হয় না। পরীক্ষককেই তখন চেষ্টা করতে হয় জানতে, পরীক্ষার্থী যতটুকু প্রকাশ করেছে তার ভিতর দিয়ে তার জ্ঞানের কোন্ অপ্রকাশিত অংশের আভাস লুকানো আছে। হস্তলিপি বা রচনাশৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হন না, এমন পরীক্ষক অল্পই আছেন। ফলে বিভিন্ন উত্তরের মূল্যায়নে পরীক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং বিশেষ ধরনের প্রতিভার তেমন সমাদর নাও হতে পারে।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। কিন্তু এই পরীক্ষার ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত এই পরীক্ষা পদ্ধতিকে একেবারে বাদ না দিয়ে একে এমন ভাবে সংস্কার করা যাতে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি যতদূর সম্ভব দূর করা যায়।

রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ করেছেন। 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের' মতে রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবহার করলে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে অধিকতর সুফল আশা করা যায়। তবে আমাদের দেশে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ঠিকভাবে প্রচলন সময়সাপেক্ষ এবং বর্তমানে এই বিষয়ে উপযুক্ত দক্ষ ব্যক্তির অভাবও রয়েছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় রচনাধর্মী পরীক্ষা ঠিকভাবে সংস্কারের চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন মনে করেন, পরীক্ষা সংস্কারের জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন পরীক্ষা পদ্ধতিতে আনা দরকার। প্রশ্নপত্র রচনা বা পেপার সেটিং-এর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

প্রথমত প্রশ্নপত্র রচয়িতা ও মডারেটরদের সচেতন থাকতে হবে যে, কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। প্রশ্নটি পাঠ্য

বিষয়ের কোন মুখ্য অধ্যায়ের অন্তর্গত ? প্রশ্নটি যদি পাঠ্য-পুস্তকের কোন অমুখ্য বিষয়ের অন্তর্গত হয়, তবে দেখতে হবে যে, তা প্রধান বিষয়ের তত্ত্ব, পদ, ভাব প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধক কিনা। প্রশ্নকর্তাকে দেখতে হবে প্রশ্নটি যেন পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধ নির্ণায়ক চিন্তাশক্তির (Relat onal thinkıng) পরিমাপক হয়। প্রশ্নটি যেন পরীক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে, তার আগ্রহকে জাগ্রত করতে পারে। প্রশ্নটি যেন পরীক্ষার্থীর বিশিষ্টতা জ্ঞাপক চিন্তাশক্তির সংগঠন ও প্রকাশের সুযোগ দিতে পারে। প্রশ্নটি যেন এমন হয় যে, তা পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের ভিতর সমন্বয় সাধন করতে পারে। প্রশ্নটির ধরন যেন এমন হয় যে, পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন তার মোটামুটি উত্তরদানে সক্ষম হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন মনে করেন যে, প্রশ্নকর্তা যদি যথেষ্ট চিন্তা করে প্রশ্ন রচনা করেন তাহলে তা পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা নিরূপণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে একমাত্র বহিঃপরীক্ষার উপর নির্ভর না করে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজকর্মের হিসাবও পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী যে সকল প্রশ্নের উত্তর লেখে বা যেভাবে শিক্ষকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে, শিক্ষকের উচিত ঐগুলির ধরন যথাযথভাবে বিচার করা। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ী থেকে যে 'গৃহকাজ' প্রস্তুত করে আনে তার জন্য কিছু নম্বরও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রগেস্ রিপোর্ট বা উন্নতি পত্রে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি, খেলাধুলায় দক্ষতা, কোন বিশেষ ধরনের ক্ষমতা যেমন, সাহিত্য রচনা, কবিতা রচনা বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতির বিবরণ উন্নতি পত্রে উল্লেখ করা উচিত। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয়ের জ্ঞান পরিমাপ করা নয়, পরীক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিবরণ দান করা।

মুদালিয়র কমিশনের মতে রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কারের জন্য কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে রচনাধর্মী পরীক্ষার মান নির্দেশের জন্য শতকতম স্কেলের ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষায় নম্বর দানের জন্য সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা ১০০ ধরা হয়ে থাকে। ১০০ সংখ্যাকে পূর্ণমান ধরে পরীক্ষক উত্তরপত্রের নম্বর দিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থার ত্রুটি এই যে, একই মানবিশিষ্ট দুইটি উত্তর পত্র যথাক্রমে ৩৮ ও ৪ নম্বর পেতে পারে। ৪০ নম্বরকে যদি পাস মার্ক ধরা হয়, তাহলে একই মানবিশিষ্ট উত্তর পত্রে একজন কৃতকার্য এবং অন্যজন অকৃতকার্য হয়েছে এরূপ ধরা হয়। অনুরূপভাবে কোন পরীক্ষায় যদি ৬০% মার্ককে ফার্স্ট ক্লাশ মার্ক হিসাবে ধরা হয়, সে ক্ষেত্রে একই মান যুক্ত দুটি উত্তর পত্রের একটি ৫৮ % এবং অন্যটি ৬০% নম্বর পাওয়ার জন্য একজনকে দ্বিতীয় শ্রেণী এবং অন্যজনকে প্রথমশ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়। মুদালিয়র কমিশন মনে করেন, এরূপ একই মানবিশিষ্ট দুটি উত্তর পত্রকে এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে অযৌক্তিক। এইরূপ অবস্থায় যদি ১০০ মার্কের মার্ক প্রদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে ৫ বা ৭ পয়েন্ট স্কেলে পরিমাপের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে একই মানবিশিষ্ট উত্তর পত্রের মধ্যে এরূপ পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ মুদালিয়র

কমিশনের সুপারিশ এই যে, বর্তমানে ব্যবহৃত **শতকতম স্কেলের পরিবর্তে পঞ্চম বা সপ্তমমান যুক্ত স্কেলের প্রবর্তন** করতে হবে।

দ্বিতীয় সংস্কারটি হল **আংশিক পরীক্ষা বা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার প্রবর্তন**। বর্তমানে কোন বিশেষ পরীক্ষায় মোট পূর্ণ সংখ্যা ১০০০ বা ১২০০ হতে পারে। পরীক্ষার্থীকে উক্ত নম্বরের পরীক্ষা একবারেই দিতে হয়। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ এই যে, পরীক্ষার্থীকে তার ক্ষমতা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। কোন পরীক্ষার্থী যদি এই পূর্ণ সংখ্যার পরীক্ষা একবারে না দিতে পারে, তবে সে আংশিকভাবে বা ভাগ ভাগ করে ঐ পরীক্ষা দিতে পারবে। অবশ্য একজন পরীক্ষার্থী কতবার ঐ পরীক্ষায় বসতে পারবে তার একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিপার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং সব ছাত্রের জন্য একই ব্যবস্থার প্রবর্তন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নীতির বিরোধী। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ছাত্র তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারবে এবং পরীক্ষা ছাত্রের নিকট ভয়ের বস্তু হবে না।

বিষয়মুখী পরীক্ষা

বিষয়মুখী পরীক্ষা বা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে ইংরাজীতে বলা হয় **'অবজেকটিভ্ টেস্ট'**। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, রচনাধর্মী পরীক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি বিষয়মুখী পরীক্ষা প্রবর্তন করে দূর করা যায়। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট ও মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে বিষয়মুখী পরীক্ষার স্বপক্ষে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে ছাড়া এই পরীক্ষার প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য এই পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে যদিও ১৯২৩ সাল থেকে ব্যালার্ড এই পরীক্ষার স্বপক্ষে প্রচার করে আসছেন, তবুও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষায়তনে এই পরীক্ষার তেমন ব্যবহার দেখা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও বর্তমানে বিষয়মুখী পরীক্ষার নানাবিধ ত্রুটির কথা শোনা যাচ্ছে। তবে শিক্ষাবিদগণ এই কথাও স্বীকার করেন যে, রচনাধর্মী পরীক্ষার বহুবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীদের বহুবিধ গুণ এর সাহায্যে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করা যায়।

স্কুল পাঠ্য অনেক বিষয় আছে যা পরিমাপের জন্য 'বিষয়মুখী পরীক্ষা'র ব্যবহার তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'ভাষা ও সাহিত্যের' পরীক্ষায় এই ধরনের পরীক্ষা তেমন উপযোগী মনে হয় না। সাহিত্যের রচনা বা কোন কবিতার উপলব্ধিমূলক আলোচনা বিষয়মুখী পরীক্ষার ছক বা প্যাটার্নের মধ্যে আনা শক্ত। তেমনি গণিতের যে সকল জটিল বিষয় সমাধানে একাধিক দক্ষতা বা নিপুণতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, সে সকল ক্ষেত্রেও বিষয়মুখী পরীক্ষা সঠিকভাবে ব্যবহার করা চলে না। বিষয়মুখী অভীক্ষা ব্যবহারের প্রথম শর্ত এই যে, প্রশ্নটি এরূপ সরল হবে যে, একটি মাত্র শব্দ ব্যবহারের দ্বারা যেন প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া যায় এবং উত্তরটিও নির্দিষ্ট

হয়। জটিল প্রশ্ন যেখানে একাধিক সমস্যাযুক্ত থাকে, সেগুলি এই ধরনের প্রশ্নপত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

বিষয়মুখী পরীক্ষাকে বলা হয় 'নতুন প্রণালীর পরীক্ষা পদ্ধতি।' এই পরীক্ষায় প্রশ্নগুলি হয় ছোট ছোট, প্রশ্নগুলি এরূপভাবে সাজানো থাকে যেন পরীক্ষার্থীরা সহজেই উত্তর দিতে পারে। প্রশ্নগুলি ছোট ছোট হওয়ায় কোন একটি বিষয়ের উপর বহু প্রশ্ন করা সম্ভব হয়। পরীক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ অভিযোগ করা সম্ভব নয় যে, প্রশ্নপত্রে তার পছন্দমত প্রশ্ন আসে নাই। কারণ সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অংশের উপরেই এই ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্ন করা সম্ভব হয়। পূর্বে আমরা রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণাগুণ আলোচনা করেছি। রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটিগুলি মোটামুটিভাবে বিষয়মুখী পরীক্ষার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে, শিক্ষাবিদগণ এরূপ মনে করেন।

বিষয়মুখী পরীক্ষার **সুবিধাগুলি** সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়—

১ নম্বর বা মার্ক দেওয়ার পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়।

২. সমগ্র সিলেবাস থেকে প্রশ্ন থাকে, সুতরাং পরীক্ষার ফল পরীক্ষার্থীর বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমাপক।

৩. পরীক্ষার ফলাফলে পরীক্ষার্থীর ভাষার মান কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। বানান ভুল, হস্তলিপি, রচনাশৈলী লব্ধ মার্ককে কোনরূপেই প্রভাবিত করে না। সুতরাং পরীক্ষায় লব্ধ মার্ক পরীক্ষার্থীর প্রকৃত বিষয় জ্ঞানের পরিমাপক।

৪. প্রশ্ন বেছে পড়া, সাজেশান্ বা কোচিং প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষার্থীর পক্ষে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করা সম্ভব নয়।

৫ সমগ্র সিলেবাসের উপর প্রশ্ন করা হয়, এই কারণে এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ের কোন্ অংশে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান দুর্বল তা সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং সেই অনুসারে বিশেষ পাঠের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। অর্থাৎ বিষয়মুখী পরীক্ষাকে 'নিদান অভীক্ষা' রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিষয়মুখী পরীক্ষা **নানা প্রকারের** হতে পারে। এইগুলি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করছি। কিন্তু এই পরীক্ষা পদ্ধতির নানাবিধ ত্রুটিও বিদ্যমান। এই সম্পর্কে সচেতন না হয়ে এই ধরনের পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। পরীক্ষার নতুন পদ্ধতি হিসাবে বিষয়মুখী পরীক্ষাকে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা বিশেষ পছন্দ করে। তবে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিকট রচনাধর্মী পরীক্ষাই অধিকতর উপযোগী মনে হয়। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'সমস্যা-সমাধানের' যে প্রবণতা আছে, বিষয়মুখী পরীক্ষার মাধ্যমে বহুলাংশে তার তৃপ্তিসাধন হয়।

বিষয়মুখী পরীক্ষার ত্রুটি

বিষয়মুখী পরীক্ষার বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও এর অনেক ত্রুটি বিদ্যমান। বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটিগুলি আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও ছাপানো অনেক ব্যয়সাধ্য। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের পক্ষেই এই ধরনেব প্রশ্নপত্র রচনা সম্ভব নয়। প্রশ্নপত্র রচনার বিশেষ টেকনিক বা কৌশল অনেকের জানা থাকে না। আবার কোন্ বিশেষ গুণ পরিমাপের জন্য কি ধরনের প্রশ্নপত্র উপযোগী, এই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানও অনেকের থাকে না। এই প্রশ্নপত্র রচনা সময়সাপেক্ষ। তবে প্রশ্নপত্র রচনায় অধিক সময় ব্যয় হলেও, উত্তরপত্র পরীক্ষায় সময় অনেক বাঁচানো যায়। বিষয়মুখী পরীক্ষার উত্তর ঠিকভাবে নির্দিষ্ট কবে দিলে 'উত্তরপত্র' অফিসের করণিক বা অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারাও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

প্রশ্নপত্র ছাপানোব খরচের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নিম্নশ্রেণীতে ব'ড করে বোডে প্রশ্ন লিখে দিয়ে এরূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে। পরীক্ষার্থীরা সাদা কাগজে প্রশ্নেব উত্তর লিখে দেবে। আবার এক সেট প্রশ্ন ছাপিয়ে উত্তর দেবার ব্যবস্থা পৃথক কাগজে বাখবে। একই প্রশ্নপত্র কযেকবার ব্যবহার করা যেতে পাবে। শ্রেণী পবীক্ষায় এই পদ্ধতি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্নপত্র রচনার সময়ে শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে, এইগুলি খুব তাডাতাডি কব. সম্ভব নয। এই কারণে সারাবছর ধরে ধীরে ধীবে এইগুলি রচনা কবা যুক্তিযুক্ত' আমার মনে হয় ট্রেনিং কলেজে এই ধরনের প্রশ্নপত্র বচনা শিক্ষা দেবার যথাযথ ব্যবস্থা রাখা উচিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি অবসব সময়ে অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে এই ধরনের প্রশ্নপত্র রচনা অভ্যাস কবেন, তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন সহজেই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহাব করা যায়।

তবে বিবযমুখী পরীক্ষাব ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

একটি মারাত্মক ত্রুটি হল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর না জেনে 'আন্দাজে' উত্তব দেওযা। এই আন্দাজ বা 'গেজিং'-এর কারণে এই পরীক্ষা পদ্ধতি তেমন নির্ভরযোগ্য হয় না। এই কারণে, নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নম্বর দানের পদ্ধতি অনেক শিক্ষাবিদ অধিকতর উপযোগী মনে করেন।

$$\text{সূত্র :}\quad S = R - \frac{W}{n-1}$$

S = পরীক্ষার্থীর স্কোর বা নম্বব, R = পরীক্ষার্থীর সঠিক উত্তরেব সংখ্যা, W = পরীক্ষার্থীর ভুল উত্তরের সংখ্যা; n = বিকল্প উত্তরের সংখ্যা।

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, যদি কোন পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তব না জেনে প্রশ্নের উত্তর আন্দাজে না দেয়, তাহলে তার সততাব কিছু মূল্য এই পদ্ধতিতে দেওযা হয়ে থাকে।

কিন্তু বিষয়মুখী পরীক্ষায আন্দাজে উত্তর প্রদানের এই ত্রুটি দূর করবার জন্য উপরের আলোচিত পদ্ধতি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তেমন যুক্তিসহ নয়, ববং এ ব্যবস্থাকে বলা যায় যান্ত্রিক পদ্ধতি। এই ব্যবস্থায় সমস্যার প্রকৃত সমাধান তেমন আশা করা যায় না।

পরীক্ষায় আন্দাজে উত্তর দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থী যে সব প্রশ্নের আন্দাজে উত্তর দেয় সেগুলি সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এরূপ বলা চলে না ; বরং বলা চলে যে, ঐগুলি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। কোন বিষয় সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞানই আন্দাজে উত্তর দেবার প্রধান কারণ। এই সম্পর্কে আরও পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে আন্দাজে উত্তর দিলে সব সময়ে তা পরীক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। তবে শিক্ষাবিদ্‌গণ লক্ষ্য করেছেন যে, বিষয়সূচী পরীক্ষায় যদি এরূপ নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, পরীক্ষার্থীগণ আন্দাজে উত্তর দেবে না ; মনে রাখবে আন্দাজে ভুল উত্তর দিলে লব্ধ সাফল্যমান থেকে আনুপাতিক নম্বর বাদ দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।' তাহলে আন্দাজে উত্তর দেবার ঝোঁক বহুলাংশে দূর হতে পারে।

আরও একটি সমস্যার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত ভুল বাক্যের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর পরিচয় শিক্ষা বিজ্ঞানের দিক থেকে অনুচিত। কারণ ভুলের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার্থীর মনে ঐ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। ঐ সকল ভুল বাক্যের সঙ্গে পরিচয় ব্যবহারিক জীবনে ভুল বিষয় ব্যবহারের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। তবে এই বিষয় নিয়ে যে সকল পরীক্ষণ বা এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলে অনেকে মনে করেন। বালার্ড মনে করেন, বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রদের দিয়ে যদি এই সকল উত্তরপত্র পরীক্ষা করানো হয়, তাহলে তা ছাত্রদের মনে সঠিক উত্তর সম্পর্কে ঠিক ধারণা সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারে।

বিষয়মুখী পরীক্ষায় অন্য একটি **ত্রুটি** এই যে, এই পদ্ধতিতে **জ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশগুলির পরিমাপ** করা হয়। কোন বিষয়ের বিশদ বিবরণগুলির দিকে সাধারণত লক্ষ্য রাখা হয় এবং সামগ্রিক জ্ঞানকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। জটিল মানসিক প্রক্রিয়া যে সকল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, বিষয়মুখী পরীক্ষায় সেগুলি বিশ্লেষণ করে তার অংশ বিশেষের উপর প্রশ্ন করা হয়। এখন সমস্যা হল এই যে, এইভাবে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডখণ্ড প্রশ্নের দ্বারা সমগ্র বিষয়ের পরিমাপ সম্ভব কিনা। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ব্যবস্থা দ্বারা সামগ্রিক বিষয়টির অনেক প্রধান অংশ বাদ পড়ে যায় এবং রচনাধর্মী পরীক্ষায় যেমন পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের সামগ্রিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়, বিষয়মুখী পরীক্ষায় তা লাভ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা করে এইরূপ দেখা গেছে যে, বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার্থীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তর মুখস্থ করে, যাতে করে তারা অনুরূপ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়। এইরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। অথচ এর বিপরীত মতও দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বিষয়মুখী পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা রচনাধর্মী পরীক্ষার ন্যায় পরিমাপ সম্ভব ; তবে সে ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র তদনুরূপ হওয়া চাই।

বিষয়মুখী পরীক্ষায় উত্তর দেবার বৈশিষ্ট্য : বিষয়মুখী পরীক্ষায় উত্তর দানের ধরন অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। যে সাঙ্কেতিক পদ্ধতিতে

এই পরীক্ষায় উত্তর দেওয়া হয়, তা দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রকাশ ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর পঠন-বয়স ৮-এর কম, তাদের পক্ষে বিষয়মুখী পরীক্ষার সাহায্যে উত্তর দান সম্ভব হয় না। কারণ কোন বিষয় পাঠ করে বুঝবার মত ক্ষমতা ৮ বৎসরের কম বয়স্কদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং একটি প্রচলিত ধারণা এই যে, বিষয়মুখী পরীক্ষা নিম্নশ্রেণীর জন্য সবিশেষ উপযোগী এবং উচ্চশ্রেণীর জন্য প্রয়োজন হল 'রচনাধর্মী পরীক্ষা'—এই নীতি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

বিষয়মুখী পরীক্ষা রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে রচনাধর্মী পরীক্ষা অপেক্ষা সহজে বিষয়মুখী পরীক্ষাকে সংস্কার করা যায়। নির্ভুল পরিমাপের যন্ত্র হিসাবে কোন পরীক্ষাকেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। সুতরাং ব্যালার্ড (১৯২৩) যেভাবে 'নতুন অভীক্ষার' প্রশংসা করেছেন তা' পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করা চলে না। আমাদের মত এই যে. উভয় প্রকারের পরীক্ষা একত্রযোগে গ্রহণ করলে পরীক্ষার ফল অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রশ্ন রচনা পদ্ধতি

বিষয়মুখী পরীক্ষার অনেক বিষয় আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রশ্নপত্র রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিষয়মুখী পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র রচনা সময়-সাপেক্ষ, রচনাধর্মী পরীক্ষার ন্যায় সহজে রচনা করা চলে না। এই কারণে যে সকল বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেখানে শিক্ষকদের উচিত শ্রেণীতে দৈনন্দিন পাঠ পরিচালনার সময়ে বিষয়মুখী প্রশ্নের উপযোগী বিষয়গুলিকে পৃথক করে নিজস্ব নোট বুকে লিখে রাখা। পরে প্রশ্নপত্র রচনার সময়ে ঐগুলি থেকে সহজে প্রশ্ন প্রস্তুত করা যেতে পারে। এইরূপ প্রশ্নে পাঠ্য পুস্তকের সামান্য বিষয়গুলির উপর জোর না দিয়ে এমন সব বিষয় নির্বাচন করা উচিত যেগুলির জ্ঞান পরীক্ষার্থীর পক্ষে সমধিক প্রয়োজনীয়। প্রশ্ন রচনায় পাঠ্য পুস্তকের ভাষা পুরোপুরি ব্যবহার না করে পরিবর্তিতভাবে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ব্যবহার করলে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী মুখস্থ শক্তির উপর বেশী জোর দিয়ে থাকে তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। ভার্নন মনে করেন একাধিক উত্তর যুক্ত প্রশ্নের কোন কোন উত্তরের জন্য পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ভুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষায় তোতা পাখী মার্কা পরীক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলা যেতে পারে।

বিষয়মুখী প্রশ্ন রচনায় আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রশ্নকর্তা যতগুলি প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে রাখতে চান তার চেয়ে বেশী প্রশ্ন তার প্রথম অবস্থায় রচনা করা প্রয়োজন। মনে করা যাক, একটি প্রশ্নপত্রে ৬০টি প্রশ্ন প্রশ্নকর্তা রাখতে চান সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্বে তার প্রস্তুত করা উচিত ৯০ থেকে ১০০টি প্রশ্ন। অনেকে মনে করেন যতগুলি প্রশ্ন শেষ প্রশ্নপত্রে থাকবে তার দ্বিগুণ প্রশ্ন প্রাথমিক তালিকায় থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্নগুলির 'কাঠিন্যমান' (Difficulty value) অনুযায়ী প্রশ্নপত্র সাজাতে হবে। এইভাবে প্রশ্নপত্রগুলি না সাজালে পরীক্ষার্থীরা প্রথম অংশের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য অযথা অধিক সময় ব্যয় করে থাকে এবং পরবর্তী অংশের সহজ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় পায় না। এরূপ ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থীর দক্ষতার যথাযথ পরিমাপ হয় না।

যে সকল প্রশ্ন সকলে পারে অর্থাৎ শতকরা ১০০ জন পরীক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে, সেগুলি বিষয়মুখী অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। আবার যে প্রশ্নগুলি পরীক্ষার্থী-দের কেউই পারে না, সেগুলিও অভীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নগুলি কিছুই পরিমাপ করতে পারে না অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের দক্ষতার তফাত নির্ণয় করতে পারে না।

নতুন বিষয়মুখী প্রশ্নপত্রে কি প্রকারের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। তবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশ্নের ধরন ও নির্বাচন নির্ভরশীল। তবে প্রশ্নপত্র রচনার সময় এই কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্নের উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ যেন বজায় থাকে। পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতার পরিমাপক হিসাবে প্রশ্নের প্রত্যেক শ্রেণী বা ধরন মোটামুটিভাবে একই বিষয় মেপে থাকে। তবে পরীক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। ছোট ছোট বহু ধরনের প্রশ্ন যদি এক সঙ্গে থাকে তবে পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ পাঠ করতেই পরীক্ষার্থীদের বহু সময় ব্যয় করতে হয়। এই কারণে এক জাতীয় প্রশ্ন এক সঙ্গে রাখলে পরীক্ষার্থীদের উত্তর দানে সুবিধা হতে পারে। এই কারণে ভার্নন মনে করেন যে, যদি প্রশ্নপত্রে 'মিল করো সিরিজের' প্রশ্ন রাখা হয়, তবে যেন তার সংখ্যা অন্তত ৫-এর কম না হয়, যদি 'একাধিক উত্তরযুক্ত প্রশ্ন' থাকে, তবে যেন তার সংখ্যা ১০-এর কম না হয়। যদি সত্য-মিথ্যা, মনে করে বলা বা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ধরনের প্রশ্ন থাকে, তবে তাদের সংখ্যা যেন ২০-এর কম না থাকে। এইভাবে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নের সংখ্যা ঠিক করা যেতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, এইভাবে প্রশ্নগুলির সঠিক সংখ্যা স্থির করে এবং এক জাতীয় প্রশ্ন এক সঙ্গে রেখে, তাদের কাঠিন্যমান অনুযায়ী সাজানো প্রয়োজন। তবে এটি প্রশ্ন-কর্তাকে করতে হবে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। এইভাবে সাজালে পরীক্ষার্থীরা সহজ প্রশ্নগুলি প্রথমেই উত্তর দেবার সুযোগ পাবে।

বিষয়মুখী প্রশ্নের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ও গুণাগুণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

শূন্যস্থান পূরণ ও স্মৃতি থেকে উত্তর

Open Complition type and Simple Recall type

এই ধরনের প্রশ্নের শেষে উত্তর লিখবার জন্য শূন্যস্থান থাকে বা একটি বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের স্থান শূন্য রেখে উপযুক্ত শব্দ বসাতে বলা হয়।

উদাহরণ :

১. ভারতে সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ পান কে ?...... ।
অথবা,
ভারতে সাহিত্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ পান......

২ নিম্নলিখিত ছকটিতে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ভগ্নাংশ	দশমিক	শতকরা হার
$\frac{1}{4}$		
	·10	
		20%

৩. আই. কিউ (I. Q.)=?

৪ অভীক্ষা বিজ্ঞানে......নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ, কারণ তিনিই প্রথমে বুদ্ধি অভীক্ষা ......করেন।

এই ধরনের প্রশ্নে প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর নির্দিষ্ট থাকে। উপরের প্রশ্নগুলিতে ২নং প্রশ্নের মার্ক বা নম্বর হল ৬।

উপবোক্ত ধ'নের প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

সুবিধা : এই ধরনেব প্রশ্ন তৈরি করা সহজ এবং রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে এগুলির বিশেষ মিল দেখা যায়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আন্দাজে দেওয়া সম্ভব নয়, এই কারণে এগুলির নির্ভরযোগ্যতা বেশী।

অসুবিধা : এই ধরনের প্রশ্নের প্রধান অসুবিধা এই যে, এগুলি পরীক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার উপর সবিশেষ জোর দিয়ে থাকে।

এই ধরনের প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করবার সময়ে প্রশ্নকর্তাকে কয়েকটি বিষয় সবিশেষ মনে রাখতে হবে। যথা,—

১. পাঠ্য বিষয়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত।

২ প্রত্যেক প্রশ্নের যেন একটি মাত্র নির্দিষ্ট উত্তর থাকে এবং একটি মাত্র শব্দের দ্বারাই যেন প্রশ্নেব উত্তব দেওয়া সম্ভব হয়।

৩. প্রশ্নগুলি যেন অত্যন্ত দীর্ঘ না হয। 'শূন্যস্থান পূরণ কর' ধরনের প্রশ্নে অত্যধিক শূন্যস্থান রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া যায় এই ভাবে শূন্যস্থানগুলি বাক্যে রাখা উচিত।

৪. উত্তরের জন্য নির্দিষ্টস্থান যেন একই প্রকার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়। কোন কোন প্রশ্নকর্তা উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি উত্তবের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছোট বা বড করতে চান।

এইরূপ রাখা ঠিক নয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তরের ধরন সম্পর্কে পূর্বেই আন্দাজ করতে পারে।

প্রশ্নপত্রের মার্কিং-এর সুবিধার জন্য উত্তর দেওয়াব জায়গা সবসময়েই ডান দিকে নির্দিষ্ট করা উচিত। কারণ উত্তরপত্রের বিভিন্ন অংশে উত্তর ছড়ানো থাকলে, উত্তরগুলি খুঁজে বের করবার জন্য পরীক্ষককে অযথা পরিশ্রম করতে হয় এবং এর ফলে দৃষ্টিশক্তিতে ক্লান্তি ঘটে।

সত্য-মিথ্যা সিরিজের প্রশ্ন বা হ্যাঁ-না সিরিজের প্রশ্ন

True-False type or Yes-No series

এই ধরনের অভীক্ষায় অনেকগুলি বাক্য দেওয়া হয় যেগুলি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। সাধাবণত এই বাক্যগুলির অর্ধেক সত্য এবং অর্ধেক মিথ্যা হযে থাকে। বানান অভীক্ষায় বানানটি ভুলভাবে লেখা হতে পাবে বা শুদ্ধভাবেও লেখা হতে পারে।

সত্য-মিথ্যা সিবিজেব অভীক্ষা সকল প্রকার পাঠ্য বিষয়েই ব্যবহার হতে পারে। এই ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করাও সহজ। এই কারণে বিদ্যালযের পরীক্ষায় শিক্ষকেরা এই ধবনের অভীক্ষা প্রচুব ব্যবহার করেন।

এই প্রকারের অভীক্ষাব প্রধান ত্রুটি এই যে, এগুলি সহজেই আন্দাজে উত্তর দেওয়া যায়। ফলে অভীক্ষা হিসাবে এব মর্যাদা তেমনভাবে দেওয়া হয না। তবে একটু সতর্ক হযে ব্যবহাব কবলে এর মূল্য অস্বীকার কবা যায় না। বিষযমুখী পরীক্ষায় এই ধবনের অভীক্ষা ব্যবহার করতে হলে একটু বেশী সংখ্যায সেগুলি দেওয়া উচিত। পরীক্ষায় এই সংখ্যা ৫০% সত্য এবং ৫০% মিথ্যা এইরূপ ভাগ ঠিক নয়। সত্য ও মিথ্যা সিরিজের বাক্য নির্বাচন লটারী কবে করা উচিত। এই সম্পর্কে একটি প্রচলিত পদ্ধতি হল, একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে সোজা বা উল্টো দিক অনুযায়ী সত্য বা মিথ্যা বাক্যগুলি সাজিয়ে রাখা। এই ব্যবস্থায় হয়তো ২০টি বাক্যেব মধ্যে অর্ধেকের বেশী সত্য বাক্য হতে পারে এবং বাকি অংশ হবে মিথ্যা। অবশ্য এই ধরনের অভীক্ষায় আন্দাজে উত্তর দেবার সুবিধা থাকায়, পরীক্ষার্থীদের আগেই সতর্ক কবে দেওয়া উচিত যে, আন্দাজে ভুল উত্তর দিলে পরীক্ষার্থীদের শাস্তি পেতে হবে। এই সম্বন্ধে নম্বর দেওয়ার জন্য পূর্বে উল্লিখিত সূত্র প্রয়োগ কবে মার্ক দেওয়া উচিত অর্থাৎ আন্দাজে ভুল উত্তর দেওয়ার জন্য আনুপাতিক নম্বর বাদ দেওয়া উচিত।

সত্য-মিথ্যা সিরিজের অভীক্ষার উদাহরণ

পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ : নিম্নে কয়েকটি বাক্য দেওয়া আছে, যেগুলি কয়েকটি সত্য এবং কয়েকটি মিথ্যা। মনোযোগ দিয়ে বাক্যগুলি পাঠ কর এবং সত্য বাক্যগুলির পাশে '+' চিহ্ন এবং মিথ্যা বাক্যগুলিব পাশে '−' চিহ্ন ব্যবহার কর।

১ ১৮৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়।

২. দিল্লী ভারতের রাজধানী।

৩. স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৪. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু আছে।

৫. বিশ্বে পাট একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে জন্মে।

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice type)

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা আর এক ধরনের বহুল ব্যবহৃত অভীক্ষা। এই ধরনের অভীক্ষায় একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর বেছে নিতে বলা হয়। প্রশ্নটির উত্তর ৬/৭টি হতে পাবে বা ৪/৫টিও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুটিও হতে পাবে। ২/৩টি উত্তর যুক্ত প্রশ্নগুলি তেমন নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ পরীক্ষার্থী আন্দাজে উত্তব দেওযার চেষ্টা করতে পারে। প্রশ্নের উত্তর অধিক হলে অর্থাৎ ৬/৭টি হলে, প্রশ্নপত্রের অনেকখানি জায়গা উত্তবগুলি দখল করে থাকে। এটি অসুবিধাজনক। সাধারণত প্রশ্নেব ৪টি উত্তরই শিক্ষাবিদগণ কাম্য মনে করেন। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে আন্দাজে উত্তব দেওযাব সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

প্রশ্নটিব উত্তর যদি একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায়, তাহলে একই লাইনে প্রশ্নেব সঙ্গে উত্তবগুলি দেওয়া যেতে পাবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পবিষ্কার করা যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ ১। জল (২১২°, ২২০°) ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে ফোটে এবং (৩০/৩২) ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে জমে যায়।

২। বুদ্ধি পরীক্ষার প্রথম বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা প্রস্তুত করেন (বিনে, থর্নডাইক)। ইত্যাদি।

যদি প্রশ্নেব একাধিক উত্তর দেওয়া হয়, তাহলে তা প্রশ্নেব ডানদিকে এমনভাবে ক্রমিক নম্বব অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা উচিত যে, পরীক্ষার্থী সহজেই তা চিহ্নিত করতে পারে। উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে প্রকৃত উত্তবটিকে চিহ্নিত করতে না বলে পরীক্ষার্থীদেব উত্তরের ক্রমিক সংখ্যাটিকে নির্দিষ্ট করতে বলা উচিত। এতে পরীক্ষার্থীর পরিশ্রম ও বিরক্তি অনেক হ্রাস পেতে পারে।

উদাহরণ ঃ

নিম্নলিখিত কোন্ শিক্ষাদলিলটি আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছে ?

১। মেকলেব মিনিট্।

২। উডেব ডেসপ্যাচ।

৩। হান্টাব কমিশন বিপোর্ট।

৪। সার্জেন্ট বিপোর্ট।

উঃ ২।

বলাবাহুল্য, উপবোক্ত উত্তরের মধ্যে ২নং বিষয়টিই প্রকৃত উত্তর। সুতবাং শিক্ষার্থীর উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ২ সংখ্যাটি বসাতে হবে।

বহুনির্বাচনী অভীক্ষাকে আবাব 'সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ উত্তর' ধরনের অভীক্ষায় পরিবর্তিত কবা যায়।

উদাহরণ :

আমরা চশমা পরি, কারণ—

১। আমাদের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পায়।

২। খারাপ চোখে ভাল দেখবার জন্য।

৩। লোকে মান্য করে।

৪। আমাদের সুন্দর দেখায়। উঃ ২।

মিলকরণ অভীক্ষা (Matching Test)

মিলকরণ অভীক্ষার সঙ্গে বহুনির্বাচনী অভীক্ষার কিছু মিল আছে। প্রকৃত পক্ষে মিলকরণ অভীক্ষা 'বহুনির্বাচনী অভীক্ষার' একটি নতুন বিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়। এই অভীক্ষায় থাকে দুটি স্তম্ভ বা কলাম্ এবং এই দুইটি স্তম্ভের মধ্যে বিষয়ের মিল দেখানোই এই ধরনের অভীক্ষার উদ্দেশ্য। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে দেখানো যায়।

উদাহরণ :

নির্দেশ : প্রথম স্তম্ভের প্রদত্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য কর। এই বিষয়গুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রদত্ত বিষয়গুলির মিল আছে। উভয় স্তম্ভের মধ্যে মিল আছে এইরূপ বিষয়গুলি দেখাও। দ্বিতীয় স্তম্ভের পাশে প্রথম স্তম্ভের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি উল্লেখ করে মিল দেখাও।

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
১। বুদ্ধি অভীক্ষা।	ক। ফ্রয়েড্
২। শিখনের সূত্র বা নিয়ম।	খ। বিনে।
৩। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত।	গ। প্যাবলভ্
৪। মনঃ সমীক্ষণ।	ঘ। বুদ্ধি।
৫। নতুন পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতা	ঙ। বর্সা।
৬। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ।	চ। থর্নডাইক।
৭। মসীছাপ অভীক্ষা।	ছ। গাণিতিক গড়।

শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্র
Cumulative Record Card

শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যবহার ছাড়াও আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে গ্রহণ করা হয়, তা হল **ক্রমোন্নতি-জ্ঞাপক বিবরণ পত্র**। ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্র হল শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতির একটি ধারাবাহিক বিবরণ। এই বিবরণ পত্রটি প্রস্তুত হয় একটি কার্ডের মত করে বা একখানি পুস্তিকার মত করে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রটি ব্যবহার করা হয় :

১. শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য।

২. ছাত্র-ছাত্রীদের কোন বিষয়ের উন্নতি বা দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা করবার জন্য এবং তদনুযায়ী তাদের সাহায্য করা যাতে তারা দুর্বলতার কারণগুলি পরিহার করে বিষয়টি বা বিষয়গুলিতে উন্নতি করতে পারে।

৩. বিদ্যালয় পরিবেশে অভিযোজনে শিক্ষার্থী যে অসুবিধা বোধ করে সেই সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তদনুযায়ী শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা।

৪. শিক্ষার্থীকে নিয়মিত পরামর্শ দেবার উপযোগী বিবরণ বা উপাত্ত-এর সূত্র হিসাবে।

৫. উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্দেশনের জন্য।

৬. বিভিন্ন পরীক্ষার বিকল্প হিসাবে।

৭. শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ ধারার একটি চিত্র হিসাবে। এই বিবরণের মাধ্যমে অভিভাবক সম্মেলনে শিক্ষকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। এই বিবরণ পত্রের ভিত্তিতে অন্য বিদ্যালয় বা কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রয়োজন ক্ষেত্রে রিপোর্ট দেওয়া যেতে পাবে।

৮. বৃত্তিমূলক নির্দেশনের জন্য।

ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিববণ পত্র শিক্ষার্থীর একটি সামগ্রিক বিকাশেব চিত্র উপস্থিত করে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের দাযিত্ব বা ভূমিকা এব দ্বারা বেশ বুঝতে পারা যায়। যদি কোন কাবণে শিশুব উন্নতি ব্যাহত হয়, তাহলে তাব কারণও এব দ্বাবা নির্দেশ করা যেতে পাবে এবং সেই অনুসারে শিশুর উন্নতির বাধা দূব করে শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দানেব ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যালযের কার্যক্রমের মধ্যেও কোন ত্রুটি থাকলে এর সাহায্যে দূব কবা যায। কিণ্ডাবগার্টেন থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুব ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হবে।

সংজ্ঞা ও বিবরণ : শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত ধারাবাহিক বিববণ যে পত্রে বা কার্ডে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে শিক্ষার্থীর 'ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্র' বলে। ইংরাজীতে একে বলা হয় কিউমুলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড।

এই পত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা, বৃত্তি ও সামাজিক উপযোজনের ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবরণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা—

১. ছাত্রেব পরিচয় ও অন্যান্য সাধারণ বিবরণ।

২. পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ।

৩. শারীরিক ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিবরণ।

৪. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে উন্নতির রেকর্ড বা মার্ক।

৫. মানসিক ও শিক্ষাগত অভীক্ষার প্রয়োগ ফল।

৬. পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ।

৭. ছাত্রের বিশেষ আগ্রহ সম্পর্কে বিবরণ।

৮. ছাত্রের বিশেষ ধরনের দক্ষতা বা প্রতিভা সম্পর্কিত বিবরণ।

ছাত্র যেদিন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে সেদিন থেকেই তার বিবরণ পত্র রাখতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের বিবরণ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বিবরণ পত্রটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা ভর্তি করা উচিত। তবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ সংগ্রহের সময়ে শিক্ষকদের নিজেদের নিকট এই প্রশ্ন করতে হবে নির্দিষ্ট বিষয়টির বিবরণ সংগ্রহের দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ গুণ বা দোষ জানা যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট বিষয়টি ছাত্রের শিক্ষা বা বৃত্তিগত নির্দেশনের ক্ষেত্রে কি ভাবে সাহায্য করতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলি যাচাই করে লিপিবদ্ধ করলে 'ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্রে' একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংগৃহীত হতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাদ পড়তে পারে।

বিবরণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ঐ বিষয়গুলির বিশেষ ব্যবহার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় : ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয় যেন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, আগ্রহ, প্রবণতা এবং বৃত্তীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দিতে পারে।

১ শিক্ষার্থীর পরিচয় ও অন্যান্য বিবরণ : বিবরণ পত্রে শিক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, বয়স, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, ধর্ম, জাতি প্রভৃতি বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। এইগুলি ছাত্রের সঠিক পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন। এই সঙ্গে ছাত্রের একটি ফটো দিলে পরিচয়টি সঠিক ও যথাযথ হতে পারে।

২. পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ : এই পর্যায়ে ছাত্রের পিতার পেশা, পারিবারিক আয়, পরিবারের মোট লোকসংখ্যা, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকবে। পরিবারে শিশুর আচরণ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সে প্রাক্ষোভিক নিরাপত্তা বোধ করে কিনা, প্রভৃতি বিষয় এই পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। শিশুর পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নানাভাবে শিশুর মনোবিকাশকে সাহায্য করে। শিশুর প্রাক্ষোভিক বাধা বা উন্নতি পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবের ফল। সুতরাং শিক্ষা ও বৃত্তি বিষয়ক নির্দেশনের জন্য এই বিবরণগুলি বিশেষ প্রয়োজন।

৩. বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার লব্ধ মার্ক : আমাদের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় লব্ধ মার্ক থেকে শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। ছাত্রের সহযোগিতার ক্ষমতা, সঠিকভাবে কাজ করবার যোগ্যতা, হস্তলিপির ধরন ও সৌন্দর্য, নিজের মনোভাব ঠিক ভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা, এই পরীক্ষার সাহায্যে জানতে পারা যায়। পরীক্ষার লব্ধ মার্ক বিশ্লেষণ করলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে কোন বিষয়ে উন্নতি করতে পারে তার একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য পরীক্ষার মার্কের সাহায্যে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার একটি আংশিক চিত্রই

মাত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে কোন বিষয়ের উপর উচ্চ মার্ক শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত দক্ষতা এবং নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহের পরিচয় দিয়ে থাকে। আবার কোন বিষয়ের অল্প নম্বর ঐ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেষণার অভাব সূচিত করে। তবে পরীক্ষার্থীর দক্ষতা সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্য পরীক্ষার ফলের সঙ্গে ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্রের বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

৪. **শারীরিক ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিবরণ ঃ** এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবরণ। শিশুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষার রিপোর্ট, শারীরিক অবস্থা, উচ্চতা, ওজন, বুকের মাপ, চোখ ও শ্রবণশক্তি সম্পর্কে পরীক্ষার রিপোর্ট প্রভৃতি শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা প্রয়োজন। যেমন পুলিশ বা মিলিটারী সার্ভিসে স্বাস্থ্যের উচ্চমানের প্রয়োজন হয়। আবার শিক্ষার্থীর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মনোবিকাশের জন্য সুস্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

৫ **মানস ও শিক্ষাঅভীক্ষা প্রয়োগের ফল ঃ** আমাদের দেশে বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য প্রমাণ নির্ধারিত অভীক্ষা ব্যবহারের সুযোগ কম। তবুও যতদূর সম্ভব নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সম্ভবক্ষেত্রে শিক্ষাগত প্রমাণ নির্ধারিত-অভীক্ষা প্রয়োগ করে উভয় ফলের মধ্যে তুলনা করা উচিত। যদি বুদ্ধির মানের সঙ্গে শিক্ষাগত মানের বিশেষ তফাত পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শিক্ষকদের উচিত তার কারণ অনুসন্ধান করা। অনেকে 'আই. কিউ'-এর সঙ্গে শিক্ষা-অঙ্ক বা অ্যাচিভমেণ্ট কোসান্টের তুলনা করতে চান। এতে বুদ্ধির অনুরূপ শিক্ষাগত সাফল্যের তুলনা করা যায়। প্রমাণ-নির্ধারিত বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগের সুযোগ না থাকলে কোন ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপের জন্য ৫ পয়েণ্ট স্কেলে শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করে তার গড়মানের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ করা যেতে পারে। যে সমস্ত শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মান বেশী, স্কুলের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ নয় তার কারণ শিক্ষকদের অনুসন্ধান করা উচিত এবং তদনুসারে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশন দেওয়া উচিত।

৬ **পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত কার্যাবলী ঃ** বিদ্যালয়ের বাইরে এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত যে সকল কাজ করতে ভালবাসে, সেগুলি মনোবিজ্ঞানীদের মতে তার আগ্রহ ও বিশেষ দক্ষতার পরিমাপক। এই সকল কাজ ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরের কোন চাপে পড়ে করে না, নিজেদের প্রকৃত আগ্রহ থেকেই করতে ভালবাসে। সুতরাং এই সকল কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করে তাদের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। ছাত্রদিগকে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশনের জন্য এই বিবরণের সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

৭ **আগ্রহ ঃ** বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের আগ্রহ তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির ধরন সম্পর্কে একটি সুন্দর আভাস দান করতে পারে। ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণপত্রে আগ্রহের বৈচিত্র্য

ও গতিরেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এতে একদিকে যেমন কোন বিশেষ আগ্রহেব পরিবর্তনধারাটি বুঝতে পারা যায়, তেমনি কোন বিষয় সম্পর্কে যদি বিশেষ আগ্রহটি মোটামুটি স্থায়ীভাবে দেখা যায়, তবে শিক্ষা ও বৃত্তির উপব তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কেও শিক্ষকদেব পক্ষে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হতে পারে। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে অস্থাযীভাবে শিশুর আগ্রহ দেখা যায় বটে, তবে কিছুদিন পরে তার পরিবর্তন হতে পাবে।

৮. **বিশেষ প্রতিভা :** স্পীয়ারম্যান যে মানসিক শক্তিকে বিশেষ গুণ বলেছেন, শিক্ষার্থীর মধ্যে এই বিশেষ গুণটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। অবশ্য অনেক সময় আগ্রহের সঙ্গে বিশেষ প্রতিভার একটি মিল দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা, অক্ষমতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে নানা বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। এই বিষয়গুলি তাদেব শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে সবিশেষ সাহায্য কবেব।

এই সম্পর্কে বিশেষ প্রবণতা অভীক্ষা প্রযোগ করে শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি কারও সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা থাকে, চারুশিল্পে তাদের সহজ কৃতিত্ব চোখে পড়ে অথবা যদি তাদের বিশেষ যান্ত্রিক দক্ষতা বা অন্য বিশেষ ধরনের শক্তি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলে ঐগুলি ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঐ সকল বিবরণ যেমন ছাত্রের শিক্ষা নির্দেশনেব জন্য প্রয়োজন, তেমনি তার বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় বৃত্তি নির্দেশনেব কাজে।

শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নে ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের বিশেষ ভূমিকা

শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নে ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রথমত বিবরণপত্রে শিশুর ধারাবাহিক উন্নতি ও বিকাশের বিবরণ উল্লিখিত থাকে। সুতরাং মূল্যায়নে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি হিসাবে একে ব্যবহার করা যায়। বিবরণপত্রে যেভাবে বহুদিন ধরে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ, বিচার, মূল্যায়ন, পরীক্ষা ও অভীক্ষা প্রয়োগের ফল প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে, তাতে এই পদ্ধতি জীববিদ্যা বা নিদান মনস্তত্ত্বে ব্যবহৃত জনি (জেনেটিক্) মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়।

ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণপত্রের বিশেষ উপযোগিতা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান সম্মত দুটি মন্তব্য করা যায়। প্রথমত, কোন গুণ সম্পর্কে সংগৃহীত উপাত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক দক্ষতার মান উচ্চ হয়, যদি ঐগুলি অনেকদিন ধরে নিয়মিত (৬ মাস বা ১ বৎসর অন্তর) সংগ্রহ করা হয়। এই মন্তব্যের অর্থ এই যে, কোন বিষয় সম্পর্কে ছাত্রের সাফল্যাঙ্ক যদি একটি সময় বা পিরিয়ড্ অন্তর ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে, তবে ছাত্রের ঐ বিশেষগুণ বা ব্যক্তিত্ব বা প্রবণতা সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হতে পারে।

দ্বিতীয় মন্তব্যটিও সবিশেষ মূল্যবান। সেটি হল যে, সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের

বিবরণ একটি বিষয়ের বিবরণ অপেক্ষা পাত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধিকতর সুষ্ঠু-ভাবে ভবিষৎবাণী করতে পারে। অবশ্য যদি ঐগুলি যথাযোগ্যরূপে বিশ্লেষণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ছাত্রের সামগ্রিক শিক্ষাগত উন্নতির চিত্র পাওয়া যায় যদি ছাত্রের স্কুল মার্ক, ছাত্রের বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা, 'বুদ্ধি ও শিক্ষা অভীক্ষার প্রয়োগফল একত্রে বিচারে করে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। অবশ্য এই উপাত্ত-গুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয় যদি ছাত্রের বিভিন্ন আচরণ ও মনস্তাত্ত্বিক গুণগুলি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা প্রয়োগের দ্বারা বিচার ও পরিমাপের চেষ্টা করা হয়।

সামগ্রিক বিষয় সমন্বিত একটি ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিববণপত্র শিক্ষার্থীর নানাবিধ যোগ্যতা বিকাশের ধাবাবাহিক চিত্র হিসাবে শিক্ষকদের নিকট একটি উপযুক্ত পরীক্ষার পদ্ধতি হিসাবে সবিশেষ প্রযোজনীয়। এব অন্য ব্যবহার এই যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্বেব যোগ্যতার মান এর থেকে শিক্ষক সর্বদাই জানতে পারেন। শুধু এই বিবরণ শিক্ষকদেব নিকটই প্রয়োজনীয় নয়, এর প্রয়োজন রযেছে নির্দেশন পরামর্শদাতা, পিতামাতা, এবং অনেকক্ষেত্রে ছাত্রেব নিজের নিকট।

ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের নমুনা

ক : সাধারণ বিবরণ—

১। শিক্ষার্থীর নাম।

২। জন্মতারিখ।

৩। পিতাব নাম।

৪। পিতাব পেশা।

৫। ঠিকানা।

৬। যে সমস্ত বিদ্যালযে পূর্বে পডাশুনা করেছে তার বিবরণ এবং অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কারণ।

৭। পারিবারিক ইতিহাস। ভাই-বোনদের ভিতব শিক্ষার্থীর স্থান কিরূপ? অর্থাৎ শিক্ষার্থী কি প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র না অন্য কোন পর্যায়ের?

৮। পারিবাবিক শৃঙ্খলার মান।

৯। পাবিবাবিক অবস্থা, বিশেষ করে আর্থিক অবস্থার মান কিরূপ?

১০। পিতামাতা শিশুকে ভবিষ্যতে কি বৃত্তিতে দিতে চান।

১১। ছাত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি?

খ : শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উন্নতির বিবরণ—

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ছাত্রের উন্নতির বিবরণ বিভিন্ন বৎসরে এবং শ্রেণীতে কিরূপ তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হবে।

বিষয় (ক) **বৎসর/শ্রেণী** (খ) **বৎসর/শ্রেণী** (গ) **বৎসর/শ্রেণী**

মাতৃভাষা।

ইংরাজী ভাষা।

তৃতীয় ভাষা।

গণিত।

বিজ্ঞান।

ইতিহাস।

ভূগোল।

অন্যান্য বিষয়।

শিল্প ও কর্মশিক্ষা

গ : মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ—

বুদ্ধির মান, আই. কিউ. মনোবয়স।

বিশেষ প্রবণতা।

আগ্রহ।

মনোভাব (অ্যাটিচুড্)।

ব্যক্তিত্ব : নিম্নরূপ গুণাবলীর ভিত্তিতে

(ক) অন্যের সাহায্য বিনা নিজে নিজে কোন কাজ করবার উদ্যম।

(খ) চারিত্রিক সততা।

(গ) অধ্যবসায়।

(ঘ) নেতৃত্ব ক্ষমতা।

(ঙ) আত্মবিশ্বাস।

(চ) প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

(ছ) সামাজিক মনোভাব।

(জ) ব্যক্তিত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়।

ঘ : সহ-পাঠক্রমিক কাজের বিবরণ—

সাহিত্য বিষয়ক গুণ।

গল্প রচনার ক্ষমতা, প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা, কবিতা রচনার ক্ষমতা।

বিতর্ক সভায় বিতর্কের ফল। অভিনয় দক্ষতা।

সঙ্গীত।

(ক) কণ্ঠসঙ্গীত, (খ) যন্ত্র সঙ্গীত।

অঙ্কন দক্ষতা।

(ক) কলাকৌশল, (খ) অভিব্যক্তি, (গ) মৌলিকতা।

খেলাধুলা।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে কি ধরনের দায়িত্ব নিয়ে থাকে?

বিদ্যালয় পত্রিকা। উৎসব। ভ্রমণ।

ঙঃ বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থী কি ধরনের কাজ করতে ভালবাসে ?

হবি ঃ কি কি জিনিস সংগ্রহ করতে ভালবাসে ? নতুন কিছু উদ্ভাবনের ঝোঁক আছে কিনা ?

ক্লাব ঃ ক্লাবের উদ্দেশ্য, ক্লাবের সভ্যসংখ্যা।

বন্ধু ঃ শিক্ষার্থীর বন্ধুদের সংখ্যা, শ্রেণীর বন্ধু, বাইরের বন্ধু।

চঃ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিবরণ—

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ, এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যথা—উচ্চতা, ওজন, চক্ষুর তীক্ষ্ণতা, বুকের মাপ ইত্যাদি।

মন্তব্য ঃ উপরোক্ত বিষয়গুলির মান বা গ্রেড্ পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে শ্রেণীশিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেবেন। সাধারণত এক বৎসরের শেষে নতুন ক্লাশে উঠবার সময়ে এই ফরম পূরণ করা উচিত।

ফরম পূরণের সংকেত : শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

মাতৃভাষা A

ইংরাজী B

গণিত B

বিজ্ঞান A

অথবা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত গুণ :

চারিত্রিক সততা B

অধ্যবসায় C

প্রাক্ষোভিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা B

ইত্যাদি।

ছাত্র সম্পর্কে মন্তব্য

১। বিদ্যালয়ে যে ধরনের দায়িত্বশীল কাজ করছে সেই সম্পর্কে মন্তব্য

২। শ্রেণী শিক্ষকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর

৩। প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর উন্নতির ধারা অনুসরণ
Follow up for Improvement

মূল্যায়নের কোন পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর কোন বিষয় বা বিষয়সমূহের উন্নতির হার পরিমাপ করা যেতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ছাত্র যখন ভর্তি হয় তখন সে যে জ্ঞান, চিন্তা শক্তি, কর্মনিপুণতা, আচরণের ভঙ্গি, বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, মনোভাব ও আদর্শ নিয়ে আসে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবার পূর্বে সেগুলির উৎকর্ষ বহুলাংশে বর্ধিত হয়। কিন্তু সকল ছাত্রের পক্ষেই এই উৎকর্ষতার মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তখন শিক্ষকদের উচিত অবনতির কারণগুলি অনুসন্ধান করা

এবং অবনতির কারণগুলি দূর করে শিক্ষার্থীর উন্নতির হার বজায় রাখতে তাকে সাহায্য করা।

থর্নডাইক (Edward L Thorndike) এবং গেট্স (Arthur I Gates 1931) লিখেছেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় পরিবেশে নানা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ও আচরণে নানা পরিবর্তন ঘটে থাকে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার ফলেই শিশু শিক্ষালাভ করে। থর্নডাইক লিখেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উৎকর্ষ ঘটে থাকে। যথা—

১. নতুন জ্ঞানলাভ ২. চিন্তা করবার, বিচার করবার, এবং যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা, ৩. কর্মনিপুণতা বা দক্ষতার বৃদ্ধি, ৪ আচরণের উৎকর্ষতা, ৫. বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ, বোধ (Comprehension), মনোভাব ও আদর্শের উন্নয়ন।

শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশুদের মানসিক পরিণমন (Maturity) প্রভৃতি বিবেচনা করে তাদের বিকাশের মান স্থির করা উচিত। কোন কারণে যদি কোন বিষয়ে শিশুর উন্নতি ব্যাহত হয় তা হলে তার কারণ বের করবার চেষ্টা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সেই অনুসারে নির্দেশ দিতে হবে যাতে সে তার উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। যে যে কারণে শিক্ষার্থীর উন্নতি ব্যাহত হতে পারে, সেই কারণগুলি আবিষ্কারের জন্য যেমন শিক্ষার্থীর কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের নিদান অভীক্ষার (Diagnostic test) প্রয়োগের মারফত ত্রুটি বা অনুন্নতির কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। নিদান অভীক্ষার অভাবে সাধারণ শিক্ষা-অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে ত্রুটি নির্দেশ করা যায়। ত্রুটির কারণগুলি বের করে শিক্ষকদের পরবর্তী কাজ হবে শিক্ষার্থীকে এমন কাজ দেওয়া বা এমনভাবে সাহায্য করা যাতে সে তার ত্রুটিগুলি দূর করতে পারে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ঐ সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারাবাহিক পাঠের ব্যবস্থা একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

উপযুক্ত নির্দেশনার (Guidance) মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে নিজের ত্রুটি নিজে আবিষ্কার করতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। উপরে যে গুণ বা যোগ্যতার তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, ঐগুলির কিছু কিছু সাধারণ মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা যেতে পারে। যেমন, শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খবর (Information) পরিমাপ করা যায় সাধারণ বিষয়মুখী পরীক্ষার সাহায্যে। শিক্ষা অভীক্ষায় নানা ধরনের শব্দজ্ঞান অভীক্ষা (Vocabulary tests) পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে ঐগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শব্দ জ্ঞানের মান বের করা হয়। আমাদের দেশে ঐ ধরনের অভীক্ষা তেমন পাওয়া যায় না। এই কারণে তা পরিমাপের জন্য বিষয়মুখী পরীক্ষার সাহায্য নেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষার্থীর চিন্তা করবার ক্ষমতা, বিচার দক্ষতা, যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা সহজে পরিমাপ করা যায় না। পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে ঐগুলি পরিমাপের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিষয়মুখী পরীক্ষার 'সবচেয়ে সঠিক উত্তর দাও' ধরনের প্রশ্ন থেকে যুক্তিশক্তি বা বিচার বুদ্ধির পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কর্মনিপুণতা বা দক্ষতা পরিমাপের জন্য আমাদের উচিত বিদ্যালয়ে কর্ম অভিজ্ঞতা বা কর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির উৎকর্ষ পরীক্ষা করে কর্মনিপুণতা পরিমাপ করা যেতে পারে।

অন্যান্য গুণগুলি পরিমাপের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের 'কিউমুলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড', ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা (Anecdotal reports), ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক ডায়েরী প্রভৃতি বিচার করা যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দলগত কাজের ব্যবস্থা করে অর্থাৎ শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Excursions), বিতর্কসভা, চড়ুইভাতি প্রভৃতির সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণের উৎকর্ষতা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং আচরণে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে সেই অনুসারে '**নির্দেশনের**' (Guidance) মাধ্যমে তা দূর করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশন

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নতির ধারা কিরূপ এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক যোগ্যতাকে আরও বাড়ানো যেতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই উচিত একটি নির্দেশন কার্যক্রম (Guidance programme) গ্রহণ করা। কিভাবে নির্দেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা বোঝবার জন্য আমাদের উচিত নির্দেশন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে অভীক্ষা বিজ্ঞানের প্রথমে যে প্রসার হয়েছিল, বর্তমানে তাকে আরও প্রসারিত করে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজস্ব এমন কতকগুলি গুণ থাকে, যেগুলি তাকে কোন্ বিশেষ ধরনের কাজের উপযুক্ত হতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞানের যে শাখা ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তি নির্দেশনের ক্ষেত্রে আলোচনা করে তাকে বলা হয় 'বৃত্তি-মনোবিজ্ঞান' (Vocational psychology)। বৃত্তি মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার বৈশিষ্ট্য বা গুণ নির্দেশ করে, তেমনি বিভিন্ন বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করে। বৃত্তি মনোবিজ্ঞানের দুটি শাখা প্রধান। প্রথমটি হল **বৃত্তি-নির্দেশন** অর্থাৎ এই পর্যায়ে ব্যক্তিকে তার গুণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করে উপযুক্ত বৃত্তি নির্দেশ করা হয়। দ্বিতীয়টি হল, **বৃত্তি নির্বাচন** অর্থাৎ একটি বিশেষ বৃত্তির জন্য আবেদন-কারীদের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা।

কিন্তু বর্তমানে **নির্দেশন** কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ অর্থে নির্দেশন হল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও বৃত্তি সম্পর্কে নির্দেশ দান করা। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে নির্দেশনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে না। সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে নির্দেশনের আধুনিক সংজ্ঞাটি এইভাবে দেওয়া যেতে পারে।

যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাক্ষোভিক সমন্বয়ে মানসিক দৃঢ়তা, সামাজিক ও নাগরিক সামঞ্জস্যতা অথবা বৃত্তীয় যোগ্যতা

ও কর্মসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য লাভ করে থাকে, তখন ঐ পদ্ধতিটিকে নির্দেশন বলা হয়। এই ধরনের নির্দেশনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি ব্যক্তিকে নিজের সমস্যা নিজে বুঝতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের উপায় নিজের প্রচেষ্টায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেক স্তরে কমবেশি নির্দেশনের কাজ চলছে। বয়স্কেরা প্রতিনিয়ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন; এই নির্দেশন কখনও বা নিজস্ব আচরণের দ্বারা দেওয়া হয়, কখনও বা উপদেশের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই নির্দেশনের সময়ে নির্দেশন দাতা এবং নির্দেশন গ্রহীতা উভয়ের নির্দেশনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কোনরূপ সচেতনতা থাকে না। এই ধরনের নির্দেশনকে অপ্রত্যক্ষ বা অদৃষ্ট (Unseen) নির্দেশন বলে।

মনোবিজ্ঞানীরা নির্দেশনকে তার উদ্দেশ্য ও কাজ অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা,—

১. শিশু-নির্দেশন (Child guidance)
২. শিক্ষাগত নির্দেশন (Educational guidance)
৩. বৃত্তীয় নির্দেশন (Vocational guidance)
৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশন (Health guidance)
৫. সামাজিক নির্দেশন (Social guidance)
৬. নাগরিক ও নৈতিকতা সম্পর্কে নির্দেশন (Citizenship and moral guidance)
৭. সুষ্ঠুভাবে অবসর বিনোদন সম্পর্কে নির্দেশন (Guidance for leisure)
৮. পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য নির্দেশন (Guidance for parents)

আমরা সাধারণত তিনটি বিষয়ে নির্দেশনকে ব্যবহার করে থাকি। যেমন,—
১. শিশু-নির্দেশন, ২ শিক্ষাগত নির্দেশন ও ৩. বৃত্তীয় নির্দেশন।

শিশু নির্দেশনের সংজ্ঞা: বিশেষ ধরনের শিশু চিকিৎসালয় বা ক্লিনিকের মাধ্যমে ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় যে সকল শিশু কঠিন আচরণগত সমস্যা বা শিক্ষাগত সমস্যার আবর্তে পতিত হয়েছে বা নানা বিষয়ে অনগ্রসর তাদের সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং তদনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতিকে **শিশু-নির্দেশন** বলে।

শিক্ষাগত নির্দেশনের সংজ্ঞা: প্রমাণ-নির্ধারিত মানস ও শিক্ষাগত অভীক্ষার প্রয়োগ ফল, বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্র ও অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বিষয়গুলি শিক্ষালাভের জন্য নির্বাচন করবে, সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ও তাদের পিতামাতাদের পরামর্শ-দানকে **শিক্ষাগত নির্দেশন** বলে। আধুনিক শিক্ষাগত নির্দেশনে

শিক্ষার উপজাত ফল, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উন্নতির ধারা অনুসরণ

বিষয় নির্বাচনে সাহায্য কবা ছাড়াও শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় পবিবেশে সঠিকভাবে উপযোজ্য সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বৃত্তীয় নির্দেশনের সংজ্ঞা ঃ বুদ্ধি অভীক্ষা, শিক্ষা অভীক্ষা, বিশেষ প্রবণতা অভীক্ষা, দক্ষতা অভীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা প্রভৃতি প্রয়োগ ফলের ভিত্তিতে, বিদ্যালয়ের উন্নতি প্রতিবেদন, সমাজের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সুযোগ-সম্ভাবনাকে বিবেচনা কবে, একটি ধারাবাহিক সুষ্ঠু কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদেব উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনে পরামর্শদান এবং সাহায্যকে **বৃত্তীয় নির্দেশন** বলে।

শিক্ষাগত নির্দেশন ও নির্বাচন

শিক্ষাগত নির্দেশনের সংজ্ঞা আমবা পূর্বে দিয়েছি। কিন্তু শিক্ষাগত নির্দেশন আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই বর্তমানে শিক্ষাগত নির্দেশনের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে শিক্ষাগত নির্দেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও সমস্যা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১. বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও কার্যক্রমে ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযোজনে সাহায্য করা।

২. নিজেদের গুণাগুণ ঠিক মতো বিচার করে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-ক্রমে ঠিকমতো উন্নতিলাভ করতে পারে সেই সম্পর্কে তাদের সাহায্য করা।

৩ ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিচারে সাহায্য করা যাতে তাবা নিজেদের যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে পারে।

৪. মাধ্যমিক পবীক্ষার শেষ শ্রেণীতে ভবিষ্যৎ বৃত্তিব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে যাতে তারা উপযুক্ত পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে পারে সেই সম্পর্কে তাদেব যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

শিক্ষাগত নির্দেশনের কার্যক্রম ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত নির্দেশন দেওযা উচিত। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের ১১-১৫ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই শিক্ষাগত নির্দেশন প্রদান করা উচিত। কাবণ এই বয়সে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সবচেয়ে বেশি প্রকট এবং এই বয়সেই ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয় নির্বাচন ও বিদ্যালয় পরিবেশে উপযোজনেব প্রয়োজন বেশি করে অনুভব কবে, এই বয়সেই বিদ্যালয়ে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

শিক্ষাগত নির্দেশনের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হল কয়েকটি স্কুল নিযে একটি স্কুল কমপ্লেক্স বা দল গঠন করা। প্রতিটি বিদ্যালয় দলের জন্য একটা স্কুল ক্লিনিক্ বা বিদ্যালয় চিকিৎসাগার স্থাপন করা দরকার। এই বিদ্যালয় চিকিৎসাগারে থাকবে একজন মনোরোগ চিকিৎসক, একজন মনোবিজ্ঞানী ও একজন সমাজকর্মী। উপরোক্ত কর্মীরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞানের যে অংশে তারা বিশেষজ্ঞ, সেখানে কাজ করবে।

মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে ছাত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণ সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। যথা—

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্র—

২. প্রশ্ন তালিকার মাধ্যমে ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিবরণ।

প্রশ্ন তালিকা প্রস্তুত সম্পর্কে কয়েকটি কথা

প্রশ্ন তালিকার গঠন ও ভাষা হবে সরল এবং উদ্দেশ্য হবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ধরনের যোগ্যতা, আগ্রহ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা। কি ধরনের প্রশ্নের মারফত এই বিবরণ সংগ্রহ করা হবে তার কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল।

১ ছাত্র পূর্ববর্তী শ্রেণীতে কোন্ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উচ্চ নম্বর পেয়েছে ?

২ কোন্ কোন্ বিষয়ে ছাত্রের যোগ্যতা গড়মানের নিচে ?

৩. নিম্ন শ্রেণীগুলিতে লব্ধ নম্বর পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলিতে লব্ধ নম্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ কিনা ? যদি না হয় কি ভাবে তা পৃথক ?

৪. ছাত্রটির বিদ্যালয়েব বিভিন্ন কাজ গুণগত দিক থেকে মোটামুটি ভাবে একই রকম কিনা ? যদি না হয় তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা পৃথক এবং কেন ?

৫. ছাত্রের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিত কিনা ?

৬. বিদ্যালয়েব পরীক্ষার ফল ছাড়া ছাত্রেব যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষকদের ও পিতা-মাতার মতামত কি ?

৭ ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের যোগ্যতার আর কি কি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে ?

বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থাৎ—বিদ্যালয় কোন যোগ্যতা নির্বাচক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচন করে থাকে। সুতরাং এনট্রান্স পরীক্ষা বা এ্যাডমিশন টেস্টের ফল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। যদিও এ্যাডমিশন টেস্টে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় না, তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল, হস্তলিপি ও উত্তরের মান পরীক্ষা করে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র ও যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।

যেখানে সম্ভব বিদ্যালযে ভর্তি হবার কয়েক দিনের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মনোবিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া উচিত। এই পরীক্ষার মধ্যে থাকবে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ও শিক্ষা-বিষয়ক অভীক্ষা। এই দুই শ্রেণীর অভীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক গুণগুলি যেমন জানা যায়, তেমনি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও ঝোঁক সম্পর্কেও জানতে পারা যায়। এইভাবে প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ চিত্র সংগ্রহ করে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দিতে হবে। ছাত্রদের ব্যক্তিগত মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, ছাত্রেরা যখন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করে বা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকে, তখন তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তাদের মনোভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রয়োজন ক্ষেত্রে ছাত্রদের ব্যক্তিদের প্রশ্ন করে তাদের নানা শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

নির্দেশক পরামর্শদাতাকে ছাত্রদের পরিবেশ সম্পর্কেও সঠিক ভাবে জানতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। যথা—

১. সু-আচরণের জন্য পিতামাতা ছাত্রকে কি ধরনের উপদেশ দেন ?

২. গৃহে কিরূপ অবস্থায় ছাত্র তার বিদ্যালয়ের কাজগুলি করে ?

৩. গৃহে পিতামাতা ছাত্রের সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করেন ? ইত্যাদি।

উপরের প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য হল ছাত্রেরা গৃহ পরিবেশে নিজেদের বিকশিত করবার জন্য কিরূপ সুযোগ পেয়ে থাকে,—সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ শিশুর গৃহ পরিবেশ এবং পিতামাতার প্রভাব তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। এই ধরনের বিবরণ থেকে নির্দেশন পরামর্শদাতা ছাত্র কিরূপ সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বড় হচ্ছে সেই সম্পর্কে জানতে পারেন এবং গৃহের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া কিভাবে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে সেই সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারেন।

গৃহ পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, যথা—

১. শিশু গৃহে পিতামাতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে ?

২. গৃহে ছোট ভাইবোন ও বড়দের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে ?

৩. বন্ধুবান্ধব ও গৃহভৃত্যদের সঙ্গে তার ব্যবহার কিরূপ ?

৪. গৃহে শিশু কিভাবে অবসর যাপন করে ?

৫. স্কুলের বাইরে কি ধরনের কাজে সে বেশি সময় ব্যয় করে ?

৬ গৃহে কি ধরনের বই পড়তে সে বেশি ভালবাসে ?

৭. ছাত্রের হবি, ও আগ্রহ কি ধরনের ?

৮. বিদ্যালয়েব কাজকর্মে শিশু নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে কিনা ?

উপরে উল্লিখিত বিবরণগুলি মারফত ছাত্রের গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে কি ধরনের বিষয়গুলি তাকে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে বাধা দিচ্ছে সেই সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ ব্যতীত শিশুর পক্ষে সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশ-লাভ সম্ভব নয় এবং এই সামঞ্জস্যতার অভাবের জন্যও বিদ্যালয়ের কাজে তার উন্নতি ব্যাহত হতে পারে।

বিভিন্ন দেশের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যালয়ে শিশুর পরীক্ষার ফল ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে শিশুর ভবিষ্যৎ যোগ্যতা সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে, তা পরবর্তীকালে প্রায় শতকরা ২৫টির ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঘটছে না। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, শিশুর চারিত্রিক গুণ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার ফলে শিশুর বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা এবং যোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। এই সম্পর্কে প্রয়োজন শিশুর দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শের সাহায্যে শিশুর কাজের মান উন্নত করা সম্ভব হতে পারে। কারণ শিশু প্রতিনিয়ত বিকাশলাভ করছে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের পুরাতন আচরণের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

বিশেষ অঞ্চলের নির্দেশন কার্যক্রমের জন্য সকল বিদ্যালয়েই একটি নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, নির্দেশন কার্য কোন একজন শিক্ষক বা কয়েকজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাউন্সিলকে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নির্দেশনের জন্য শিক্ষক কাউন্সিলকে নিয়মিত সভা আহ্বান করতে হবে। এই সভায় যোগ দেবেন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ডাক্তার প্রভৃতি। এই কাউন্সিলের সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে। যথা—

১. যে সমস্ত ছাত্র পড়াশুনায় সবিশেষ কাঁচা, অনগ্রসর, অমনোযোগী, বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে নিয়মপালনে অনিচ্ছুক এবং চরিত্রগত অসঙ্গতিযুক্ত—সেই সকল ছাত্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২. কাউন্সিল আরও এমন সব বিষয় আলোচনা করবে যেগুলি ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩. ছাত্রের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক গুণ, যথা, স্মৃতিশক্তি, স্মৃতিপ্রসর, মনোসংযোগ ক্ষমতা, সামাজিক আচরণ, এবং আগ্রহের বৈচিত্র্য সম্পর্কে এই কাউন্সিল বিবরণ সংগ্রহ করবে এবং তদনুযায়ী ছাত্রকে সাহায্য করবে।

৪. ছাত্রের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি জেনে কাউন্সিল সেগুলি দূর করবার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি বের করবে।

৫. যে সকল ছাত্র উপযুক্ত উপদেশ সত্ত্বেও সফলকাম হতে পারছে না, এবং পড়াশুনায় কোনরূপ যোগ্যতা দেখাতে পারছে না, তাদের জন্য পৃথক পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কথাও কাউন্সিলকে চিন্তা করতে হবে।

এই ধরনের অনুসন্ধান প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্র যখন উচ্চশ্রেণীতে উচ্চ ও বিশেষ বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে, তখন ছাত্রের উন্নতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। ঐ সময়ে মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছাত্রের উন্নতির বিবরণ যেমন দিতে হবে, তেমনি চেষ্টা করতে হবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় কিভাবে ছাত্রের ত্রুটিগুলি দূর করা যায়। ছাত্রদের উন্নতি সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বিবরণ রাখতে হবে। এই বিবরণ রাখবার সুস্থ পদ্ধতি হল কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড। কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এই কার্ডে ছাত্রের উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ছাড়া থাকবে ছাত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পর্যবেক্ষণের ফলাফল। এই ধরনের ফরম্ নানারকম হতে পারে। তবে ফরমের গঠন যেন সরল হয় এবং ফরমের বিষয়বস্তু যেন ছাত্রের উন্নতির একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করতে পারে।

শিক্ষাগত নির্দেশন পত্রটি যেন সরল হয় এবং মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করে ঐ নির্দেশন পত্রটি প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই ফরমের প্রথম অংশে থাকবে

পারিবারিক বিবরণ, দ্বিতীয় অংশে থাকবে ছাত্রের স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশ সম্পর্কিত বিবরণ, তৃতীয় অংশে থাকবে ছাত্রের শিক্ষাগত উন্নতির ইতিহাস—বর্তমান ও পুরাতন স্কুলের, চতুর্থ অংশে থাকবে মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ যথা, বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ, চরিত্র প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে। প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐ বিবরণের ভিত্তিতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় পত্র / ব্যবহারিক অংশ

শিক্ষালব্ধ সাফল্যাঙ্ক

বিদ্যালয়ে ছাত্ররা আসে জ্ঞান লাভের জন্য। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বলে অর্জিত জ্ঞান। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষার ফলকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। আমাদের বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে 101 পয়েণ্ট স্কেল ব্যবহার করা হয় লব্ধজ্ঞান পরিমাপের জন্য। মনে করা যাক, একটি ছাত্র অঙ্কে 85 (পূর্ণসংখ্যা 100) পেল। এখানে 85 সংখ্যাটি হল ছাত্রটির লব্ধ সাফল্যাঙ্ক। আর এক ধরনের সাফল্যাঙ্ক ছাত্ররা লাভ করতে পারে, যেগুলিকে বলা হয় জন্মগত সাফল্যাঙ্ক। যেমন, বুদ্ধি একটি জন্মগত দক্ষতা (Innate ability)। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য আমরা যে একক (Unit) ব্যবহার করি, তা হল আই. কিউ. (I.Q)। স্মৃতি শক্তি পরিমাপের জন্য আমরা ব্যবহার করি স্মৃতি প্রসর (Memory span)। এইগুলি ছাত্রদের জন্মগত গুণের পরিমাপ করে।

আমরা সাফল্যাঙ্ক কথাটি পূর্বে ব্যবহার করেছি। সাফল্যাঙ্ক-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হল স্কোর (Scores)। শিক্ষালাভের মাধ্যমে আমরা যে স্কোরগুলি পাই তাকে বলে লব্ধ সাফল্যাঙ্ক (Achievement scores)। মনে করা যাক, একটি পরীক্ষায় 5 জন ছাত্র নম্বর পেল 62, 81, 55, 79, 77। এই সংখ্যাগুলিকে বলা হয় কাঁচা সাফল্যাঙ্ক (Raw scores)। কাঁচা সাফল্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত নম্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু ধারণা করা যায় না। কাঁচা নম্বরগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করবার জন্য আমাদের রাশি বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রাশি বিজ্ঞানীরা বলেন যে লব্ধ সাফল্যাঙ্কগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা অনেক রহস্য আবিষ্কার করতে পারি। সংখ্যার রহস্য বুঝতে হলে নানা দিক থেকে সংখ্যাগুলিকে বিচার করা দরকার। আমরা রাশি বিজ্ঞানের কতকগুলি নিয়ম এখানে আলোচনা করছি।

সাফল্যাঙ্ক বা তথ্য বিশ্লেষণ

নানা সূত্র থেকে লব্ধ সাফল্যাঙ্ক বা স্কোরগুলিকে রাশি বিজ্ঞানীরা নানাভাবে বিশ্লেষণ করেন। এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত সাফল্যাঙ্ক কোন বিষয় বিবৃত করতে পারে না। প্রথম ধাপে এই জন্য স্কোরগুলিকে সুবিধা মতো দলে সাজানো হয়। মনে করা যাক, একটি ক্লাসে পড়ে এরূপ পাঁচজন ছাত্রের কোন এক বিষয়ের নম্বর হল।

140, 160, 130, 180, 150

যেভাবে স্কোরগুলি দেওয়া আছে তা থেকে তাড়াতাড়ি কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী নম্বর হল 180 এবং সবচেয়ে কম নম্বর হল 130 ; উভয়ের অন্তর হল 180—130 অর্থাৎ 50। সর্বাপেক্ষা বেশি এবং সর্বাপেক্ষা কম স্কোর দুটির অন্তরকে বলা হয় **বিস্তার বা রেঞ্জ** (Range)। রেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত নম্বরের একটি সীমারেখা পাওয়া যাচ্ছে।

সারীকরণ ও ছক বিন্যাস

স্কোর বা তথ্যগুলি সংগ্রহ করবার পর স্কোরগুলি সম্পর্কে আরও স্পষ্টতর ধারণার জন্য দরকার স্কোরগুলির সারীকরণ করা অর্থাৎ ছকে সাজানো। সারীকরণ হল Tabulation of Scores। সারীকরণের উদ্দেশ্য হল রাশি তথ্যের আকার সংক্ষেপ করা এবং সংক্ষেপে এমনভাবে করা যাতে স্কোরগুলির রূপ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই কাজ করা হয় ছকের সাহায্যে।

ছক বিন্যাস কিভাবে করা হয় ? আমরা যখন প্রথমে তথ্য বা স্কোরগুলি সংগ্রহ করি, তাতে কোন শ্রেণীবিভাগ থাকে না। আমরা ছকের সাহায্যে এইগুলি শ্রেণী-বিভাগ করি। আমরা এখানে ছক বিন্যাসের নিয়ম আলোচনা করছি।

১. ছক বিন্যাস করবার জন্য স্কোরগুলি মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট এবং সর্বাপেক্ষা বড় স্কোর দুটি চিহ্নিত কর। উভয়ের অন্তর হল রেঞ্জ বা বিস্তার। সারণী ১-এ সর্বা-পেক্ষা বড় স্কোর হল 139 এবং সর্বাপেক্ষা ছোট হল 96।

২. স্কোরগুলির বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা অনুযায়ী ছক বিন্যাসের বিভাগ সীমা (Class limit) ঠিক করতে হবে। সবচেয়ে বেশী নম্বর ও সবচেয়ে কম নম্বরের অন্তরকে একটি সুবিধা মতো বিভাগে ভাগ করতে হয়। ১নং সারণীতে সর্বাপেক্ষা বড় সংখ্যা এবং সর্বাপেক্ষা ছোট সংখ্যার অন্তর হল, 139 – 96 = 43। 43-কে নয় ভাগ করা হল। এ ক্ষেত্রে স্কোরগুলির বিভাগ সীমা হবে 139·5, 134·5,...99·5 আর বিভাগ অন্তর (Class interval) হবে 5। সারণীতে আমরা ব্যবহার করেছি 139, 134 · 99 ইত্যাদি। এইগুলি হচ্ছে স্কোরগুলির আপাত বিভাগ সীমা। রাশি বিজ্ঞানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন চলক (Continous variate)-এর ব্যবহার হয়ে থাকে, এই কারণে কোন নম্বরকে আমরা বিন্দু হিসাবে দেখি না; দেখি অন্তর হিসাবে, অর্থাৎ 139 নম্বর মানে একটি অন্তর 134·5 থেকে 139·5-এর মধ্য বিন্দু। তা হলে দেখা যাচ্ছে সংখ্যাগুলির যথার্থ সীমা রেখা হল 139·5, 134·5 ইত্যাদি এবং আপাত সীমারেখা হল 139, 134 ইত্যাদি। এখন এই সীমারেখার প্রযো-জন কেন ? কারণ হল যে কোন ছাত্রের নম্বর যদি 132 হয় তাহলে 130—134 এই সীমারেখার মধ্যে থাকবে। অন্য যে সব সংখ্যা 130-এর বেশি কিন্তু 134-এর কম, তারা এর মধ্যে পড়বে।

৩. বিভাগ, সীমা ও বিভাগ অন্তর ঠিক হয়ে গেলে সংখ্যাগুলিকে বড থেকে ছোট কিংবা ছোট থেকে বড বিভাগ সীমা অনুযায়ী সাজাও। এইভাবে সাজিয়ে প্রত্যেক ছাত্রের নম্বর ছকে সাজাতে হবে। যেমন কোন ছাত্রের নম্বর যদি 121 হয় তাহলে তাকে (120 – 124) বিভাগের মধ্যে দাগ দিতে হবে। এইভাবে যার নম্বর হবে 113 তাকে দাগ দিতে হবে (110-114) বিভাগ সীমার মধ্যে। এইভাবে 50 জন ছাত্রের নম্বর দাগ দিতে হবে। দাগ দেওয়া হয়ে গেলে ছকের চেহারা কিরূপ হবে ২নং সারণী থেকে বোঝা যাবে। এই দাগ দেওয়াকে বলা হয় ট্যালি মার্ক দেওয়া।

৪. ট্যালি বা দাগগুলিকে যোগ করে পরিসংখ্যা (Frequencies) নির্ণয় করতে হবে। পরিসংখ্যার মোটসংখ্যা ও স্কোরগুলির সংখ্যা এক হবে।

৫. ২নং সারণীতে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে এটি হল 50 জন ছাত্রের নম্বরের পরিসংখ্যা ছক। 50 জন ছাত্রের সারণীকরণ এখানে করা হয়েছে। এই ছকটি লক্ষ্য করে রাশি তথ্য বা স্কোরগুলির প্রকৃতি সহজেই বোঝা যায়। পরিসংখ্যা ছকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মাঝামাঝি জায়গায় ছাত্রসংখ্যা বেশি এবং দুই পাশে কম।

সারণী ১

কাঁচা স্কোর

130, 132, 134, 130, 131, 125, 126, 127, 128, 129, 126, 127, 125, 120, 121, 121, 123, 124, 122, 122, 123, 124, 122, 123, 124, 115, 116, 119, 117, 118, 115, 116, 117, 118, 117, 110, 111, 112, 113, 114, 105, 106, 108, 109, 101, 102, 103, 96† 98, 139* (N = 50)

উপরের কাঁচা স্কোর বা অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যা ছকে (Frequency distribution) সাজানো হল। সাজানোর জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। সর্বাপেক্ষা বড স্কোর থেকে ছোট স্কোরটিকে বিয়োগ করে পাওয়া গেল 43। 5টি করে স্কোর একসঙ্গে রাখলে 9টি শ্রেণী ব্যবধান পাওয়া যাবে। এখানে মনে রাখতে হবে স্কোরের সংখ্যা যতোই থাকুক না কেন কোনক্রমেই যেন শ্রেণী ব্যবধান 10টির বেশি না হয়। কারণ স্কোরগুলিকে শ্রেণী ব্যবধানে সাজানোর অর্থ হল স্কোরগুলির পরিসর সংকীর্ণ করে আনা।

---

† সর্বাপেক্ষা ছোট স্কোর 96। * সর্বাপেক্ষা বড স্কোর 139।

সারণী ২

1 স্কোর শ্রেণী–ব্যবধান	2 হিসাবের দাগ বা ট্যালি	3 পরিসংখ্যা
135 – 139	|	1
130 – 134	~~||||~~	5
125 – 129	~~||||~~ |||	8
120 – 124	~~||||~~ ~~||||~~ ||	12
115 – 119	~~||||~~ ~~||||~~	10
110 – 114	~~||||~~	5
105 – 109	||||	4
100 – 104	|||	3
95 – 99	||	2

মোট = ৫০

লেখের সাহায্যে বিশ্লেষণ
Graphic representation of the data

উপরের নম্বরগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা যেমন পরিসংখ্যা ছক তৈরি করেছি, তেমনি লেখ অঙ্কনের সাহায্যে ঐগুলি আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা যায়। অর্থাৎ কেবলমাত্র সারণীকরণ দ্বারা নম্বর বা উপাত্তগুলির বৈশিষ্ট্যের পুরো চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা করবার জন্য কেবলমাত্র বর্ণনার দ্বারা পুরো জিনিসটি বোঝা যায় না, তেমনি পরিসংখ্যা ছকও পুরো বৈশিষ্ট্যটি জানাতে পারে না। বাশি বিজ্ঞানীরা বলেন সংখ্যা বা নম্বরগুলির একটি চিত্ররূপ পেলে বিষয়টি বুঝতে আরও সুবিধা হয়। এই চিত্ররূপটি হল লেখ বা গ্রাফ্।

গ্রাফ্ অঙ্কনের নিয়মটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সাধারণত দুই শ্রেণীর লেখ আমরা পরিসংখ্যা ছক থেকে পেতে পারি। এগুলি হল ১. **পরিসংখ্যা বহুভুজ** (Frequency polygon) ও ২. **আয়ত লেখ** (Histogram)।

আমরা এখানে উভয় প্রকার লেখ অঙ্কনের নিয়মাবলী আলোচনা করছি।

১ পরিসংখ্যা বহুভুজ

১নং চিত্রটিতে আমরা ২নং সারণীতে প্রদত্ত উপাত্তগুলির ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করেছি। কিভাবে পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করা হয় সেই নিয়মটি এখানে আলোচনা করছি।

১. ox অক্ষরেখা বরাবর বিন্দু বসানো

একটি লেখ কাগজে (Graph paper) ox অক্ষরেখা অঙ্কন কর। ox রেখাটির প্রথম দিকে একটা বিচ্ছিন্ন বা ভাঙা চিহ্ন (*SS*) দিয়ে দেখান হয়েছে যে, মূল বিন্দু o অনেক দূরে আছে এবং এইভাবে সুবিধামতো কাগজের আকার অনুযায়ী লেখটি অঙ্কন করা যায়।

২. এইবার ox অক্ষরেখা বরাবর স্কোরগুলির বিভাগ-সীমার মধ্যবিন্দুগুলি বসাও, এবং অতিরিক্ত দুটি স্কোর নাও। আলোচ্য সারণীতে উপরে দিকে 142 এবং নিচের দিকে 92 এই দুটি অতিরিক্ত মধ্যবিন্দু নেওয়া হয়েছে। মধ্যবিন্দুর অর্থ হল বিভাগ সীমার মধ্যবিন্দু। মধ্যবিন্দু বের করবার নিয়ম হল বিভাগ সীমার প্রথম ও শেষ স্কোর দুটিকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেমন (135 – 139)-এর মধ্যবিন্দু হল $\frac{135+139}{2}$ অর্থাৎ 137। এখানে মনে রাখাত হবে পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য যে অতিরিক্ত দুটি স্কোর নেওয়া হয়েছে তাদের পরিসংখ্যা হল শূন্য।

৩. মধ্যবিন্দুগুলি চিহ্নিত করবার পর, oy axis বরাবর পরিসংখ্যার মানগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে। ১নং সারণীতে সবচেয়ে বেশী পরিসংখ্যা দেওয়া আছে 12। একটি সুবিধা মতো দূরত্বকে একক ধরে (মনে করা যাক দুই ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র) পরিসংখ্যা মানগুলি চিহ্নিত কর। (১নং চিত্রটি লক্ষ্য করো) ox অক্ষরেখার মধ্যবিন্দুর বরাবর যে পরিসংখ্যা রয়েছে—এ দুটি যেখানে মিলিত হয়েছে সেই বিন্দুগুলি চিহ্নিত কর। যেমন 97-এর পরিসংখ্যা হল 2। মনে মনে 97-এর উপর একটি একটি লম্ব আঁক এবং oy অক্ষরেখার 2 বিন্দু যেখানে চিহ্নিত করা হয়েছে সেখান থেকে বরাবর ox অক্ষরেখার সমান্তরাল একটি কাল্পনিক রেখা মনে মনে অঙ্কন কর। উভয় সরলরেখা যেখানে মিলিত হয়েছে সেটাই হল নির্দিষ্ট বিন্দু। এইভাবে ছকটির সমস্ত বিন্দুগুলি চিহ্নিত কর।

৪. বিন্দুগুলি নির্দিষ্ট করবার পর, সরলরেখা দ্বারা বিন্দুগুলি পর পর যোগ কর। যে চিত্রটি পাওয়া গেল তাই হল **পরিসংখ্যা বহুভুজ**। চিত্রটি সম্পূর্ণ করবার জন্য আমরা দুটি অতিরিক্ত স্কোর নিয়েছি যাদের পরিসংখ্যা হল o।

পরিসংখ্যা বহুভুজের আকার : অঙ্কিত লেখটিকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য ox অক্ষরেখা এবং oy অক্ষরেখার দৈর্ঘ্যের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। ox অক্ষরেখা যদি খুব লম্বা হয়, তাহলে লেখটি খুব বেঁটে হয়ে যাবে এবং oy অক্ষরেখা অধিকতর লম্বা হলে চিত্রটি হবে অতিরিক্ত উঁচু। এই কারণে চিত্রটির আকারের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনবার জন্য 75%-এর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ ox অক্ষরেখার যে দৈর্ঘ্য হবে, oy অক্ষরেখার দৈর্ঘ্য তার 75% অর্থাৎ $\frac{3}{4}$

-অংশ। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই নিয়ম সঠিকভাবে মান্য করা সম্ভব হয় না। সেখানে 60-80%-এর মধ্যে উভয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত রাখা উচিত।
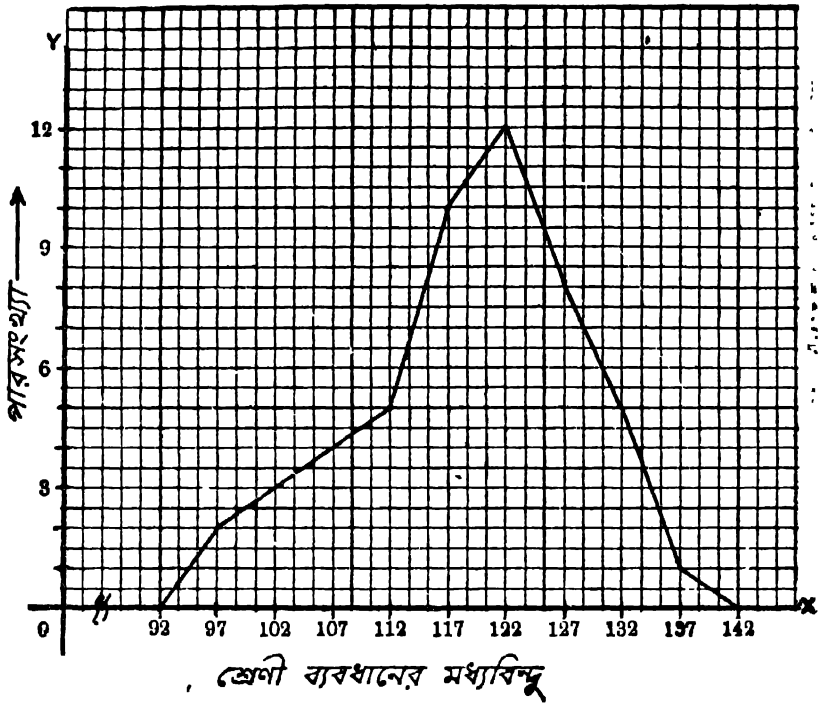
চিত্র ১

২. আয়তলেখ

২নং সারণীর উপাত্তগুলির সাহায্যে হিস্টোগ্রাম অঙ্কন করবার নিয়ম আলোচনা করা হল।

১. OX অক্ষরেখার বরাবর স্কোরগুলির বিভাগ অন্তরের উচ্চসীমা বিন্দুগুলি (যথা 99, 104, 109 ইত্যাদি) বসাও।

২. প্রত্যেকটি বিভাগ অন্তরের উপর নির্দিষ্ট পরিসংখ্যার উচ্চতা অনুযায়ী আয়তক্ষেত্র অঙ্কন কর।

৩. এই আয়ত ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফল পরিসংখ্যার মান অনুযায়ী হবে। পরিসংখ্যা বহুভুজ যেভাবে আঁকতে হবে আয়তলেখও সেইভাবে অঙ্কন করতে হবে। তবে পার্থক্য এই যে, পরিসংখ্যা বহুভুজের ক্ষেত্রে বিভাগ-সীমার মান মধ্য বিন্দু দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় এবং আয়তলেখের ক্ষেত্রে স্কোরগুলি সমানভাবে বিভাগ-সীমার উপর বিস্তৃত থাকে এইরূপ ধরা হয়। প্রত্যেকটি আয়তলেখের ভূমি নির্দিষ্ট হয় বিভাগ অন্তর দ্বারা এবং বিভাগ সীমার জন্য নির্দিষ্ট পরিসংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সী

আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা নির্দেশ করে। নিচের ২নং সারণীতে প্রদত্ত উপাত্ত-এর দ্বারা একটি আয়তলেখ অঙ্কিত করা হল।
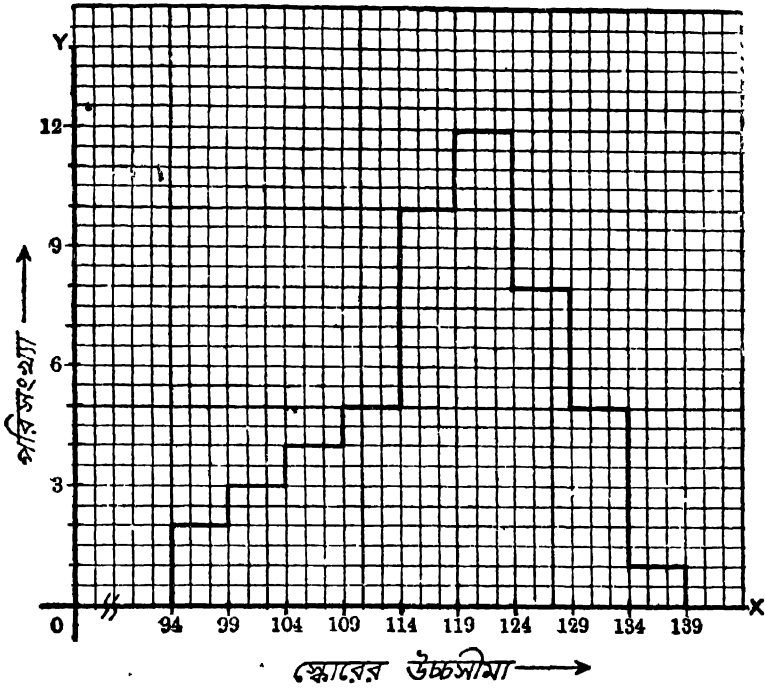
চিত্র ২

আয়তলেখে প্রত্যেকটি বিভাগ অন্তর পৃথক আয়তক্ষেত্র দ্বারা দেখানো হয়। আয়তলেখের পরিসীমার উত্থান পতন এক বিভাগ-অন্তর থেকে অন্য বিভাগ-অন্তর-এর পরিসংখ্যার ঘনত্ব নির্দেশ করে। কিন্তু পরিসংখ্যা বহুভুজের ক্ষেত্রে যেমন, আয়তলেখের ক্ষেত্রেও স্কোরের সংখ্যা (N) লেখটির ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে। তবে আয়তলেখের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিভাগ-অন্তরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র পৃথকভাবে ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যার অনুপাত (Proportional)। এই কারণে আয়তলেখ স্কোরগুলির বিস্তার বৈশিষ্ট্যের একটি সম্পূর্ণ ছবি প্রদান করে;

একই অক্ষরেখার উপর পরিসংখ্যা বহুভুজ ও আয়তলেখ অঙ্কন: ২নং সারণীর উপাত্তগুলির সাহায্যে একই অক্ষরেখার উপর পরিসংখ্যা বহুভুজ ও আয়তলেখ অঙ্কন করা হল। লেখচিত্রটি থেকে উভয়ের সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)।

পরিসংখ্যা বহুভুজ এবং আয়তলেখ কোন্ কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে ?

কখন আমরা পরিসংখ্যা বহুভুজ ব্যবহার করবো এবং আয়তলেখ ব্যবহার করবো—এই সম্পর্কে কোনরূপ ধরা বাঁধা নিয়ম স্থির করা যায় না। তবে পরিসংখ্যা বহুভুজ অপেক্ষা আয়তলেখ অধিকতর নিখুঁতভাবে পরিসংখ্যা বিভাজনের (Frequency distribution) বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ করতে পারে। কারণ আয়তলেখ শ্রেণী বা বিভাগ অন্তর অনুযায়ী ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে, যেটি পরিসংখ্যা বহুভুজ পারে না।
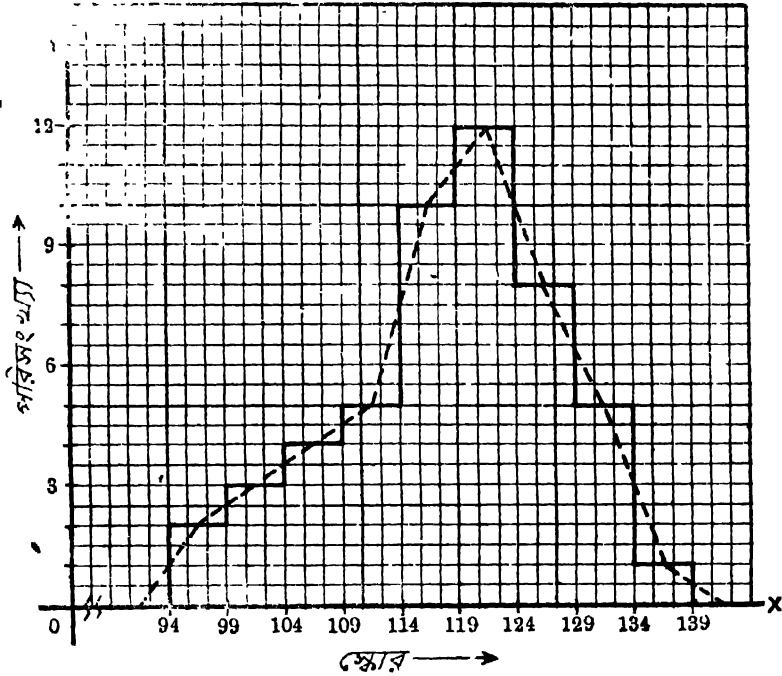
চিত্র ৩

তবে যখন দুই বা ততোধিক পরিসংখ্যা বিভাজন তুলনা করবার প্রয়োজন হয় এবং উক্তকারণে একই অক্ষরেখার উপর ঐগুলি অঙ্কন করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আয়তলেখ অপেক্ষা পরিসংখ্যা বহুভুজ অধিকতর উপযোগী মনে হয়। কারণ একই অক্ষরেখার উপর দুই বা ততোধিক আয়তলেখ অঙ্কন করলে তাদের অনেক অংশ পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এবং ফলে স্পষ্টভাবে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করলে তুলনা করবার ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধাজনক মনে হয়।

কিন্তু স্কোরগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে উভয়ের প্রয়োজন সমান এবং উভয় লেখ একইভাবে স্কোরগুলির বিবরণ প্রদান করে। উভয়ের সাহায্যে আমরা স্কোরগুলির লৈখিক চিত্র (Graphic form) পাই এবং এই লৈখিক চিত্রের মাধ্যমে

আমরা সহজেই জানতে পারি স্কোবগুলি কিভাবে রয়েছে। স্কোবগুলি যদি ডান দিকে বেশী সংখ্যায় অবস্থান কবে, তাহলে সহজেই ধরে নেওয়া যায় অভীক্ষা (Test) টি
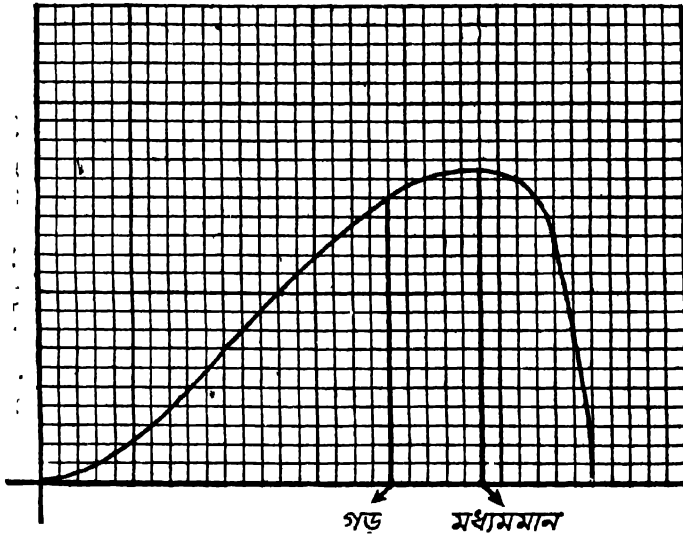
চিত্র ৪ : বামায়ত প্রতিবৈষম্য

অধিকতর সহজ এবং যদি বাঁদিকে অধিক সংখ্যায় অবস্থান কবে তবে ধবতে হবে অভীক্ষাটি অধিকতর দুরূহ। যদি অভীক্ষাটিব দুরূহতা মাঝামাঝি ধরনেব হয়, তবে
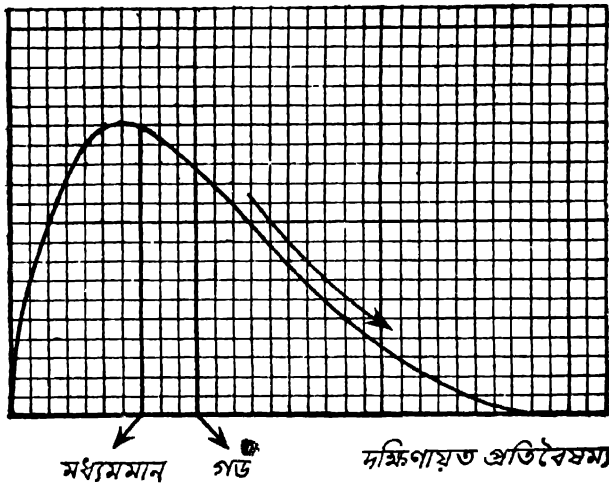
চিত্র ৫

লেখচিত্রের আকার হবে **প্রতিসম** অর্থাৎ দুই দিক দক্ষিণ ও বাম একই ধবনেব। অনেক সময়ে প্রথম দিকের বা শেষেব দিকের পবিসংখ্যা বেশি এবং মাঝেব অংশে

কম হতে পারে। এই সকল ছকেব যদি লেখ অঙ্কন করা যায় তবে আমরা পাব অপ্রতিসম আয়ত লেখ ; এগুলি দক্ষিণায়ত বা বামায়ত হতে পারে। দক্ষিণায়ত ও বামায়ত প্রতিবৈষম্য (Positive and Negative Skewness)-এর ধরন নয় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্র দুটির সাহায্যে বোঝা যাবে।

পরিসংখ্যা বিভাজনের ধ্রুবক নির্ণয়

Measures of central tendency, i. e. Calculation of Mean Median and Mode

উপবে আমবা যে লেখ দুটিব কথা আলোচনা কবলাম, ঐগুলি বাশিগুলিব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধাবণা মাত্র দিতে পাবে। বাশি তথ্যেব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আব বিশেষ কিছুই দিতে পাবে না। এই কাবণে বাশি বিজ্ঞানীবা পবিসংখ্যা বিভাজনেব কযেকটি ধ্রুবক (Constants) নির্ণয কবেন। এই ধ্রুবকগুলিকে বলে **কেন্দ্রীয় প্রবণতা** জ্ঞাপক বাশি। পবিসংখ্যা বিভাজনেব ধ্রুবকেব সাহায্যে বাশি তথ্য বিশ্লেষণ কবা সম্ভব। এইগুলি থেকে বাশিতথ্যেব প্রকৃতি সম্পর্কে আবও পবিষ্কাব ধাবণা কবা যায়। বাশি বিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য হল বাশি তথ্যেব সমষ্টিকে সংক্ষেপ কবা। কতকগুলি ধ্রুবকেব সাহায্যে বাশিতথ্যেব সমষ্টিকে সংক্ষেপ কবা হয়। একটি উদাহবণেব সাহায্যে বিষযটি আলোচনা কবা যাক। মনে কবা যাক, আমাদেব দেশেব মধ্যবিত্ত পবিবাবেব মাসিক খবচ 100 টাকা। এই কথাটিব অর্থ কি ? এব অর্থ হল অনেক পবিবাব বেশি খবচ কবে, অনেক পবিবাব খবচ কবে কম। 100 টাকা হল **মধ্যগামী মান**। এই টাকাব হিসাব থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীব জীবন যাত্রাব মান সম্পর্কে কিছু ধাবণা কবা যায়, যদিও আমবা প্রত্যেক লোকেব খবচেব হিসাব জানি না। মধ্যগামী মান বা কেন্দ্রীয প্রবণতাব মান আমবা অঙ্কেব সাহায্যে নির্ণয় কবতে পাবি। তিন প্রকাবেব মধ্যগামী মান পাওয়া যায। ঐগুলি হল— ১. যৌগিক গড (Arithmetical mean), ২. মধ্যমা (Median) ও ৩. সংখ্যাগুরু মান (Mode)।

১. যৌক্তিক গড় নির্ণয়

যখন বাশিতথ্যেব সংখ্যা কম থাকে, বাশিগুলিকে যোগ কবে মোট সংখ্যা দিযে ভাগ কবলেই যৌগিক গড পাওয়া যায়। মনে কবা যাক, কোন ছাত্রেব বিভিন্ন পবীক্ষায় গণিতেব নম্বব হল যথাক্রমে 50, 60, 70। এক্ষেত্রে তাব গণিতেব গড নম্বর হল :

$\frac{50+60+70}{3}=60$। যখন বাশি তথ্য (data) পবিসংখ্যা ছকে সাজানো

থাকে না, তখন গড নির্ণয়েব সূত্র হল :

$$M=\frac{\Sigma x}{N} \qquad \cdots \quad (1)$$

এখানে N হল মোট রাশির সংখ্যা ; x হল উপাত্ত বা রাশিতথ্য এবং Σ প্রতীক চিহ্নটি যোগ করবার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন।

কিন্তু যখন রাশিতথ্য বা উপাত্তগুলি পরিসংখ্যা ছকে সাজানো থাকে, তখন যৌগিক গড নির্ণয়ের জন্য অন্য সূত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। তখন গড নির্ণয়ের সূত্র হল ঃ

$$M = \frac{\Sigma fx}{N} \qquad \cdots\cdots (2)$$

২নং সূত্রের সাহায্যে যৌগিক গড নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক বিভাগ অন্তরের মধ্য-বিন্দু নির্ণয় করতে হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সী বা পরিসংখ্যার সঙ্গে ঐ মধ্যবিন্দু গুণ করে fx বের করা হয়। fx-গুলির যোগফলকে N বা মোট রাশির সংখ্যার দ্বারা ভাগ দিলে Mean বা যৌগিক গড পাওয়া যায়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে যৌগিক গড নির্ণয়ের নিয়মটি আলোচনা করা হল। সূত্রটি (২নং)-তে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, প্রতি বিভাগের ব্যষ্টিগুলি অর্থাৎ পৃথক স্কোরগুলি বিভাগের মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত আছে এবং প্রতি বিভাগের পরি-সংখ্যা হচ্ছে তার মধ্যমানের পরিসংখ্যা। অবশ্য এই নিয়মে পরিসংখ্যা বের করলে কিছু ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

৩নং সারণীতে যে রাশিতথ্য নেওয়া হয়েছে—ঐগুলি হল ৩০ জন ছাত্রের গণিতের নম্বর। ঐ নম্বরগুলির যৌগিক গড পাওয়া গেল 58·50। এই যৌগিক গড থেকে ছাত্রদের গণিতের মান সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।

সারণী ৩

বিভাগ	মধ্যবিন্দু x	পরিসংখ্যা F	FX
76—80	78	1	78
71—75	73	2	146
66—70	68	2	136
61—65	63	5	315
56—60	58	10	580
51—55	53	5	265
45—50	48	4	192
41—45	43	1	43
		N = 30	1755

গাণিতিক গড $= \frac{1755}{30} = 58·50$

$$\text{মধ্যমা} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm}\right) xi$$

$$= 55·50 + \left[\frac{5}{10}\right] x5$$

$$= 55·50 + \frac{5}{2} = 55·50 + 2·50$$

$$= 58·00$$

যৌগিক গড় থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ছাত্রদের গণিতের মান মোটামুটি। খুব খারাপও নয় এবং খুব ভালও নয়।

উপরে আলোচিত যৌগিক গড় নির্ণয়ের নিয়মটি একটু সময় সাপেক্ষ, কারণ এই পদ্ধতিতে মধ্যবিন্দুর সঙ্গে পরিসংখ্যাগুলি গুণ করবার প্রয়োজন হয় এবং বড় ছকের ক্ষেত্রে Σfx নির্ণয় করাও কঠিন। অবশ্য হিসাবের মেসিন ব্যবহার করে গুণ ও যোগগুলি তাড়াতাড়ি করা যেতে পারে।

তাড়াতাড়ি যৌগিক গড় নির্ণয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত-পদ্ধতি (short method) ব্যবহার করা হয়। ৩নং সারণীর রাশি ছকটির সাহায্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে রাশি ছকটির যৌগিক গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হল।

সারণী ৪

(1) স্কোর শ্রেণী ব্যবধান	(2) মধ্যবিন্দু	(3) পরিসংখ্যা (f)	(4) x^1	(5) fx^1
76—80	78	1	+4	+4
71—75	73	2	+3	+6
66—70	68	2	+2	+4
61—65	63	5	+1	+5
56—60	58	10	0	0(+19)
51—55	53	5	−1	−5
45—50	48	4	−2	−8
41—45	43	1	−3	−3(−16)
		N = 30		

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় (Mean) বের করবার সূত্র

$$M = AM + ci$$

এখানে, AM = (Assumed Mean) কাল্পনিক গড়।

c = সংশোধন (Correction)

i = শ্রেণী ব্যবধান (Class interval)

$$c = \frac{\Sigma fx_1}{N} = \frac{19-16}{30} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10} = \cdot 1$$

$$ci = \cdot 1 \times 5 = \cdot 5$$

$$\therefore M = 58\,0 + 50 = 58\cdot 50$$

আলোচনা : সংক্ষিপ্ত বা সহজ পদ্ধতির সাহায্যে গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি এখানে আলোচনা করা হল :

১. রাশির শ্রেণী ব্যবধানে যে কোন একটিতে ইচ্ছা মতো কাল্পনিক গড় ধর। তবে যে শ্রেণী ব্যবধানে পরিসংখ্যা সব চেয়ে বড় সেখানে ধরাই সমীচীন। এখানে অর্থাৎ আলোচ্য ছকটিতে 56—60 শ্রেণী ব্যবধানের ক্ষেত্রে কাল্পনিক গড়

ধবা হয়েছে। কাল্পনিক গড হল 56—60 শ্রেণী ব্যবধানেব মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 58·0।

২. কাল্পনিক গড ঠিক করে পববর্তী ধাপ হল 'সংশোধন' হিসাব কবা। কাল্পনিক গড়কে সংশোধন কবে প্রকৃত গড নির্ণয় করা হয়।

৩. x^1 স্তম্ভে কাল্পনিক গড থেকে অন্য শ্রেণী ব্যবধানেব মধ্যবিন্দুগুলিব পার্থক্য বা অন্তর শ্রেণী ব্যবধানের সমান বা ধাপ অনুসাবে 5, 10, 15 অথবা $-5, -10, -15$ ইত্যাদি। ঐ ব্যবধানগুলিকে 5 দ্বাবা ভাগ করলে অর্থাৎ এককে পবিবর্তিত কবলে, তা হয 1, 2, 3 অথবা $-1, -2, -3$।

৪. x^1 স্তম্ভটি সম্পূর্ণ কবে fx^1 ধাপটি বসাতে হবে। f-এব সঙ্গে x^1 গুণ কবে fx^1 পাওয়া যাবে। ধনাত্মক (+) ও ঋণাত্মক (−) সংখ্যাগুলি পৃথকভাবে যোগ কব এবং উভযেব অন্তব কর। Σfx^1 হল উভয়েব যোগফল।

৫. সংশোধন হিসাব করবার জন্য $\frac{\Sigma fx^1}{N}$ নির্ণয় কব অর্থাৎ Σfx^1-কে মোট স্কোরের সংখ্যা দ্বাবা ভাগ কব।

৬. বর্তমান ছকেব ক্ষেত্রে $\frac{\Sigma fx^1}{N}$ হল $\frac{+19-16}{30} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10} = \cdot 1$

৭. ci হল $\cdot 1 \times 5 = \cdot 5$ (এখানে 5 হল শ্রেণী ব্যবধান।)

৮. প্রকৃত গড হল কাল্পনিক গড + সংশোধন × শ্রেণী ব্যবধান অর্থাৎ $58\cdot 0 + \cdot 5 = 58\cdot 50$।

২, মধ্যমা

মধ্যগামী মান বোঝাতে আব একটি অঙ্ক আমরা প্রয়োজন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি সেটি হল **মধ্যমা**। মধ্যমাকে **মধ্যম-মান**ও বলে।

রাশিগুলি যখন ছকে সাজানো থাকে না, তখন বাশিগুলি যদি মান হিসাবে পর পর সাজানো হয়, তখন মাঝখানের রাশিটিই হল মধ্যমা। অবিন্যস্ত (Ungrouped) রাশিগুলি থেকে মধ্যমা বেব কবতে গেলে দুই রকমের অবস্থা দেখা দিতে পাবে। অর্থাৎ (ক) যখন N বেজোড সংখ্যা (odd) এবং (খ) যখন N জোড় সংখ্যা (even)। মনে করা যাক, একটি হস্তলিপি পরীক্ষাতে 7 জন ছাত্র নিম্নলিখিত নম্বর পেল—

5 6 6 (7) 8 9 10

এখানে মধ্যমা হল 7·0 কাবণ 7·0-এর উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক রাশি রয়েছে। 7 হল সংখ্যা সিবিজেব মধ্যবিন্দু।

উপরেব সিবিজ থেকে যদি আমবা প্রথম রাশিটি বাদ দিই, তাহলে সিরিজ দাঁড়ায় এইরূপ—

7·50

6 6 7 8 9 10

এই দ্বিতীয় সিরিজে আছে মোট ছয়টি রাশি (জোর সংখ্যা) এ ক্ষেত্রে মাঝের দুটি রাশির গড় নির্ণয় করে মধ্যমা পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মধ্যমা হল 7·50।

যখন রাশিগুলি ছকে সাজানো থাকে, তখন মধ্যমা নির্ণয়ের পদ্ধতি

Calculation of the median when data are grouped into a Frequency Distribution

যখন রাশি বা স্কোরগুলি ছকে সাজানো থাকে, তখন মধ্যমা হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যার উপরে ও নীচে মোট পরিসংখ্যার 50% থাকে। পরিসংখ্যা ছকে সাজানো রাশিগুলির মধ্যমা বের করবার সূত্র হল—

$$\text{মধ্যমা} = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - F}{fm}\right) i$$

এখানে L = সিরিজের যে বিভাগে মধ্যমা আছে তার নিম্নসীমা।

$\frac{N}{2}$ = মোট রাশির অর্ধেক।

F = L-এর নিচের রাশিগুলির পরিসংখ্যার মোট সংখ্যা।

fm = মধ্যমা যে বিভাগে আছে তার পরিসংখ্যা।

i = শ্রেণীঅন্তরের মান।

৩ নং সারণী থেকে মধ্যমা বের করবার নিয়ম আলোচনা করা হল।

$\frac{N}{2} = \frac{30}{2} = 15$; $L = 55{\cdot}5$; $F = 10$; $fm = 10$ ও $i = 5$

$$\text{সুতরাং মধ্যমা} = 55{\cdot}50 + \frac{15-10}{10} \times 5$$

$$= 55{\cdot}5 + \frac{5}{10} \times 5 = 55{\cdot}50 + 2{\cdot}50$$

$$= 58{\cdot}0$$

মধ্যমা নির্ণয়ের নিয়মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১. $\frac{N}{2}$ বের কর, N হল মোট পরিসংখ্যা।

২. পরিসংখ্যা বিভাজনটির নিচের দিক থেকে যোগ করে যেখানে মধ্যমা আছে সেই বিভাগের নিম্ন সীমা (Lower limit) বের কর। উপরের ছকটিতে নিম্ন সীমা হল 55·5।

৩. পরিসংখ্যা বিভাজনটির নিচের দিকের পরিসংখ্যাগুলি যোগ কর এবং $\left(\frac{N}{2} - F\right)$ বের কর। যে বিভাগ স্তরে মধ্যমা রয়েছে তার পরিসংখ্যা দিয়ে $\frac{N}{2}$ - F-কে ভাগ কর। অর্থাৎ $\frac{\frac{N}{2} - F}{fm}$ বের কর এবং একে i অর্থাৎ শ্রেণী অন্তর দিয়ে গুণ কর। (উপরের হিসাব লক্ষ্য কর।)

৪. ৩নং-এ আলোচিত হিসাব অনুসারে $\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}$ নির্ণয় করে L-এর সঙ্গে যোগ করে মধ্যমা বের করতে হবে।

৩. সংখ্যাগুরু মান

একটি সিরিজে যে স্কোর বা সংখ্যাটি বেশী বার উল্লিখিত থাকে, তাকে স্থূল ভূষিষ্টক (Crude mode) বা প্রাযোগিক ভূষিষ্টক (Empirical mode) বলে। কিন্তু যখন সংখ্যাগুলি পবিসংখ্যা ছকে সাজানো থাকে, তখন যে শ্রেণী অন্তরের (Class interval) পরিসংখ্যা সব চেযে বড। তাব মধ্যবিন্দুটিকে স্থূল ভূষিষ্টক বা মোড হিসাবে ধরা হয়।

প্রকৃত সংখ্যাগুরু মান নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$Mode = 3\ Mdn - 2\ Mean$$

উপবের ৩নং সারণী থেকে আমবা মধ্যমা ও গাণিতিক গড বের কবেছি। ঐগুলি উপরেব সূত্রটিতে বসিয়ে সংখ্যাগুরু মানটি বের কবা হল।

ভূষিষ্টক বা মোড্ $= 3 \times 58{\cdot}0 - 2 \times 58{\cdot}50$

$= 57{\cdot}0$

উপরের আলোচিত মধ্যগামী মানগুলি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে ?

তিন শ্রেণীর মধ্যগামী মান অর্থাৎ **গাণিতিক গড়, মধ্যমা ও ভূষিষ্টক** নির্ণয়ের পদ্ধতি আমরা আলোচনা কবেছি। রাশি বিজ্ঞানেব ছাত্রছাত্রীবা প্রথমে যে অসুবিধা বোধ করে, তা হল কোন মানটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহাব কবা হবে সেই সম্পর্কে। গাণিতিক গড অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য মান এবং অন্যান্য মধ্যগামী মান অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ গাণিতিক গড বেব করাব জন্য সমস্ত রাশিগুলিকেই হিসাবের মধ্যে আনা হয। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যেখানে মধ্যমা ও মোড্ ব্যবহাব অধিকতর সুবিধাজনক এবং বাশি বিজ্ঞানের দিক থেকেও প্রয়োজনীয় মান হিসাবে মনে কবা হয়। রাশিবিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্থির করে, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মধ্যগামী মানটি ব্যবহৃত হবে ?

গাণিতিক গড়ের ব্যবহার ঃ ১. যখন রাশিতথ্যগুলি কোন একটি মধ্যবিন্দুর চতুর্দিকে প্রতিসম অবস্থায় (Symmetrically) থাকে অর্থাৎ যখন পরিসংখ্যা ছকটি প্রতিবৈষম্য (Skewed) না হয়, তখন গাণিতিক গড একটি উত্তর মধ্যগামী মান। পরিসংখ্যা বিভাজনে গাণিতিক গডটি ভর কেন্দ্র (Centre of Gravity) হিসাবে কাজ করে এবং বিভাজনের প্রত্যেকটি রাশি তা নির্ণয়ে সাহায্য করে।

২. গাণিতিক গড় অন্যান্য মধ্যগামী মান থেকে অধিকতর সুস্থিত (Stable)। এই কারণে যখন কোন অধিকতর নির্ভরযোগ্য মান প্রয়োজন হয়, তখন গাণিতিক গড় নির্বাচন করা হয়।

৩. যখন মধ্যগামী মান ও অন্যান্য রাশি গাণিতিক মান যথা সমক পার্থক্য (Standard deviation), সহগাঙ্ক (Correlation co-efficient) একই সঙ্গে নির্ণয় করবার প্রয়োজন হয়, তখন গাণিতিক গড নির্ণয় করাই সুবিধা।

মধ্যমার ব্যবহার : ১. যখন বাশি বিভাজনের সঠিক মধ্যবিন্দু হিসাব করবার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ 50% বিন্দুর প্রয়োজন হয়।

২. যখন পরিসংখ্যা বিভাজনে প্রান্তবর্তী রাশিগুলি গাণিতিক গড়ের মানকে প্রভাবিত করে। প্রান্তবর্তী রাশিগুলি মধ্যমাকে প্রভাবিত কবে না।

ভূয়িষ্টক বা সংখ্যাগুরু মানের ব্যবহার : ১. যখন কোন মধ্যগামী মান তাডাতাডি মোটামুটিভাবে নির্ণয়েব প্রযোজন হয়।

২. যখন মধ্যগামী মানেব দ্বারা কোন বিষয়েব প্রতিনিধিত্বমূলক মান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। মনে করা যাক একটি জুতা কোম্পানী বেশির ভাগ মেয়েরা কি ধবনের জুতা পছন্দ করে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চায়—সেখানে ভূয়িষ্টক প্রয়োজনীয় মধ্যগামী মান।

অনুশীলনী

১. নিম্নলিখিত 25 রাশি বা স্কোবকে পবিসংখ্যা ছকে সাজাও এবং শ্রেণী ব্যবধান 3 অথবা 5 ধর। প্রথম বিভাগটি আরম্ভ 45 রাশিটি থেকে।

72	69	84	67	61
73	72	63	71	83
70	76	76	82	67
72	86	65	78	81
64	67	77	75	72

২. নিম্নলিখিত রাশিগুলি সপ্তম শ্রেণীর 50 জন ছাত্রের গণিতের নম্বর। রাশিগুলি পরিসংখ্যা ছকে সাজাও ; শ্রেণী ব্যবধান 10 ধর।

50	46	48	62	70	75	71	61	60	45
44	48	40	30	35	60	50	52	46	40
20	28	33	38	46	42	40	45	50	53
57	58	60	44	38	46	49	27	80	37
12	30	50	68	72	36	28	53	65	70

৩. নবম শ্রেণীর ৬৫ জন ছাত্রীর বাংলার নম্বর হল নিম্নরূপ। রাশিগুলিকে 5-এর শ্রেণী ব্যবধানে সাজাও এবং প্রথম বিভাগটি আরম্ভ কর 45 রাশি থেকে।

64	58	69	72	80	92	92	52	66	68
85	50	66	62	81	71	88	78	99	71
54	47	80	81	71	65	76	76	85	61
70	65	72	92	76	65	71	90	88	92
80	67	71	90	54	66	88	70	59	51
91	51	71	41	81	76	66	72	72	70
85	75	65	81	66					

৪. 25 জন শিশুর আই. কিউ. (বুদ্ধির মাপ) এখানে দেওয়া হল। 5 শ্রেণী ব্যবধান ধরে পরিসংখ্যা ছকে সাজাও।

120	85	130	88	101
100	91	110	125	128
98	110	108	120	130
108	105	105	102	125
102	111	100	105	140

৫. উপরে উপাত্তগুলি নিয়ে যে পরিসংখ্যা ছক তৈরি করেছো, সেইগুলির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

৬. 4নং'উদাহরণের পরিসংখ্যা ছকটির আয়তলেখ অঙ্কিত কর।

৭. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা ছকটির গাণিতিক গড, মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর।

বিভাগ :	21—25	26—30	31—35	36—40	41—45
পরিসংখ্যা :	4	6	20	7	3

৮. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা ছকটির গাণিতিক গড, মধ্যমা নির্ণয় কর।

বিভাগ :	6—10	11—15	16—20	21—25	26—30	31—35	36—40
পরিসংখ্যা :	3	5	8	15	24	13	6

ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ ও আয়ত লেখ অঙ্কিত কর এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯. নিম্নলিখিত রাশিগুলির গাণিতিক গড় ও মধ্যমা নির্ণয় কর।

9, 10, 8, 11, 8, 6, 7, 9.

বিস্তৃতির পরিমাপ
Measures of Variability

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে বা কাঁচা রাশি থেকে আমরা তিন শ্রেণীর ধ্রুবক সংখ্যা পেতে পারি। যথা **গাণিতিক গড়, মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরু মান**। কিন্তু এগুলি দরকার পরিসংখ্যা বিভাজনটি যখন অপ্রতিসম। প্রতিসম ছক বিন্যাসে মধ্যগামী মানের তিনটি অঙ্কই খুব কাছাকাছি হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক হবে।

মধ্যগামী মানেব সাহায্যে রাশিতথ্যের প্রকৃতি প্রকাশ করা সব সময় সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গড়ের মান এক হলেও রাশিতথ্যেব বিভিন্ন নমুনার প্রকৃতি পৃথক হতে পাবে। একটি উদাহরণেব সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

নিম্নলিখিত দুটি নমুনাব বাশিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলি পৃথক হলেও, এদের যৌগিক গড 50।

১নং নমুনা :	40	47	50 (যৌগিক গড)	52	61
২নং নমুনা :	13	20	50 (যৌগিক গড)	75	92

দুটি নমুনার গড 50, কিন্তু প্রথমটির বাশিগুলির পার্থক্য যৌগিক গড থেকে কম অর্থাৎ বাশিগুলি যৌগিক গডেব কাছাকাছি। কিন্তু দ্বিতীযটিতে বাশিগুলিব পার্থক্য যৌগিক গড থেকে খুব বেশি। শুধু যদি যৌগিক গড বিবেচনা কবি, তাহলে রাশি তথ্যেব বৈশিষ্ট্য আমাদেব নিকট তেমন পরিষ্কার হবে না। এই জন্য প্রয়োজন বাশিগুলির বিস্তৃতির একটি মাপ দেওয়া।

রাশিগুলির বিস্তৃতিব (Variability) পবিমাপেব জন্য রাশি বিজ্ঞানীবা অনেক রকমের মাপ ব্যবহাব কবেন। এইগুলি হল—১. **প্রসার** (Range), ২. **গড় পার্থক্য** (Mean deviation), ৩. **সমক পার্থক্য** (Standard deviation or S. D) ও ৪. **চতুর্থক পার্থক্য** (Quartile deviation or Q)

১. প্রসার : কোন নমুনাতে বাশিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড এবং সবচেয়ে ছোট বাশি পার্থক্যকে বা অন্তবকে তার **প্রসার** বলে। এই মাপকে বিস্তৃতির সুষ্ঠু মাপ হিসাবে নেওয়া ঠিক নয়, কাবণ প্রসাবে সমস্ত রাশিব মধ্যে সবচেয়ে বড এবং সবচেয়ে ছোট রাশিকে কেবল মাত্র বিবেচনা করা হয়।

২. **গড় পার্থক্য ঃ** যৌগিক গড় থেকে বিভিন্ন রাশির অন্তর ফলের নিরপেক্ষ (অর্থাৎ ধনাত্মক (+) বা ঋণাত্মক (--) চিহ্ন বাদ দিয়ে) ফলকে যোগ করে মোট সংখ্যামান দ্বারা ভাগ দিয়ে গড় পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। যৌগিক গড থেকে রাশিগুলির পার্থক্য বিবেচনা না করে মধ্যমা থেকেও করা যেতে পারে।

৩. **সমক পার্থক্য ঃ** বিস্তৃতির মাপ হিসাবে সমক পার্থক্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহাব কবা হয। সমক পার্থক্য বিস্তৃতির সর্বাপেক্ষা নির্ভবযোগ্য পরিমাপ। শিক্ষা বিষয়ক মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যবিধ গবেষণায় এই পবিমাপেব যথেষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

গাণিতিক গড থেকে বিভিন্ন বাশির অন্তবেব বর্গফল যোগ করে, লব্ধ ফলকে মোট বাশি সংখ্যা (N) দ্বাবা ভাগ করে, প্রাপ্ত ভাগফলের বর্গমূলকে **সমক পার্থক্য** (Standard deviation or S. D) বলে। সমক পার্থক্যকে গ্রীক অক্ষর σ (সিগমা) দ্বাবা নির্দেশ করা হয়।

অবিন্যস্ত রাশিসমূহের সমক পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্র

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$$

এখানে Σx^2 = যৌগিক গড থেকে রাশিসমূহেব অন্তরের বর্গের যোগফল।

N = বাশির মোট সংখ্যা

উদাহরণ ঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি বাশিব সমক পার্থক্য নির্ণয় কর।

6, 8, 10, 12, 14

এই পাঁচটি বাশিব গাণিতিক গড হল 10 এবং 10 থেকে প্রত্যেক বাশির অন্তব-ফল হল যথাক্রমে −4, −2, 0, 2, 4. পাঁচটি অন্তব ফলেব বর্গ হল 16, 4, 0, 4, 16 এবং এইগুলিব যোগফল হল 40 এবং N = 5। উপরের সূত্রেব সাহায্যে

$$\sigma=\sqrt{\frac{40}{5}}=2{\cdot}83$$

বিন্যস্ত বা ছকে সাজানো রাশিসমূহের সমক পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্র

বিন্যস্ত বা ছকে সাজানো রাশিসমূহের সমক পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা যেতে পাবে।

$$\sigma=i\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}}$$

একটি উদাহবণেব সাহায্যে সমক পার্থক্য নির্ণযের পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

সারণী ৫

(1) বিভাগ	(2) মধ্যবিন্দু	(3) পরিসংখ্যা (f)	(4) x'	(5) fx'	(6) fx'^2
76—80	78	1	+4	+4	16
71—75	73	2	+3	+6	18
66—70	68	2	+2	+4	8
61—65	63	5	+1	+5 (+19)	5
56—60	58	10	0	0	
51—55	53	5	—1	—5	5
46—50	48	4	—2	—8	16
41—45	43	1	—3	—3 (—16)	9
		N = 30			77

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - c^2}$$
$$= 5\sqrt{\frac{77}{30} - \left(\frac{3}{30}\right)^2}$$
$$= 5\sqrt{2 \cdot 56 - \cdot 01}$$
$$= 5\sqrt{2 \cdot 55}$$
$$= 5 \times 1 \cdot 56$$
$$= 7 \cdot 80$$

পূর্বে আমরা গাণিতিক গড় নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পদ্ধতিতে একটি গাণিতিক গড়কে কল্পনা করে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী স্তরে কাল্পনিক গড়কে সংশোধন করে প্রকৃত গড় বের করা হয়। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সমক পার্থক্য নির্ণয়েও বেশ সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারের দ্বারা সময় ও পরিশ্রম বাঁচানো যায়। উপরে কিভাবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা সমক পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে, তা দেখানো হয়েছে।

সমক পার্থক্য নির্ণয়ের পদ্ধতি

১. স্কোর বিভাগের যে স্তরে কাল্পনিক গড় ধরা হয়েছে x' স্তম্ভে সেখানে 0 (শূন্য) বসাও এবং +1, +2 এবং −1, −2 ইত্যাদি দ্বারা উপরের ও নিচের ধাপগুলি চিহ্নিত কর।

২. পরিসংখ্যা ও x' স্তম্ভের রাশিগুলি পাশাপাশি গুণ করে fx' স্তম্ভ সম্পূর্ণ কর।

৩. পুনরায় fx'-এব সঙ্গে x' গুণ কব এবং fx'^2 স্তম্ভটি সম্পূর্ণ কর।

৪. সূত্রটিতে প্রয়োজনীয় রাশিগুলি বসিয়ে সমক পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪. চতুর্থক পার্থক্য

চতুর্থক পার্থক্য বের কবতে হলে পরিসংখ্যা বিভাজনকে চলকেব মান অনুসারে চারটি সমান অংশে ভাগ কবতে হবে। মনে কবা যাক, একটি পরিসংখ্যা বিভাজনে মোট পরিসংখ্যা হল 40 সুতবাং Q_1 হল চলকেব এমন একটি রাশি যার নিচেয আছে পরিসংখ্যার 25% অর্থাৎ $40 \div 4 = 10$টি রাশি।

চিত্র ৬

অনুরূপভাবে Q_2 হল চলকের এমন একটি রাশি যার নিচে আছে N-এব 50% অর্থাৎ 40-এর $\frac{1}{2} = 20$। Q_2 **প্রকৃত পক্ষে মধ্যমা**। এই ভাবে Q_3 হল চলকেব এমন একটি রাশি যার নিচেয় থাকবে N-এব 75% অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে $40 \times \frac{3}{4} = 30$।

Q_1-কে বলা হয় **লঘু চতুর্থক** (1st quartile)

Q_2-কে বলা হয় **মধ্যমা** (2nd quartile or Median)

এবং Q_3-কে বলা হয় **গুরু চতুর্থক** (Third quartile)
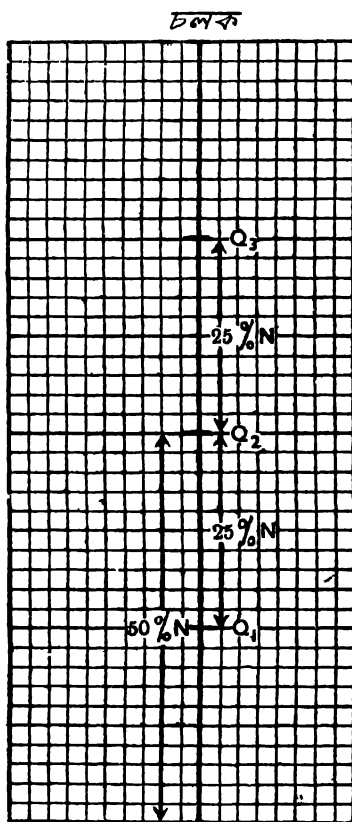
চতুর্থক পার্থক্য হল $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

চতুর্থক পার্থক্য নির্ণয়ের পদ্ধতি

১. যে নিয়মে মধ্যমা বেব কবা হযেছে, সেই নিয়ম এখানেও অনুসরণ করা হবে। Q_2 যেমন মধ্যমা, তেমনি Q_1 বা লঘু চতুর্থক হল

$$Q_1 = L + i\left(\frac{\frac{N}{4} - \text{cum f}}{fq}\right)$$ এবং

গুরু চতুর্থক অর্থাৎ $Q_3 = L + i\left(\frac{\frac{3N}{4} - \text{cum } f}{fq}\right)$

২. সারণী ৩-এর উপাত্তগুলি নিয়ে Q_1 বের করবার নিয়ম আলোচনা করা হল। এখানে 25% বা $\frac{1}{4}$ of N হল 7·5। যেখানে Q_1 আছে তার নিচের রাশিগুলির সমষ্টি হল 5 (4+1=5)। 51–55 শ্রেণীবিভাগের মধ্যে Q_1 আছে; এই বিভাগের পরিসংখ্যা হল 5, এখানে L হল 50·5।

সুতরাং $Q_1 = 50{\cdot}5 + 5 \times \left(\frac{\frac{30}{4} - 5}{5}\right)$

$$= 50{\cdot}5 + 5 \times \left(\frac{7{\cdot}5 - 5{\cdot}0}{5}\right) = 50{\cdot}5 + 5 \times \left(\frac{2{\cdot}50}{5}\right)$$

$$= 50{\cdot}5 + 2{\cdot}5 = 53{\cdot}0$$

৩. অনুরূপভাবে $Q_3 = 60{\cdot}5 + 5 \times \left(\frac{22{\cdot}5 - 20}{5}\right)$

$$= 60\ 5 + 2{\cdot}5 = 63{\cdot}0$$

$$\therefore Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$= \frac{63{\cdot}0 - 53{\cdot}0}{2} = \frac{10}{2} = 5.$$

দ্রষ্টব্য ঃ মধ্যমার অবস্থান হল গুরু চতুর্থক (Q_3) এবং লঘু চতুর্থক (Q_1)-এর মধ্যবিন্দুতে। যখন পরিসংখ্যা বিভাজনটি স্বভাবী বিভাজনেব (Normal distribution) ন্যায় হয়, তখন Q-কে বলা হয় সম্ভাব্য ভ্রান্তি মান (Probable error or PE)। অনেকে PE ও Q-কে একই অর্থে ব্যবহাব কবেন। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। একমাত্র স্বভাবী বিভাজনেব ক্ষেত্রেই এ দুটি এক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

অতিরিক্ত অনুশীলনী

১. একটি বিদ্যালয়েব মাধ্যমিক পবীক্ষাব বাংলা ভাষাব নম্বব নিম্নরূপ। শ্রেণী-ব্যবধান 5 লইয়া নম্ববগুলি একটি পরিসংখ্যা বিভাজনে সাজাও।

26	49	46	51	79	51	52	55	44	42
33	58	53	26	55	53	35	63	·56	47
50	68	56	74	58	63	56	62	57	53
61	72	62	40	45	69	59	51	64	56
44	38	35	47	47	56	63	49	43	59

২. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনটিব পরিসংখ্যা বহুভুজ ও আয়ত লেখ অঙ্কিত কব এবং লেখটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য লিখ।

স্কোর শ্রেণী-ব্যবধান :	125-129	120-124	115-119	110-114	105-109	100-104
পরিসংখ্যা :	4	8	12	20	15	14

স্কোর শ্রেণী-ব্যবধান :	95-99	90-94	85-89	80-84
পরিসংখ্যা :	12	8	5	2

৩. ২নং প্রশ্নের পরিসংখ্যা বিভাজনটিব গাণিতিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কব।

৪. ২নং প্রশ্নের পরিসংখ্যা বিভাজনটিব সমক পার্থক্য নির্ণয় কব।

৫. নিম্নলিখিত পবিসংখ্যা বিভাজনটিব গড, মধ্যমা ও সমক পার্থক্য নির্ণয় কব। বিভাজনটিব আয়ত লেখ অঙ্কিত কর এবং লেখটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য লেখ।

শ্রেণী-ব্যবধান স্কোর	পরিসংখ্যা
2—9	1
10—17	0
18—25	5
26—33	6
34—41	7
42—49	8
50—57	10
58—65	6
66—73	5
74—81	6
82—89	4
90—97	2
	N=60

বিস্থালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লব্ধ মার্ক-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা
Interpretations of School Marks

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পবীক্ষা নির্ভর। পবীক্ষায় ফলাফলেব উপব ছাত্রদেব অভিভাবকেবা বেশি জোর দিয়ে থাকেন। যে ছাত্র ইতিহাসে ৮০ পেল সে মনে করে তার ইতিহাসের জ্ঞান খুব অধিক; যে ছাত্র কম নম্বব পেল তাকে মনে করা হয় খাবাপ ছেলে। স্কুলের পরীক্ষায় সাধাবণত দুই প্রকারের নম্বর ব্যবহার করা হয়। এইগুলি হল **বর্ণক্রম** (Letter grading) এবং সংখ্যা ক্রম (Digit

grading)। অক্ষর ক্রম সাধারণত 3, 5 অথবা 7 পয়েণ্ট স্কেলে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যা ক্রম ব্যবহৃত হয় 101 পয়েণ্ট স্কেলে। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষায় সংখ্যা ক্রম অর্থাৎ 101 পয়েণ্ট স্কেলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই স্কেলের সূক্ষ্ম বিভাগের জন্য কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন একটি পরীক্ষায় যদি কেউ 60% মার্ক পায়, তাহলে সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু কেউ যদি 59% মার্ক পায় তাহলে তাকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। অথচ একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে দুটি ছাত্রই একই মানের। বর্ণক্রম ব্যবস্থায় এই দোষ দূর করা যায়, অর্থাৎ যারা B মার্ক পেল, তাদের শিক্ষার মান মোটামুটি এক ধরনের।

আমাদের বিদ্যালয়ে, যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাদেরও মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা জ্ঞান (Knowledge) বিষযক এবং গুণ (Quality) বিষয়ক। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানমুখী বিষয় এবং হাতের লেখা, রচনা, অঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতি গুণবাচক বিষয়। ইতিহাসের পরীক্ষায় ইতিহাসের বিষয়বস্তু জানা আছে কিনা, তা পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু হাতের লেখা, রচনা পরীক্ষায় হাতের লেখার সৌন্দর্য, দ্রুত (Speed) প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। রচনা পরীক্ষাযও রচনার লিখন শৈলী, শব্দ নির্বাচন, বর্ণনাভঙ্গি প্রভৃতি বিচার করা হয়। জ্ঞানমুখী পরীক্ষায় নম্বর দান মোটামুটিভাবে বিষয় নির্ভর (Objective), কিন্তু গুণবাচক বিষযে নম্বর দান নির্ভর করে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি, মান ও মনোভাবের উপর। একই রচনায় বা হাতের লেখায় এক এক জন পরীক্ষক এক এক প্রকার নম্বর দিতে পারেন। বিষয়মুখী পরীক্ষায় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি বা মতামত কোন প্রভাব বিস্তার করে না। প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলেই পরীক্ষক নম্বর দিতে বাধ্য হন।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল নানা বিষযের উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়গুলি নিম্নলিখিত কযেকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

(১) পরীক্ষার্থীদের দক্ষতা (Ability) এবং প্রস্তুতি।

(২) পরীক্ষকদের বিচারের পদ্ধতি। কোন পরীক্ষক নম্বর দানে খুব উদার, কেউবা কড়া, কেউবা মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করেন।

(৩) প্রশ্নপত্রের ধরন। প্রশ্নপত্র যদি কঠিন হয়, তাহলে অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল করবার আশা করে, কিন্তু সহজ প্রশ্নপত্রে পাশের হার এবং উচ্চ নম্বর পাবার হার বেড়ে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষার ফল উপরোক্ত তিনটি বিষয় যথা, প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক এবং পরীক্ষার্থী তিনজনের উপরই নির্ভরশীল।

আমরা পূর্বে ছাত্রদের পরীক্ষায় লব্ধ মার্ক নিয়ে রাশি-গণিতের সাহায্যে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আলোচনা করছি—কিভাবে পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে অঙ্কিত লেখ-এর সাহায্যে

পরীক্ষায় ফলের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করছি।

উদাহরণ ১

একটি বিদ্যালয়েব বিজ্ঞানের নম্বর নিযে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বহুভুজটি অঙ্কিত করা হল। পরিসংখ্যা বহুভুজটি বিশ্লেষণ কবে ঐ পবীক্ষার্থী দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়?

পরিসংখ্যা বহুভুজটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বেশিব ভাগ পরীক্ষার্থী অধিক নম্বব পেয়েছে। পবিসংখ্যা বহুভুজটি বামাযত প্রতিবৈষম্যযুক্ত (Negatively skewed)। এর কাবণ হিসাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত কবা যেতে পারে।
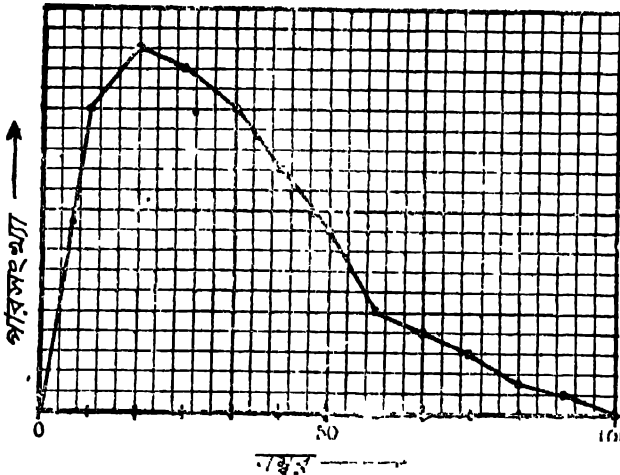
চিত্র ৭

১. প্রশ্নপত্র খুব সহজ,
২. পবীক্ষক নম্বব দানে খুব উদাব,
৩. পবীক্ষার্থীদেব প্রস্তুতিব মান খুব উন্নত। অথবা,
৪. উপরের তিনটি কাবণেব সম্মিলিত প্রভাবের জন্য।

উদাহরণ ২

একটি স্কুলে ইংরাজী পবীক্ষায় লব্ধ মানেব পরিসংখ্যা বহুভুজটি নিম্নলিখিত আকারেব। পরিসংখ্যা বহুভুজটি লক্ষ্য কবলে বোঝা যায় সেটি দক্ষিণায়ত প্রতি-বৈষম্যযুক্ত (Positively skewed)। পবিসংখ্যা বহুভুজ থেকে পবীক্ষা ও পবী-ক্ষার্থীদেব দলটি সম্পর্কে কি ধাবণা কবা যায়?

বহুভুজটি যেহেতু দক্ষিণায়ত প্রতিবৈষম্য বিশিষ্ট, সেইহেতু সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, বেশির ভাগ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত মার্ক 50-এর নিচেয়। এর কারণ হিসাবে নিম্ন-লিখিত কারণগুলি নির্দেশ করা যায়।

১. প্রশ্নপত্র খুব কঠিন।

২. পরীক্ষক নম্বর দানে খুব কড়া।
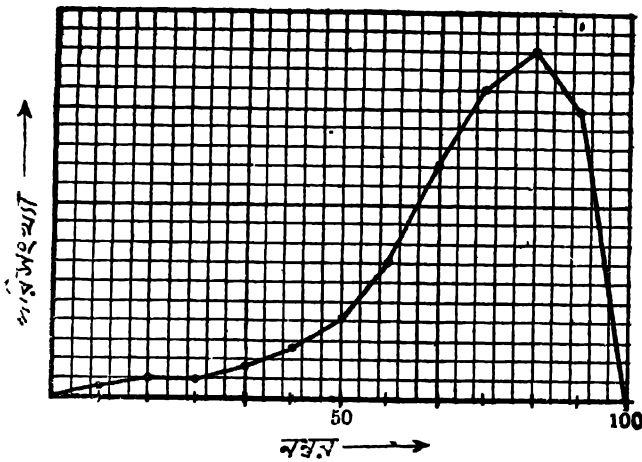
চিত্র ৮

৩. পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির মান উন্নত নয় ; অথবা,

৪. উপরের উল্লিখিত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফল।

উদাহরণ ৩

একটি পরীক্ষায় 'পরীক্ষার্থীদের পরিসংখ্যা বহুভুজটি পাওয়া গেল প্রদত্ত
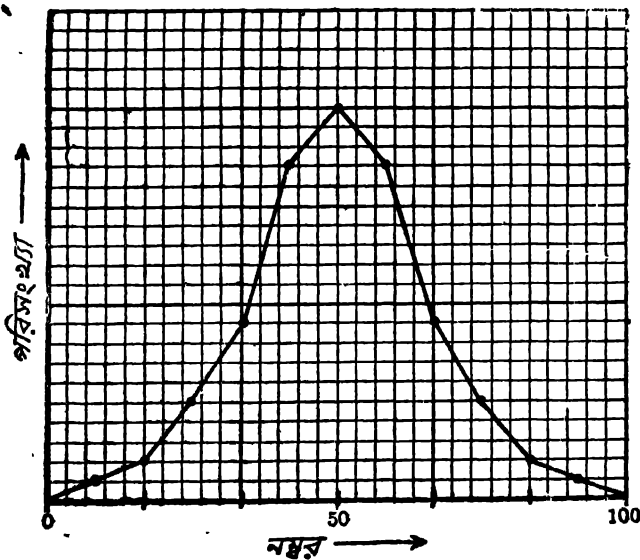
চিত্র ৯

চিত্রের ন্যায়। এই লেখটি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার মান সম্পর্কে কি ধারণা করা যায় ?

উত্তর : ১. প্রশ্নপত্র সঠিক মানের।
২. পরীক্ষকের নম্বর দানের মান যথাযথ।
৩. পরীক্ষার্থীদের দলটি স্বভাবী (Normal)।

মন্তব্য : পরিসংখ্যা বহুভুজ লেখটি একটি স্বভাবী সম্ভাবনা লেখ (Normal probability curve)-এর মত দেখতে। স্বভাবী শিশুদেব বুদ্ধি, পরীক্ষার ফল সাধারণভাবে স্বভাবী সম্ভাব্য লেখের আকার ধারণ করে।

উদাহরণ 8

কোন পবীক্ষায় ছাত্রদেব পঠন ক্ষমতা ও গণিতেব মান পরীক্ষা কবে নিম্নলিখিত নম্বব পাওযা গেল। ছাত্রদের মোট সংখ্যা হল 50। একই অক্ষরেখার উপর নিম্নলিখিত উপাত্তেব ভিত্তিতে দুটি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর এবং লেখ দুটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

মার্ক	মার্ক (%)	পরিসংখ্যা (পঠন ক্ষমতা)	পরিসংখ্যা (%) (পঠন ক্ষমতা)	পবিসংখ্যা (গণিত)	পবিসংখ্যা (%) (গণিত)
10	100	15	30	3	6
9	90	20	40	4	8
8	80	5	10	3	6
7	70	8	16	7	14
6	60	2	4	10	20
5	50	0	0	12	24
4	40	0	0	4	8
3	30	0	0	2	4
2	20	0	0	2	4
1	10	0	0	1	2
0	0	0	0	2	4

উপরেব উপাত্তগুলি শতকরা হাবে পরিবর্তিত কবে, তাদেব সাহায্যে দুটি পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কিত করা হল। পরিসংখ্যা বহুভুজ দুটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় যে, পঠন ক্ষমতা সংক্রান্ত বহুভুজটি বামায়ত। এব কারণ বোধ হয় পঠন ক্ষমতাব পবীক্ষায় পবীক্ষকেব ব্যক্তিগত অভিমত ও ধাবণা সবিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবে। এই কাবণেই পবিসংখ্যা বহুভুজটিব আকাব সুষম না হয়ে বামায়ত হযেছে। এথেকে এরূপ সিদ্ধান্ত কবা যায যে, পঠন ক্ষমতা বা হস্তলিপি প্রভৃতি পবিমাপের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয় নির্ভব না হয়ে পবীক্ষক নির্ভব হযে থাকে এবং লব্ধ পরিসংখ্যা বহুভুজটি আকারে দক্ষিণায়ত বা বামায়ত প্রতিবৈষম্যযুক্ত হতে পারে।

ব্যবহারিক অংশ

সাতাশ

কিন্তু গণিতের জ্ঞান পরিমাপের ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি নৈর্ব্যক্তিক ধরনের এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় লব্ধ মার্ক লেখে পরিবর্তিত করলে, লেখাটি সুষম আকার ধারণ করে অর্থাৎ লেখের উভয় পার্শ্বে কম সংখ্যক ছাত্র অবস্থান করে এবং বেশি সংখ্যক ,অবস্থান করে
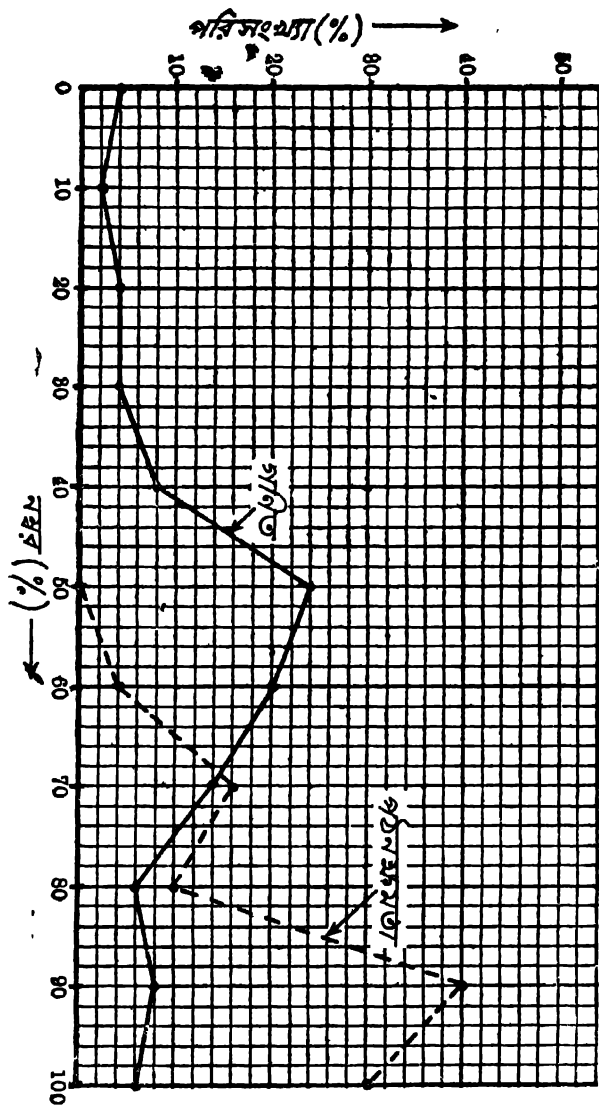
মধ্যদেশে গাণিতিক গড়ের কাছাকাছি। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে লব্ধ মার্কের সাহায্যে অঙ্কিত পরিসংখ্যা বহুভুজটি মোটামুটিভাবে স্বভাবী সম্ভাব্য লেখের মত হয়।

বিদ্যালয়ে লব্ধ বিভিন্ন প্রকারের সাফল্যাঙ্ক বা স্কোরের মধ্যে তুলনা

অনেক সময় ছাত্রদেব লব্ধ স্কোর নানা এককে (Unit) প্রকাশ করা হয়। যেমন, গণিতেব নম্বর ও বুদ্ধির মাপ। আবার এক জন ছাত্রের দুটি বিষযেব মানের তুলনা কববার প্রযোজন হয়। একটি বিদ্যালয়েব ৭ম শ্রেণীর একটি ছাত্রেব গণিতের নম্বর 90 এবং পঠন ক্ষমতাব নম্বর 50। এই ক্ষেত্রে যদি পৃথক গাণিতিক গড ও সমক পার্থক্য পাওয়া যায তবে উভয় নম্ববেব মধ্যে তুলনা কববাব সুবিধা হয়। প্রাপ্ত নম্বরকে সমক পার্থক্য বা সিগ্‌মা দিযে ভাগ কবে সিগ্‌মা একক পাওয়া যায়। একটি উদাহবণেব সাহায্যে বিষযটি আলোচনা কবা যাক।

একটি পবীক্ষায গাণিতিক গড হল 122 এবং সমক পার্থক্য হল 24। টিয়া ঐ পরীক্ষায় নম্বব পেল 146 এবং কেয়া পেল 110। তাদেব দুই জনের প্রাপ্য নম্বরেব তুলনা কববাব জন্য টিয়া ও কেযাব নম্ববকে সিগমা এককে (σ unit) পরিবর্তিত করতে হবে।

টিযাব নম্ববেব গাণিতিক গড 122 থেকে পার্থক্য হল $146-122=24$

∴ টিযাব নম্ববেব সিগমা একক হল $24 \div 24 = 1$

গাণিতিক গড থেকে কেযাব নম্ববেব পার্থক্য হল $110 - 122 = -12$

∴ কেয়াব নম্ববের সিগমা একক হল $-12 \div 24 = -\cdot 5$

গাণিতিক গড থেকে নম্ববেব পার্থক্যকে সিগমা এককে পবিবর্তিত করে যে স্কোর পাওযা যায় তাকে বলে সিগমা স্কোব (σ score)। রাশি গণিতে সিগমা একককে z স্কোর বা পবিবর্তিত স্কোবও বলে। তবে সিগমা স্কোব সংজ্ঞাটি অধিকতব অর্থবোধক, স্কোবটির অর্থ বেশি পবিষ্কাবভাবে প্রকাশ করে। এক সেট সিগমা স্কোবেব গাণিতিক গড হল 0 (শূন্য) এবং σ-এব মান সর্বদাই 1 হবে। কিন্তু সিগমা স্কোরেব অসুবিধা হল যে, অর্ধেক মান ঋণাত্মক এবং অন্য অর্ধেক হবে ধনাত্মক। আবাব সিগমা স্কোব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে মান নির্দেশ করে এবং এই কারণে হিসাবের সময়ে অসুবিধা সৃষ্টি কবে। এই কাবণে সিগ্‌মা স্কোরগুলিকে নতুনভাবে বণ্টন করা হয়; এই নতুন বণ্টনে সুবিধামত গাণিতিক গড (M) ও সমক পার্থক্য (σ) স্থির কবা হয়। এর ফলে সমস্ত স্কোবগুলি ধনাত্মক স্কোরে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিবর্তনের সুবিধা এই যে, এই স্কোরগুলিব সাহায্যে হিসাবে সুবিধা হয। এইরূপ পবিবর্তিত স্কোবগুলিকে বলে **আদর্শ স্কোর** (Standard scores)।

কাঁচা স্কোরগুলি আদর্শ স্কোরে পবিবর্তনেব ফলে স্কোর বণ্টনেব কোনরূপ গুণগত পরিবর্তন হয না কাবণ পবিবর্তনটি হল সবলবৈখিক পবিবর্তন। এর অর্থ হল মূল স্কোবগুলিব বণ্টনের আকাব যদি বামাযত বা দক্ষিণায়ত প্রতিবৈষম্যযুক্ত

(Negatively or positively skewed) হয়, তাহলে পরিবর্তিত স্কোরগুলিও একই প্রকারের আকার ধারণ করবে।

কাঁচা স্কোরগুলি আদর্শ স্কোরে রূপান্তরের সূত্র হল :

$$\frac{X' - M^1}{\sigma^1} = \frac{X - M}{\sigma}$$ যখন X = মূল বণ্টনটির স্কোব।

X^1 = নতুন বণ্টনেব আদর্শ স্কোর।

M এবং M^1 = কাঁচা স্কোবগুলির গাণিতিক গড এবং পবিবর্তিত স্কোরগুলিব গাণিতিক গড়।

σ ও σ^1 · যথাক্রমে কাঁচা ও আদর্শ স্কোবগুলির সমক পার্থক্য।

$$\therefore\ X' = \frac{\sigma^1}{\sigma}\left(X - M\right) + M^1$$

একটি উদাহরণ : একটি পরিসংখ্যা বণ্টনে গাণিতিক গড হল 25 এবং σ হল 5; ঐ বণ্টনেব রঞ্জনেব স্কোর হল 30 এবং তনিকাব স্কোর হল 40। ঐ কাঁচা স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত কব—যে বণ্টনে গাণিতিক গড হবে 50 এবং σ হবে 10।

উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে :

$$X^1 = \frac{10}{5}(X - 25) + 50$$

বঞ্জনেৰ স্কোর 30 বসিয়ে :

$$X^1 = 2(30 - 25) + 50$$
$$= 10 + 50 = 60$$

তনিকার স্কোর 40 বসিযে :

$$X^1 = \frac{10}{5}(40 - 25) + 50$$
$$= 2 \times 15 + 50 = 30 + 50 = 80.$$

কোন ব্যক্তি একাধিক অভীক্ষাব মাধ্যমে পৃথক স্কোব লাভ করে এবং স্কোরগুলিব (একক) যদি পৃথক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ঐগুলি তুলনা করা যায় না। কিন্তু যদি স্কোবগুলিকে আদর্শ স্কোবে পরিবর্তিত করা যায়। তাহলে ঐগুলি তুলনা করা সম্ভব। অবশ্য যদি স্কোবগুলির বণ্টন স্বভাবী সম্ভাবনা লেখের ধরনে থাকে। সুবিধাব কথা এই যে, বেশিব ভাগ বিষয়েব ক্ষেত্রে স্কোরগুলিব বণ্টন স্বভাবী সম্ভাবনা লেখের আকারে থাকে।

আদর্শ প্রশ্ন

প্রথম পত্র / প্রথম খণ্ড

১ শিক্ষাশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. শিক্ষাশাস্ত্র কাকে বলে? শিক্ষাশাস্ত্রের সহিত দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

২. 'আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রভাবিত' এই মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩. নতুন বিষয় বা ডিসিপ্লিন হিসাবে শিক্ষা-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২ শিক্ষার তাৎপর্য, প্রয়োজন, লক্ষ্য ও কাজ

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. 'শিক্ষা' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২. 'শিক্ষা একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া'—এই বাক্যটির উপর মন্তব্য লেখ।

৩. শিক্ষাকে একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া বলে কেন? ২ নং প্রশ্নের সঙ্গে এটি তুলনা কর।

৪. 'আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষার' অর্থ আলোচনা কর। কিভাবে অনুষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়? আমাদের সমাজে এই শিক্ষার প্রভাব কি?

৫. উদার অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার তাৎপর্য আলোচনা কর। এই সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৬. শিক্ষাকে পুরাতন শিক্ষা এবং নতুন শিক্ষা এই দুই ভাগে ভাগ করবার সার্থকতা কোথায়? নতুন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। নতুন শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলা হয় কেন?

৭. শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। কিভাবে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি?

৮. শিক্ষার ভিত্তি বলতে কি বোঝা যায়? শিক্ষার জৈবিক ভিত্তি ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯. শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি বলতে কি বোঝ? 'সামাজিকীকরণ' (Socialisation) কথাটির অর্থ কি?

১০. প্রত্যেক দেশে শিক্ষার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১. শিক্ষার যে কোন দুটি সংজ্ঞা দাও এবং তাদের তুলনামূলক আলোচনা কর।

১২. শিক্ষার অর্থ উপযোজন বা সংগতি বিধান—এই সংজ্ঞাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৩. 'শিক্ষার অর্থ হল বৃদ্ধি ও বিকাশ'—এই কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। বৃদ্ধি ও বিকাশ এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা দাও। কি অবস্থায় বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে থাকে?

১৪. পরিবেশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। কিভাবে শিক্ষা শিশুকে বিভিন্ন পরিবেশে সংগতি বিধানে সাহায্য করে।

১৫. অভিজ্ঞতার (Experience) সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি? কিভাবে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি? শিক্ষাকে 'ব্যক্তির অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ' বলা হয় কেন?

১৬. ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন কেন? শিক্ষা কিভাবে আমাদের সাহায্য করে?

১৭. শিক্ষা কিভাবে সামাজিক ও জাতীয় প্রগতিকে সাহায্য করে?

১৮. শিক্ষার লক্ষ্য বলতে কি বোঝ? শিক্ষার কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৯. শিক্ষার কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। এর মধ্যে কোন লক্ষ্যটি সঙ্গত মনে কর?

২০. 'শিক্ষার লক্ষ্য আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি'—এই উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২১. 'শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন'—এই উক্তিটি নিয়ে আলোচনা কর।

২২. স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের আদর্শ শিক্ষার কি লক্ষ্য হওয়া উচিত?

২৩. শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।

২৪. শিক্ষার কাজ বলতে কি বোঝ? শিক্ষার প্রধান কাজগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১. সত্য / মিথ্যা বল :

(ক) শিক্ষা একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া।

(খ) শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর মুখস্থ শক্তির উন্নতি সাধন।

(গ) শিক্ষা হল পরীক্ষায় পাস করা এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা।

২. শিক্ষার নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোনটি উদার অর্থে এবং কোনটি সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করছে? উদার সংজ্ঞাটির পাশে 'উ' বসাও এবং সংকীর্ণ সংজ্ঞাটির পাশে 'স' বসাও।

(ক) শিক্ষা হল জ্ঞান অর্জন বা জ্ঞান সঞ্চয়।

(খ) মানসিক শক্তির উন্নতি ঘটানো হল শিক্ষা।

(গ) মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটানোই শিক্ষা।

(ঘ) জীবনকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করাই হল শিক্ষা।

(ঙ) শিক্ষা হল পরিবেশের সঙ্গে সঠিক সংগতি বিধান।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বৃদ্ধির তিনটি শর্ত হল ১. —— ২. —— ৩. ——

(খ) উপযোজন শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ হল —— ও —— পরস্পরের কাছাকাছি আনা এবং এমনভাবে সেগুলিকে পরিবর্তিত করা, যাতে উভয়ে —— অবস্থান করতে পারে।

(গ) কর্মের বিভিন্ন স্তর ও অংশের মধ্যে যে —— বিদ্যমান, —— মাধ্যমে তা উপলব্ধি করাই হল শিক্ষা।*

(ঘ) রাসেলের মতে আদর্শ চরিত্রের চারটি মূল ভিত্তি হল, (১) —— (২) —— (৩) —— ও (৪) ——।

(ঙ) শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণগুলি হল —— (১০টি গুণের উল্লেখ কর)।

(চ) শিক্ষার কাজ হল (১) —— (২) ——।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১. শিক্ষার অর্থ সম্পর্কে দুটি মত উল্লেখ কর।

২. শিক্ষার স্বর্ণ কণিকা ও শূন্য ভাণ্ডার তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. নল ও শূন্য কুম্ভ তত্ত্বটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪. শিক্ষা কিভাবে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে একটি উদাহরণের সাহায্যে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. উপযোজন শব্দটির একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

৬. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তাৎপর্য আলোচনা কর।

(ক) শিক্ষা একটি দ্বি মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া।

(খ) শিক্ষা একটি ত্রি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া।

(গ) আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক।

(ঘ) সার্থক আত্মানুভূতি।

(ঙ) শিক্ষার ব্যক্তি-তান্ত্রিক লক্ষ্য।

(চ) সহজাত প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ।

(ছ) আনন্দ ও দুঃখ নীতি।

৩ শিক্ষা ও সামাজিক গোষ্ঠী—গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. সমাজ কাকে বলে ? সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি ?

৩. সৎ প্রতিষ্ঠান কাকে বলে ? সৎ প্রতিষ্ঠানের কাজ কি ?

৪. গৃহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। গৃহ কিভাবে শিশুর শিক্ষার সাহায্য করে ?

৫. গৃহের কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর। গৃহকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ? বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬. রবীন্দ্রনাথ গৃহকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন ?

৭. শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে গৃহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৮. কি কি কারণে বর্তমানে গৃহের পক্ষে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয় ?

৯. শিক্ষার একটি ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০. বিদ্যালয়ের কাজ কি ?

১১. বিদ্যালয়কে একটি সমাজ বলা হয় কেন ? বিদ্যালয় সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১২. বিদ্যালয়কে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর এবং প্রত্যেক শ্রেণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

১৩. মাধ্যমিক বিদ্যালযের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা কর।

১৪. শিক্ষার একটি ক্ষেত্র হিসাবে সমাজের কাজ বর্ণনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১. সত্য / মিথ্যা বল :

(ক) সমাজের একটি জৈবিক সত্তা আছে।

(খ) সামাজিক ঐক্যবোধ সমাজের প্রাণশক্তি।

(গ) অশিক্ষিত গৃহ-পরিবেশের সামাজিক মান উন্নত পর্যায়ের।

(ঘ) বৃহৎ গৃহ পরিবেশে পরিবারের সভ্যদের আন্তঃসম্পর্ক মধুর।

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) একটি বিশেষ —— দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত।

(ঘ) সমাজ ব্যক্তিকে একটি —— প্রদান করে।

(গ) সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির —— বৃত্তির বণ্টন।

(ঘ) গৃহই শিশুকে ——, ——, ও নৈতিক নিদর্শন দিয়ে থাকে।

(ঙ) শিশুর শিক্ষার উন্মেষকালের —— গৃহই।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১. সমাজের বৈশিষ্ট্য তিনটি মাত্র বাক্যের দ্বারা প্রকাশ কর।

২. ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. গৃহের ৪টি কাজের উল্লেখ কর।

৪. বিদ্যালয়ের কাজ চারটি বাক্যে রচনা কর।

৫. বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা কর।

৬. 'সমাজ থেকে কিভাবে শিশু শিক্ষা লাভ করে'—এই সম্পর্কে ৪টি উদাহরণ দাও।

৪ শিক্ষার উপাদান : শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. শিক্ষাকে একটি দ্বি-মেরুযুক্ত প্রক্রিয়া বলা হয় কেন ? বিশদভাবে আলোচনা কর।

২. শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষককে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?

৩. শিক্ষার উপাদান কথাটির তাৎপর্য কি ?

৪. শিশুর জীবন পরিক্রমার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৫. শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর।

৬. শিক্ষালাভের যোগ্যতা ও আচরণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিশুদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর।

৭. অনগ্রসর শিশুদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা কর।

৮. প্রতিভাশীল শিশু ও উনমানস শিশুদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর।

৯. পাঠ্যক্রম কাকে বলে ? পাঠ্যক্রমের প্রযোজন কেন ? পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন ?

১০. পাঠ্যক্রম সংগঠনের মূল নীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১. প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়গুলি কি ?

১২. মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের সংগঠনের মূল নীতি কিসের উপর ভিত্তি করে রচিত ?

১৩. মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৪. কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ও অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা কর।

১৫. বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা কর। কিভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন করা যায় ? সহপাঠ্যক্রমিক কার্যের শিক্ষাগত মূল্য কি ?

১৬. 'মানুষ একমাত্র মানুষের নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করতে পারে'—বক্তব্যটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

১৭. একজন সুশিক্ষকের কাজ ও চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৮. আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৯. 'একজন শিক্ষককে যে গুণগুলির অধিকারী হতে হয়। তার মধ্যে কিছু

তিনি জন্মসূত্রে অর্জন করেন এবং কিছু তিনি লাভ করেন ট্রেনিং-এর সাহায্যে। কোন্ গুণগুলি শিক্ষক জন্মসূত্রে লাভ করেন এবং কোন্গুলি তাকে লাভ করতে হয় ট্রেনিং-এর মারফত?

২০. শিক্ষককে শিক্ষার উপাদান বলা হয় কেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১. সত্য / মিথ্যা বল :

(ক) আধুনিক শিক্ষায় শিশুর প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী।

(খ) জন্ম থেকেই শিশু সচল ও আত্মনির্ভর।

(গ) শৈশব কাল হল উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনার কাল।

(ঘ) কৈশোর কাল মনুষ্য হৃদয়ের চঞ্চলতা ও অব্যবস্থার কাল।

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শিশু, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষককে শিক্ষার —— বলা হয়।

(খ) আর্নেস্ট জোন্স শিশুর জীবন পরিক্রমাকে —— স্তরে ভাগ করেছেন।

(গ) —— সাহায্যে শিশু বিশ্ব জগতের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে।

(ঘ) শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি ও —— প্রভাব আছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

(ক) শিক্ষার উপাদান কাকে বলে?

(খ) শিশু শতাব্দী কথাটির অর্থ কি?

(গ) শিশু মনের 'বিস্ময়ের পর্যায়'—উক্তিটির তাৎপর্য লেখ।

(ঘ) 'সহজাত প্রবৃত্তি কাকে বলে?

(ঙ) বংশগতির দুটি সূত্রের উল্লেখ কর এবং ঐ সম্পর্কে মন্তব্য লেখ।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) প্রতিভাশালী শিশু। (খ) উনমানস শিশু। (গ) অনগ্রসর শিশু। (ঘ) দুষ্ক্রিয় শিশু।

৩. 'প্রাথমিক শিক্ষার মাতৃভাষার স্থান' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪. মন্তব্য লিখ :

(১) মানব মূলধন (২) মূল বিষয় ও প্রান্তস্থ বিষয় (৩) জীবন কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (৪) কর্ম কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (৫) অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম।

৫. তিনটি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর নাম কর।

৬. 'গুরুকে পিতা মাতা না হইলে চলে না'—মন্তব্য লেখ।

মনোবিজ্ঞানধর্মী শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন (Psycho-Educational Tests)

[For Advanced Students]

১. আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

২. শিশু কিভাবে নিজে নিজে শেখে ? আত্মশিক্ষা কাকে বলে ?

৩. ঘটনাজাত শিক্ষার একটি উদাহরণ দাও।

৪. শিক্ষা কিভাবে মৌলিকতা ও সৃজন শক্তির বিকাশ ঘটায় ?

৫. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৬. শিক্ষার 'স্বর্ণ কণিকা ও শূন্য ভাণ্ডার তত্ত্বে' জ্ঞানকে স্বর্ণ কণিকা বলা হয়েছে কেন ?

৭. 'শূন্য কুম্ভ ও নল তত্ত্বে' জ্ঞানকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?

৮. 'ব্যক্তি বৈষম্য' বলতে কি বোঝ ?

৯. 'প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সুচরিত্র সৃষ্টি' এবং 'সুঅভ্যাস গঠন'—এই দুয়ের পার্থক্য আলোচনা কর।

১০. শিশুর বুদ্ধি অপরিণতি ও নমনীয়তার উপর নির্ভরশীল কেন ?

১১. সার্থক আত্মানুভূতি ও ব্যর্থ আত্মানুভূতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

১২. 'পরীক্ষামূলক আত্মগঠন কর্ম' ও 'প্রকৃত আত্মগঠন মূলক কর্মের মধ্যে তুলনা কর।

১৩. শিক্ষাকে উপযোজন বলা হয় কেন ?

১৪. শিক্ষাতত্ত্বে 'পবিবেশকে' কিভাবে ব্যাখা করা হয় ?

১৫. অভিজ্ঞতা অর্জন ও শিক্ষালাভ কিভাবে সমার্থক ?

১৬. শিক্ষা কিভাবে আমাদের মনে আশা ও আত্মবোধ জাগ্রত করে ?

১৭. আদর্শ চরিত্রের মূল ভিত্তিগুলি কি ? কিভাবে শিক্ষার সাহায্যে ঐগুলি বিকশিত হয় ?

১৮. 'ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝা যায় ? ব্যক্তিত্বের কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা কর।

১৯. 'ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর উন্নতির সহায়ক নয়'। এই বিষয়ে তিনটি মন্তব্য লেখ।

২০. 'মানবিক সম্পদ' বলতে কি বোঝ ? শিক্ষা কিভাবে মানবিক সম্পদ সৃষ্টি করে ?

২১. 'সহজাত প্রবৃত্তি' বলতে কি বোঝা যায় ? শিক্ষা কিভাবে সহজাত প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ করে ?

২২. শহরের সমাজ ও গ্রামাঞ্চলের সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। শিক্ষা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন আনে ?

২৩. 'সৎপ্রতিষ্ঠান' বলতে কি বোঝ ? সৎপ্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২৪. উত্তম গৃহ-পরিবেশ শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজন কেন ? তিনটি কারণ দাও।

২৫. 'গৃহ মানবিক সম্পর্কের প্রকৃত সত্যটিকে প্রকাশ করে'—ব্যাখ্যা কর।

২৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি? প্রাথমিক শিক্ষাকে গণতন্ত্রের শিক্ষা বলা হয় কেন?

২৭. সমাজ থেকে আমরা কিভাবে শিক্ষালাভ করি—উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

২৮. অনেক ছেলেমেয়ে লেখা পড়ায় ভাল হয় না। এর কয়েকটি কারণ নির্দেশ কর।

২৯. তোমাদের শিক্ষাতত্ত্ব (Education)-কে পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচন করার তিনটি কারণ দেখাও।

৩০. 'প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় ভাবের আদান-প্রদানের জন্য; কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ভাষা রূপ নেবে সাহিত্যের'—এই মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩১. কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, জীবনকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম সংগঠনে একই নীতি নির্দেশ করে। এই বিষয়টি সম্পর্কে তোমাদের মতামত আলোচনা কর।

৩২. সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর শিক্ষাগত মূল্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩৩. 'শিক্ষকের কাজকে একমাত্র একজন শিল্পীর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়'—আলোচনা কর।

৩৪. 'শিক্ষাদান শিক্ষকের আপন সাধনার অঙ্গ'—এই মন্তব্যটিকে ব্যাখ্যা কর।

প্রথম পত্র / দ্বিতীয় খণ্ড

৫ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

২. প্রাচীনকালের কয়েকটি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের নাম কর।

৩. হিন্দু যুগ ও বৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে? প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কি? প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করে?

৬. প্রাথমিক শিক্ষাদানে কি ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭. পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। Common School movement কাকে বলে?

৮. প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি কি কি? কিভাবে এইগুলির সমাধান করা যায়?

৯. প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নতি কাকে বলে? অনুন্নতির প্রধান কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০. আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয়ের হার সম্পর্কে আলোচনা কর। অপচয়ের কারণ কি?

১১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম কোন্ ভাষা হওয়া উচিত?

১২. প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও উন্নতির বিরুদ্ধে প্রধান বাধা কি কি?

১৩. বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১৪. বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাগত তাৎপর্য আলোচনা কর।

১৫. মাধ্যমিক শিক্ষা কাকে বলে? মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার পার্থক্য কি?

১৬. বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটিগুলি কি? কিভাবে ঐগুলি দূর করা যায়?

১৭. পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৯. মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য কি? মাধ্যমিক শিক্ষাকে কৈশোর কালের শিক্ষা বলা হয় কেন?

২০. উচ্চ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি? উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২১. ভারতে উচ্চ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২২. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কি বোঝা যায়? ভারতে এই ধরনের উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান তাৎপর্য কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

প্রকৃত উত্তরটির নিচে দাগ দাও:

১. প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয়—(১) গরীব মানুষের শিক্ষা, (২) গণতন্ত্রের শিক্ষা· (৩) জীবন ধারণের শিক্ষা।

২. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল—(১) চাকুরী লাভের সুযোগ লাভ, (২) আত্ম প্রকাশ ও লেখবার পড়বার সুযোগ লাভ (৩) লোকে মান্য করে।

৩. বুনিয়াদী শিক্ষা হল—(১) গ্রামের শিক্ষা, (২) শহরের শিক্ষা (৩) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Shost Answers Type Questions)

১. প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি লক্ষ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. প্রাথমিক শিক্ষার অনুন্নতির ৪টি কারণ উল্লেখ কর।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের ৩টি কারণ দেখাও।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম শিশুদের মাতৃভাষা হওয়া উচিত—এই সম্পর্কে তোমার মন্তব্য লিখ।

৫. বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৬. মাধ্যমিক শিক্ষার ৩টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষার ৪টি প্রধান লক্ষ্যের উল্লেখ কর।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ৩টি লক্ষ্যের কথা আলোচনা কর।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর এবং ঐগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০. গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালযের ৩টি বৈশিষ্ট্য বল।

৬ আধুনিক ভারতের শিক্ষা সমস্যা

(১)

১. পশ্চিবঙ্গের 'সাক্ষরতা'র সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি? ঐ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। শিশুদের আচরণের সঙ্গে বয়স্কদের আচরণের পার্থক্য কোথায়?

৪. বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হবে?

৫. বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(২)

৬. শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি? কিভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজকে সেবা করতে পারে?

৭. সমাজ সেবার একটি কার্যক্রমের সঙ্গে তোমার মতামত উল্লেখ কর।

(৩)

৮. আমাদের দেশে নারী শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি কি? নারী শিক্ষার মূল নীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতামত উল্লেখ কর।

৯. আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৪)

১০. শিক্ষা কিভাবে জাতীয় সম্প্রীতি আনতে পারে?

১১. ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে জাতীয় সংহতি নষ্ট করে?

১২. ভারতে জাতীয় সম্প্রীতি বর্তমানে প্রয়োজন কেন?

১৩. জাতীয় বিদ্যালয় কিভাবে জাতীয় সংহতি আনতে পারে?

১৪. বৃত্তিগত দক্ষতা কাকে বলে ? কিভাবে তা উন্নত করা যায় ?

১৫. বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক আলোচনা কর।

১৬. বিদ্যালয়ে 'কর্ম অভিজ্ঞতা' কিভাবে বৃত্তিগত দক্ষতার উন্নতি করতে পারে

১৭. বৃত্তীয় দক্ষতার বিকাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন কেন ?

১৮. শিক্ষার সাহায্যে বৃত্তি-মুখীনতা কিভাবে আনা যায় ?

১৯. বুনিয়াদী শিক্ষা কিভাবে কর্ম-অভিজ্ঞতা আনতে পারে ?

২০. ব্যক্তির বৃত্তিগত যোগ্যতা কি কি গুণের উপর নির্ভরশীল ?

দ্বিতীয় পত্র/প্রথম খণ্ড

১ শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। কয়েকজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর কার্যাবলী উল্লেখ কর।

২. মনোবিজ্ঞানের বিকাশের ধারার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা কর। মনোবিজ্ঞানকে আচরণ-বিজ্ঞান বলা হয় কেন ?

৩. মনোবিজ্ঞানের একটি গ্রহণীয় সংজ্ঞা দাও এবং মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা কর। মনোবিজ্ঞান কিভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে ?

৫. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দাও। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ? শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজগুলি আলোচনা কর।

৭. 'আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রভাবিত'—এই মন্তব্যটির ব্যাখ্যা কর।

৮. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে ?

৯. ব্যক্তিগত বৈষম্য, বৃত্তি নির্বাচন, শিশু মনের প্রকৃতি—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত কেন ? শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য নির্ণয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কি কোন প্রভাব আছে ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রকৃতিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা— (১) —— (২) —— (৩) ——।

(খ) মনোবিজ্ঞানের একদিকে রয়েছে —— এবং অন্যদিকে রয়েছে সমাজ-মনোবিজ্ঞান।

(গ) আধুনিক শিক্ষা —— প্রভাবিত।

২. সত্য / মিথ্যা বল :

(ক) প্রকৃতির কোন অংশের সুশৃঙ্খল আলোচনার নামই বিজ্ঞান।

(খ) জার্মান মনোবিজ্ঞানী উইলহেলম্ ভুণ্ড লাইপজিগে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন।

(গ) মনোবিজ্ঞান জড় সম্পর্কে আলোচনা করে।

(ঘ) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান পদার্থবিত্তার শাখা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১. তিনজন প্রধান মনোবিজ্ঞানের নাম উল্লেখ কর।

২. মনোবিজ্ঞানের যে কোন তিনটি সংজ্ঞা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩. মনোবিজ্ঞানকে মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে কেন? এই সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমার মতামত দাও।

৪. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে একটি ছোট অনুচ্ছেদ লেখ।

৫. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তিনটি কাজের উল্লেখ কর।

৬. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে পৃথক বিষয় হিসাবে প্রমাণ করে একটি ছোট অনুচ্ছেদ লেখ।

৭. শিক্ষার লক্ষ্য কিভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়?

২ শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা—শিশুর প্রক্ষোভ, আগ্রহ ও মনোভাব

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. চাহিদা কাকে বলে? চাহিদা ও আচরণের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২. চাহিদাকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩. শিশুর প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদা কি? ঐগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. শিশুর সুসম ব্যক্তিত্ব গঠনে চাহিদার পরিতৃপ্তির প্রয়োজন কেন? এই প্রসঙ্গে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. বয়ঃসন্ধি কালের প্রধান প্রধান মানসিক চাহিদা কি? চাহিদা পরিতৃপ্তির ব্যাপারে পিতামাতা ও শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬. আবেগ কাকে বলে? আবেগের স্বরূপ আলোচনা কর।

৭. আবেগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. সাধারণ প্রক্ষোভ ও বিশেষ প্রক্ষোভ কাকে বলে? প্রক্ষোভের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সম্পর্ক কি?

৯. শিশুদের প্রাক্ষোভিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১০. প্রাথমিক বা মৌলিক আবেগ কাকে বলে? আবেগের সাপেক্ষীকরণ সম্পর্কে ওয়াট্‌সনের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১. আবেগের সুনিয়ন্ত্রণে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২. শিশুর আচরণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৩. শিশুর আচরণে ক্রোধের প্রভাব কি? কিভাবে ক্রোধ'সৃষ্টি হয়? কিভাবে শিশুরা ক্রোধ প্রকাশ করে? শিশুদের রাগ হলে কিভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে হবে?

১৪. প্রক্ষোভ হিসাবে ভয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। শিশুদের মনে ভয় সৃষ্টির কারণ কি? শিশুদের জীবনে ভয়ের প্রয়োজন কি?

১৫. শিশুদের আচরণে ভালবাসার প্রকাশ কখন দেখা যায়? শিশুদের জীবনে ভালবাসার প্রভাব কি?

১৬. আগ্রহ কাকে বলে? আগ্রহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর? স্বাভাবিক ও অর্জিত আগ্রহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। আগ্রহের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। বিভিন্ন বিষয়ে শিশুদের আগ্রহ কিভাবে গড়ে ওঠে? আগ্রহ দল কাকে বলে? আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক কি? পাঠে শিশুদের আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?

১৭. পাঠে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টিতে পিতামাতা ও ভাল স্কুলের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৮. মনোভাব কাকে বলে? আগ্রহের সঙ্গে মনোভাবের পার্থক্য কি? আমাদের সংস্কার কিভাবে মনোভাবকে প্রভাবিত করে? মনোভাব সংগঠনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

১. সত্য/মিথ্যা বল :

(ক) অভাববোধ থেকেই চাহিদার জন্ম।
(খ) চাহিদা ও আচরণের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।
(গ) চাহিদার পরিতৃপ্তি হলে শিশুর মনে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়।
(ঘ) শিশুদের জীবনে ভালবাসার চাহিদাটি গুরুত্বপূর্ণ।
(ঙ) প্রক্ষোভ হল এক ধরনের জটিল মানসবৃত্তি।
(চ) ওয়াট্‌সনের মতে মৌলিক আবেগের সংখ্যা তিনটি।
(ছ) আগ্রহ হল একশ্রেণীর প্রবণতা।
(জ) আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের কোন সম্পর্ক নেই।
(ঝ) মনোভাব ব্যক্তির একটি মানসিক অবস্থা।
(ঞ) মনোভাবের সঙ্গে সংস্কারের কোন সম্পর্ক নেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

১. চাহিদা কাকে বলে? চাহিদার দুটি উদাহরণ দাও।

২. চাহিদার তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. বয়ঃসন্ধি কালের চাহিদার দুটি উদাহ ণ দাও।

৪. প্রক্ষোভের দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা কর।

৫. প্রক্ষোভের শিক্ষায় পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনটি মন্তব্য লেখ।

৬. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্ষোভের উল্লেখ কর এবং যে কোন একটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭. শিশুর মনে কিভাবে ভয় সৃষ্টি করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. আমরা কোন কোন বিষয়ে আগ্রহে প্রকাশ করি, সেই সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দাও।

৯. আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

১০. সংক্ষেপে মনোভাবের একটি সংজ্ঞা দাও।

১১. মনোভাব সংগঠনের উপযোগী দুটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩ শিশুর শিখন : শিখনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন কৌশল

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. শিখনের একটি সংজ্ঞা দাও। উদাহরণের সাহায্যে শিখনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২. শিখন কয়েকটি শর্তের উপর নির্ভরশীল ; ঐ শর্তগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. শিখনের সঙ্গে পরিণমনের সম্পর্ক কি ? উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা কর।

৪. শিশুর পরিবেশ কিভাবে শিখনকে সাহায্য করে।

৫. শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬. পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কিভাবে শিশু শিক্ষালাভ করে ? শিখনের একটি পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষণের গুণাগুণ আলোচনা কর।

৭. অনুকরণের অর্থ কি ? কিভাবে শিশু অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে ? অনুকরণের শিক্ষাগত মূল্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯. শিখন সম্পর্কে থর্নডাইকের পরীক্ষাটি নিয়ে আলোচনা কর। বিড়ালটি কিভাবে খাঁচা থেকে বের হবার নিয়মটি শিক্ষালাভ করল।

১০. থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলি আলোচনা কর। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলির তাৎপর্য কি ?

১১. শিক্ষকদের নিকট ফললাভের সূত্রটির বিশেষ তাৎপর্য কি ? বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ ব্যবহার কি ?

১২. অনুশীলন সূত্রটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন সকল সময়ে

শিক্ষালাভকে সাহায্য করতে পারে না কেন? উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা কর।

১৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে 'সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত' তত্ত্বটির তাৎপর্য আলোচনা কর। কে এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন?

১৪. অন্তর্দৃষ্টি কাকে বলে? কিভাবে আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষালাভ করি?

১৫. অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে কোয়েলারের পরীক্ষণগুলি বর্ণনা কর।

১৬. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

১৭. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনে একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মত সমস্যাটির সমাধান শিক্ষার্থীর মনে উদয় হয়।—এই মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

১৮. অন্তর্দৃষ্টি ও পরীক্ষা ও ভ্রান্তি শিখনের মধ্যে তুলনা কর।

১৯. সুলতান নামে শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে কোয়েলার যে পরীক্ষা করেন তার বর্ণনা দাও এবং উক্ত পরীক্ষাটি থেকে কোয়েলারের সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

সত্য / মিথ্যা বল :

১. শিখন হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর আদিম আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

২. শিখন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়।

৩. পরিণমন ও শিখন উভয়ই শিশুর বিকাশে সাহায্য করে।

৪. শিশুরা একমাত্র পরীক্ষা ও ভ্রান্তি পদ্ধতির মাধ্যমে শেখে।

৫. অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন তখনই ঘটে যখন সমগ্রের সঙ্গে অংশের সঠিক সম্পর্কটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answers Type Questions)

১. কিভাবে শিশু শেখে তার তিনটি উদাহরণ দাও।

২. যান্ত্রিক শিখন কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।

৩. শিখন যে দেহমনের পরিপক্বতার উপর নির্ভরশীল এই সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দাও।

৪. থর্নডাইকের শিখনসূত্রের একটি উল্লেখ কর এবং এর তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫. কিভাবে আমরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখি—সেই সম্পর্কে দুটি উদাহরণ দাও।

৬. শেখবার জন্য শিশুর প্রস্তুতি দরকার কেন? এই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪ কয়েকটি আধুনিক শিক্ষার প্রণালী

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. শিক্ষা-পদ্ধতি কাকে বলে? আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি এবং প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে তুলনা কর।

৩. প্রগতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতি কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৪. কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য কি? খেলাচ্ছলে শিক্ষা-পদ্ধতি কাকে বলে?

৬. প্রোজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি কাকে বলে? ঐ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭. প্রোজেক্ট পদ্ধতির মূলনীতি বিশ্লেষণ কর। একটি প্রোজেক্টের মূল্যায়ন কিভাবে করা হয়?

৮. কর্মশালা পদ্ধতি কাকে বলে? কিভাবে কর্মশালা পদ্ধতি সংগঠন করা হয়? কর্মশালা পদ্ধতির একটি উদাহরণ দাও।

৯. পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। একে ডাল্টন প্ল্যান বলে কেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

সত্য / মিথ্যা বল :

১. যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন বিষয় আয়ত্ত করে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাস করে তাকে আধুনিক পদ্ধতি বলে।

২. আমরা কাজের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করি তাকে পরোক্ষ-জ্ঞান বলে।

৩. হাতের কাজের ভিতর দিয়ে শিশুরা নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের শিক্ষালাভ করে।

৪. বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে হাতের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।

৫. প্রোজেক্ট হল একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ।

৬. ল্যাবরেটরী পদ্ধতি প্রথমে ব্যবহার করেন ডাঃ মন্তেসরী।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answers Questions)

১. সংক্ষেপে শিক্ষা-পদ্ধতির' একটি সংজ্ঞা দাও।

২. কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার দুটি উদাহরণ দাও।

৩. বুনিয়াদী শিক্ষাকে হাতের কাজ বলা হয় কেন?—দুটি মন্তব্য লেখ।

৪. কিলপ্যাট্রিক প্রোজেক্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উল্লেখ কর।

৫. প্রোজেক্টের চারটি ধাপ বা স্তর উল্লেখ কর।

৬. ডালটন প্ল্যানকে ল্যাবরেটরী পদ্ধতি বলা হয় কেন?
৭. গান্ধীজীর সেবাগ্রাম পদ্ধতিকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা-পদ্ধতি বলা হয় কেন?
৮. সেবাগ্রাম পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতির তুলনা কর।
৯. কর্মশালা পদ্ধতিতে শিক্ষকদের কি বলা হয়?
১০. ডালটন প্ল্যানে শ্রেণীকক্ষকে পরীক্ষাগার বলা হয় কেন?
১১. ডালটন প্ল্যানে চুক্তিপত্র কাকে বলে?
১২. আমাদের দেশে ল্যাবরেটরী পরিকল্পনা প্রবর্তনে বাধা কোথায়?

৫ শিক্ষার উপজাত ফল, মুল্যায়ন পদ্ধতি ও উন্নতির ধারা অনুসরণ

রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type Questions)

১. শিক্ষার উপজাত ফল বলতে কি বোঝ? শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

২. মুল্যায়ন কাকে বলে? মূল্যাযনের প্রধান উদ্দেশুগুলি আলোচনা কর।

৩. মুল্যায়নের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের সম্পর্ক কি?

৪. পরীক্ষার কাজ কি? বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

৫. রচনাধর্মী পরীক্ষা কাকে বলে? রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

৬. বিষয়মুখী পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। বিষয়মুখী পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

৭. ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্র কাকে বলে? ক্রমোন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্রের একটি বর্ণনা দাও। এই পত্রের উদেশ্য কি?

৮. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উন্নতির ধারা কিভাবে অনুসরণ করতে হয়?

৯. শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশক কাকে বলে? কিভাবে শিক্ষা-নির্দেশন দিতে হয়?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Questions)

সত্য / মিথ্যা বল :

১. মুল্যায়ন হল একটি সামগ্রিক পরিমাপ।
২. মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি অপরিবর্তনীয়।
৩. বুদ্ধি অভীক্ষা শিশুর মনোভাব পরিমাপ করে।
৪. আগ্রহের সঙ্গে সাফল্যের সম্পর্ক নেই।
৫. পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।
৬. রচনাধর্মী পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা কম।
৭. বিষয়মুখী পরীক্ষা জ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশের পরিমাপ করে।
৮. বিষয়মুখী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি এই যে, পরীক্ষার্থীরা আন্দাজে কোন কোন উত্তর দিতে পারে।
৯. ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিবরণ লাভ করা।

১০. শিক্ষাগত নির্দেশনের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short Answers Type Question)

১. পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পার্থক্য সংক্ষেপে বল।

২. রচনধর্মী পরীক্ষার তিনটি ত্রুটির উল্লেখ কর।

৩. বিষয়মুখী পরীক্ষার দুটি গুণের উল্লেখ কর।

৪. ক্রমোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ পত্রের তিনটি উদ্দেশ্য বল।

৫. শিক্ষা নির্দেশনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর।

মনোবিজ্ঞানধর্মী শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Psycho-Educational Tests)

[For advenced students]

১. মনোবিজ্ঞানের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দাও। মনোবিজ্ঞানকে দর্শন না বলে বিজ্ঞান বলা হয় কেন ?

২. আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা হয় কেন ? এর কয়েকটি সঙ্গত কারণ দেখাও।

৩. মনোবিজ্ঞানের কোন্ কোন্ শাখা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ? সঙ্গতি-বিধানের মনস্তত্ত্ব বলতে কি বোঝা যায় ?

৪. জৈবিক চাহিদা ও মানসিক চাহিদার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

৫. শিশুর নিরাপত্তার চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা কর। বড়দের স্নেহ ও ভালবাসা শিশুর জীবনে প্রয়োজন কেন ?

৬. শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশের ধারাগুলি আলোচনা কর।

৭. আবেগের সাপেক্ষীকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর। এই সম্পর্কে ওয়াট্‌সনের পরীক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮. মনোভাবের সঙ্গে সংস্কারের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা কর।

৯. শিশুর মনোভাব কিভাবে গঠিত হয় ? কি কি উপাদান (Factors)-এর সঙ্গে যুক্ত।

১০. যান্ত্রিক শিখন (Rote learning) কাকে বলে। যৌক্তিক শিখনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?

১১. থর্নডাইকের শিখনের ফললাভের সূত্রটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। শিক্ষায় পুরস্কার ও শাস্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?

১২. "অন্তর্দৃষ্টির ফলে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলি রয়েছে, তার বিন্যাস নতুনভাবে ঘটে। এর ফলে যে উপকরণগুলি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের পশ্চাৎ ভূমিতে ছিল তা কেন্দ্রে মূর্ত হয়ে ওঠে"—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১৩. প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতি কিভাবে শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে ?

১৪. মূল্যায়নের সঙ্গে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির পার্থক্য কি ? মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।

১৫. রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে বিষয়মুখী পরীক্ষার তুলনা কর।

১৯৭৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী

PAPER I

১। নিম্নের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দাও এবং সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা

শিক্ষার 'সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য' বলতে কি বোঝ আলোচনা কর।

(খ) "বিদ্যালয় সমাজেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) 'শিশু'কে কেন শিক্ষার প্রাথমিক 'উপাদান' বলা হয় যুক্তিসহ আলোচনা কর।

(ঘ) কর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম কি ? এই পাঠ্যক্রমের দুইটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

(ঙ) মাধ্যমিক শিক্ষাকে 'মাধ্যমিক' বলা হয় কেন ? এই স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য কী কী ?

মাধ্যমিক স্তরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠ্যক্রমে থাকা কি উচিত ?

(চ) স্কুল ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেন থাকা প্রয়োজন ? এই সম্পর্ক স্থাপনের কতিপয় পন্থা নির্দেশ কর।

২। নিম্নের প্রশ্নগুলির যে কোন **তিনটির** উত্তর **সংক্ষেপে** দাও :

(ক) মানুষের জীবনে শিক্ষা কেন প্রয়োজন ?

(খ) 'পরিবেশ' বলতে কি বোঝায় ?

(গ) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলতে কি বোঝ ? তাদের শিক্ষাগত মূল্য কি !

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার 'অপচয়' শব্দটির অর্থ কি ?

অথবা

একটি উদাহরণ সহ 'ব্যবহারিক সাক্ষরতা'র সংজ্ঞা দাও।

(ঙ) মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে কর্মশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমার মতামত দাও।

অথবা

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংহতির মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য একটি কর্মসূচী উল্লেখ কর।

৩। নিম্নের যে কোন **তিনটির** উপর টীকা লেখ :

(ক) ভারতে উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য।

অথবা

নিরক্ষরতা দ্রুত দূরীকরণের একটি কর্মসূচী।

(খ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে সমাজ সেবার গুরুত্ব।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার সমস্যা।

(ঙ) তোমার মতে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী।

অথবা

শিক্ষা সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? একটি বিদ্যালয় এ সমীক্ষাকে কিভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারে? তুমি যে শিক্ষা সমীক্ষার কাজ করেছ, তার ফলাফল বর্ণনা কর।

PAPER II

যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান কিভাবে সম্পর্কিত দেখাও এবং এই পটভূমিকায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিচার কর।

২। 'চাহিদা' কথাটির অর্থ কি? জৈবিক চাহিদা এবং মানসিক চাহিদা বলতে কি বোঝায়? শিক্ষায় এই দুই ধরনের চাহিদার কাজ দেখিয়ে দাও।

অথবা

প্রক্ষোভ কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ভয় এবং রাগ এই দুইটি প্রক্ষোভ কিভাবে শিশুর আচরণ প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা কর।

৩। শিখনের সংজ্ঞা দাও। এই শিখনের স্বরূপ উদাহরণ সাহায্যে বুঝিয়ে দাও। (শিশু-জীবন থেকে উদাহরণগুলি নাও।)

৪। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত দাও। স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সহিত এর পার্থক্য কি? আচরণ কিভাবে সাপেক্ষিত হয় তা নির্দেশ কর।

অথবা

'প্রচেষ্টা ও ভুল' পদ্ধতিতে শিখনের বৈশিষ্ট্য কি কি? এই পদ্ধতিটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর।

৫। 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' বিষয়টির তাৎপর্য পরিস্ফুট কর। আজকের বিদ্যালয়-শিক্ষায় এর উপযোগিতা বিচার কর।

৬। শিক্ষায় 'মূল্যায়ন' বলতে ঠিক কি বোঝায়? মূল্যায়নের যে কোন **দুইটি** পদ্ধতি উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (যে কোন দু'টি)

(ক) শিশু-জীবনে ভালবাসার স্থান,

(খ) শিশু শিখনের কাজে অনুকরণের ভূমিকা,

(গ) মাধ্যমিক পরীক্ষার যে কোন বিষয়ে প্রশ্নপত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

৮। ইংরাজী বিষয়ের যে স্কোর বন্টনটি নিচে দেওয়া আছে তার একটি লেখচিত্র আঁক এবং তাতে তার গড় মানটি বসিয়ে দাও।

৭০-৭৯	—	১
৬০-৬৯	—	১
৫০-৫৯	—	৫
৪০-৪৯	—	১২
৩০-৩৯	—	১৫
২০-২৯	—	১১
১০-১৯	—	৪
০- ৯	—	১
		৫০

১৯৭৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী

PAPER I

১। নিম্নের প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন তিনটির উত্তর দাও :

(ক) মানব জীবনে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রয়োজন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

(খ) শিশু-শিক্ষায়, 'গৃহের' কাজগুলি উল্লেখ কর। তাদের মধ্যে যে কোন দুইটি আলোচনা কর।

(গ) পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার একটি 'উপাদান' বলা হয় কেন ? প্রাথমিক স্তরের জন্য পাঠ্যক্রম রচনায় যে কোন দুইটি নীতি উল্লেখ কর।

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন, আলোচনা কর। এই স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য কী কী ?

(ঙ) সাক্ষরতা বলতে কি বোঝায় ? ভারতে সাক্ষরতা অভিযানের লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট কর।

(চ) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। নিম্নের প্রশ্নগুলির যে কোন তিনটির উত্তর সংক্ষেপে দাও :

(ক) শিক্ষায় 'ব্যক্তিতান্ত্রিক' লক্ষ্যের সংজ্ঞা দাও এবং একটি উদাহরণ দাও।

(খ) একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নাম কর এবং তার শিক্ষামূলক কাজগুলি উল্লেখ কর।

(গ) 'স্বনির্ভরতার শিক্ষা'-এর উদাহরণ দাও।

(ঘ) আমাদের দেশের শিক্ষা-কার্যসূচীতে 'জাতীয় সংহতির' গুরুত্ব বিচার কর।

অথবা, একটি 'সমাজসেবা' প্রকল্পের খসড়াচিত্র দাও।

(ঙ) ভারতে 'নারীশিক্ষার' দ্রুত প্রসারের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ কর।

৩। একটি বিশেষ এলাকায় জনশিক্ষার চাহিদা কিভাবে অনুসন্ধান করবে? জনশিক্ষার জন্য যে শিক্ষাউপকরণগুলি তুমি তৈরি করেছ, তার মধ্যে যে কোন **দুইটির** নক্সাসহ বিবরণ দাও।

অথবা

নিম্নের যে কোন **তিনটির** উপর টীকা লিখ :

(ক) গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য,

অথবা, বিদ্যালয়-শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান ;

(খ) 'শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার' তাৎপর্য,

(গ) শিক্ষায় শরীরচর্চার গুরুত্ব ;

(ঘ) বিদ্যালয়ের 'সংস্কারমূলক' কাজ,

(ঙ) শিশুদের উপযোগী 'হাতের কাজের' উদাহরণ

PAPER II

যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। শিক্ষা-মনোবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা কর। এর মুখ্য কার্যগুলি বুঝিয়ে দাও।

২। 'আগ্রহ' কথাটির অর্থ কি? আগ্রহ কয় প্রকার? মনোযোগের সঙ্গে আগ্রহ কিভাবে সম্পর্কিত? শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। অনুকরণের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ সাহায্যে এর স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। শিশুদের শিক্ষায় অনুকরণের ভূমিকা কি?

৪। প্রাণীদের শিখন বিষয়ে যে কোন একটি পরীক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ দাও এবং শিশু শিখনের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা পরিস্ফুট কর।

৫। (ক) শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? (খ) 'বস্তুমুখী অভীক্ষা' বলতে কি বোঝায়? এর গুণ ও দোষগুলি আলোচনা কর।

৬। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? যে কোন **একটি** পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং স্কুলের শিক্ষায় এর উপযোগিতা বিচার কর।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন **দুইটি**):

(ক) শিখনের উপর পরিণমনের প্রভাব ;

(খ) চাহিদার সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক ;

(গ) তোমার বিদ্যালয়ের প্রতি তোমার মনোভাব ;

(ঘ) তোমাদের স্কুলের মূল্যায়ন প্রণালী।

৮। গণিত পরীক্ষার নিম্নলিখিত 25টি স্কোরকে 'তিনের শ্রেণী-ব্যবধানে' একটি পরিসংখ্যাবণ্টনে সাজাও। প্রথম শ্রেণী-ব্যবধানটি 60 থেকে আরম্ভ কর। তারপর এ বিষয়ে যে কোন একটি লেখচিত্র এঁকে তোমার মন্তব্য দাও।

72	81	67	83	61
75	78	82	71	67
77	65	76	63	84
67	86	76	72	69
72	73	70	72	64